নূতন ছন্দ-পরিক্রমা প্রবোধচন্দ্র সেন

ছন্দ পরিক্রমা

নূতন ছন্দ-পরিক্রমা

প্রবোধচন্দ্র সেন

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৬
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

ISBN 978-81-7066-576-2 (print)
ISBN 978-93-90048-58-8 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: প্রবীর সেন

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এখন থেকে ভবিষ্যতে, আমার জীবনকালে ও তৎপরে— (১) আমার যেসব অ-গ্রন্থভুক্ত মুদ্রিত রচনা (সাময়িক পত্রে, কোনো সংকলনগ্রন্থে বা অন্য লেখকের রচিত গ্রন্থে প্রকাশিত) আমার নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, (2) বর্তমানে অপ্রাপ্য যেসব গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রত্যাশিত, এবং (৩) বর্তমানে প্রচলিত যেসব গ্রন্থ ভবিষ্যতে অপ্রাপ্য হবে—এই তিন শ্রেণীভুক্ত সব গ্রন্থের আইন-সম্মত আমার সর্ববিধ আর্থিক স্বত্বাধিকার আমি কিছু শর্তসাপেক্ষ ভাবে সর্বসাধারণের অনুকূলে দান করলাম। প্রধান শর্তগুলি এই।—

এক। যেসব বই সম্পাদনের দায়িত্ব নিতে আমি অনিচ্ছুক বা অক্ষম, সেসব বই আমার অনুমোদিত কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে সম্পাদন করিয়ে অখণ্ডিত ও অপরিবর্তিত রূপে প্রকাশ করতে হবে।

দুই। প্রকাশের পরে আমাকে কয়েকখানি (সাধারণতঃ আটখানি, উভয় পক্ষের সুবিধা এবং আমার প্রয়োজন বিবেচনায় তার চেয়ে কিছু বেশি বা কম) বই দিতে হবে।

তিন। প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের পরে তিন মাসের মধ্যে বই বিক্রির হিসাব এক কপি আমাকে দিতে হবে এবং আর-এক কপি (প্রচলিত বিধি অনুসারে রেভিনিউ-স্ট্যাম্প সহ আমার অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত) থাকবে প্রকাশকের জিম্মায়।

চার। আমার মৃত্যুর পরে আমার পত্নী শ্রীমতী রুচিরা সেনের অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করতে হবে। উক্ত তিন শর্ত তখনও বলবৎ থাকবে।

পাঁচ। আমার পত্নীর মৃত্যুর পরে আমার সমস্ত গ্রন্থ ও রচনা মূল বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় অথবা ভাষান্তরিত করে প্রকাশের সম্পূর্ণ নিঃশর্ত অধিকার হবে সর্বসাধারণের। অর্থাৎ, আমাদের দেশের প্রচলিত কপিরাইট-আইন এ-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, এই আমার অভিপ্রায়। যত দিন আমি স্বেচ্ছায় ও সুস্থ মনে এই অভিপ্রায় প্রত্যাহার বা পরিবর্তন না করব, তত দিন এই বিজ্ঞপ্তিপত্রই আমার অন্তিম ইচ্ছাপত্র ও আইনসম্মত দলিল বলে গ্রাহ্য হবে।

ছয়। যেসব বই-এর যে-যে সংস্করণ আমার উদ্‌যোগে অথবা আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে বা হবে সেসব বইএর সেই-সেই সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলির স্বত্বাধিকার আপাততঃ আমার বা আমার পত্নীরই থাকবে।

এ-বিষয়ে আগ্রহী যে-কোনো সাহিত্যচর্চা-প্রতিষ্ঠান, প্রকাশন-সংস্থা বা ব্যক্তিবিশেষ সাক্ষাতে বা চিঠি লিখে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আনুষঙ্গিক অন্য সব কথা জানানো যাবে।

'রুচিরা', শান্তিনিকেতন **প্রবোধচন্দ্র সেন**

৪ নভেম্বর ১৯৮৫ ॥ ১৮ কার্তিক ১৩৯২

এই লেখকের ছন্দ-গ্রন্থাবলী—

১। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী, ১৯৪৫ জুন।
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ অচির-প্রকাশ্য।

২। ছন্দ-পরিক্রমা (প্রথম)। জিজ্ঞাসা, ১৯৬৫ মে।
এই গ্রন্থেরই আমূল পরিবর্তিত রূপ বর্তমান 'নূতন ছন্দ-পরিক্রমা'।

৩। ছন্দ-জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪, এপ্রিল।

৪। ছন্দ (রবীন্দ্রনাথ)। এই লেখক-কর্তৃক পুনর্বিন্যস্ত ও ব্যাখ্যাত তৃতীয় প্রকাশ। বিশ্বভারতী, ১৯৭৬ জানুয়ারি।

৫। বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা। জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭ এপ্রিল।
এই গ্রন্থের প্রায় অর্ধাংশ (পৃ ১-৮৫) এই লেখকের। বাকি অংশ (পৃ ৮৬-১৭৭) অন্য সাত ছান্দসিকের।

৬। ছন্দ-পরিক্রমা (দ্বিতীয়)। জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭ সেপ্টেম্বর।
পরিমার্জিত দ্বিতীয় প্রকাশ প্রত্যাশিত।

৭। বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ। অণিমা, ১৯৭৮ এপ্রিল।
পরিমার্জিত দ্বিতীয় প্রকাশ প্রত্যাশিত।

৮। **ছন্দ-সোপান।** অণিমা, ১৯৮০ জুলাই।

৯। আধুনিক বাংলা ছন্দসাহিত্য (১৯১৮-৮০)। অণিমা, ১৯৮০ আগস্ট।

১০। **বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ।** রবীন্দ্রচর্চা-ভবন, ১৯৮১ এপ্রিল।

১১। নূতন ছন্দ-পরিক্রমা। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৬ জানুয়ারি।

১২। বাংলা ছন্দচিন্তার অগ্রগতি (ঊনবিংশ শতক)। প্রকাশ আসন্ন।

প্রথম শিক্ষার্থীদের প্রতি

প্রথম ছন্দশিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী অতি ছোট দুটি বই।—

১। ছন্দ-সোপান। তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান—অণিমা প্রকাশনী, ১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯।

২। বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ। দশ টাকা

এই পুস্তকের মূল পাঠ্যাংশের (পৃ ১-৬০) অন্তে 'দৃষ্টান্ত-পরিচয়' নামে একটি বিভাগ (পৃ ৬১-৬৮) যুক্ত করা হয়েছে। এটির সহায়তায় প্রথম শিক্ষার্থীরাও অতি সহজেই বালা ছন্দের রীতি ও রূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) রবীন্দ্রচর্চা-ভবন। ৯৭এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬।

(২) পুস্তক-বিপণি। ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।

এই দুটি বই আগে পড়ে নিলে 'নূতন ছন্দ-পরিক্রমা' এবং এই লেখকের অন্য যে-কোনো ছন্দের বই অনুসরণ করা সহজ হবে।

প্রবোধচন্দ্র সেন

ছন্দশিল্পী কবি
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
স্নেহভাজনেষু

হায় গো রূপকার,
ভরিয়া দিয়ো জীবন-উপহার;
চুকিয়ে দিয়ে তোমার দেয়,
রিক্ত হাতে চলিয়া যেয়ো,
কোরো না দাবি ফলের অধিকার।
জানিয়ো মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথি আছেন হিয়া-মাঝে;
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।

—**রবীন্দ্রনাথ**

বিন্যাসক্রম

বাংলা ছন্দের রূপবৈচিত্র্য

পরিভাষাকোষ ও মতান্তরবিচার

এখানে শুধু প্রধান সংজ্ঞাশব্দগুলির পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লিখিত হল, আর বিশেষভাবে আলোচিত শব্দগুলি মুদ্রিত হল মোটা হরফে।

নিবেদন

(১৯৬৫)

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি দীর্ঘকালের চিন্তা, চর্চা ও অভিজ্ঞতার ফল। আশা করি এখানে তার একটু ইতিহাস দেওয়া অনুচিত হবে না।

ছন্দচর্চার ইতিহাস

ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়বার সময়েই বাংলা ছন্দের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট হয়; আর তখনই তার বিশ্লেষণপ্রণালীর ত্রুটি এবং অপূর্ণতা আমার মনকে পীড়িত করে।

আমাদের বাংলাসাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটির কথা আজও মনে আছে। যেমন—কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন', কাশীরাম দাসের 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্ভরসভা' এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'কৈলাসবর্ণন'। কাশীরামের স্বয়ম্বরসভাবর্ণনার

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥

ইত্যাদি অংশের রচনাকৌশল ও ছন্দোবৈশিষ্ট্যে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম, অন্নদামঙ্গলের

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস।

এই রচনার ছন্দোবন্ধুরতায় তেমনি অস্বস্তিবোধ করেছিলাম। ওই পাঠ্যপুস্তকে মধুসূদনের 'অশোকবনে সীতা' নামে একটি রচনাও ছিল যার আরম্ভে আছে

একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে।

এইঅংশটুকুর ভাবসম্পদ্ তথা রচনাবৈশিষ্ট্যের প্রতি উদাসীন থাকতে পারিনি।

কিন্তু আমার মনকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের দুটি রচনা। রবীন্দ্রনাথের

আজি কি তোমার মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে,
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ

ঝলিছে অমল শোভাতে।

আর সত্যেন্দ্রনাথের

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল?

এই দুটি রচনা ভাবের অভিনবতায় ও গভীরতায় আমার হৃদয়কে যেমন নিবিড়ভাবে অধিকার করেছিল, এ-দুটির নূতন ধরনের ছন্দের দোলাও তেমনি অননুভূতপূর্ব ভঙ্গিতে মনকে নাচিয়ে তুলেছিল। কিন্তু 'অক্ষর' গণনা করে এ দুই ছন্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তেমনি নিরাশ হতে হয়েছিল। এই অক্ষমতায় মনটা যে কতকখানি দমে গিয়েছিল তা আজও মনে আছে। প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ'-খানি তখন আমাদের ভালো করেই পড়তে হয়েছিল। এই ব্যাকরণের শেষের দিকে একটি অধ্যায়ে ছিল ছন্দের আলোচনা। এই অধ্যায়টা ইস্কুলে পড়ানো হত না। কিন্তু সে অধ্যায়টার প্রতি আমার আগ্রহ কম ছিল না। এই অধ্যায়ে বাংলা ছন্দের যে বিবরণ দেওয়া ছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশ কবিতাই বিশ্লেষণ করা গেল। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ চিনে নিতে কোনো অসুবিধা হল না। এমন কি, অমিত্রাক্ষর বন্ধের অভিনবত্বেও অনায়াসেই উপলব্ধি করা গেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের উল্লিখিত কবিতা-দুটির ছন্দ কিছুতেই বিশ্লেষণ করা গেল না। 'সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণে' বিভিন্ন ছন্দের যে বিবরণ দেওয়া ছিল তার প্রায় সবগুলিরই মূলনীতি ছিল 'অক্ষরগণনা'। আর ছিল তোটক তূণক ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দের বর্ণনা। সেগুলিও অক্ষরসংখ্যার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, যদিও অক্ষরগুলি বিভিন্ন ছন্দে লঘুগুরুভেদে বিভিন্ন প্রণালীতে সজ্জিত। এই দুই উপায়ের কোনো উপায়েই ও-দুটি কবিতার ছন্দ নিরূপণ করা গেল না। এই অভাববোধের দুঃখ আমার মন থেকে কখনও যায়নি। মনে হয়েছিল, এই ছন্দের অধ্যায়টা নূতন করে রচিত হওয়া উচিত যাতে সমস্ত ছন্দেরই যথাযথ বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয়।

আরও বছর তিনেক পরে আমাদের পড়তে হল নেস্‌ফীল্ডের ইংরেজি ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণের শেষভাগেও ছিল একটি ছন্দের অধ্যায়। এই অধ্যায়ে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে ইংরেজি ছন্দোনীতি ও ছন্দোবন্ধের যে সতর্ক বিশ্লেষণ ও প্রণালীবদ্ধ সুশৃঙ্খল বিবরণ দেওয়া ছিল, তার তুলনায় বাংলা ছন্দব্যাকরণের দুর্বলতাটা আরও গভীরভাবে অনুভব করলাম। এই সময়ে ***Lahiri's Select Poems*** নামক ইংরেজি কবিতার বইটি আমাদের পড়তে হত। নেস্‌ফীল্ড-ব্যাকরণের সূত্র ধরে এই সংকলনপুস্তকের কবিতাবলীর ছন্দোনিরূপণ করা গেল অনায়াসেই, কোথাও খটকা লাগল না। মনে হল বাংলা ব্যাকরণের সূত্র ধরে এভাবে বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করা যায় না কেন।

ইতিমধ্যে আমাদের বিদ্যালয়লব্ধ সংস্কৃতজ্ঞানও কিছু অগ্রসর হয়েছে। আমাদের বিদ্যাপ্রসারের দিকে, বিশেষতঃ কালিদাসের রচনার সঙ্গে পরিচয়-সাধনের দিকে, আমাদের সংস্কৃতশিক্ষক মহাশয়ের উৎসাহ ছিল প্রচুর। এই সময়েই হাতে এসে পড়ল সংস্কৃত 'ছন্দোমঞ্জরী' বইখানি। এই বই-এর সাহায্যে ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, স্রগ্ধরা, রুচিরা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত ছন্দের পরিচয় পাওয়া গেল। সংস্কৃত

ছন্দোনীতির স্বাতন্ত্র্য এবং বিভিন্ন ছন্দের অপূর্ব বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য মনের মধ্যে এক নূতন আনন্দের সঞ্চার করল। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রসাদে ও নিজের আগ্রহে কালিদাসের রচনার যে রস উপভোগ করা গিয়েছিল, ছন্দরস-উপলব্ধি ছিল তার অত্যাজ্য অঙ্গ।

ইংরেজি ও সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের মৌলিক পার্থক্যবোধ বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্যনির্ণয়ের প্রতি মনকে আরও উন্মুখ করে তুলল। এই মানসিক প্রবণতার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল আমার ছন্দবিষয়ক প্রথম প্রবন্ধগুলিতেই।

বাংলা ছন্দের এই বৈশিষ্ট্য নিরূপণের প্রচেষ্টাও শুরু হল। তার একটা সুযোগও জুটে গেল অবিলম্বেই। ইস্কুলের উচ্চতর বর্গের ছাত্রদের পক্ষ থেকে একটা হাতে-লেখা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হল। পত্রিকাটির নাম রাখা গেল 'নবযুগ'। সম্পাদকতার গুরুদায়িত্ব পালনের অত্যুৎসাহে কিছুমাত্র ত্রুটি ঘটল না। এই সম্পাদকীয় কর্তব্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল সহপাঠীদের রচিত কবিতাবলীর ছন্দসংশোধন বা ছন্দের উন্নতিবিধান। কাজটা বড় সহজ ছিল না। সমবয়সী সহপাঠী কবিযশঃপ্রার্থীদের রচনার ত্রুটি বা দুর্বলতা সম্বন্ধে তাদের আপত্তি নিরসন করা সুসাধ্য নয়। অনেক যুক্তিতর্ক ও তথ্য দেখিয়ে তাদের নিরস্ত করতে হত। এই উপলক্ষে বিচিত্র ছন্দের কবিতা পড়তে হয়েছিল প্রচুর পরিমাণে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মূলগত ছন্দোনীতি আবিষ্কারের প্রতিও মনোনিবেশ করতে হয়েছিল গভীরভাবে। কারণ তর্কযুদ্ধে সমকক্ষের সম্মুখীন হতে হলে যথোচিতরূপে অস্ত্রসজ্জিত হওয়া চাই। শুধু কানের দোহাই দিয়ে লড়াই ফতে করা সম্ভব ছিল না। কারণ প্রতিপক্ষেরও তো কানের দোহাই দেবার অধিকার ছিল সমভাবেই। এই লড়াই-এ যে মাঝে-মাঝে পিছু হটতে হয়নি তাও নয়। একবার স্বোদ্ভাবিত যে ছন্দোনীতির অস্ত্র নিয়ে লড়াই ফতে করতে চেয়েছি, পরের বার সে ছন্দোনীতিটাকেই পুনর্বিচার করতে এবং প্রয়োজনমতো সংশোধন করতে বাধ্য হয়েছি। সে আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কালের কথা। স্বমতের পুনর্বিচারের উন্নতিবিধানের প্রবণতা তথা প্রক্রিয়া আজও শেষ হয়েছে বলা যায় না।

শুধু যে সতর্ক বিচারবিশ্লেষণের পথেই ছন্দোনীতি-নিরূপণের দিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তা নয়। সমকক্ষদের তাড়নায় সক্রিয় পরীক্ষণ এবং সংগঠনের পথেও এগোতে হয়েছিল। অথাৎ ছন্দ-রচনাতেও হাত পাকাতে বাধ্য হয়েছিলাম, প্রথমে গোপনে ও পরে প্রকাশ্যে। দেখা গেল প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করবার পক্ষে এটাই সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র। এই হাত পাকাবার অভ্যাস দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। তার ফসলের পরিমাণও কম হয়নি। কিন্তু সেগুলি সবই মরশুমী, প্রয়োজনের ঋতুর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলির আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হয়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ছন্দপ্রবন্ধগুলিতে তার কিছু অবশেষ এখনও রয়ে গেছে। প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধেই তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যাবে।

২

যে সময়ে আমার বালকজীবনে এই ছন্দজিজ্ঞাসা দেখা দেয় সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র ছন্দের বান ডেকে চলেছে। প্রবাসী, ভারতী, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকায় প্রতি মাসেই নানা ছন্দের যে ঐকতান-উৎসব চলছিল, আমার কান আশ মিটিয়ে তার মাধুর্য পান করেছে। সে যুগে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র,

যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়—প্রমুখ কবিদের সমবেত ছন্দসংগীতে বাংলাসাহিত্যের আসর যেভাবে মুখরিত হয়ে উঠেছিল, আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কিছু তুলনা হতে পারে বৈষ্ণব যুগের সঙ্গে। এ কথা সত্য যে, "বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলাসাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে" (রবীন্দ্রনাথ)। বস্তুতঃ বৈষ্ণবপদাবলী-যুগের ছন্দোবৈভব বাংলাসাহিত্যে পরম গৌরবের বস্তু। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক, এই প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে নবছন্দপ্রবর্তনার বেগ দ্রুতসঞ্চারিত হয়ে ও অচিরাৎ মহাকল্লোলের রূপ ধারণ করে বাংলা সাহিত্যজগৎকে যেভাবে মুখরিত করে তুলেছিল, তার তুলনায় বৈষ্ণবপদাবলীর ছন্দসমৃদ্ধিও অকিঞ্চিৎকর বলেই প্রতীয়মান হবে। এই যুগের বাংলাকাব্য-আত্মার অন্যতম মুখ্য বাণীই যেন ভাষা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের এই দুটি উক্তিতে।

এক। টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ,
নবসংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক নবীন বাসনা।

—'সোনার তরী', বিশ্বনৃত্য (১৮৯৩)

দুই। নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে ওঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।

—'চিত্রা', অন্তর্যামী (১৮৯৪)

বাংলাসাহিত্যে ছন্দ-উদ্ভাবনার এই স্বর্ণযুগেই যে আমার ছন্দচেতনার জাগরণ ঘটেছিল, এটাকে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলেই মনে করি।

মা, তোর মুখের বাণী
আমার কানে
লাগে সুধার মতো।

অন্তরের মধ্যে অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছিলাম যে, বাংলাবাণীর এই অমৃতরসের অনেকখানি নিহিত ছিল তার বিচিত্র ছন্দসম্পদের মধ্যে। এই বৈচিত্র্যানুভূতির বিস্ময়ই আমাকে প্রবর্তিত করেছিল তার কক্ষে কক্ষে বিচরণ করে তার স্বরূপ-উদঘাটনের দিকে।

এই প্রবর্তনা কেবল আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা হতেই পারে না। আমার অগ্রগামীদের মধ্যেও যে তার ক্রিয়া চলছিল তার কিছু কিছু নিদর্শন পেয়েছিলাম তৎকালীন সাময়িক প্রত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে। যে সময়ে আমি আমার সহপাঠী কাব্যকারদের সঙ্গে ছন্দবিতর্কে নিরত ছিলাম সে সময়ে প্রকাশিত এই ছন্দপ্রবন্ধগুলির প্রতি আমার আগ্রহের সীমা ছিল না। আমার তৎকালীন ছন্দজিজ্ঞাসাই যে এই আগ্রহের একমাত্র কারণ তা নয়। তার ব্যাবহারিক প্রয়োজনও ছিল। যেখান থেকেই হক, ছন্দের মূলনীতির সন্ধান

পাওয়া গেলে সেটাকে হাতে-কলমে ছন্দপরীক্ষণের কাজেও লাগানো যাবে, আর তাতে সহপাঠী বন্ধুদের ছন্দরচনায় সহায়তাও করা যাবে, তাও ছিল এই আগ্রহের অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনো প্রবন্ধের দ্বারাই আমার জিজ্ঞাসার তৃপ্তি ঘটল না।

এখানে তৎকালপ্রকাশিত ছন্দপ্রবন্ধগুলির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ১৩২১ সালের গোড়ার দিকে বাংলা সাময়িক পত্রিকায় পরপর তিনটি ছন্দ-আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই তিনটির মধ্যে কবি **শশাঙ্কমোহন সেনের** 'বাঙ্গালা ছন্দ' প্রবন্ধটিই[১] (১৩২০ চৈত্র ২৭ তারিখে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত) বোধ করি অগ্রণীত্বের অধিকারী। প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশের (১৩২১ আষাঢ়) সঙ্গে সঙ্গেই অসীম আগ্রহ নিয়ে প্রবন্ধটি নিজেও বারবার পড়েছি, সহপাঠী বন্ধুদেরও পড়ে শুনিয়েছি এবং ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই নিজের মনেও তৃপ্তি পেলাম না, বন্ধুদেরও সন্তুষ্ট করা গেল না। আমার অতৃপ্তির কারণ যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে ছন্দোবিশ্লেষণ ও নীতিনিরূপণ-প্রয়াসের অভাব। আমার বোধ হয়েছিল কবিসুলভ ভাবোচ্ছ্বাস ও তত্ত্বকল্পনার প্রভাবে বাংলা ছন্দের সত্যরূপটিকেই যেন আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছিল এবং ফলে ছন্দের বিভিন্ন নীতিসূত্রের মধ্যে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। তাই এই প্রবন্ধটি আমার মনে কোনো স্থায়ী ছাপ রাখতে পারে নি। তার চেয়ে স্পষ্টতর সত্যের আভাস পেয়েছিলাম সবুজপত্রে প্রকাশিত (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রাবণ) **রবীন্দ্রনাথের** দুটি পত্রপ্রবন্ধ থেকে। কিন্তু এ-দুটিতেও বাংলা ছন্দের রূপবিশ্লেষণ ও নীতিনিরূপণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেল না। এর কিছুকাল পরে প্রবাসীতে (১৩২২ অগ্রহায়ণ) **বিজয়চন্দ্র** মজুমদারের একটি প্রবন্ধ ('কবিতার ভাষা ও ছন্দ') প্রকাশিত হয়। এটিতে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নিয়ে ছন্দোবিশ্লেষণের প্রয়াস সুস্পষ্ট। তাতে ছন্দোনীতির কোনো-কোনো বিশেষ দিক্ নিয়ে কিছু নিপুণ আলোচনাও আছে, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ এবং ছন্দজিজ্ঞাসুর তৃপ্তিবিধানে অক্ষম।

এর কিছুকাল পরে সবুজপত্রে **রবীন্দ্রনাথের** আরও দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একটির নাম 'সংগীতের মুক্তি' (১৩২৪ ভাদ্র), অপরটির নাম 'ছন্দ' (১৩২৪ চৈত্র)। প্রথমটিতে গানের তালের সঙ্গে বাংলা ছন্দপর্বের সাদৃশ্যের দিক্টা বেশ সুস্পষ্টরূপেই ফুটে উঠেছে। বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথের ছন্দদৃষ্টি অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রিত হয় সংগীতদৃষ্টির দ্বারা।

> 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি,
> তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।'—

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাঁর ছন্দ-আলোচনার সম্পর্কেও অনেক পরিমাণে সত্য। এই গানের দৃষ্টি তাঁর উক্ত 'ছন্দ' প্রবন্ধটিতেও প্রকাশ পেয়েছে, এক হিসাবে 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধের চেয়ে গভীরতর ও সূক্ষ্মতর ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য এই প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে এমন আরও অনেক কথা আছে যার গুরুত্ব সামান্য নয়। রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দপ্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে, এগুলি সবই ছন্দরচনার দৃষ্টি নিয়ে লেখা, ছন্দব্যাকরণের দৃষ্টি নিয়ে নয়। এ দৃষ্টি স্রষ্টার, বিশ্লেষকের নয়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহাশিল্পীর দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া কম লাভ নয়। কিন্তু শিল্পরচনার ও ব্যাকরণবিশ্লেষণের দৃষ্টি দুই ভিন্ন জাতের জিনিস। এই দুই দৃষ্টি পরস্পরবিরোধী না হলেও তাদের ক্ষেত্র পৃথক্, তাদের সার্থকতাও স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দসরস্বতী'-নামক সুবিখ্যাত প্রবন্ধটি[১] (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ)। এই প্রবন্ধটিতে নিছক বিশ্লেষণের অভিপ্রায়কে অন্তরালে রেখে রচনারসসৃষ্টিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তথাপি এই রচনাটিতে অলংকৃত ভাষার ও রূপকজালের আড়াল থেকে সত্যেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য নানাভাবে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী ও ভাষা-প্রয়োগের অভাবে ছন্দজিজ্ঞাসুর আকাঙক্ষা অতৃপ্তই থেকে যায়। তা ছাড়া, ছন্দব্যাকরণের অনেকগুলি প্রধান বিষয়ই এই প্রবন্ধের আওতার মধ্যে পড়ে নি।

বলতে ভুল হয়েছে যে, এরই মধ্যে কোনো সময়ে (বোধকরি শশাঙ্কমোহনের প্রবন্ধ পড়বার আগেই) দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যের (১৩১৪ বৈশাখ) ভূমিকা থেকে বাংলা লৌকিক রীতির ছন্দসম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গির তথা সৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে খুবই বিস্মিত হই। কিন্তু ওই স্বল্পায়াতন আলোচনার অপূর্ণতা ও পারিভাষিক শব্দপ্রয়োগের অনির্দিষ্টতা আমার অভাববোধ মেটাবার পক্ষে অন্তরায়স্বরূপই হয়েছিল।

এতগুলি প্রবন্ধ পড়েও আমার অশান্ত ছন্দজিজ্ঞাসার শান্তিবিধান হল না। বরং এগুলি আমার অতৃপ্তিকে বাড়িয়েই তুলল। এই অতৃপ্তির প্রেরণাতে অবশেষে নিজেই অগ্রসর হলাম ছন্দব্যাকরণ রচনার দিকে। আমার স্বল্প শিক্ষা ও স্বল্পতর শক্তি সম্বন্ধে আমি অচেতন ছিলাম না। কি যে কুণ্ঠা, ও দ্বিধা-গ্রস্ত চিত্ত নিয়ে এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তা আজও ভুলতে পারি নি। কেবলই মনে হচ্ছিল, 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ'। তবু যে আমি এ পথে চলতে উদ্যত হয়েছিলাম তার কারণ আছে। এতদিন পর্যন্ত যাঁরা ছন্দ-আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা সকলেই কবি। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ও শশাঙ্কমোহনের প্রবন্ধগুলি পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল, জাত-কবিদের পক্ষে শিল্প ও ব্যাকরণকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসম্ভব না হলেও সুসাধ্য নয়, অর্থাৎ অমিশ্র ব্যাকরণবুদ্ধি জাত-কবিদের কাছে প্রত্যাশিত নয়, প্রত্যাশা করা উচিতও নয়। অতএব এ কাজে অ-কবিদেরই অগ্রসর হওয়া উচিত। সেইজন্যই আমি একান্ত ভয়ে ভয়ে হলেও নিছক ব্যাকরণবুদ্ধিকে সম্বল করেই এ কাজে ব্রতী হতে সাহসী হয়েছিলাম। আমার প্রথম প্রবন্ধ পাঁচ মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল প্রবাসী পত্রিকায় (১৩২৯ পৌষ-চৈত্র এবং ১৩৩০ বৈশাখ)।

৩

আমার এই প্রথম প্রচেষ্টা অপ্রত্যাশিতরূপে পুরস্কৃত হল নানা দিক্ থেকে। পুরস্কার এল রবীন্দ্রনাথের মতো কবির এবং সুনীতিকুমারের মতো ভাষাচার্যের হাত থেকে। কবি মোহিতলালের কাছে যে উৎসাহ পেয়েছিলাম তাও উপেক্ষণীয় নয়। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে পরে শুনেছি আমার প্রবন্ধটি পাঠানো হয়েছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। তিনি পড়ে খুশি হয়েছিলেন। তাঁর সানন্দ অনুমোদনের ফলেই লেখাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পরে এটি সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করবেন, এ অভিপ্রায়ও জানিয়েছিলেন। আমার পক্ষে গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, তার পূর্বেই তাঁর অকালতিরোধান ঘটে (১৩২৯ আষাঢ়)।

কিন্তু প্রবন্ধটি প্রকাশের পরে এটির অপূর্ণতা ও ত্রুটিগুলি অন্যের দৃষ্টি এড়ালেও আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। আমার আত্মপরীক্ষণের প্রবৃত্তি তখনও নিষ্ক্রিয় হয় নি। ফলে রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার-প্রমুখ অনেকের কাছ থেকে পুনঃপুনঃ উৎসাহ পাওয়া সত্ত্বেও এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে উৎসুক হই নি। আমার ছন্দজিজ্ঞাসা এগিয়েই চলল। লক্ষ্য হল এই প্রবন্ধটির সমস্ত অপূর্ণতা ও ত্রুটি নিরসন করে একটি পূর্ণাঙ্গ ছন্দব্যাকরণ রচনা করা।

বারবার সে কাজে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু বারবারই বাধা পেয়ে সে কাজ আজও অপূর্ণই রয়ে গেছে। সে বাধা কখনও এসেছে ভিতর থেকে অর্থাৎ নিজের মানসিক তৃপ্তিবোধের অভাব থেকে, কখনও এসেছে বাইরে থেকে অর্থাৎ প্রতিপক্ষ পাঠকদের পরিতৃপ্ত করবার অক্ষমতা থেকে। বাইরের বাধার ইতিহাসটাও সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বার সংকল্পবদ্ধ হয়ে ছন্দব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হই ১৩৩৭-৩৮ সালে (ইং ১৯৩১)। তারই পূর্বাভাসস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্‌মন্দিরে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিই (১৩৩৮ ভাদ্র) এবং বিচিত্রা পত্রিকায় '**বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ**' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ)। এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে বাংলা ছন্দ নিয়ে একটা বাদপ্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায় বিভিন্ন পত্রিকায়। প্রথম প্রতিবাদ আসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, সে প্রতিবাদের আঘাতও খুব সামান্য ছিল না। অতঃপর সেই ছন্দবিতর্কের রণক্ষেত্রে অমূল্যধন, দিলীপকুমার, মোহিতলাল, সজনীকান্ত প্রমুখ আরও অনেকেই অবতীর্ণ হন। সে ছন্দসংগ্রামের কিছু ইতিহাস পাওয়া যাবে এই তিনটি গ্রন্থে।—

১। রবীন্দ্রনাথ—'ছন্দ' (১৩৬৯), বিজ্ঞপ্তি এবং পাঠ পরিচয়, পৃ ৩৮০-৪১৩;

২। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—'বিগত দিন' (১৩৬৪), অধ্যায় ৭-৮;

৩। দিলীপকুমার রায়—'স্মৃতিচারণ' দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৬৮), পৃ ১৪২-৪৬।

এই তর্কবিতর্কের যুগে দীর্ঘকাল ধরে বহু প্রবন্ধ লিখে নিজের বক্তব্যকে পাঠকের কাছে উত্তরোত্তর অধিকতর সহজবোধ্য করে তুলতে প্রয়াসী হতে হয়েছিল। তাতে নিজের ছন্দবোধকে গভীরতর করে তোলবার পক্ষে খুবই সহায়তা হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ঝড়ের বেগে ছন্দব্যাকরণ রচনার সংকল্প বানচাল হয়ে গেল। অনেক প্রবন্ধ লেখা হল বটে, কিন্তু বই লেখা আর হল না। এইভাবে আমার ছন্দজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় পর্ব (১৩৩৭-৪৪) উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

তৃতীয় পর্বে (১৩৪৮-৬৪) ছন্দব্যাকরণ রচনার সংকল্প আপাততঃ স্থগিত রেখে রবীন্দ্রসাহিত্যের ছন্দোবিবর্তনের প্রতি মনোনিবেশ করা গেল। তার ফল **'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'** গ্রন্থ (১৯৪৫। বাং ১৩৫২ আষাঢ়)। তখন আধুনিক বাংলা ছন্দের বিবর্তনধারা অনুসরণের ইচ্ছাও আমার ছিল। সুসময়ে ছন্দজিজ্ঞাসু ছাত্র **নীলরতন সেনের** গবেষণানিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে তার উপরেই এ কাজের ভার দেওয়া গেল। তাঁর বহু বৎসরের প্রচেষ্টায় আমার এই ইচ্ছা অনেকাংশেই সফল হয়েছে। তাঁর **'আধুনিক বাংলা ছন্দ'** বইখানি (১৯৬২। বাং ১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠ) ছন্দচর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে।

এই সময়ে ছন্দব্যাকরণ রচনার সংকল্প আবার জেগে ওঠে। তার জন্য পুনঃপ্রস্তুতির কাজও শুরু হয়। এই প্রস্তুতির কিছু পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে **'বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র'** প্রবন্ধটিতে (১৯৪৫। বাং ১৩৫২ আশ্বিন)। পূর্ববর্তী ছন্দবিতর্কের যুগেই বোঝা গিয়েছিল যে, এই কোলাহলের অন্যতম মূলকারণ হল সুষ্ঠু, অথাৎ দ্ব্যর্থহীন সহজবোধ্য ও সুনির্দিষ্ট, পরিভাষার অভাব। তাই নূতন করে বিচারসহ ও স্বতঃস্বীকার্য পরিভাষার সন্ধানে ব্রতী হতে হয়েছিল। এই কাজ শুরু হয় ছন্দচর্চার প্রথম পর্বেই, তৃতীয় পর্বেও তার সমাপ্তি হয় নি। তথাপি এই পর্বেই পরিভাষা-জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্তির অনেকটা কাছাকাছি এসেছিল, এ কথা বলা যায়। তার কিছু কিছু পরিচয় আছে এই সময়কার ও পরবর্তী কালের অনেক প্রবন্ধে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **'ছন্দপরিভাষা'**-নামক প্রবন্ধটি (১৯৪৯। বাং ১৩৫৫ মাঘ)। এই প্রবন্ধটি লিখিত হয় ছন্দব্যাকরণ রচনার নবোদ্যমের পূর্বাভাসরূপে। এটিতে প্রায় সমস্ত পারিভাষিক শব্দের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধে সবিস্তারে আমার শেষ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করি। অতঃপর এই প্রবন্ধের প্রায় পঞ্চাশটি মুদ্রিত কপি বাংলা দেশের প্রধান প্রধান কবি, ছান্দসিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও ছন্দশিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে তাঁদের অনুকূল বা প্রতিকূল অভিমত জানতে চাই, যাতে তাঁদের মতামতের সহায়তায় নিজের সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার করবার সুযোগ পাই। কিন্তু তার ফলটা খুব উৎসাহজনক হয় নি। কারণ অধিকাংশের কাছ থেকে শুধু সৌজন্যসূচক উত্তরই পেয়েছিলাম। একমাত্র কবি মোহিতলাল সৌজন্য না জানিয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন, যদিও তিনি কোনো পারিভাষিক শব্দের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো অভিমত প্রকাশ করেন নি। সুতরাং নিজের পথ নিজে রচনা করবার নীতিকেই আশ্রয় করতে হল। তখন থেকে ওই প্রবন্ধে স্বীকৃত পরিভাষাগুলি অনুসরণ করে চলছি। তাই ওই 'ছন্দপরিভাষা' প্রবন্ধটিকে কিছু পরিমার্জিত করে এই পুস্তকে স্থান দেওয়া গেল 'পরিভাষা-পরিচয়' নামে।

এই তৃতীয় পর্বেও যে ছন্দবিতর্ক সম্পূর্ণ নিরস্ত হয় নি, তার কিছু নিদর্শন আছে তৎকালীন 'উত্তরা' ও 'কবিতা' পত্রিকায়। তবে আমি নিজে এই বিতর্ক থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকাই কাম্য মনে করেছিলাম। আর বিতর্কটাও প্রত্যক্ষতঃ আমাকে স্পর্শ করে নি। শুধু দুইবার 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইটির বিরুদ্ধে সমালোচনা উপলক্ষে আমার নামটা তার সঙ্গে কিছু জড়িত হয়েছিল। দিলীপকুমারের সমালোচনার একটা উত্তর দেওয়া কর্তব্য বোধ করেছিলাম 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে (১৩৫২ ফাল্গুন)। 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৫২ চৈত্র) বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার উত্তর দেওয়া সম্পূর্ণ নিস্ফল হবে, এই আশঙ্কায় তার থেকে বিরত থাকি। বুদ্ধদেবের এই প্রবন্ধটি পরে তাঁর 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থে (১৩৬১ বৈশাখ) সংকলিত হয় 'বাংলা ছন্দ' নামে। বহু বৎসর পরে ইদানীং 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত **'পয়ার-পরিচয়'** প্রবন্ধে (১৯৬৪। বাং ১৩৭১ আষাঢ়) বুদ্ধদেবের উক্ত প্রবন্ধটির কিছু সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছি প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে। এই প্রবন্ধটিও বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হল পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে।

আমাদের ইস্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে ছন্দ-অধ্যায়ের অপূর্ণতা দেখে ছেলেবেলায় মনে যে খেদ দিয়েছিল, সে খেদও অন্ততঃ কিছু পরিমাণে মেটাবার সুযোগ এল এই তৃতীয় পর্বে। জগদীশচন্দ্র ঘোষের **'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ'**-খানির ছন্দ-অধ্যায়টির সংস্কারসাধনের অনুরোধে কয়েক সংস্করণেই অধ্যায়টির কিছু কিছু উন্নতিবিধান করা গেল। এভাবে কয়েক বৎসরে এই অধ্যায়টি প্রায় সম্পূর্ণ নূতন মূর্তিতে দেখা দিল। গ্রন্থের নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে রেখে সংস্কার করতে হত বলে সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায় নি বটে, কিন্তু ছেলেবেলার

একটা খেদ মেটাবার এটুকু সুযোগের মূল্যও আমার কাছে কম মনে হয় নি। এই পর্বের অন্যান্য প্রবন্ধ রচিত হয় নানা উপলক্ষে। তার ইতিহাস উল্লেখযোগ্য নয়।

চতুর্থ পর্বের (১৩৬৮-৭১) প্রধান ফসল রবীন্দ্রনাথের **'ছন্দ'** গ্রন্থ-সম্পাদন (১৯৬২। বাং ১৩৩৯ কার্তিক) ও রবীন্দ্রনাথের ছন্দশিল্প-বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ রচনা। সবগুলিই রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রচিত ও প্রকাশিত।

এই দীর্ঘকাল (১৯২২-৬৪। বাং ১৩২৯-৭১) ধরে প্রায় অবিশ্রান্তভাবে প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গে আমার জিজ্ঞাসা ও চিন্তাধারা স্বভাবতঃই নানা বাঁক ঘুরে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এই প্রবন্ধপ্রবাহ আমার জিজ্ঞাসা ও চিন্তাধারার অগ্রগতির তথা গতিপরিবর্তনের পথরেখা অঙ্কিত করে চলেছে। কালের গতির সঙ্গে চিন্তার গতি অনুসরণেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে। এ বিষয়ে উৎসুক লোকের সংখ্যা কম নয়। তাঁদের ঔৎসুক্য প্রশমনের অভিপ্রায়ে আমার ছন্দচিন্তাবিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করলাম এবং তাঁদের পথ সুগম করবার জন্য আমার ছন্দবিষয়ক রচনাসমূহের একটি কালানুক্রমিক তালিকা গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট করলাম। বলা বাহুল্য, অন্যান্য ছান্দসিকদের প্রবন্ধাবলীও নানা পত্রপত্রিকায় বিকীর্ণ হয়ে আছে। তবে সুখের বিষয় তার অধিকাংশই গ্রন্থাকারে সহজপ্রাপ্য। এখনও যা গ্রন্থভুক্ত হয় নি তার সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু আমার লিখিত প্রবন্ধাবলী গ্রন্থভুক্ত হয়ে সহজলভ্য হয় নি, বারবার এই অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অপরাধ অস্বীকারেরও কোনো উপায় নেই। কিছু পরিমাণে এই অপরাধ ক্ষালনের অভিপ্রায়েও বর্তমানে এই তালিকা সংকলন করা গেল। এগুলিকে গ্রন্থাকারে সংকলনের পরিকল্পনাও করা গিয়েছে। আশা করি তার প্রথম কিস্তি হিসাবে **'ছন্দজিজ্ঞাসা'** প্রথম পর্ব প্রকাশিত হতে দেরি হবে না। এখানে বলে রাখতে চাই যে, ঐতিহাসিক মূল্যই এই প্রবন্ধসমূহের একমাত্র সম্বল নয়, এগুলির স্থায়ী মূল্যও উপেক্ষণীয় নয় বলেই বিশ্বাস করি। নতুবা এগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছামাত্রও করতাম না।

এই যে অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া গেল তার আর-একটা দিকের কথাও উল্লেখ করা উচিত। প্রায় অর্ধশতাব্দী কালের ছন্দচর্চা ও প্রবন্ধরচনার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের সময় থেকে বহু ছন্দজিজ্ঞাসুর বহু সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে হাতে-কলমে। বুঝতে পেরেছি এটাও বড় সহজ কাজ নয়। এদের মধ্যে যেমন ছিল অল্পবয়সের শিক্ষার্থী, তেমনি ছিলেন পরিণতবুদ্ধি অভিজ্ঞ ব্যক্তিও। আমার পক্ষে তার চেয়েও সহায়ক হয়েছে ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা। অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করব, কলেজের অগ্রগামী ছাত্রদের ছন্দশিক্ষা দিতে গিয়ে তাঁদের যত শিখিয়েছি, তাঁর চেয়ে নিজে শিখেছি অনেক বেশি। ছন্দোনীতিকে তাঁদের কাছে স্পষ্ট ও সুষ্ঠুরূপে উপস্থিত করতে গিয়ে নিজের চিন্তাকেই স্বচ্ছতর ও পরিচ্ছন্নতর করবার প্রয়াস করতে হয়েছে অবিরত। সময়ে সময়ে মেধাবী ছাত্রদের বুদ্ধিসমুজ্জ্বল প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে গিয়ে অনেক সমস্যাকে নূতন দৃষ্টিতে দেখতে বা নূতনভাবে বিচার করতেও প্রণোদিত হয়েছি। তাদের সকলকেই আজ সুগভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

বর্তমান পুস্তকখানি রচনার মূলে রয়েছে পূর্বাশা-সম্পাদক স্নেহভাজন কবি শ্রীমান্ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহু ছন্দজিজ্ঞাসু ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকের আগ্রহ ও অনুরোধ। আসলে এ সময়ে এজাতীয় ছন্দগ্রন্থ প্রকাশের কোন পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় আমার ছিল না। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে শ্রীমান সঞ্জয় পয়ার-সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন ও সমস্যা উত্থাপন করে এ বিষয়ে পূর্বাশায় একটা প্রবন্ধ লেখবার জন্য বারবার অনুরোধ জানান। এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি বহুকাল পূর্বেই, বিশেষতঃ 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেবের পূর্বোক্ত 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধটি পড়বার সময় থেকে। কিন্তু যথেষ্ট প্রেরণার অভাবে এতদিন এ বিষয়ে কিছু লেখার আগ্রহ বোধ করি নি। এবার যখন পূর্বাশার জন্য লেখা শুরু করলাম তখন স্বতঃই মনের মধ্যে আগ্রহের বেগ দেখা দিল। মনে হল একে তো পয়ার বন্ধটা গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য উভয় দিক্ থেকেই সমস্ত বাংলা ছন্দোবন্ধের শীর্ষস্থানীয়, তার উপরে এটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবটাও বেশ ব্যাপক, সুতরাং এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধই লেখা উচিত। **'পয়ার-পরিচয়'** প্রবন্ধটি তারই ফল। এটি লিখতে গিয়ে সব সময়ই মনে রাখতে হয়েছিল যে, এটিকে পূর্বসংস্কারনিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে উপস্থাপিত না করলে এর উদ্দেশ্যই অনেকাংশে ব্যর্থ হবে, পাঠকমনের পূর্বলব্ধ ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধতায় পয়ারবন্ধের যথার্থ স্বরূপ-উপলব্ধির অন্তরায় ঘটবে। তাই কোনো দিকে ভ্রান্তির কোনো অবকাশ না রেখে প্রবন্ধটি যাতে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হয়েছিল। পয়ারের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হলে বাংলা ছন্দের মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। তাই এটিতে ছন্দের মূলনীতিগুলিকেও সংক্ষেপে পরিস্ফুট করতে চেষ্টিত হয়েছি, যাতে ছন্দোনীতির সাধারণ জ্ঞানের আলোতে পয়ারবন্ধের বিশেষ জ্ঞান লাভের সহায়তা হয়। ফলে পয়ারের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার উপলক্ষে এই প্রবন্ধটিকে একটি সংক্ষিপ্ত ছন্দব্যাকরণের রূপ দিতে হয়েছিল।

এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হল না। কোনো-কোনো ছন্দবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক এই অভিমত জানালেন যে, এটিকে পুস্তিকা-আকারে প্রকাশ করলে তাতে জিজ্ঞাসুদের ছন্দজ্ঞানলাভের ও পয়ার সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা-নিরসনের বিশেষ সহায়তা হবে। তাঁদের যুক্তি উপেক্ষণীয় নয় মনে করে প্রবন্ধটিকে পরিমার্জিত করতে প্রয়াসী হলাম। মাসিকপত্রিকালভ্য নির্দিষ্ট পরিসরের কথা বিবেচনা করে যেসব বক্তব্য বিষয়কে কিছু সংকুচিত করতে হয়েছিল সেগুলিকে বিশদ করা গেল এবং যেসব উক্তিতে কিছু অস্পষ্টতা ছিল বলে কারও কারও মনে হয়েছিল, সেগুলিকে স্পষ্টতর করা গেল। অতঃপর তাঁদেরই কারও কারও অনুরোধে প্রবন্ধটির শেষে পূর্বপ্রকাশিত 'ছন্দ-পরিভাষা' প্রবন্ধটিকে পুনঃসংস্কৃত রূপে যোগ করে দেবার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হল। সর্বশেষে এই মন্তব্যও এল যে, পয়ার-পরিচয়ের মুখবন্ধরূপে বাংলা ছন্দের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ যুক্ত হলে পুস্তিকাটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়। এই মন্তব্যের সঙ্গে যে অনুরোধ যুক্ত ছিল তাও উপেক্ষা করা গেল না।

এই হল এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তির ইতিহাস। এর থেকে সহজেই বোঝা যাবে, বইটিতে সম্পূর্ণতা থাকলেও তাতে অখণ্ডতা নেই এবং সমতার অভাবও আছে। কারণ এটি একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে রচিত নয়। এর তিনটি অধ্যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। কিন্তু এই বিভিন্ন উদ্দেশ্য একই মূল অভিপ্রায়ের বিভিন্ন অঙ্গ, প্রত্যেকটি অধ্যায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ একান্তভাবে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নয়। এই

স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছন্দ বিষয়টাকে অধিগত করার পক্ষে সহায়ক বলে আমার বিশ্বাস। আর এইজন্য প্রতি অধ্যায়ে কিছু কিছু পুনরুক্তির দায়ও মেনে নিতে হয়েছে। এই পুনরুক্তির নিরসন ঘটিয়ে এ অধ্যায়গুলিকে পরস্পরসাপেক্ষ করা হয়তো কঠিন হত না। কিন্তু তাতে বিষয়বস্তুর সুগমতার কিছু হানি ঘটত বলে মনে করি। এই বিশ্বাসেই বইটির সমগ্রতাবিধানে অগ্রসর হই নি।

তা ছাড়া তিনটি অধ্যায় তিনটি ক্রমোন্নত স্তরে বিন্যস্ত। এরূপ স্তরবিন্যাসে প্রায় অলক্ষিতভাবেই বিষয়বস্তুর উপরে পাঠকের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বলে আমার ধারণা। আমার অধ্যাপকজীবনে আমি এই পথকে শিক্ষাদান-সিদ্ধির পথ বলে মেনে নিয়েছি। এইজন্যই তিনটি অধ্যায়কে এক সমস্তরে নামিয়ে এনে বা তুলে নিয়ে গ্রন্থের সমতাবিধানে প্রয়াসী হই নি।

চিরাচরিত প্রথার অনুসরণে প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরে গ্রন্থ ও অধ্যায়ের নাম সন্নিবিষ্ট না করে আলোচিত প্রসঙ্গের নামোল্লেখ করাই সমীচীন মনে করেছি। আশা করি তাতে পাঠকের সহায়তা হবে। কোনো কোনো স্থলে কিছু ত্রুটিও লক্ষিত হতে পারে, সে ত্রুটি গুরুতর নয় বলেই মনে করি। প্রথম অধ্যায়ের প্রসঙ্গবিন্যাসেও কিছু ত্রুটি লক্ষিত হবে। অনবধানতাকৃত এই ত্রুটির অপরাধ শুধরে নিয়েছি অধ্যায়সূচিতে। পাঠক যদি এই অধ্যায়সূচির প্রতি দৃষ্টি রেখে গ্রন্থের বিভিন্ন প্রসঙ্গ অনুধাবন করেন, আশা করি তা হলে সমগ্রভাবে ছন্দ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে কোনো বাধা ঘটবে না।

বাংলা ছন্দের নীতি ও প্রণালী সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা-সৃষ্টির সহায়তা করাই এই গ্রন্থ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকের কানের অভ্যাসগঠনে সহায়তা করা। ছন্দ বস্তুটা শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য হলেই চলে না, শ্রুতিগ্রাহ্যও হওয়া চাই। এইজন্য সূত্রব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করতে কার্পণ্য করি নি। বরং স্থলে স্থলে দৃষ্টান্তবাহুল্যই লক্ষিত হবে। আশা করি তাতে ছন্দের নীতিবোধের সঙ্গে শ্রুতিবোধও স্বতঃই তৈরি হয়ে যাবে। ‘শ্রুতবোধ’-নামক বহুখ্যাত সংস্কৃত ছন্দগ্রন্থখানির যা উদ্দেশ্য, এই গ্রন্থখানিরও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তাই। তার সঙ্গে একটি পরোক্ষ অভিপ্রায়ও জড়িত আছে। ছন্দরস ও কাব্যরস পরস্পরের পরিপূরক, একের মধ্যে অন্যের সার্থকতা। কেননা, স্বভাবতঃই কাব্যের ভাব ‘আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে’। তাই ছন্দের দৃষ্টান্তগুলি বাংলার শ্রেষ্ঠ রচনা থেকে উদ্ধৃত করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি, যাতে নীরস ছন্দোবিশ্লেষণ অনুধাবনের ক্লান্তি কাব্যরস-অনুভূতির দ্বারা কিছু পরিমাণে অপনোদিত হয়। তাছাড়া, সর্বত্রই উদ্ধৃতিগুলির উৎসনির্দেশও করেছি, যাতে উৎসুক পাঠক মূলরচনার সঙ্গে সহজেই পরিচিত হতে পারেন এবং প্রয়োজনমতো গ্রন্থকারকৃত ছন্দোবিশ্লেষণের যাথার্থ্য বিচার করে দেখতে পারেন।

যেসব রচনার ছন্দ সর্বস্বীকৃত আদর্শসম্মত,—দৃষ্টান্তগুলি যথাসম্ভব তার থেকেই সংকলিত। যেসব রচনার ছন্দবিশুদ্ধি সন্দেহাতীত নয়, তার থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করলে ছন্দোনীতি-নিরূপণের ভিত্তিই টলে যায়। এইজন্য অধিকাংশ দৃষ্টান্তই সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে। সেসব ক্ষেত্রে কবির নাম না করে শুধু গ্রন্থ ও কবিতার নাম উল্লিখিত হল। অন্য ক্ষেত্রে গ্রন্থ ও কবিতার নামের পূর্বে কবির নামও দেওয়া হল। আর যে দু-একটি দৃষ্টান্তের কোনো পরিচয় দেওয়া নেই সেগুলি গ্রন্থাকারের রচিত।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি পরবর্তী দুই অধ্যায়ের ভূমিকা হিসাবে রচিত। বস্তুতঃ এটি সমগ্র ছন্দব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ বলেও গণ্য হতে পারে। ফলে এই নবরচিত অধ্যায়টি অপরিণত বুদ্ধি প্রথম-শিক্ষার্থীর পক্ষেও দুষ্প্রবেশ্য হবে না বলেই আশা করা যায়। কিন্তু পরবর্তী দুই অধ্যায় সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। ও-দুটি অধ্যায় অপেক্ষাকৃত পরিণতবুদ্ধি পাঠকের উপযোগী করেই লিখিত। তবে পাঠকদের মধ্যে যাঁরা পরিণতবুদ্ধি অথচ ছন্দ-বিষয়ে প্রথমশিক্ষার্থী, তাঁদের পক্ষে অধ্যায়-দুটি যাতে দূরধিগম্য না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

এই পুস্তকে সাধারণ নিয়মের সমস্ত ব্যতিক্রম, সমস্ত বিশেষ বিধি ও অন্যবিধ সমস্ত জটিল প্রশ্নের বিষয় সযত্নে পরিহার করে চলতে চেষ্টা করেছি। কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি প্রথমেই বিশেষ বিধি বা ব্যতিক্রমের বিষয় উপস্থাপন করলে তার জটিলতার জালে মূলনীতিগুলি প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়, ফলে ছন্দোনীতিব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। বলা উচিত যে, এই বইটি অপেক্ষাকৃত পরিণতবুদ্ধি পাঠকের উপযোগী করে লিখিত হলেও বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ পাঠকদের জন্য অভিপ্রেত নয়। তাই এর নাম ‘ছন্দপরিক্রমা’। এর দ্বারা ছন্দসৌধের চার দিক্ পরিক্রমণ করে তার বহিরাকৃতি ও তার বিভিন্ন অবয়ব সম্বন্ধে সাধারণ পরিচয়লাভ হতে পারবে, তার আভ্যন্তর রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধিত হবে না। তার জন্য স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ ছন্দব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন রইল।

প্রবোধচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রভবন

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

দোলপূর্ণিমা। ৩ চৈত্র ১৩৭১

---

১. এটি পরে কিছু পরিমার্জিতরূপে লেখকের ‘বঙ্গবাণী’ গ্রন্থে (১৯১৫) সংকলিত হয় ‘বাংলা ছন্দ’ নামে।

১. সত্যেন্দ্রনাথের ‘ছন্দসরস্বতী’ ও রবীন্দ্রনাথের ‘ছন্দ’, এই দুটি প্রবন্ধই ‘বিচিত্রা’ ক্লাবে পঠিত হয় ১৩২৪ সালে। পাঠের তারিখ যথাক্রমে ১৭ই ফাল্গুন এবং ৬ই চৈত্র। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের ‘ছন্দ’ গ্রন্থ (১৩৬৯ সংস্করণ), পৃ ৩৫৪-৫৯।

নিবেদন

(১৯৮৫)

আমার প্রায় সারাজীবনের ছন্দ-চিন্তা ও চর্চার পরিণত ফল এই গ্রন্থ, এ-কথা বললে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হবে না। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

ইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে (১৯০৯) রবীন্দ্রনাথের একটি ও সত্যেন্দ্রনাথের একটি কবিতা আমাদের পড়তে হয়েছিল। এই কবিতা-দুটি যে দুই ভিন্ন স্বাদের ছন্দে রচিত, তা সহজেই বোঝা গেল। আমাদের পাঠ্য পুস্তকের অন্য কোনো কবিতাতেই এই দুই ছন্দের নিদর্শন পাওয়া গেল না। আমাদের পাঠ্য ব্যাকরণ গ্রন্থের ছন্দ-প্রকরণেও এই দু-রকম ছন্দের প্রকৃতি পরিচায়ক কোনো সূত্র ছিল না। এটাই হল আমার ক্ষোভের বিষয়। আর দু-বছর পরে আমাদের পাঠ্য ইংরেজি ব্যাকরণের ছন্দ-অধ্যায়ে যেসব বিধিবিধান ছিল, সেগুলির সাহায্যে আমার পড়া সব ইংরেজি কবিতার ছন্দ নিরূপণ করা গেল অনায়াসেই। ইংরেজি ব্যাকরণে যদি ইংরেজি ছন্দের সরল ও সুন্দর ব্যাখ্যা থাকে তবে বাংলা ব্যাকরণে কেন বাংলা ছন্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা থাকবে না? এই ভাবনা আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধে রইল।

অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে (১৯১২) রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্য এক খন্ড কিনে নিলাম। এটাই আমার প্রথম কেনা ও প্রথম পড়া রবীন্দ্রনাথের বই। পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা গেল তিন বছর আগে আমার পড়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতাটি, ('আজি কি তোমার মধুর মুরতি' ইত্যাদি) আছে এই কাব্যেই। যা হক, এই কাব্যখানি যেন আমার চোখের সামনে বাংলা ছন্দের একটি রত্নভাণ্ডার খুলে দিল। বাংলা ছন্দের তিনটি পৃথক্ রীতির সুস্পষ্ট সন্ধানও পেলাম এই কাব্যেই। অনেকগুলি কবিতার বিভিন্ন প্রকার তালবিভাগ এবং তার ধ্বনিসংগীতের বৈশিষ্ট্যও আমার কানে ধরা পড়ল। কিন্তু এই সবই ভাষাহীন অনুভূতি মাত্র। এই অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার ছিল না। সে ইচ্ছাও আমার হয় নি। তখনও আমার আক্ষেপ শুধু এই যে, ব্যাকরণ-গ্রন্থে বাংলা ছন্দের এসব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের যথাযথ পরিচয় থাকে না কেন?

নবম ও দশম শ্রেণীতে আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন শ্যামাচরণ পণ্ডিত মশায়। তিনি ছিলেন কবি কালিদাসের পরম ভক্ত। একটু সুযোগ পেলেই তিনি কালিদাসের শ্লোক আবৃত্তি করতেন, বিভিন্ন ছন্দের শ্লোক। তাঁর আবৃত্তিভঙ্গিও ছিল সুন্দর। আবৃত্তি করেই বলতেন—"দেখেছ, কি সুন্দর কবিতার ভাব, আর কি সুন্দর এই 'উপজাতি' ছন্দ। তোমাদের বাংলায় আছে এমন ভাব, আর এমন সুন্দর ছন্দ?" এভাবেই মালিনী, মন্দাক্রান্তা, ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত ছন্দের নাম জানা হয়ে গেল। এ-রকম কোনো এক সুযোগে পণ্ডিত মশায়ের কাছে সংস্কৃত ছন্দ-বইএর নাম জেনে নিয়ে এক খণ্ড 'ছন্দোমঞ্জরী' কিনে নিলাম। আমার এক জ্যাঠতুতো দাদা ('দীনেশদাদা') তখন আমাদের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়তেন। কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যের দুটি বা তিনটি সর্গ ছিল তাঁর পাঠ্য। এই রঘুবংশ হল আমার একটি প্রিয় বই। ছন্দোমঞ্জরীর সূত্র মিলিয়ে রঘুবংশ ও অন্যান্য কাব্যের ছন্দ বিশ্লেষণ করার খেলায় মেতে গেলাম। এবার মনে হল কোনো

ব্যাকরণ গ্রন্থের আশ্রয় না নিয়ে শুধু বাংলা ছন্দের পরিচয় দিয়ে ছন্দোমঞ্জরীর মতো একখানি স্বতন্ত্র বইও তো রচিত হতে পারত। তাও হয় নি। এটাই দুঃখ।

বাংলা ছন্দের কলাকৌশল আয়ত্ত করার আগ্রহে আমি নানা ভাবে চেষ্টিত আছি, এমন সময় (১৯১৪। বাং ১৩২১ আষাঢ়) 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'বাংলা ছন্দ' নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। লেখক খ্যাতনামা কবি ও বিদগ্ধ সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন। কিন্তু প্রবন্ধটি বারবার পড়েও তৃপ্ত হতে পারলাম না। মনে হল লেখকের পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু তাঁর চিন্তায় শৃঙ্খলা নেই, তাছাড়া তাঁর ছন্দবোধেও কিছু ঘাটতি আছে। বস্তুতঃ আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলাম যে, কোনো-কোনো বিষয়ে তিনি একেবারেই ভুল সিদ্ধান্ত করেছেন। মোট কথা, এ প্রবন্ধ পড়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, এটি পাঠকের ছন্দজ্ঞান-বৃদ্ধির সহায়ক তো হবেই না, বরং এটি তাদের ছন্দচিন্তাকে ভুল পথেই চালাবে। তাই মনে-মনে স্থির করলাম বাংলা ছন্দের প্রণালীবদ্ধ পরিচয় দিয়ে আমিই একটি প্রবন্ধ লিখব। এই সংকল্পের ফলেই আট বছর পরে আমার প্রথম ছন্দ-প্রবন্ধ ওই 'প্রবাসী' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল পাঁচ কিস্তিতে (১৩২৯ পৌষ - ১৩৩০ বৈশাখ। ইং ১৯২২ ডিসেম্বর - ১৯২৩ এপ্রিল)। বলা বাহুল্য, এই আট বছর আমার ছন্দ-চিন্তা ও চর্চা কখনও নিষ্ক্রিয় হয় নি। ফলে আমার এই প্রথম প্রয়াসও নিষ্ফল হয় নি। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধেই দেখা গেল বাংলা ছন্দশাস্ত্রের রূপরেখা রচনার প্রথম প্রয়াস। যা হক, আমার এই প্রয়াসে পরোক্ষ প্রবর্তনা জুগিয়েছিল শশাঙ্কমোহনের এই প্রবন্ধ। সেজন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী, এ-কথা আমার স্বীকার করা কর্তব্য। সেই যে আমার বাংলা ছন্দশাস্ত্র রচনার সংকল্প ও প্রয়াস শুরু হল ১৯১৪ সালে, তারই পরিণতি ঘটল এই গ্রন্থ রচনায়। তাই বলেছি এই গ্রন্থ আমার প্রায় সারাজীবনের চিন্তা ও চর্চার ফল।

আমার প্রথম প্রবন্ধের ভূমিকায় আমি রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-প্রবন্ধের কাছে যথাযোগ্য ঋণ স্বীকার করেছি। কিন্তু শশাঙ্কমোহনের ওই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির নামোল্লেখও করিনি। অথচ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার তাঁর *Origin and Development of the Bengali language* গ্রন্থে (১৯২৩) শশাঙ্কমোহনের ওই প্রবন্ধর বেশ সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। আমি কিন্তু আমার সব প্রবন্ধে ও গ্রন্থে এ-বিষয়ে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করেছি। যাঁর প্রশংসা করা যায় না তাঁর নিন্দা করাও অনুচিত। তবে কর্তব্যের খাতিরে কখনও-কখনও অপ্রিয় সত্য বলতে হয়। তার নিদর্শন আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত **'বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা'** গ্রন্থে[১] (১৯৭৭, পৃ ২৩-২৭)।

২

আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের পরে এটি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেক মনস্বী ব্যক্তির অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করে। তাছাড়া, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকেই এটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুরোধ জানান। বস্তুতঃ এই প্রবন্ধটি একটি স্বল্পায়তন অথচ পূর্ণাঙ্গ ছন্দগ্রন্থ রূপেই পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার পরে এটির বেশ কিছু ত্রুটি ও অপূর্ণতা আমার চোখে পড়ল। তাই মনে হল এসব ত্রুটি ও অপূর্ণতা মোচন না করে এটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা উচিত হবে না। কেননা তাতে পাঠকদের মনে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্ত ধারণা সঞ্চারেরই সহায়তা হবে। কিন্তু অচিরেই আমি কঠিন জীবনসংগ্রামে এবং তার

পরে দীর্ঘস্থায়ী ছন্দবিতর্কে জড়িয়ে পড়লাম। ফলে আমার অভীষ্ট ছন্দগ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প অনিশ্চিত কালের জন্য পিছিয়ে গেল।

তার পরে অন্ততঃ আরও দু-বার (১৯৪০ এবং ১৯৭৪ সালে) পূর্ণাঙ্গ ছন্দ-ব্যাকরণ রচনার কাজে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু দু-বারই আমার কাজ বাধাগ্রস্ত হয়ে অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। প্রথম বারের প্রয়াসে যে দশটি অধ্যায় রচিত হয়েছিল, সেটুকুও গ্রন্থাকারে প্রকাশের সুযোগ হয় নি। সে দশ অধ্যায়ে ছিল প্রধানতঃ বাংলা ছন্দের শ্রৌত প্রকৃতির (Phonology-র) পরিচয়। দ্বিতীয় বারের প্রয়াসেও ওই শ্রৌত প্রকৃতির পরিচয়টুকু আবার রচনা করতে হল নূতন ভাষা ও পরিভাষায়, এবং নূতন বিন্যাসক্রমে। তার পরে বাংলা ছন্দের রূপবৈচিত্র্যের (Morphology-র) শ্রেণীবদ্ধ পরিচয় অংশতঃ রচিত হবার পরেই পড়ল ছেদ। তাই পরিকল্পিত গ্রন্থের শ্রৌত প্রকৃতি অংশটুকুই প্রকাশিত হল নূতন **'ছন্দ-পরিক্রমা'**-র প্রথম খণ্ড রূপে (১৯৭৭)।

তার প্রায় সাত বছর পরে আবার পূর্ণাঙ্গ ছন্দশাস্ত্র রচনার কাজে হাত দেওয়া গেল নূতন পরিকল্পনা নিয়ে। এবার গ্রন্থের নাম হল **'নূতন ছন্দপরিক্রমা'**। স্বভাবতঃই এটিরও প্রধান বিভাগ দুটি—শ্রৌত প্রকৃতি ও রূপবৈচিত্র্য। এর শ্রৌত প্রকৃতি বিভাগটিতে উক্ত 'ছন্দপরিক্রমা' প্রথম খণ্ডে (১৯৭৭) আলোচিত বিষয়গুলি পুনরুক্ত হয় নি। এই বিভাগের প্রথম অধ্যায়ে আছে বাংলা ছন্দের শ্রৌত প্রকৃতির প্রাথমিক পরিচয় এবং অন্য কোথাও আলোচিত হয় নি এমন কয়েকটি নূতন প্রসঙ্গ। বাংলা ছন্দ-রচনার তিন রীতিও মূলতঃ শ্রুতিনির্ভর। তাই ছন্দোরীতির প্রসঙ্গটাও আলোচিত হয়েছে শ্রৌত বিভাগের প্রথম অধ্যায়েই। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে বাংলা ছন্দে উপযমক (মিল), যমক, অর্ধযমক এবং অনুরূপ আরও কিছু অলংকরণগুণাবলীর বিশদ পরিচয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় বিভাগেও আছে দুই অধ্যায়। এই দুই অধ্যায়ে আছে যথাক্রমে বাংলার বিচিত্র ছন্দোরূপের শ্রেণীবদ্ধ পরিচয় এবং পয়ার ও অন্যবিধ দ্বিপদী বন্ধের বিভিন্ন রূপ ও প্রয়োগভেদের শ্রেণীবদ্ধ বিবরণ।

এই চার অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে বাংলা ছন্দশাস্ত্রের সব প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। গ্রন্থের আয়তনবৃদ্ধির ভয়ে এবং সময় বাঁচাবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করা গেল না। সুযোগ পেলে গ্রন্থান্তরে প্রকাশ করা যাবে। এখানে বলে রাখা উচিত যে, এই বইটি মূলতঃ পরিকল্পিত হয়েছে বাংলা ছন্দের সরল বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ (Descriptive grammar) রূপে। তাই এই গ্রন্থে ছন্দর তত্ত্বকথা, রসবিচার বা বিকাশক্রমের প্রসঙ্গ সযত্নে পরিহার করেছি। কোনো বিশেষ মতবাদ-প্রতিষ্ঠাও এই গ্রন্থের লক্ষ্য নয়। এর লক্ষ্য বিশুদ্ধ আরোহাত্মক (Inductive) পদ্ধতিতে কবিপ্রয়োগের অন্তর্নিহিত নিয়ম অর্থাৎ ছন্দসূত্র আবিষ্কার করা, সহজবোধ্য পরিভাষাযোগে তা প্রকাশ করা এবং সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রত্যেক ছন্দসূত্রের যথার্থতা প্রতিপন্ন করা।

বাংলা ছন্দশাস্ত্রের উক্ত দুই প্রধান বিভাগের সঙ্গে আরও একটা বিভাগ যুক্ত করার আবশ্যকতা বোধ করেছি। এই তৃতীয় বিভাগে আছে পরিভাষা ও মতান্তর-প্রসঙ্গ। কেননা বাংলা ছন্দ-আলোচনায় নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। এই বিষয়ে যত লেখক তত মত, তত পরিভাষা। তাতে শুধু যে পাঠকেরা বিভ্রান্ত হয় তা নয়। লেখকেরাও পরস্পরের বক্তব্য বুঝতে পারেন না। ফলে সুধীজনগ্রাহ্য ছন্দশাস্ত্র গড়ার কাজও বিলম্বিত হয়। শুধু এই কারণেই এত দিনেও একটা স্বীকৃতিযোগ্য ছন্দশাস্ত্রের বই রচিত হতে পারল না। এজন্য চাই বিভিন্ন মতের তুলনাত্মক ও নিরপেক্ষ বিচার। এ কাজে উৎহাসী গবেষকদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে **'আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য'** বইটি (১৯৮০)। এটিতে কুড়িজন ছন্দগ্রন্থলেখকের ও চারজন বিশিষ্ট

প্রবন্ধকারের মতামত এবং তাঁদের ব্যবহৃত পরিভাষার সবিস্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আশা করি তাতে ভবিষ্যৎ গবেষকদের পক্ষে একটা স্বীকৃতিযোগ্য ছন্দশাস্ত্র গড়ে তোলার কাজ কিছু সহজ হবে।

আপাততঃ আমার মনে হয় অধিকাংশ লেখকের মতামত ও পরিভাষা কালক্রমে হারিয়ে যাবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ, এই তিন কবির মতামত ও পরিভাষা ভবিষ্যতে স্বীকৃত না হলেও বিস্মৃত হবে না। কেননা এঁরা শিল্পস্রষ্টা, তাঁদের শিল্পকর্মের বিশিষ্টতা যথাযথভাবে উপলব্ধির পক্ষে তাঁদের শিল্পচিন্তার সঙ্গে পরিচয় থাকা আবশ্যক। বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের বৈচিত্র্য যেমন বেশি তাঁর শিল্পচিন্তার অথাৎ ছন্দচিন্তার পরিধিও তেমনি বেশি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছন্দসৃষ্টি তথা ছন্দচিন্তার কালব্যাপ্তিও বেশি। ফলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার যে বিবর্তন দেখা যায়, অন্য দুই কবির ছন্দচিন্তায় তা দেখা যায় না। এখানে বলা উচিত যে, আমি তো রবীন্দ্রছন্দের কলাকৌশল বোঝবার আগ্রহে ১৯১৪ সাল থেকেই তাঁর ছোট-বড় সব ছন্দপ্রবন্ধ অবলম্বনে তাঁর ছন্দচিন্তার ধারা অনুসরণে চেষ্টিত ছিলাম। পরবর্তী কালে তিনিও আমার ছন্দচিন্তার পরিচয় নিতে আগ্রহী হয়েছিলেন। ফলে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে চিন্তাবিনিময়ের অনেক সুযোগ আমি পেয়েছি। আমার পক্ষে এটা কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। যা হক, এই বিনিময়ের ফলে ছন্দ-বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য ক্রমে সংকুচিত হতে-হতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এসব কারণেই আমার ছন্দচিন্তার শেষ দুই পর্বে তাঁর **'ছন্দ'** বইটি দু-বার (১৯৬২ এবং ১৯৭৬) সম্পাদন করার মতো দুঃসাধ্য কাজের দায়িত্ব নিতে সাহসী হয়েছি। আর এই কারণেই এই গ্রন্থে নিরপেক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার গুণাগুণ বিচার করে এ বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করাও কর্তব্য বলে বোধ করেছি। অবশ্য এ-বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনার অবকাশ এখনও রইল।

৩

ভেবেছিলাম এই তিন কবির ছন্দচিন্তার আপেক্ষিক মূল্য যাচাই করেই নিরস্ত হব। কেননা তাঁরা আমার অগ্রগামী এবং তাঁদের চিন্তা শুধু যে আমার চিন্তাকে উদ্রিক্ত করেছে তা নয়, এগিয়ে চলার প্রেরণাও দিয়েছে। তারই ফলে নিজের চিন্তাকে সুগঠিত রূপ দিতে পেরেছি। কিন্তু নানা কারণে অমূল্যধনকেও এই তিন কবির পাশে স্থান দিতে হয়েছে। অমূল্যধনের **'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'** বইটি বোধ করি অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্দিষ্ট আছে। ফলে অসংখ্য ছাত্র এবং বহু অধ্যাপক এই বই-এর বিশ্লেষণপ্রণালী ও পরিভাষাতেই অভ্যস্ত। বাংলা ছন্দের অন্যরকম বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা পরিভাষা তাঁদের চিন্তায় স্থান পায় না। এ-রকম বহু ছাত্র ও শিক্ষকই সাক্ষাতে বা চিঠিপত্রে জানতে চান আমি সিলেব্‌ল্‌-কে 'অক্ষর' এবং তানপ্রধান-কে 'পয়ারজাতীয়' বলি না কেন, 'যতি' ও 'ছেদ'-এর ভেদ মানি না কেন, অথবা ছন্দের পূর্ণযতি-বিভাগকে 'চরণ' না বলে 'পঙ্‌ক্তি' বলি কেন? মোট কথা, 'মূলসূত্র' বই-এর ছন্দব্যাখ্যা ও পরিভাষাই তো ভাল ছিল, তা না মেনে অন্যরকম ব্যাখ্যা ও পরিভাষা এনে অকারণে জটিলতা বাড়াচ্ছি কেন, এসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করি। আমিই যে অভ্রান্ত, এমন কথা কি আমি বলতে পারি? বস্তুতঃ আমি নিজেই তো নিজের ভুলত্রুটি মোচন করতে করতে এগিয়ে চলেছি, শেষ কথা কি আমি বলতে পেরেছি? যার নিজের ভুল শোধন করতে করতেই এগিয়ে চলতে হয়, তার পক্ষে অন্যের ভুল শোধন করতে চাওয়াই তো অপরাধ। এইজন্য আমার কোনো প্রবন্ধে বা গ্রন্থে অন্য কারও মতামতের পরিভাষা সম্বন্ধে আমি

প্রতিকূল মতামত প্রকাশ করি না। কিন্তু তাতে আমার সমালোচকরা সন্তুষ্ট নন। তাঁদের মতে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। কেননা তাতে পাঠকরা উপকৃত হবেন। তবু আমার দ্বিধা কাটে না। আমি পরের ত্রুটি দেখাব কোন্ অধিকারে? আমার অধিকার তো শুধু নিজের ত্রুটি মোচনের।

কিন্তু বর্তমানে এমন অবস্থা দেখা দিয়েছে যে, এখন এ-বিষয়ে নীরব থাকাই হবে আমার অপরাধ। ইদানীং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বি-এ (পাস ও অনার্স) পরীক্ষার্থীদের পক্ষে বর্তমান লেখকের **'ছন্দপরিক্রমা'** (প্রকাশিতব্য) ও অমূল্যধনের **'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র',** এই দুটি বই-ই অবশ্য পাঠ্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। আর ছন্দের পাঠ্যসূচীতে (সিলেবাসে) এই দুই গ্রন্থের দুই প্রস্ত পরিভাষা ও ছন্দব্যাখ্যা অবশ্য শিক্ষণীয় বলে গণ্য হয়েছে। পরস্পর বিরুদ্ধ দু-রকম ছন্দ ব্যাখ্যা ও পরিভাষা শিখতে ও শেখাতে গিয়ে ছাত্র ও শিক্ষক উভয় পক্ষই পড়বেন মহাসংকটে।

আমাদের শিক্ষাজগতে সম্প্রতি এর চেয়েও ভয়াবহ আর-একটা দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এক শ্রেণীর লেখক (এঁদের মধ্যে অভিজ্ঞ অধ্যাপকও আছেন) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসারে একজাতীয় ছাত্রসহায়ক বা পরীক্ষাতারণ ছন্দপুস্তক প্রকাশ করেছেন। **'ছন্দশিক্ষা'**, **'ছন্দমীমাংসা'** ইত্যাদি নামের এ-জাতীয় সব বই-এর প্রধান চেষ্টা বিভিন্ন মতের সমন্বয়-সাধন। ফলে এসব অধ্যাপক লেখকদের হাতে বাংলা ছন্দশাস্ত্রটা ধারণ করছে হাঁসজারু, হাতিমি বা বকচ্ছপমূর্তি। বাংলা ছন্দশাস্ত্রের এসব বিকৃত রূপ আমাদের ছন্দশিক্ষার পরিমণ্ডলটাকে দূষিত করছে। এ অবস্থায় নীরব থাকাই অপরাধ বলে মনে করি। যে আলোতে নিজের ত্রুটিগুলি আমার চোখে ধরা পড়ে, সেই আলোতেই পরের ত্রুটিও চোখে পড়ে। এত দিন নিজের ত্রুটিমোচনই ছিল আমার একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু এখন উক্ত বিশেষ কারণে অমূল্যধনের পরিভাষা ও মতামতের গুণাগুণ-বিচারও কর্তব্য বলে স্বীকার করতে হল এই পঞ্চম অধ্যায়ে।

এ প্রসঙ্গে আশা করি বলা অনুচিত হবে না যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি 'ছন্দপরিক্রমা' ও 'মূলসূত্র', এই দুই পুস্তকের যে-কোনো একটি অবলম্বনে ছন্দ শেখানো যেতে পারে, কিন্তু দু-রকম পরিভাষা ও মতামতকে মিশিয়ে ফেলা চলবে না—এ-রকম নির্দেশ প্রচার করেন, তাহলে ছন্দশিক্ষায় এ-রকম বিভ্রান্তি ঘটবে না। ছন্দশিক্ষকরাও স্বস্তি পাবেন, কেননা তাতে তাঁরা নিজেদের অভিরুচি মতো যে-কোনো এক ধারায় ছন্দ শেখাবার সুযোগ পাবেন। অধিকন্তু বাংলা ছন্দশাস্ত্রের বকচ্ছপ-মূর্তি গড়ার প্রয়াসও নিরস্ত হতে পারে। তবে শিক্ষার উচ্চতর (বি. এ. অনার্স বা এম. এ.) পর্যায়ে আগ্রহী ছাত্রদের পক্ষে ছন্দচিন্তার বিভিন্ন ধারার আপেক্ষিক গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা অর্জন অত্যাবশ্যক। নতুবা এ বিষয়ে গবেষণার পথ প্রশস্ত হবে না।

এখানে অমূল্যধনের 'মূলসূত্র' গ্রন্থের দু-একটি প্রধান দুর্বলতার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য মনে করি। আগেই বলেছি আমার প্রথম ছন্দ-প্রবন্ধটি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার পরেই এটির বেশ কিছু ত্রুটি আমার চোখে ধরা পড়ে। তাই বারবার অনুরুদ্ধ হয়েও এটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সংগত মনে করি নি। আশ্চর্যের বিষয়, সেসব ভুলত্রুটির অনেকগুলিই 'মূলসূত্র' গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণেও (১৯৮৩) বহাল রয়েছে। অর্থাৎ এই গ্রন্থের অনেক ভুলের মূলই রয়েছে 'প্রবাসী'র ওই প্রবন্ধে। এমন কি, 'মূলসূত্র' নামের মূলও। আমার সেই প্রথম প্রবন্ধে ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিপ্রবাহের বৃহত্তম বিভাগকে বলেছিলাম 'ছত্র' (বা পঙ্‌ক্তি), এবং ছত্রের ছোট-ছোট বিভাগকে বলেছিলাম 'পদ' (বা চরণ)। আর, ছত্র ও পদের অন্তে দু-রকম

যতি (বা ছেদ) স্বীকৃতি পেয়েছিল সে প্রবন্ধে। এটুকু মাত্র সম্বল নিয়েই সব রকম বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। 'মূলসূত্র' গ্রন্থেও ঠিক তাই করা হয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, আমার কথিত 'ছত্র' আর 'পদ' মূলসূত্র গ্রন্থে আখ্যাত হয়েছে যথাক্রমে 'চরণ' ও 'পর্ব' নামে। শুধু দু-রকম যতি আর দু-রকম যতিবিভাগ নিয়ে কারবার করাতে আমার প্রথম প্রবন্ধে যেসব ত্রুটি ঘটেছিল, মূলসূত্র গ্রন্থেও ঠিক তাই ঘটেছে এবং এখনও তাই আছে। আমি তবু 'বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ' নামে একটা পরিচ্ছেদে বাংলা ছন্দের রূপবৈচিত্র্যের (Morphology-র) শ্রেণীবদ্ধ পরিচয় দিতে চেষ্টিত হয়েছিলাম। মূলসূত্র গ্রন্থে অনুরূপভাবে ছন্দের রূপবৈচিত্র্য দেখানো যায় নি।

পরবর্তী কালে আমি বুঝেছিলাম, অন্ততঃ চতুর্বিধ (পূর্ণ, অর্ধ, লঘু, উপ) যতি এবং অবস্থাবিশেষে 'যতিলোপ' স্বীকার না করলে বাংলা ছন্দোরূপের যথাযথ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। **'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'** গ্রন্থেই (১৯৪৫) তার নিদর্শন পাওয়া যাবে। কিন্তু 'মূলসূত্রে' চতুর্বিধ যতি এবং যতিলোপ কখনও স্বীকৃত হয় নি। ফলে ওই গ্রন্থে কোথাও ছন্দোরূপের যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায় না। এমন কি, অনেক স্থলে ছন্দপঙ্ক্তির ('চরণের') তথা পর্ব-পর্বাঙ্গেরও নির্ভুল পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া আরও নানারকম বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে ওই একই কারণে।

এ প্রসঙ্গে আর-একটা কথা বলে রাখা কর্তব্য। **"Syllable শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ"** নামে এক প্রবন্ধে (কালি ও কলম, ১৩৮১ আশ্বিন) অমূল্যধন বলেন—"বর্তমানে কেহ কেহ syllable-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'দল' শব্দটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" আমি যে তাঁর এই উক্তির অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর আগে থেকেই 'দল' শব্দ ব্যবহার করে আসছি এবং আমার **'ছন্দ পরিক্রমা'** বই (১৯৬৫) প্রকাশের পরে প্রায় সর্বজনজ্ঞাত হয়ে গিয়েছে, মনে হয় তিনি তা জানতেন না এবং 'ছন্দপরিক্রমা' বইটিও তিনি পড়েন নি। যা হক, অমূল্যধন তাঁর এই প্রবন্ধ শেষ করেছেন এই বলে—"অতএব 'Syllable'র প্রতিশব্দ হিসাবে 'দল' শব্দটি গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা করিতে চাহেন তাঁহারা ভ্রান্তিবিলাসেরই প্রশ্রয় দেন।" তাঁর এই উক্তির উত্তরে আমি দুটি প্রবন্ধ লিখি—**"সিলব্‌ল্‌কে 'দল' বলি কেন"** (অমৃত, ১৩৮২ ভাদ্র ১৯) এবং **"সিলেব্‌ল্‌কে 'অক্ষর' বলি না কেন"** (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৮২ কার্তিক-চৈত্র)। এই দুটি প্রবন্ধ পরে সংকলিত হয়েছে আমার দ্বিতীয় 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থে (১৯৭৭)। তাতে অমূল্যধন ও তাঁর ওই প্রবন্ধের উল্লেখও আছে। কিন্তু তবু আমার এই দুই প্রবন্ধের উল্লেখমাত্রও না করে অমূল্যধন তাঁর ওই প্রবন্ধটি তাঁর 'মূলসূত্র' গ্রন্থে (সপ্তম সং ১৯৮৩, পৃ ২৪৬-৪৮) সংকলন করেছেন। তাই মনে হয় আমার দ্বিতীয় 'ছন্দপরিক্রমা' বইটিও তিনি পড়েননি। ফলে তিনি তাঁর পূর্বসিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করার সুযোগও পান নি। তাতে 'মূলসূত্র' বইটির কিছু মূল্যহানি হয়েছে।

এসব কারণে এই গ্রন্থে অমূল্যধনের মতামতের প্রসঙ্গ আনার কিছুমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছন্দ-সিলেবাস এবং শিক্ষাজগতে বাংলা ছন্দশাস্ত্রের বকচ্ছপ-মূর্তির আবির্ভাব দেখে নেহাত কর্তব্যবোধেই এই অবাঞ্ছিত কাজে হাত দিতে বাধ্য হয়েছি। তাছাড়া, আমার পরিকল্পিত ছন্দশাস্ত্রের আদর্শ রূপটাও তাতে কিছু ব্যাহত হল। এটাও আমার মানসিক অস্বস্তির একটা বড় কারণ। আমি জানি

অনেক পাঠকই আমার ছন্দচিন্তার সমগ্র ও পরিচ্ছন্ন রূপটাই শুধু দেখতে চান। অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা চান না। তবু আশা করি আমার একান্ত অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটিটুকু সহৃদয় পাঠকের মার্জনা লাভে বঞ্চিত হবে না।

এখানে বলে রাখি, আমার এ বই রচিত হয়েছে বাংলা কাব্যচর্চার অঙ্গ হিসাবে, আর কাব্যরসপিপাসুরাই এই গ্রন্থের উদ্দিষ্ট পাঠক। যদি এই গ্রন্থের দ্বারা কিছু পরিমাণেও তাঁদের পরিতোষ সাধিত হয় তাহলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

৪

সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে আমার চিন্তায় বাংলা ছন্দশাস্ত্রের যে পূর্ণাঙ্গ রূপটি দেখা দিয়েছে তা প্রকাশের সুযোগ পেলাম জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। তাই এই বই লেখার কাজটা দ্রুত শেষ করার একটা তাড়া মনে ছিল সব সময়, যদিও জানি এটা তাড়াহুড়ার কাজ নয়। 'বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি, এখনো সময় আছে কি, সময় আছে কি?'—এই ভাবনা নিয়ে কাজ করতে হয়েছে বলে সময় বাঁচাবার চেষ্টা করেছি নানা ভাবে। প্রথম থেকেই এক-একটা অংশ লেখা হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেটুকু টাইপ করিয়ে নিয়েছি। আমার লেখায় অনেক কাটাকুটি থাকে, আমার হাতের লেখাও এখন আর অনায়াসবোধ্য হয় না। তাই টাইপ করিয়েই লেখার প্রেসকপি তৈরি করতে হয়। এভাবে চার অধ্যায় শেষ হবার পরে বই-এর আয়তন দেখে আমার পরিকল্পিত বই-এর তিনটি অধ্যায় বাদ দেওয়াই সংগত মনে হল। ওই তিন অধ্যায়ের জন্য আরও সময় নেবার ভরসাও করতে পারি নি। ফলে আমার পরিকল্পনায় যা ছিল অষ্টম অধ্যায় তা-ই হয়েছে এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়। যদি সময় পাই তবে ওই বর্জিত তিন অধ্যায় লিখে রাখতে এবং সুযোগমতো অন্য কোনো গ্রন্থে যুক্ত করে দিতে চেষ্টা করব। মোট কথা, এই বইটি আসলে আমার পরিকল্পিত বইএর খণ্ডিত খসড়া মাত্র। সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া পড়ে এবং যথারীতি মেজেঘষে এটিকে সুসমন্বিত ও সুগঠিত রূপ দেবার সাহস পাই নি। তা হলে যে আরও অনেক সময় লেগে যাবে। তাই আমার লেখা শুধু এগিয়ে চলেছে, অবশ্য সতর্কভাবে, কিন্তু পিছন দিকে তাকাবার এবং আগের লেখার সঙ্গে সংগতি আছে কিনা তা দেখে দিতে পারি নি। ফলে বিভিন্ন অধ্যায়ে কিছু অসামঞ্জস্য ও পুনরুক্তিদোষ থাকার আশঙ্কা রইল। কিন্তু পুনরুক্তিমাত্রই দোষাবহ নয়, অনভীষ্টও নয়। বরং অনেক স্থানে জেনেশুনেই পুনরুক্তি করেছি আলোচ্যমান প্রসঙ্গের স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষার জন্য এবং পাঠকের স্মৃতি তথা ছন্দোবোধকে জাগিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্যেই বহু দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণও করেছি বারবার এবং বিশদভাবেই। আশা করি তাতেও অনেক পাঠকের পক্ষেই নিজেদের স্মৃতি ও ছন্দোবোধকে ঝালিয়ে নেবার সহায়তা হবে। প্রথম 'ছন্দপরিক্রমা'র (১৯৬৫) 'নিবেদন'-এ গ্রন্থের অন্যান্য যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছিল, এই 'নূতন ছন্দপরিক্রমা'-তেও সেসব বৈশিষ্ট্য রক্ষার চেষ্টা করেছি।

বই লিখতে বসার আগে সমগ্র বই-এর অধ্যায়ক্রম মনে-মনে ঠিক করা ছিল বটে, কিন্তু প্রতি অধ্যায়ের বিষয়ক্রম ঠিক করা ছিল না। কোনো কিছু টুকে রাখার অভ্যাসও আমার নেই। তাই আমাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় নিজের চিন্তার ধারা, যুক্তির পরম্পরা এবং বহুলাংশে স্মৃতির উপরে। দীর্ঘ কালের ব্যবধানে স্মৃতি মলিন হয়ে এসেছে। ফলে কোন-কোনো তথ্য বা সুষ্ঠুতম দৃষ্টান্ত যথাসময়ে মনে পড়ে নি। ফলে কোনো-

কোনো স্থলে হয়তো বক্তব্য বিষয় বা দৃষ্টান্তের বিন্যাসক্রম কিছু বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। হয়তো ভালো-ভালো দৃষ্টান্ত যথাস্থানে বসানো যায় নি অথবা একেবারেই বাদ পড়ে গেছে। যখন একটা ভালো দৃষ্টান্ত মনে হল তখন হয় তো সেটা উদ্ধৃত করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিংবা একই দৃষ্টান্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিকবার উদ্ধৃত হয়েছে। এসব দোষ ত্রুটি থেকে যাবার সম্ভাবনাও রয়েই গেল।

পক্ষান্তরে এমন অনেক বিষয়ও আছে যা দীর্ঘকাল মনে পোষণ করে আসছি, কোথাও প্রকাশের সুযোগ হয় নি। সেসব নূতন বিষয় এই বইটিতেই প্রথম সন্নিবিষ্ট হল। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়েই সেসব নূতন বিষয়ের নিদর্শন পাওয়া যাবে। যদি সেসব বিষয় বিচারক্ষম পাঠকদের মনে কিছু নূতন চিন্তা জোগায় কিংবা প্রতিবাদস্পৃহা জাগায়, কিন্তু তাদের উদাসীন থাকতে না দেয়, তাহলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

প্রথম 'ছন্দপরিক্রমা'র মতো এই 'নূতন ছন্দপরিক্রমা'-র 'অনুষঙ্গ' বিভাগেও আমার সমস্ত ছন্দপ্রবন্ধ ও ছন্দগ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন রচনার 'প্রসঙ্গ-পরিচয়'ও দেওয়া গেল। আশা করি তাতে জিজ্ঞাসু ও গবেষক পাঠকদের কিছু সহায়তা হবে। কিন্তু তালিকাটি ১৯৭৬। বাং ১৩৮৩ আষাঢ় পর্যন্ত এনেই শেষ করতে হয়েছে। তবে পূর্বের তালিকায় যেসব ত্রুটি বা অপূর্ণতা আমার চোখে ধরা পড়েছে, এই নূতন তালিকায় সেসবই যথাসম্ভব মোচন করতে চেষ্টিত হয়েছি। তাছাড়া আমার ছন্দচিন্তার পর্ববিভাগেও কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে এখন বুঝতে পারছি আমার ছন্দচিন্তার তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব শুরু হয় যথাক্রমে আমার **'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'** (১৯৪৫) ও প্রথম **'ছন্দপরিক্রমা'**(১৯৬৫) প্রকাশের সময় থেকে। বস্তুতঃ এই দুটি বই তৎকালীন ছন্দচিন্তকদের মনেও অল্পাধিক প্রভাব সঞ্চার করেছিল বলে আমার ধারণা।

১৩৮৩ আষাঢ়ের (ইং ১৯৭৬ জুন-জুলাই-এর) পরবর্তী কালের প্রবন্ধতালিকা রচনা করা সম্ভব হয়নি। আমার পক্ষে এখন প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সহ সব প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গ তালিকা রচনা করা খুবই দুঃসাধ্য। তাই আমার আশঙ্কা, এই তালিকাটিতেও হয়তো কিছু অপূর্ণতা ও অন্যরকম কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। সেসব দোষত্রুটি মোচনের ভার রইল গবেষক ছাত্রদের উপরে।

৫

আমাদের দেশে এক কালে ছন্দশাস্ত্র রচিত হয়েছিল বেদচর্চার অঙ্গ হিসাবে। তাই ছন্দশাস্ত্র স্বীকৃত হয়েছিল অন্যতম 'বেদাঙ্গ' বলে। উত্তরকালে ছন্দশাস্ত্রের চর্চা হত অন্যতম 'কাব্যাঙ্গ' হিসাবে। কিন্তু আধুনিক কালে বাংলা ছন্দশাস্ত্র এখনও অন্যতম কাব্যাঙ্গ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তাছাড়া, যথার্থ ছন্দশাস্ত্র বলে গণ্য হতে পারে এমন কোনো গ্রন্থও এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যের এই বহুপ্রতীক্ষিত অভাব পুরণের দুরাশা নিয়েই এই গ্রন্থখানি রচিত হল, অন্ততঃ সাত দশকের চিন্তা, চর্চা ও প্রচেষ্টার ফলে। যদিও আমি জানি সময়ের তাড়নায় এই গ্রন্থে নানা স্থানে বিষয়বিন্যাসে ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে কিছু-কিছু অসামঞ্জস্য, অনভীষ্ট পুনরুক্তি প্রভৃতি দোষত্রুটি থাকতে পারে, আর যদিও দ্বৈতবৃত্ত, স্বৈরবৃত্ত (ফ্রী ভর্স) প্রভৃতি কয়েকটি প্রসঙ্গ জেনেশুনেই বাদ দিতে হয়েছে, তবু আমি মনে করি দোষেগুণে জড়ানো এই বইখানিই আমার সারাজীবনের ধ্যানধারণার শেষ রূপ। তাই কবির ভাষায় বলতে পারি—

দেবী,   তুমি জানো মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবসনিশি।
মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বারবার,
ভালোয় মন্দ আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি।
তবু, ওগো দেবী, নিশিদিন করি পরাণপণ
চরণে দিতেছি আনি
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধনখানি।

কেননা আমার বিশ্বাস—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।

আর এই ভরসাতেই আমি আমার এই শেষ পারানির কড়ি তুলে দিলাম আমার খেয়াতরীর মাঝির হাতে।

'রুচিরা'
শান্তিনিকেতন
১৫ আগস্ট ১৯৮৫। ৩০ শ্রাবণ ১৩৯২ **প্রবোধচন্দ্র সেন**

---

১. প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা'। প্রকাশকাল ১৯৭৭ এপ্রিল (বাং ১৩৮৪ বৈশাখ)।

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনায় আমার তিন কন্যা (গার্গী, সংঘমিত্রা, সুগতা) এবং প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী পম্পা মজুমদার ও প্রাক্তন ছাত্র শ্রীসন্তোষকুমার দে, এই পাঁচ জনের কাছে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে কিছু-কিছু সহায়তা পেয়েছি। সবচেয়ে বেশি সহায়তা পেয়েছি রবীন্দ্রভবনের যন্ত্রলেখক শ্রীজানকীনাথ দত্তের কাছে। পরিশেষে স্মরণ করছি আমার কর্মদক্ষ জামাতা শ্রীমান্ দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম। তার সাগ্রহ সহায়তায় শুধু যে আমার শ্রমলাঘব হয়েছে তা নয়, আমি নানা ভাবে চিন্তামুক্তও হয়েছি। এদের সকলকেই জানাই আমার অশেষ আশীবাদ।

এই বইটির প্রুফ দেখার পুরো দায়িত্ব নিতে হয়েছে একা আমাকেই। তাই কোথাও কোনো গুরুতর ভুল থেকে গেল কিনা ভেবে আমি আশঙ্কিত। নির্ভুল প্রুফ দেখার ক্ষমতা এখন আর নেই। একই কারণে বইটির নির্দেশিকাও তৈরি করতে পারিনি। সেজন্যও আমার নিজেরই মন অপ্রসন্ন।

প্রবোধচন্দ্র সেন

স্মরণীয়

জেম ণ সহই কণঅ-তুলা
তিল-তুলিঅং অদ্ধ-অদ্ধেণ।
তেম ণ সহই সবণ-তুলা
অবছন্দং ছন্দভঙ্গেণ।

—প্রাকৃতপৈঙ্গলম্ ১।১০

সয় না সোনার নিক্তি যেমন
ওজন-ফারাক আধ রতির,
তেমনি সূক্ষ্ম কানের নিরিখ
একটু খুঁতেই হয় অথির।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'ছন্দসরস্বতী'

ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।...যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'ছন্দ' (১৯৭৬ সং), পৃ ৪-৫

প্রত্যেক ভাষারই একটা **স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি** আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়।

—রবীন্দ্রনাথ, 'ছন্দ' (১৯৭৬ সং), পৃ ৩১

Study carefully *the phonetic system of a language*, above all *its dynamic features*, and you can tell what kind of a verse it has developed—or, if history has played pranks with its psychology, what kind of verse it should have developed and some day will.

—Edward Sapir, *Language*

আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্।

শঙ্কা যারে অগ্নি বলে স্পর্শক্ষম রত্ন সে তো।

নূতন ছন্দ পরিক্রমা

উপক্রম

১। বাংলা ছন্দশাস্ত্রের মুখ্য পরিভাষা ও নীতিসূত্র

এখানে বাংলা ছন্দশাস্ত্রের মুখ্য পরিভাষা ও নীতিসূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুসরণের পক্ষে এগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

স্বরবর্ণ—উচ্চারণভেদে বাংলা স্বরবর্ণের তিন রূপ। যথা—

১। মুক্তস্বর (open vowel)— অ আ, ই উ, এ ও, এই ছয়টি পূর্ণোচ্চারিত ও স্বনির্ভর স্বর। ই-ঈ এবং উ-ঊ লেখায় ভিন্নরূপ হলেও বাংলা উচ্চারণে ও শ্রুতিরূপে অভিন্ন। তাই ঈ এবং ঊ স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ বলে গণ্য হয় না। বাংলায় সংস্কৃতের মতো নিত্যহ্রস্ব ও নিত্যদীর্ঘ স্বর নেই। বাংলায় সব স্বরবর্ণই সাধারণতঃ হ্রস্ব। তবে ছন্দের প্রয়োজনে সব স্বরবর্ণই অবস্থাবিশেষে দীর্ঘও হয়ে থাকে।

২। **খণ্ডস্বর** (vowel particle)—ই্ উ্ এ্ (লিখিত রূপ য়্) ও্, এই চারটি অপূর্ণোচ্চারিত ও পরনির্ভর স্বরবর্ণকে বলা যায় 'খন্ডস্বর'।

৩। **রুদ্ধস্বর** (closed vowel)—ছয়টি মুক্তস্বর ও চারটি খণ্ডস্বরের বিভিন্ন প্রকার সমবায়ে গঠিত জোড়াস্বর। অর্থাৎ,

মুক্তস্বর+খণ্ডস্বর=রুদ্ধস্বর

যেমন—অই্, আও্, ইউ্, উই্, ওই্ ইত্যাদি। ঐ ঔ, এ-দুটিও রুদ্ধস্বর। কেননা, এদের উচ্চারণ যথাক্রমে অই্ অউ্।

খণ্ডবর্ণ (sound particle)—অপূর্ণোচ্চারিত ও পরনির্ভর ধ্বনিকে বলা যায় 'খণ্ডবর্ণ'। খণ্ডবর্ণের দুই রূপ —(১) ই্ উ্ প্রভৃতি চারটি পরনির্ভর স্বরধ্বনি অর্থাৎ খণ্ডস্বর এবং (২) খণ্ড ত্ লিখিত রূপ ৎ) ন্ প্ শ্ প্রভৃতি সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি। অনুস্বার এবং বিসর্গও ব্যঞ্জনধ্বনি বলে গণ্য হয়। ব্যঞ্জনধ্বনি স্বভাবতঃই পরনির্ভর। ব্যঞ্জনবর্ণের সাংকেতিক নাম **হস্**। কোনো শব্দের অন্তে হস্‌বর্ণ (অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ) থাকলে তাকে বলা হয় **হসন্ত**। তেমনি কোনো শব্দের মধ্যে হস্‌বর্ণ থাকলে তাকে বলা যায় **হস্‌মধ্য**। যেমন, বণিক্, শরৎ, পাগল্ প্রভৃতি হসন্ত শব্দ, আর মুক্তি (মুক্‌তি), বৎস, পাগ্‌লা প্রভৃতি হস্‌মধ্য শব্দ।

দল (syllable)—বাক্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ড। গঠনভেদে দলের দুই রূপ। যথা —

১। **মুক্তদল** (open syllable)—মুক্তস্বরান্ত দল। যেমন—কে, উ·মা, এ·কা·কী, নি·রু·প·মা।

২। **রুদ্ধদল** (closed syllable)—খণ্ডবর্ণান্ত মুক্তদল। অর্থাৎ,

মুক্তদল+খণ্ডবর্ণ=রুদ্ধদল

যেমন—দই্, বউ্, দিন্, ফুল্ বৈ·শাখ্, গৌ·রব্, পশ্·চিম্।

উচ্চারণভেদেও দলের দুই রূপ।—(১) **হ্রস্বদল** (short syllable), অর্থাৎ অপ্রসারিত রূপে উচ্চারিত দল (মুক্ত বা রুদ্ধ) এবং (২) **দীর্ঘদল** (long syllable), অর্থাৎ প্রসারিত রূপে উচ্চারিত দল (সাধারণতঃ রুদ্ধ)। হাইফেন (-) চিহ্ন রুদ্ধদলের প্রসারণসূচক। যেমন—

দুর্·ল-ভ্ এ জ·গ·তে-র্ ব্যর্·থ·ত·ম প্রা-ণ্

এই পদ্যাংশটুকুতে আছে তিনটি দীর্ঘ রুদ্ধদল (ল-ভ্, তে-র্, প্রা-ণ্), দুটি হ্রস্ব রুদ্ধদল (দুর্, ব্যর্) এবং ছয়টি হ্রস্ব মুক্তদল (এ, জ, গ, থ, ত, ম)।

কলা (mora)—একটি হ্রস্বদলের (মুক্ত বা রুদ্ধ) সমপরিমাণ ধ্বনি। প্রত্যেক হ্রস্বদলে এক কলা এবং প্রত্যেক দীর্ঘদলে দুই কলা গণনীয়। যেমন—'দুর্লভ এ জগতের' ইত্যাদি পদ্যাংশটিতে আছে তিন দীর্ঘ রুদ্ধদলে ৬ কলা, দুই হ্রস্ব রুদ্ধদলে ২ কলা এবং ছয় হ্রস্ব মুক্তদলে ৬ কলা—মোট ১৪ কলা।

মাত্রা (unit of measure)—যে-কোনো বস্তু পরিমাপের আদর্শ মান। অর্থাৎ, যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্তুর সহায়তায় (অর্থাৎ সংখ্যা গণনা করে) কোনো বৃহত্তর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা হয় তাকে বলা হয় 'মাত্রা'। যেমন—দিনের মাত্রা ঘন্টা, ঘন্টার মাত্রা মিনিট, মিনিটের মাত্রা সেকেণ্ড। রচনার প্রণালীভেদে বাংলা ছন্দের ধ্বনিপরিমাপের ক্ষুদ্রতম মাত্রা দু-রকম—**দলমাত্রা ও কলামাত্রা**।

রীতি (style)—ছন্দ-রচনায় বিভিন্ন ধ্বনিবিন্যাস-প্রণালীকে বলা হয় 'রীতি'। বাংলা ছন্দে ধ্বনি বিন্যস্ত হয় তিন স্বতন্ত্র প্রণালীতে। তাই ছন্দের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয় অর্থাৎ মাত্রাগণনাও করা হয় তিন স্বতন্ত্র প্রণালীতে। এই তিন প্রণালীকেই বলা হয় বাংলা ছন্দের তিন রীতি। যথা—

১। এক রীতিতে সাধারণতঃ মুক্ত বা রুদ্ধ-নির্বিশেষে সব দলই আমাদের উচ্চারণে হয় সমপরিমাণ ও একমাত্রক। অর্থাৎ এই রীতিতে দলকেই ছন্দের ধ্বনিমাত্রা বলে গণ্য করা হয়। তাই এই রীতিকে বলা যায় **দলমাত্রক বা দলবৃত্ত** (syllable)। যেমন—

রা·বণ্ আ·মার্। কি করবে মা। নেই্ তো আ·মার্। সী·তা

এই পঙ্‌ক্তির প্রথম তিন বিভাগে আছে চারটি করে দলমাত্রা, শেষ বিভাগে দুটি—মোট ১৪ দলমাত্রা।

২। দ্বিতীয় রীতিতে সব রুদ্ধদলই আমাদের উচ্চারণে হয় দীর্ঘ, আর মুক্তদল সাধারণতঃ হয় হ্রস্ব। তাই এই রীতিতে প্রতি রুদ্ধদলে দুই কলা আর প্রতি মুক্তদলে এক কলা হিসাবে মাত্রাগণনা করা হয়। অর্থাৎ, এই রীতিতে কলাকেই ছন্দের ধ্বনিমাত্রা বলে গণ্য করা হয়। এজন্যই এই রীতির নাম হয়েছে **কলামাত্রক বা কলাবৃত্ত** (moric)। যেমন—

প-শ্ চি-ম্। ন·দী·তী·রে। স-ন্·ধ্যা-র্। দে·শে

এটির প্রথম তিন বিভাগে আছে চারটি করে কলামাত্রা, শেষ বিভাগে দুটি—মোট ১৪ কলামাত্রা।

৩। তৃতীয় রীতিতে আমাদের উচ্চারণে (১) শব্দান্ত্য রুদ্ধদল হয় দীর্ঘ, (২) শব্দের অপ্রান্ত রুদ্ধদল সাধারণতঃ হয় হ্রস্ব, আর (৩) মুক্তদল স্বভাবতঃই হ্রস্ব হয়। তাই এই রীতিতে দীর্ঘ রুদ্ধদলে দুই কলা, আর হ্রস্ব রুদ্ধদলে ও মুক্তদলে এক কলা হিসাবে মাত্রা গণনা করা হয়। অর্থাৎ, এই রীতিতেও কলাকেই ছন্দের ধ্বনিমাত্রা বলে গণ্য করা হয়। তবে এই রীতিতে রুদ্ধদলের দীর্ঘ ও হ্রস্ব এই দুই রূপের একত্র সমাবেশ ঘটে। তাই এই রীতি আখ্যাত হয়েছে **মিশ্র-কলাবৃত্ত,** সংক্ষেপে **মিশ্রবৃত্ত** (composite) নামে। যেমন—

দুর্·ল-ভ্ এ। জ·গ·তে-র্। ব্যর্.থ.ত.ম। প্রা-ণ

হিসাব করলে দেখা যাবে, এটিতেও প্রথম তিন বিভাগে আছে চারটি কলামাত্রা, শেষ বিভাগে দুটি—মোট ১৪ কলামাত্রা। কিন্তু মাত্রাগণনার প্রণালীটা মিশ্রপ্রকৃতির, দ্বিতীয় রীতির মতো সরল নয়।

মোট কথা। মুক্তদল তিন রীতিতেই সাধারণতঃ হ্রস্ব ও এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। আর রুদ্ধদল—(১) দলবৃত্ত রীতিতে হয় মুক্তদলের সমান অর্থাৎ এক দলমাত্রা, (২) কলাবৃত্ত রীতিতে হয় মুক্তদলের দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই কলামাত্রা, আর (৩) মিশ্রবৃত্ত রীতিতে অবস্থাভেদে কখনও হয় মুক্তদলের সমান, মানে এক কলামাত্রা আর কখনও হয় মুক্তদলের দ্বিগুণ, মানে দুই কলামাত্রা। যেমন 'নিরুদ্দেশ' শব্দটি—

দলবৃত্ত রীতিতে—নি.রুদ্.দেশ্=১+১+১, মোট ৩ দলমাত্রা;
কলাবৃত্ত রীতিতে—নি.রু-দ্.দে-শ্=১+২+২, মোট ৫ কলামাত্রা;
মিশ্রবৃত্ত রীতিতে—নি.রুদ্.দে-শ্=১+১+২, মোট ৪ কলামাত্রা।

'নি' মুক্তদল তিন রীতিতেই এক মাত্রা। কিন্তু 'রুদ্' ও 'দেশ্' এই দুটি রুদ্ধদল কখনও এক মাত্রা, কখনও দুই মাত্রা। তাতেই বোঝা যায়, বাংলা ছন্দের রীতি-বৈচিত্র্য মূলতঃ নির্ভর করে রুদ্ধদলের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের উপরে।

২। তিন রীতির নামভেদ

এক সময়ে (১৯২২) এই তিন রীতির নাম দিয়েছিলাম যথাক্রমে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। এখনও এই তিন নাম একেবারে অচল হয়ে যায়নি। কিন্তু এই তিন নাম ছন্দের প্রকৃতি-পরিচায়ক নয়, আর পাঠকের পক্ষেও বিভ্রান্তিকর। তাই পরবর্তী কালে এই তিন নাম বর্জন করে যথাক্রমে দলমাত্রক, কলামাত্রক ও মিশ্র-কলামাত্রক নাম চালানোই সমীচীন মনে করি। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৯৬৫) ব্যবহৃত দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্র-কলাবৃত্ত উক্ত তিন নামেরই রূপান্তর মাত্র। তাছাড়া, বাংলার তিন শ্রেষ্ঠ ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া নামগুলিও ছন্দজিজ্ঞাসু মাত্রেরই জেনে রাখা অবশ্যকর্তব্য। তাই নীচে এক দিকে এই গ্রন্থকার-স্বীকৃত বর্তমান নাম, আর অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া নাম এবং গ্রন্থকারের পূর্বস্বীকৃত ও পরে পরিত্যক্ত নাম যথানুক্রমে সাজিয়ে দেওয়া গেল। আশা করি তাতে পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন নামের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে এই গ্রন্থের আলোচনা ও বিশ্লেষণ অনুসরণ করা সহজ হবে। তাছাড়া, এ বিষয়ে উক্ত তিন কবির মতামতের তাৎপর্য উপলব্ধিরও সহায়তা হবে।

দলবৃত্ত (syllabic)— ১. বাংলা প্রাকৃত (রবীন্দ্রনাথ)
২. মাত্রিক (দ্বিজেন্দ্রলাল)

৩. চিত্রা (সত্যেন্দ্রনাথ)

কলাবৃত্ত (moric)— ৪. স্বরবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)

১. সাধু, নূতন (রবীন্দ্রনাথ)

২. মিতাক্ষর, নূতন (দ্বিজেন্দ্রলাল)

৩. হৃদ্যা (সত্যেন্দ্রনাথ)

৪ মাত্রাবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)

মিশ্রবৃত্ত (composite)— ১. সাধু, পুরাতন (রবীন্দ্রনাথ)

২. মিতাক্ষর, পুরাতন (দ্বিজেন্দ্রলাল)

৩. আদ্যা (সত্যেন্দ্রনাথ)

৪. অক্ষরবৃত্ত (প্রবোধচন্দ্র)

'মিশ্র-কলাবৃত্ত' নামেরই সংক্ষিপ্ত রূপ 'মিশ্রবৃত্ত'। পরিভাষা হিসাবে ব্যবহারের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত নামটাই অধিকতর উপযোগী। কেননা, ছোট নামেরই চলৎশক্তি থাকে বেশি।

ভারতচন্দ্রের সময় অথবা তারও আগে থেকে সাধুসাহিত্যে প্রচলিত মুখ্য ছন্দোরীতিটিকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন 'সাধু' (পুরাতন), দ্বিজেন্দ্রলাল বলতেন 'মিতাক্ষর' (পুরাতন) আর সত্যেন্দ্রনাথ বলতেন 'আদ্যা'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানসী' কাব্যে (রচনাকাল ১৮৮৭-১৮৯০) যে ছন্দোরীতির প্রবর্তন করেন, তাকেও তিনি পূর্বতন 'সাধু' রীতিরই নূতন রূপ বলে মনে করতেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাকে পূর্বতন 'মিতাক্ষর' রীতিরই একটা নূতন রূপমাত্র বলে মনে করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ এই নূতন রীতিটিকেই আখ্যাত করেছিলেন 'হৃদ্যা' নামে। আর, সুপ্রাচীন কাল থেকে লোকসাহিত্যে প্রচলিত ছন্দোরীতিকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন 'বাংলা প্রাকৃত' (মানে লৌকিক)। একে দ্বিজেন্দ্রলাল বলতেন মাত্রিক (syllabic)। আর সত্যেন্দ্রনাথের মতে এরই নাম 'চিত্রা'।

রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া নামগুলি ছন্দের উৎস বা গুণ-পরিচায়ক, ছন্দের গঠনপ্রকৃতির পরিচায়ক নয়, তাই বৈজ্ঞানিক নীতিসম্মতও নয়। পক্ষান্তরে দ্বিজেন্দ্রলালের দেওয়া নামগুলি ছন্দের গঠনপরিচায়ক বটে, কিন্তু ত্রুটিহীন নয়। কেননা অক্ষর কোনো ছন্দেরই মূল উপাদান বলে গণ্য হতে পারে না, আর 'মাত্রা' শব্দকেও ইংরেজি সিলেব্‌ল্-এর বাংলা প্রতিশব্দ বলে মেনে নেওয়া যায় না। এসব কারণেই বাংলা ছন্দের তিন রীতির নূতন নাম রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

বাংলা ছন্দের শ্রুতিবৈচিত্র্য

Phonology of Bengali Versification

প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক **চলিবার ভঙ্গি** আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়। ১৩২১

—রবীন্দ্রনাথ

প্রত্যেক ভাষার একটি স্বকীয় ধ্বনি-উদ্‌ভাবনা আছে। তার থেকে তার স্বরূপ চেনা যায়। বাংলা ভাষারও নিজের একটা বিশেষ **ধ্বনিস্বরূপ** আছে। তার ধ্বনির এই চেহারা হসন্তবর্ণের যোগে। ইংরেজির মতো তারও সুর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে। প্রাকৃত বাংলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে। ১৩৪১ (ইং ১৯৩৪) বৈশাখ

—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ছন্দের ধ্বনিপ্রকৃতি

গদ্য ও পদ্য ভাষা

সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিমিত বাক্‌বিন্যাসের নাম **ছন্দ**। আমাদের নিত্যকথিত বা গঠিত গদ্য ভাষার ধ্বনিপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত রূপে বিন্যস্ত করলেই পদ্যের ছন্দ উৎপন্ন হয়।

পদ্যছন্দও সংগীতের ন্যায় একটি ধ্বনিশিল্প। কিন্তু সংগীত মূলতঃ বাক্‌নির্ভর নয়। যন্ত্রসংগীতই তার প্রমাণ। উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসংগীতও অনেকাংশেই বাক্‌নিরপেক্ষ। কিন্তু পদ্যছন্দ একান্তভাবেই বাক্‌নির্ভর। আমাদের নিত্যকথিত ও পঠিত ভাষার উচ্চারণ ও শ্রুতিই পদ্যছন্দের মূল আশ্রয়। সংগীতেরও ছন্দ আছে এবং পদ্যছন্দ ও গীতছন্দের সাদৃশ্য পার্থক্যের আলোচনাও ঔৎসুক্যজনক। এ সম্পর্কে প্রধান স্মরণীয় বিষয় এই যে, গীতছন্দ সর্বদাই বাক্যের গতিভঙ্গি তথা ভাবের অনুবর্তী না হতেও পারে। যেমন—

ঐ আসে | 'ঐ অতি' | ভৈরব | হরষে
'জলসিঞ্চ' | 'চিতক্ষিতি' | সৌরভ | রভসে।

—কল্পনা, বর্ষামঙ্গল

এটা হচ্ছে গীতছন্দের ভঙ্গি। বলা বাহুল্য, এটা আমাদের বাক্‌ভঙ্গির অনুবর্তী নয়। অন্ততঃ তিন স্থলে বাক্‌ভঙ্গি লঙ্ঘিত হয়েছে। স্বাভাবিক বাক্‌বিন্যাসের ভঙ্গি হচ্ছে এরকম।—

ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতিসৌরভ | রভসে।

বাক্‌বিন্যাস স্বভাবতঃই নির্ভর করে ভাষাগত ভাবের উপরে। সংগীতের পক্ষে তা অলঙ্ঘনীয় নয়। পক্ষান্তরে বাক্‌বিন্যাস তথা ভাববিন্যাসের ভঙ্গিকে যথাসম্ভব রক্ষা করে চলাই পদ্যছন্দের নীতি।

ভাষার গতি, বিরতি ও ছন্দস্পন্দ

আমাদের কথিত বা গঠিত গদ্যভাষার ভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ তার গতি ও বিরতির দ্বারা। মুখের ভাষা কখনও একটানা চলে না। মাঝে মাঝে থামে, আবার চলে। যেমন—

গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ থেকেই | তার মধ্যে প্রবেশ করেছে | ছন্দের অন্তঃশীলা ধারা। রস যেখানেই চঞ্চল হয়েছে, | সেখানেই শব্দগুচ্ছ | স্বতই সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ভাবরসপ্রধান | গদ্য আবৃত্তির মধ্যে | সুর লাগে, | অথচ তাকে | রাগিণী বলা চলে না, | তাতে তালমানসুরের | আভাসমাত্র আছে। তেমনি গদ্যরচনায় | যেখানে রসের আবির্ভাব | সেখানে ছন্দ | অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না, | কেবল তার মধ্যে থেকে যায় | ছন্দের গতিলীলা।

—রবীন্দ্রনাথ, 'ছন্দ' (১৯৭৬), গদ্যছন্দ, পৃ ২১৪

এই হচ্ছে গদ্যের স্বাভাবিক গতিভঙ্গি। ভাষার গতি যেখানে-যেখানে থেমেছে, সেই স্থানগুলি নির্দিষ্ট হল বিরতিসূচক দণ্ডচিহ্নের দ্বারা। পাঠকের অভিরুচি অনুসারে এগুলির কিছু ইতরবিশেষ হতে পারে কিন্তু যথেচ্ছ বিরতি ঘটানো চলে না। মোট কথা, গদ্যভাষারও একটা ভঙ্গি আছে, সে ভঙ্গি দেখা দেয় তার ভাবগত গতি ও বিরতির ফলে। আর তারই প্রভাবে 'শব্দগুচ্ছ স্বতই সজ্জিত' হয়ে ওঠে। এই যে গতি ও বিরতির স্বতঃসজ্জিত শব্দগুচ্ছ, তাকে বলি **বাক্‌পর্ব**। প্রত্যেক বাক্‌পর্বের প্রথমেই থাকে একটি করে ঝোঁকের বেগ, আর ওই বেগজাত গতির বিরতি ঘটে বাক্‌পর্বের শেষে। এই বেগ ও বিরতি ভাষাকে তরঙ্গিত করে তোলে। ভাষার এই তরঙ্গিত ভঙ্গিকেই বলি 'ছন্দ'।

গদ্য ও পদ্যের ছন্দ একরূপ নয়। গদ্যভাষার ছন্দ কখনও 'অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না'। এই অনতিনির্দিষ্ট বা 'অনতিনিরূপিত'[১] গদ্যছন্দকে বলতে পারি **'বাক্‌ছন্দ'** (speech rhythm)। বেগ ও বিরতি-জাত এই যে উত্থানপতনময় তরঙ্গভঙ্গি, তারই সাধারণ নাম **ছন্দস্পন্দ** (rhythm)। এই ছন্দস্পন্দ গদ্য ও পদ্য উভয় ভাষাতেই আছে। গদ্যের ছন্দস্পন্দ অনির্দিষ্ট বা অনিরূপিত, কেননা তার পর্বগুলি অপরিমিত (unmeasured)। পদ্যের ছন্দস্পন্দ সুনির্দিষ্ট বা সুনিরূপিত, কেননা তার পর্বগুলি সুপরিমিত (measured)। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায়,—গদ্যের গতিকে যথার্থ ছন্দ বলা চলে না, কারণ তাতে সুপরিমিত পর্ব থাকে না, তার 'আভাসমাত্র' থাকে। সুপরিমিত ছন্দপর্বের এই আভাসটুকুকেই তিনি বলেছেন 'ছন্দের গতিলীলা'। গদ্যের গতিতে যথার্থ ছন্দ থাকে না, থাকে তার লীলাটুকু মাত্র। ছন্দ-আলোচনায় যার পারিভাষিক নাম ছন্দস্পন্দ, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'ছন্দের গতিলীলা'।

প্রস্বর ও যতি

গদ্য ও পদ্যের প্রধানতম পার্থক্য এই যে, **গদ্যস্পন্দ** (prose rhythm) উৎপন্ন হয় অপরিমিত পর্বযোগে আর **পদ্যস্পন্দ** (verse rhythm) উৎপন্ন হয় সুপরিমিত পর্বযোগে। পদ্যরচনার পর্ব কিভাবে পরিমিত হয় তা নির্ণয় করাই ছন্দশাস্ত্রের প্রাথমিক কাজ। এই কাজের জন্য প্রথম প্রয়োজন পদ্যরচনার পর্ববিভাগ করা। পূর্বেই বলা হয়েছে, পর্বের প্রথমেই থাকে একটি করে ঝোঁক, আর তার শেষে থাকে বিরতি; এই বিরতির দ্বারা ঝোঁকের বেগের অবসান সূচিত হয়। এই ঝোঁকের পারিভাষিক নাম **প্রস্বর** (accent)। আর ছন্দের পরিভাষায় পর্বগতির অবসানসূচক বিরতিকে বলা হয় **যতি** (pause)। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

আজি কি তোমার | মধুর মূরতি || হেরিনু শারদ | প্রভাতে,
হে মাত বঙ্গ, | শ্যামল অঙ্গ || ঝলিছে অমল | শোভাতে।

—কল্পনা, শরৎ

প্রতি পর্বের আদ্যক্ষরের শীর্ষস্থ তির্যক রেখাটি প্রস্বরসূচক, আর প্রতি পর্বের পার্শ্বস্থ দণ্ডচিহ্নটি যতিসূচক। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক লাইনের শেষেও একটি করে যতি আছে, সেটি কোনো চিহ্নযোগে নির্দিষ্ট হয়নি।

যতির তারতম্য

পূর্ণযতি, অর্ধযতি, লঘুযতি, উপযতি ও অণুযতি

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক লাইনেই চারটি করে যতি আছে। একটু মন দিয়ে শুনলেই টের পাওয়া যাবে যে, ওই সবগুলি যতি সমান পর্যায়ের নয়—ওগুলির মধ্যে তারতম্য ভেদ আছে। প্রত্যেক লাইনের প্রথম ও তৃতীয় যতি-দুটি স্পষ্ট অনুভূত হলেও দ্বিতীয় ও চতুর্থ যতির তুলনাও অপেক্ষাকৃত লঘু। দ্বিতীয় যতিটি প্রথম ও তৃতীয়র তুলনায় স্পষ্টতর, অর্থাৎ এটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। আর শেষ, অর্থাৎ চতুর্থ যতিটি স্পষ্টতম, এটির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি। ছন্দের পরিভাষায় প্রথম ও তৃতীয়, এই দুটি যতিকে বলা যায় **লঘুযতি**, আর চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যতিটিকে বলা যায় **পূর্ণযতি**। দ্বিতীয় যতিটির গুরুত্ব এই দুই-এর মধ্যবর্তী, অতএব এটিকে বলা যায় **অর্ধযতি**। এই তিন রকম যতির পার্থক্য দেখাবার জন্য তিন রকম যতি চিহ্নের প্রয়োজন। যেমন—

চন্দ্র যখন | অস্তে নামিল || তখনো রয়েছে | রাতি,
পূর্ব দিকের | অলস নয়নে || মেলিছে রক্ত | ভাতি।

—চিত্রা, সিন্ধুপারে—

প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরে লঘুযতি, দ্বিতীয় পর্বের পরে অর্ধযতি আর সর্বশেষে পূর্ণযতি। সব সময় পূর্ণযতি-সূচক কোনো চিহ্ন না দিলেও চলে, অর্থাৎ উহ্য রাখা চলে। এই গ্রন্থের পরবর্তী সব দৃষ্টান্তেই পূর্ণযতির চিহ্ন উহ্য থাকবে। তাছাড়া, প্রস্বরচিহ্নও সর্বত্র দেখানো নিষ্প্রয়োজন। উপরের দৃষ্টান্তটিতেও প্রস্বরচিহ্ন উহ্য আছে। অন্য সব দৃষ্টান্তেও তাই থাকবে।

আরও নিবিষ্টভাবে মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে প্রত্যেক পর্বের মধ্যেও একটি লঘুতর যতি আছে। পর্বের মধ্যবর্তী এই লঘুতর যতিকে বলি **উপযতি**। প্রয়োজনমতো (:) এই **দ্বিবিন্দু দণ্ড** চিহ্ন দিয়ে উপযতির অবস্থান নির্দেশ করা যায়। যেমন—

চন্দ্র: যখন | অস্তে: নামিল ||তখনো: রয়েছে | রাতি,
পূর্ব: দিকের | অলস: নয়নে|| মেলিছে: রক্ত | ভাতি।

যখন শুধু পর্ববিভাগ দেখানোই উদ্দেশ্য হয় তখন অর্ধযতির চিহ্নটিকে উহ্য রাখতে হয়। এখানে তাই করা হয়েছে। পূর্ণযতি এবং প্রস্বরচিহ্নও উহ্য আছে। এই দৃষ্টান্তে শুধু উপযতির অবস্থানই নির্দেশ করা গেল দ্বিবিন্দু-দণ্ড চিহ্ন দিয়ে।

একটু তলিয়ে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে, যে-কোনো বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দও আমাদের মুখে স্বভাবতঃই টুকরো-টুকরো হয়ে উচ্চারিত হয়। কোনো-কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় এক টুকরো রূপেই যেমন—না, কি, সে, মাস্, দিন্, ফুল্। আবার কোনো-কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় দুই বা ততোধিক টুকরো হয়ে। যেমন—ন·দী, সুপ্·তি, আ·কাশ্, ক·বি·তা, ব·সন্·ত ইত্যাদি। আমাদের মুখে এ-রকম প্রত্যেকটি টুকরো বা খণ্ডের পরেই একটু বিরতি ঘটে, যেমন আমাদের চলার সময় প্রতি পদক্ষেপের পরেই ঘটে **ক্ষণিক** বিরতি। বাক্যগত এ-রকম ধ্বনিখণ্ডের পরবর্তী ক্ষণিক বিরতিকে ছন্দ-পরিভাষায় বলি **অণুযতি**। আর এ-রকম ধ্বনিখণ্ডকে বলি **দল** (syllable)। এই দলের কথা পরে বলা যাবে বিশদভাবে। এবার উপরের দৃষ্টান্তটিতে প্রতিশব্দের অন্তর্গত অণুযতির অবস্থান দেখানো যাক **একবিন্দু** (·) চিহ্ন যোগে।—

চন্·দ্র. য·খন্। অস্.তে না.মি.ল ॥ ত.খ.নো র·য়ে·ছে। রা·তি,

পূর্·ব দি·কের। অ·লস্ ন·য়.নে ॥ মে.লি.ছে রক্·ত। ভা.তি।

শব্দের শেষ ধ্বনিখণ্ডের পরবর্তী অণুযতি-চিহ্নটিকে সহজেই উহ্য রাখা যায়। আর উপযতি, লঘুযতি প্রভৃতি যতিচিহ্নের পূর্বে অনুরূপ অণুযতি-চিহ্ন রাখা একেবারেই অনাবশ্যক। এই দৃষ্টান্তেও সব শব্দেরই শেষ অণুযতির চিহ্ন উহ্য আছে। এই নীতি সর্বত্রই সমভাবে অনুসৃত হতে পারে।

যতিবিভাগ

পঙ্‌ক্তি, পদ, পর্ব, উপপর্ব ও দল

বিভিন্ন রকম যতির দ্বারা নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগগুলির বিভিন্ন নাম থাকাও প্রয়োজন। তাই পূর্ণযতির দ্বারা নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগকে বলব পঙ্‌ক্তি। অর্থাৎ ছন্দের পূর্ণযতিবিভাগের পারিভাষিক নাম **পঙ্‌ক্তি** (verse)। তেমনি অর্ধযতিনির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগের নাম **পদ** (clause), লঘুযতি-বিভাগের নাম **পর্ব** (foot), উপযতি-বিভাগের নাম **উপপর্ব** (sub-foot), আর অণুযতি-বিভাগের অর্থাৎ ধ্বনিখণ্ডের নাম **দল** (syllable)।

এইসব ছন্দোবিভাগের নাম অনুসারে পূর্ণযতিকে **পঙ্‌ক্তিযতি**, অর্ধযতিকে **পদযতি**, লঘুযতিকে **পর্বযতি**, উপযতিকে **উপপর্বযতি** এবং অণুযতিকে **দলযতি** নামেও অভিহিত করা যায়।

উপরের দুটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে দুই পদ; আর প্রতি পদে আছে দুই পর্ব। অর্থাৎ এই দুই দৃষ্টান্তেরই প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী ও প্রত্যেক পদ দ্বিপর্বক। উভয়ত্রই পঙ্‌ক্তির শেষ পর্বগুলি স্পষ্টতঃই অপূর্ণ। বাংলা ছন্দে অধিকাংশ স্থলেই পঙ্‌ক্তির শেষপ্রান্তস্থিত পর্ব অপূর্ণ থাকে।

এবার অন্যরকম একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

শীর্ণ শান্ত। সাধু তব ।। পুত্রদের। ধরে,
দাও সবে। গৃহছাড়া ॥ লক্ষ্মীছাড়া। করে।

—চৈতালি, বঙ্গমাতা

এই দৃষ্টান্তেও প্রতি পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী, প্রতি পদ দ্বিপর্বক এবং শেষ পর্ব অপূর্ণ। তাছাড়া পূর্ববর্তী দুই দৃষ্টান্তের মতো এটিতেও প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে দুই উপপর্ব। কিন্তু কানের সাক্ষ্যেই বোঝা যায়, পঙ্‌ক্তি পদ ও পর্বের এই বর্ণনার অভিন্নতা সত্ত্বেও এই দৃষ্টান্তটি আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় দিক্ থেকেই পূর্ববর্তী দুটি দৃষ্টান্ত থেকে বহুলাংশেই পৃথক্। যথাস্থানে এই পার্থক্যের কারণ নির্দেশ করা যাবে।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, ছন্দের **পঙ্‌ক্তি** (verse বা metrical line) আর মুদ্রিত বা লিখিত **ছত্র** (printed বা written line) এক নয়। একই ছন্দপঙ্‌ক্তিকে অভিরুচি বা প্রয়োজনমতো একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা যায় বা লিখতে হয়। এসব ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তিগুলিকে সাধারণতঃ অর্ধযতিতে বিভক্ত করে দুই বা ততোধিক ছত্রে সাজানো হয়। কখনও কখনও লঘুযতি অনুসারেও ছত্রভাগ করা যায়। কিন্তু যথেচ্ছ ভাগ করা কখনও চলে না।

ছন্দপঙ্‌ক্তিকে অর্ধযতি বা লঘুযতি অনুসারে একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা হলে আর চিহ্ন দিয়ে যতিবিভাগ দেখাবার প্রয়োজন থাকে না। অর্ধযতি বা লঘুযতি চিহ্ন তখন উহ্য থাকে।

অর্ধযতি বা পদযতি (medial pause, caesural pause) অনুসারে পঙ্‌ক্তি বিভাগের দৃষ্টান্ত এই।—

লেখে স্বর্গে মর্তে মিলে
দ্বিপদীর শ্লোক—
আকাশ প্রথম পদে
লিখিল আলোক
ধরণী শ্যামল পত্রে
বুলাইল তুলি,
লিখিল আলোর মিল
নির্মল শিউলি।

—স্ফুলিঙ্গ-২২৩, 'লেখে স্বর্গে মর্তে'

এই রচনাটিতে আছে মোট চার পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী এবং পদযতি অনুসারে বিভক্ত হয়ে দুই ছত্রে সজ্জিত। বলা বাহুল্য, পঙ্‌ক্তিগুলিকে ভেঙে দুই ছত্রে না সাজিয়ে অনায়াসেই এক ছত্রেও সাজানো যায়। আর-একটা দৃষ্টান্ত এই।—

মুদিত আলোর | কমলকলিকা | -টিরে
রেখেছে সন্ধ্যা | আঁধার পর্ণ | -পুটে।
উতরিবে যবে | নবপ্রভাতের | তীরে
তরুণ কমল | আপনি উঠিবে | ফুটে।
উদয়াচলের | সে তীর্থপথে | আমি
চলেছি একেলা | সন্ধ্যার অনু | -গামী,
দিনান্ত মোর | দিগন্তে পড়ে | লুটে ॥

—গীতালি-১০৭, 'মুদিত আলোর',

এই দৃষ্টান্তটিতে আছে মোট তিন পঙ্‌ক্তি, পদে পদে ভেঙে সাত ছত্রে সাজানো। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী, তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ত্রিপদী। প্রত্যেক পদে তিন পর্ব, শেষ পর্ব অপূর্ণ।

পর্বে পর্বে বিভাজনের দৃষ্টান্ত এই।—

বুকভরা মধু | বঙ্গের বধূ ‖ জল লয়ে যায় | ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ | করে আনচান ‖ চোখে আসে জল | ভরে।

—চিত্রা, দুই বিঘা জমি

এই দৃষ্টান্তের 'দ্বিপদী' পঙ্‌ক্তিগুলিকে পর্বে-পর্বে ভেঙে তিন বা চার ছত্রেও লেখা যায়। যেমন—

বুকভরা মধু
বঙ্গের বধূ
জল লয়ে যায় | ঘরে।

শেষ অপূর্ণ পর্বটিকে ('ঘরে') বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চার ছত্রও করা যেতে পারে। অনেক সময় পঙ্ক্তি ভাঙার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় পর্বপ্রান্তিক (বা পদপ্রান্তিক) মিলকে ফুটিয়ে তোলা। উপরের দৃষ্টান্তটিতে প্রথম দুই পর্বের পরেই মিল আছে, তৃতীয় পর্বের পরে নেই। তাই তৃতীয় ও চতুর্থ (অপূর্ণ) পর্বকে এক ছত্রেই রাখা হয়েছে। এ-রকম রচনাকে অনেক সময় দুই ছত্রেও সজানো হয়। যেমন—

বুকভরা মধু   বঙ্গের বধূ
    জল লয়ে যায় ঘরে।

মিল দেখাবার প্রয়োজনে প্রথম ছত্রে দুই পর্বের বা পদের মধ্যে খানিকটা ফাঁক রাখা হয়। এসব স্থলেও যতিচিহ্ন উহ্য রাখা যায়।

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, প্রচলিত প্রথায় এইজাতীয় রচনাকে বলা হয় 'ত্রিপদী'। বস্তুতঃ এসব রচনাকে ত্রিপদী বলা সমীচীন নয়। কেননা, 'বুকভরা মধু'-র ন্যায় লঘুযতির বিভাগকে 'পদ' বলার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। পর্বে-পর্বে মিল থাকলেই তাকে 'পদ' বলা যায় না। যেমন—

শলাকাবিদ্ধ | হতেছে সিদ্ধ || মনুনিষিদ্ধ | পক্ষী।

—কল্পনা, উন্নতিলক্ষণ

নৌকা ফি সন | ডুবিছে ভীষণ || রেলে কলিশন | হয়।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান

এসব স্থলে তিন পর্বে মিল আছে বলেই এ ধরনের পঙ্ক্তিকে চৌপদী বলা চলে না। অর্ধযতির প্রতি দৃষ্টি রেখে দ্বিপদী বলাই সমীচীন। পক্ষান্তরে

ভোরের গগনে | অরুণ উঠিতে || কমল মেলেছে | আঁখি,
নবীন আষাঢ় | যেমনি এসেছে || চাতক উঠেছে | ডাকি।

—কল্পনা, প্রকাশ

এটার কোনো পর্বের পরেই মিল নেই, অথচ গঠনপ্রণালীতে এটা পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের সম্পূর্ণ অনুরূপ। সুতরাং এটিকেও 'দ্বিপদী' বলাই সমীচীন। আর যদি পঙ্ক্তি ভাঙার প্রয়োজন হয় তবে অর্ধযতিতে বিভক্ত করে দুই ছত্রে সাজানো যেতে পারে।

পূর্বে বলেছি পর্বান্ত্য বা পদান্ত্য মিলকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে ছন্দপঙ্ক্তিকে অনেক সময় ভেঙে ভেঙে সাজাতে হয়। তার আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

দুঃখের | বরষায়
        চক্ষের | জল যেই
            নাম্‌ল,

বক্ষের | দরজায়
        বন্ধুর | রথ সেই

থাম্‌ল।

—গীতালি-১, 'দুঃখের বরষায়'

এই পঙ্‌ক্তিগুলি ত্রিপদী, পদে-পদে ভাঙা হয়েছে। এর পর্যায়ক্রমিক মিলগুলি (বরষায়-দরজায়, যেই-সেই) লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, মিল দেখাবার প্রয়োজন না থাকলেও লেখকের অভিরুচিক্রমে পদে-পদে পঙ্‌ক্তি ভাঙা চলে।

পূর্বে বলা হয়েছে, পর্বের আদিতে থাকে একটি প্রস্বর ও অন্তে থাকে একটি লঘুযতি। এই প্রস্বর ও যতির যোগেই ছন্দ তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, অথাৎ ছন্দস্পন্দ উৎপন্ন হয়। পর্বের আদি ও অন্তস্থিত প্রস্বর ও যতির যোগে যে উত্থানপতনময় তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাকে বলতে পারি **পর্বতরঙ্গ বা পর্বস্পন্দ**।

এই পর্বস্পন্দের দ্বারাই সমগ্র পঙ্‌ক্তির স্পন্দবৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্বস্পন্দের পরিচয়েই রচনার ছন্দস্পন্দের পরিচয়। বস্তুতঃ রচনার ছন্দোবৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রধানতঃ নির্ভর করে তার পর্বগুলির আকৃতি ও প্রকৃতির উপরে। পর্বপ্রকৃতির কথা যথাস্থানে পরে বলা যাবে।

যতি ও প্রস্বরের অবস্থান

১। লঘুযতি ও উপযতির অবস্থান

গদ্যভাষার বাক্‌পর্ব স্বভাবতঃই ভাবানুসারী। তাই তার বাক্‌পর্বের বিরতি ঘটে কোনো-না-কোনো শব্দের শেষে, মধ্যে নয়। কিন্তু পদ্যভাষার সুপরিমিত যতি-বিভাগ পুরোপুরি ভাবানুসারী হয় না, হতে পারে না। অর্থাৎ, পদ্য ভাষার ছন্দোযতি সব সময় ভাবযতির স্থলবর্তী হতে পারে না। ফলে ছন্দের উপযতি ও লঘুযতি অনেক সময় শব্দের মধ্যেও স্থাপিত হয়। কিন্তু যথেচ্ছভাবে শব্দের মধ্যে যতি স্থাপন করা যায় না। কেন যায় না, তা বোঝাবার পূর্বে বাংলা শব্দের উচ্চারণপ্রণালীর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

পূর্বে বলেছি ছন্দের অণুযতি-বিভাগের নাম দল (syllable)। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ডের নাম **দল**। দল-এর পূর্ণতর পরিচয় পরে দেওয়া যাবে। ছোট-ছোট বাংলা শব্দে থাকে এক, দুই বা তিন দল। যেমন—দিন, সুপ্‌.তি ও ব.স.ন্ত যথাক্রমে এক, দুই ও তিন দলের শব্দ। এর চেয়ে বড় শব্দ আমাদের মুখে ছোট-ছোট দলগুচ্ছে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, আর প্রত্যেক গুচ্ছে থাকে দুটি বা তিনটি দল। দীর্ঘ শব্দের এ-রকম উচ্চারণ-বিভাগকে বলি **শব্দপর্ব**। যেমন—আরা-ধনা, মরী-চিকা, অপরি-চিত, অনু-কর-ণীয়।

এ প্রসঙ্গে আর-একটা কথা মনে রাখা দরকার। ভাবপ্রকাশের বা ছন্দের বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে একদল শব্দ আমাদের মুখে স্বভাবতঃই পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—কে-কে যাবে? তুমি-কি যাবে? তুমি না-গেলে আমিও যাব-না। কে-কে, তুমি-কি, না-গেলে ইত্যাদি রকমের দুই বা তিন দলের জোড়া-শব্দও ছন্দের বিভাগে এক-একটি অখণ্ড শব্দ ও উপপর্বের মর্যাদা পেয়ে থাকে।

সমাসবদ্ধ শব্দের অংশগুলিও শব্দপর্ব রূপেই স্বীকৃত হয়ে থাকে। যেমন—কালি-দাস, রঘু-বংশ, মহা-ভারত, ভারত-বর্ষ, অমৃত-সাগর। ছন্দের রীতিভেদে শব্দপর্বের আয়তনে পার্থক্য ঘটে। যথাস্থানে তা দেখানো

যাবে। যা হক, দুই শব্দপর্বের মধ্যে যে একটি ক্ষীণ যতি অনুভূত হয়, গুরুত্বের বিচারে সেটি ছন্দের উপযতির সমান। তাই ছন্দের উপযতি অতি সহজেই দুই শব্দপর্বের মধ্যে স্থাপিত হতে পারে। তাছাড়া, অনেক সময় ছন্দের লঘুযতিও দুই পর্বের মধ্যে স্থাপিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ শব্দের মধ্যস্থিত উপযতিকেই ছন্দের লঘুযতি রূপে প্রয়োগ করা হয়। যেমন—

মৃত্যু: যে-দিন। বলবে: 'জাগো,। প্রভাত: হল। তোমার: রাতি',
নিবিয়ে: যাব। আমার: ঘরের। চন্দ্র: সূর্য। দুটো: বাতি।
আমরা: দোঁহে। 'ঘেঁষা: ঘেঁষি'
'চির: -দিনের'। 'প্রতি: বেশী',
'বন্ধু: -ভাবে'। কণ্ঠে: সে-মোর। জড়িয়ে দেবে। 'বাহু: পাশ,'
'বিদায়: -কালে'। 'অদৃষ': টেরে'। করে: যাব। 'পরি: হাস'।

—কল্পনা, হতভাগ্যের গান

এই দৃষ্টান্তে আটটি শব্দের পর্বসন্ধি-স্থলে উপযতি পড়েছে। তার মধ্যে চারটি শব্দ (ঘেঁষাঘেষি, প্রতিবেশী, অদৃষ্টের, পরিহাস) অখণ্ড, আর বাকি চারটি সমাসবদ্ধ। শব্দপর্বের মধ্যে লঘুযতি নেই কোথাও। 'যে-দিন এবং 'সে-মোর' এই দুটি জোড়া-শব্দ এখানে প্রযুক্ত হয়েছে ছন্দের উপপর্ব রূপে। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

জল সে: চিত। আল: বালে। তরুণ:'সহ। কারে',
প্রিয়: নামটি। শিখিয়ে: দিত। সাধের:'সারি। কারে'।...
মরব: না-ভাই। নিপু: ণিকা। চতু: রিকার। শোকে,
তারা: সবাই। অন্য: নামে। আছেন: 'মর্ত্য।-লোকে'।

—ক্ষণিকা, সেকাল

এখানে দুটি শব্দের (নিপুণিকা, চতুরিকা) পর্বসন্ধিতে স্থাপিত হয়েছে উপযতি, আর তিন শব্দের (সহকারে, সারিকারে, মর্ত্য-লোকে) পর্বসন্ধিতে স্থাপিত হয়েছে লঘুযতি। প্রথম দুটি শব্দ অখণ্ড, তৃতীয়টি সমাসবদ্ধ। 'না-ভাই' এই জোড়া-শব্দের উপপর্বরূপটিও লক্ষণীয়। তা-ছাড়া, এই ছন্দে 'জল, সেচিত' পর্বের একদল 'জল' শব্দটি আমাদের কণ্ঠে স্বতঃই পরবর্তী ত্রিদল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি চতুর্দল পর্ব গঠন করে। আর এই চার দলের পর্বটিও স্বভাবতঃই দুই দলের দুটি উপপর্বে (জল্‌সে, চিত) বিভক্ত হয়।

দুই বা তিন দলের শব্দে পর্ববিভাগ থাকে না। তাই ও-রকম ছোট শব্দের মধ্যে উপযতি বা লঘুযতি স্থাপন করা যায় না।

২। অধিপ্রস্বর ও উপপ্রস্বরের অবস্থান

এ প্রসঙ্গে প্রস্বরের অবস্থানের বিষয়টাও চিন্তনীয়। গদ্যভাষায় বাক্‌পর্বের প্রথম শব্দের আদি দলের উপরে পড়ে প্রধান ঝোঁক বা **অধিপ্রস্বর**, অন্য শব্দের আদিতে **উপপ্রস্বর**। তেমনি, বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হলে দীর্ঘ শব্দের বেলায় প্রথম শব্দপর্বের আদিদলের উপরে পড়ে অধিপ্রস্বর, অন্য শব্দপর্বের আদিতে উপপ্রস্বর। কিন্তু

পদ্যভাষায় ছন্দপর্বের প্রথম উপপর্বের আদিতে পড়ে অধিপ্রস্বর, অন্য উপপর্বের আদিতে উপপ্রস্বর। যদি কোনো দীর্ঘ শব্দের মধ্যে লঘুযতি স্থাপিত হয় তবে লঘুযতির পরবর্তী শব্দপর্বের আদিতেই পড়ে অধিপ্রস্বর, আর প্রথম শব্দপর্বের আদিতে উপপ্রস্বর। অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে অধিপ্রস্বর শব্দের মধ্যেও স্থাপিত হতে পারে, সে অবস্থায় উপপ্রস্বর পড়ে শব্দের আদিতে। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

মর্‌ব: না-ভাই। নিপু: ণিকা। চতু: রিকার। শোকে,
তারা: সবাই। অন্য: নামে। আছেন: মত।-লোকে।

একটু মন দিয়ে শুনলেই টের পাওয়া যাবে, এই দৃষ্টান্তের প্রতি পর্বেই প্রথম উপপর্বের আদিতে পড়ে অধিপ্রস্বর, আর দ্বিতীয় উপপর্বের আদিতে উপপ্রস্বর। পঙ্‌ক্তিশেষের দুই পর্ব অপূর্ণ, এক উপপর্ব নিয়ে গঠিত। এই দুই উপপর্বের (শোকে, লোকে) উপরেই পড়ে অধিপ্রস্বরের ঘা। দেখা যাচ্ছে 'মর্ত্যলোকে' শব্দের প্রথমাংশ (মর্ত্য) এখানে প্রযুক্ত হয়েছে পূর্ববর্তী পর্বের দ্বিতীয় উপপর্ব রূপে, তাই তার উপরে পড়েছে উপপ্রস্বরের মৃদু ঘা। আর, তার শেষাংশ নিয়ে গড়া হয়েছে পরবর্তী পর্বের আদি উপপর্ব, তাই তার আদিতে পড়েছে অধিপ্রস্বরের প্রবল ঘা। বোঝা গেল, অবস্থাবিশেষে ছন্দের খাতিরে বাংলা শব্দের মধ্যেও প্রবল প্রস্বর পড়তে পারে।—এই দৃষ্টান্তটির উপরে একটু হাত বুলিয়ে এটির শেষ অপূর্ণ পর্ব দুটিকে পূর্ণ রূপ দেওয়া যাক।—

মরব: না-ভাই। নিপু: ণিকা। কিংবা: চতু। রিকার: শোকে,
তারা: সবাই। অন্য: নামে। আছেন: মোদের। মর্ত্য: লোকে।

এবার 'চতুরিকা' শব্দের পর্বসন্ধিতে আছে লঘুযতি, আর 'মর্ত্যলোকে' শব্দের পর্বসন্ধিতে উপযতি। ফলে এবার উপপ্রস্বর পড়ল 'চতুরিকা' শব্দের আদিতে, আর অধিপ্রস্বর শব্দের মধ্যে দ্বিতীয় উপপর্বের আদিতে। পক্ষান্তরে 'মর্ত্যলোকে' অধিপ্রস্বর ও উপপ্রস্বর নিজেদের মধ্যে স্থানবদল করেছে—অধিপ্রস্বর চলে এল আদিতে, আর উপপ্রস্বর চলে গেল মধ্যে। অধিপ্রস্বর ও উপপ্রস্বরের এ-রকম অবস্থান-বদল বাংলা ছন্দের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ।

অন্য রীতির ছন্দেও বাংলা প্রস্বরের এই লীলা দেখা যায়। যেমন—

বুড়ার: গান: তাহে। ডুবিয়া: যায়,
  তুফান: মাঝে: ক্ষীণ। তরী—
কেবল: দেখা যায়। 'তান: পুরায়'
  আঙুল: কাঁপে: থর। থরি।...
কোলের: সখী: 'তান। পুরার': 'পরে
  রাখিল: লজ্‌জিত। মাথা,
ভুলিল: শেখা: গান। পড়িল: মনে
  বাল্য: ক্রন্দন। গাথা।

—সোনার তরী, গনভঙ্গ

উদ্ধৃত অংশে 'লজ্জিত' (লজ: জিত) ও 'ক্রন্দন' (ক্রন্‌: দন) শব্দের যুক্তাক্ষর ভেঙে উপপর্ব-বিভাগ দেখানো হয়নি অর্থবোধের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে। এখানে আসল লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'তান: পুরায়' শব্দে 'তান্‌' দলের উপরে পড়ে অধিপ্রস্বরের প্রবল ঘা, আর পরবর্তী 'পু' দলের উপরে পড়ে উপপ্রস্বরের

মৃদু ঘা, কিন্তু তৃতীয় পঙ্‌ক্তির 'তান। পুরার' শব্দে এই দুই প্রস্বরের আসন-বদল হয়েছে। কারণ প্রথম শব্দের পর্বসন্ধিতে আছে উপযতি, আর দ্বিতীয় শব্দের পর্বসন্ধিতে আছে লঘুযতি।

এবার আর-এক রীতির রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

হে-মোর: দুর্ভাগা: দেশ॥ যাদের: করেছ: 'অপ। মান',
'অপ: মানে'। হতে: হবে॥ তাহা: দের। সবার: সমান।

—গীতাঞ্জলি—১০৮, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'

প্রথম পঙ্‌ক্তির 'অপ। মান' শব্দের উপপ্রস্বর ও অধিপ্রস্বর নিজেদের আসন বদলে নিয়েছে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'অপ-মানে' শব্দে। কারণ এই দুই শব্দের পর্বসন্ধিস্থিত যতির গুরুত্বভেদে দ্বিবিধ প্রস্বরের অবস্থান-পরিবর্তনের এই প্রবণতা নিতান্ত অলক্ষিতভাবেই বাংলা ছন্দে ধ্বনিসৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়তা করে।

৩। পূর্ণযতি ও অর্ধযতির অবস্থান

পূর্ণযতি স্বভাবতঃই স্থাপিত হয় ছন্দ পঙ্‌ক্তির শেষ প্রান্তে। কবি মধুসূদন অবশ্য এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু সে শুধু এক রকম ছন্দোবন্ধেই। অন্য সব ছন্দোবন্ধে সাধারণ নিয়মই অনুসৃত হয়।

অর্ধযতি থাকে দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির মধ্যে, সাধারণতঃ দুই বা তিন পর্বের পরে—তৃতীয় পর্ব সাধারণতঃ অপূর্ণ থাকে। যেমন—

১। গন্ধ চলে। যায়, হায়॥ বন্ধ নাহি। থাকে,
ফুল তারে। মাথা নাড়ি॥ ফিরে ফিরে। ডাকে।
বায়ু বলে। যাহা গেল॥ সেই গন্ধ। তব,
যেটুকু না। দিবে তারে॥ গন্ধ নাহি। কব।

—কণিকা, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে

২। আজি এই। উৎসবের। দিনে
কত লোক। ফেলে অশ্রু। ধার,
গেহ নেই। স্নেহ নেই। আহা,
সংসারেতে। কেহ নেই। তার।...
অনাথ ছে। লেরে কোলে। নিবি
জননীরা। আয় তোরা। সব,
মাতৃহারা। মা যদি না। পায়
তবে আজ। কিসের উৎ। সব

—কড়ি ও কোমল কাঙালিনী

প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে অর্ধযতি আছে পুরো দুই পর্বের পরে, শেষার্ধের দ্বিতীয় পর্ব অপূর্ণ। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে অর্ধযতি আছে তিন পর্বের পরে, তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ, শেষার্ধেও তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ। এই দৃষ্টান্তের অর্ধযতি বিভাগ অর্থাৎ পদবিভাগ দেখানো হয়েছে পঙ্‌ক্তি ভেঙে। তাই অর্ধযতির চিহ্ন উহ্য রাখা হয়েছে।

পঙ্‌ক্তি যদি বেশি দীর্ঘ হয় তবে এক পঙ্‌ক্তিতে দুটি বা তিনটি অর্ধযতি থাকে। ও-রকম দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি দুটি বা তিনটি অর্ধযতির দ্বারা যথাক্রমে তিন বা চার পদে বিভক্ত হয়। এ-রকম পদবিভাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

দুই ও তিন পর্বের ছোট পঙ্‌ক্তিতে অর্ধযতি থাকে না। পর্বগুলির মধ্যে থাকে একটি বা দুটি লঘুযতি। আর, লঘুযতির পরেই আসে পূর্ণযতি। এ-রকম অর্ধযতিহীন ছোট পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত এই—

১। কালো রাতি | গেল ঘুচে
আলো তারে | দিল মুছে।
পুব দিকে | ঘুম-ভাঙা
হাসে ঊষা | চোখ-রাঙা।

—সহজপাঠ (১ম), দ্বিতীয় পাঠ

২। কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি,
বোঝাই-করা | কলসি, হাঁড়ি।
গাড়ি চালায় | বংশীবদন,
সঙ্গে যে যায় | ভাগ্নে মদন।

—সহজ পাঠ (২য়), হাট

৩। দূর হতে যারে। পেয়েছি পাশে
কাছের চেয়ে সে। কাছেতে আসে।

—লেখন, ‘দূর হতে যারে’

৪। উতল সাগরের। অধীর ক্রন্দন
নীরব আকাশের। মাগিছে চুম্বন।

—লেখন, উতল সাগরের

৫। নগরীরে | অন্ন বিলা | -বার
আমি আজি | লইলাম | ভার।...

কহিল সে | নমি সবা | কাছে,
শুধু এই | ভিক্ষাপাত্র | আছে।...
ভিক্ষা-অন্নে | বাঁচাব ব:সুধা,
মিটাইব | দুর্ভিক্ষের | ক্ষুধা।

—কথা, নগরলক্ষ্মী

৬। পথের প্রান্তে | আমার তীর্থ | নয়,
পথের দুধারে | আছে মোর দেবা | লয়।

—লেখন, 'পথের প্রান্তে'

প্রথম চার দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে এক লঘুযতির দ্বারা বিভক্ত দুই পর্ব। তার পরেই পূর্ণযতি, অর্ধযতি নেই। তৃতীয় দৃষ্টান্তে প্রতি পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্ব অপূর্ণ। আর, শেষ দুই দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দুই লঘুযতির দ্বারা বিভক্ত তিন পর্ব (তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ)। তার পরেই অর্ধযতির স্থানে আছে পূর্ণযতি, অর্ধযতি নেই।

সবচেয়ে ছোট পঙ্‌ক্তিতে থাকে দুই উপপর্ব নিয়ে গড়া এক পর্ব। দুই উপপর্বের মধ্যে থাকে উপযতি, আর এই এক পর্বের পরে লঘুযতির স্থানে থাকে পূর্ণযতি। এ-রকম এক পর্বের পঙ্‌ক্তিতে অর্ধযতি তো থাকেই না, লঘুযতিও থাকে না। দৃষ্টান্ত—

১। বায়ু: বয়
বন: ময়।
বাঁশ: গাছ
করে: নাচ।

—সহজ পাঠ (১), প্রথম পাঠ

২। সরস: দল
পনস: ফল।
শমন: ঘরে
গমন: করে।

—মদনমোহন, শিশুশিক্ষা (১ম)

৩। কোকিল: ডাকিল,
অখিল: হাসিল।
যাতনা: বাড়িছে,
চেতনা: ছাড়িছে।

—মদনমোহন, শিশুশিক্ষা (১ম)

এই তিন দৃষ্টান্তেই প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে দুই উপপর্ব নিয়ে গড়া এক পর্ব। এই এক পর্বের পরেই আছে পূর্ণযতি, লঘুযতি নেই, অর্ধযতিও নেই।

এক পর্বের ছোট পঙ্‌ক্তির ধারাবাহিক রচনা ছোট শিশুদের শিক্ষারম্ভের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। দুই ও তিন পর্বের ছোট পঙ্‌ক্তির ধারাবাহিক রচনার নিদর্শনও অতি বিরল। কাব্যরচনায় এ-রকম ছোট-ছোট পঙ্‌ক্তি সাধারণতঃ দীর্ঘতর পঙ্‌ক্তির অনুষঙ্গ রূপেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—

১। আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে
ছিল মনে।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা হৈল গত
স্বপ্ন-মতো।

—ক্ষণিকা, ক্ষতিপুরণ

২। হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিও ক্ষমা।

—ক্ষণিকা, অবিনয়

৩। মোর সুকুমার ললাট-ফলকে লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চির-ভক্ত
এ কি সত্য?

—কল্পনা প্রণয়-প্রশ্ন

৪। আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রু সিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ।
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃ স্বরে।

—কল্পনা, জগদীশচন্দ্র বসু

যতি ও প্রস্বর লোপ

কবিতা আবৃত্তিকালে আমাদের উচ্চারণে অনেক সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাশিত বিরতি ঘটে না। উচ্চারণের এ-রকম অ-বিরতিকে বলা হয় যতিলোপ বা যতিলঙঘন। বাংলা ছন্দে উল্লিখিত পাঁচ রকম যতিই অবস্থাবিশেষে লুপ্ত বা লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। এখানে একে একে ওই পাঁচ রকম যতিলোপের পরিচয় দেওয়া গেল।

১। পূর্ণযতিলোপ—সাধারণতঃ পঙ্‌ক্তিপ্রান্ত্য পূর্ণযতি লুপ্ত হয় না। কেননা, পূর্ণযতি লুপ্ত হলে পঙ্‌ক্তির তথা ছন্দোবন্ধের মূল কাঠামোটাই ভেঙে যায়। কিন্তু এক শ্রেণীর নবপ্রবর্তিত ছন্দোবন্ধে পঙ্‌ক্তিপ্রান্ত্য পূর্ণযতির স্থানে প্রায়শঃ উচ্চারণের পূর্ণবিরতি ঘটে না। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ এ-রকম পূর্ণযতিহীন ছন্দকে বলেছেন ‘পঙ্‌ক্তিলঙঘক’ ছন্দ। আসলে সে ছন্দ হচ্ছে ‘পঙ্‌ক্তিযতি-লঙ্ঘক’ ছন্দ। এ-রকম পঙ্‌ক্তিযতি-লঙঘক ছন্দকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় **প্রবহমান ছন্দ**। মধুসূদন-প্রবর্তিত **অমিত্রাক্ষর** পয়ারই (১৮৫৯) প্রবহমান

ছন্দোবন্ধের প্রথম নিদর্শন। পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে যথোচিত দৃষ্টান্তসহ প্রবহমান ছন্দোবন্ধের বিশদ পরিচয় দেওয়া যাবে।

২। অর্ধযতিলোপ—আধুনিক কালের রচনায় অর্ধযতি লোপের দৃষ্টান্ত খুব বিরল। কিন্তু একেবারে অপ্রাপ্যও নয়। অর্ধযতি পদবিভাগের সূচক। তাই অর্ধযতি লুপ্ত হলে পঙ্‌ক্তির পদবিভাগও লোপ পায়। ফলে অর্ধযতি (অর্থাৎ পদযতি) লুপ্ত হলে তার পরবর্তী পার্বারম্ভসূচক প্রস্বরটিও স্বতঃই লুপ্ত হয়ে যায়। ঢ্যারা (×) চিহ্ন অর্ধযতি বা পদযতিলোপের পরিচায়ক। যেমন—

নিজ হস্তে। নির্দয় আ × ঘাত করি। পিতঃ,
ভারতেরে। সেই স্বর্গে || কর জাগ।-রিত।

—নৈবেদ্য-৭২, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

বীর্য দেহ। তোমার চ × রণে পাতি'। শির
অহর্নিশি। আপনারে || রাখিবারে। স্থির।

—নৈবেদ্য-৯৯, 'তব কাছে এই মোর'

ক্ষুদ্র সত্য। বলে, 'মোর || পরিষ্কার। কথা,
মহাসত্য। তোমার ম × হান্ নীর।—বতা'।

—কণিকা, অস্ফুট ও পরিস্ফুট

কাল বলে,। আমি সৃষ্টি ॥ করি এই। ভব,
ঘড়ি বলে,। তাহলে আ × মিও স্রষ্টা। তব।

—কণিকা, উপলক্ষ

এ-রকম অর্ধযতিলোপের দৃষ্টান্ত আধুনিক সাহিত্যে যত বিরল, অধুনাপূর্ব সাহিত্যে তত বিরল ছিল না। কবি ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় এজাতীয় দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়।

৩। লঘু যতিলোপ—বাংলা ছন্দে লঘু যতি অর্থাৎ পর্বযতি-লোপের আধিক্য তথা গুরুত্বই সর্বাধিক। কেননা, পর্বই বাংলা ছন্দের প্রধান বাহন। পর্বযতি-লোপের প্রসঙ্গে প্রথম স্মরণীয় বিষয় এই যে, পর্বের আয়তনসীমা নিরূপিত হয় তার আদিস্থিত প্রস্বর এবং অন্তস্থিত যতির দ্বারা। বাংলা ছন্দের পর্বসূচক এই প্রস্বর ও যতি বাঙালির কানে স্বাভাবিক ভাবেই ধরা পড়ে। তাই পঙ্‌ক্তির পর্ববিভাগ নিরূপণের পক্ষে কোনো বাধা ঘটে না। কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পর্বান্ত্য যতি ও তার পরবর্তী পর্বের আদিস্থিত প্রস্বরের লোপ ঘটে।

সেসব স্থলে কিছু সংশয় দেখা দেয়। যেমন—

দুর্লভ এ। ধরণীর ॥ লেশতম। স্থান,
দুর্লভ এ। জগতের ॥ ব্যর্থতম। প্রাণ।

—চৈতালি, দুর্লভ জন্ম

চঞ্চল। মৌমাছি ॥ গুঞ্জরি। গায়,
বেণুবনে। মর্মরে || দক্ষিণ। বায়।

—চিত্রবিচিত্র, ফাল্গুন

এই দুটি রচনা প্রকৃতিতে ভিন্ন হলেও আকৃতিতে অভিন্ন। দুটিরই পর্বযতি নির্ণয়ে কোনো অসুবিধা নেই। ফলে প্রস্বর নির্ণয়েও সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই চিহ্ন-যোগে প্রস্বর দেখানো হয়নি, ঊহ্য রাখা হয়েছে। কিন্তু নিম্নলিখিত দুটি দৃষ্টান্তেই পর্বযতি স্থাপনে সংশয় দেখা দেয়।—

লজ্‌জা দিয়ে | সজ্‌জা দিয়ে || দিয়ে আব | -রণ,
তোমারে দুর্‌: লভ করি || করেছে গো: পন।
পড়েছে তো: মার পরে || প্রদীপ্ত বা: সনা,
অর্ধেক মা: নবী তুমি || অর্ধেক কল্‌: পনা।

—চৈতালি, মানসী

ধীরে ধীরে | শর্বরী || হয় অব | -সান,
উঠিল বি: হঙ্গের || প্রত্যুষ | -গান।
বনচূড়া | রঞ্জিল || স্বর্ণ লে: খায়
পূর্বাদি: গন্তের || প্রান্ত রে: খায়।

—চিত্রবিচিত্র, উৎসব

এই দুটি দৃষ্টান্তও প্রকৃতিতে যথাক্রমে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্ত-দুটির অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এই যে, কবির প্রয়োজনমতো স্থলে-স্থলে পর্বযতি লোপ করা হয়েছে—(:) এই **ত্রিবিন্দু-দণ্ড** চিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট। যেসব স্থলে এরূপ পর্বযতির লোপ ঘটেছে, সেসব স্থলে ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ রক্ষার প্রয়োজনে আমাদের রসনা পর্বযতির স্বাভাবিক অবস্থানকে লঙ্ঘন করে স্বতঃই একটানা অগ্রসর হয়ে চলে। ধ্বনির এ-রকম অবিচ্ছিন্ন গতির ফলে ছন্দতরঙ্গের একঘেয়েমি দূর হয়ে বেশ একটু অভিনবত্বও দেখা দেয়। কবির ভাবপ্রকাশের সুযোগও প্রশস্ততর হয়। মনে রাখা দরকার যে, এই লঘুযতি বা পর্বযতি লোপের ফলে তার পরবর্তী পর্বপ্রস্বরটিও লুপ্ত হয়, আর ওই লুপ্ত যতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্বদুটি একত্র সংলগ্ন হয়ে গিয়ে একটি **যুক্তপর্বক পদ** উৎপন্ন হয়। উপরের দৃষ্টান্ত দুটির 'পড়েছে তোমার পরে', 'উঠিল বিহঙ্গের' প্রভৃতি অংশকে বলা যায় 'যুক্তপর্বক পূর্ণপদ' আর 'প্রদীপ্ত বাসনা', 'স্বর্গালেখায়' প্রভৃতি অংশকে বলা যায় 'যুক্তপর্বক অপূর্ণপদ'। 'পড়েছে তোমার পরে', 'প্রদীপ্ত বাসনা' প্রভৃতি অংশকে পূর্ণ বা অপূর্ণ 'পর্ব' বলে গণ্য না করাই সমীচীন।

বলা প্রয়োজন যে, সব রকমের ছন্দেই পর্বযতির লোপ ঘটানো হয় না। ও-রকম লোপের ফলে ছন্দে গতিবৈচিত্র্য উৎপন্ন না হয়ে অনেক সময় তালভঙ্গ

ঘটার আশঙ্কা দেখা দেয়। যেমন—

একদা তুমি | অঙ্গ ধরি | ফিরিতে নব | ভুবনে,
মরি মরি অ: নঙ্গদেব | -তা।
কুসুমরথে | মকরকেতু | উড়িত মধু | -পবনে,
পথিকবধূ | চরণে প্রণ | -তা।

—কল্পনা, মদনভস্মের পূর্বে

দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম পর্বযতিলোপের ফলে আবৃত্তির সময়ে একটু খটকা, লাগে। তাই এইজাতীয় পর্বযতিলোপের দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রের শেষে পর্বযতি-দুটিকেও লুপ্ত করা যায় অর্থাৎ 'দেবতা' ও 'প্রণতা' এই শব্দ দুটিকে অবিচ্ছিন্নরূপে উচ্চারণ করা যায়। তাতে বিশেষ খটকা লাগে না, আর উচ্চারণের স্বাভাবিকতাও বজায় থাকে। এ-রকম যতিলোপের দৃষ্টান্তও বেশি পাওয়া যায় না।

৪। উপযতি লোপ—সব রীতির ছন্দেই অবস্থাবিশেষে উপযতিও লুপ্ত হয়। উপযতি লোপের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। দৃষ্টান্ত দিলেই সহজে বোঝা যাবে।—

চিত্র: গুপ্ত | হেসে: বলে | বড়: শক্ত | বুঝা,
যারে: বলে | ভালো: বাসা। তারে: বলে। পূজা।

—চৈতালি, পুণ্যের হিসাব

এই দৃষ্টান্তে প্রত্যেক পর্বেই উপযতিবিভাগ সুস্পষ্ট। কোনো উপযতিই লুপ্ত হয়নি। আর নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত-তিনটিতে যে মাঝে-মাঝে উপযতি লুপ্ত হয়েছে তা বোঝা ও কঠিন নয়। উপযতি-লোপের চিহ্ন (0) শূন্য।

১। সব: আশা।মিটা 0 ইতে। পারি 0 স্ নে। হায়,
তা ব 0 লে কি। ছেড়ে: যাব। তোর: তপ্ত। বুক?

—সোনার তরী, অক্ষমা

যা পা 0 ই্ নি। তাও: থাক্। যা পে 0 য়ে ছি। তাও,
তুচ্ছ: বলে। যা চা 0 ই্ নি। তাই্: মোরে। দাও।

—চৈতালি, দুর্লভ জন্ম

২। দুঃখ: সহার। তপস্: স্যাতেই। হোক্ বা 0 ঙালির। জয়,
ভয়কে: যারা। মানে: তারাই। জাগিয়ে: রাখে। ভয়।
মৃত্যু 0 কে যে। এড়িয়ে: চলে। মৃত্যু: তারেই। টানে,
মত্যু: যারা। বু ক পে 0 তে লয়। বাঁচতে: তারাই। জানে।

—পূরবী, চিঠি

৩। তুলি মে 0 ঘ-ভার। আকাশ: তোমার। করেছ: সুনীল। -বরণী
শিশির: ছিটায়ে। করেছ: শীতল। তোমার: শ্যামল। ধরণী
স্থলে জ 0 লে আর। গগনে: গগনে
বাঁশি বা 0 জে যেন। মধুর: লগনে,
আসে দ 0 লে দলে। তব দ্বা 0র -তলে। দিশি দি 0 শি হতে। তরণী:
আকাশ: করেছ। সুনীল: অমল,। স্নিগ্ধ: শীতল। ধরণী।

—কল্পনা, শরৎ

একটু নিবিষ্টভাবে কান পেতে শুনলেই অনুভব করা যাবে, মাঝে মাঝে উপযতিলোপের ফলে এই তিন দৃষ্টান্তে, বিশেষতঃ তৃতীয়টিতে, পর্বের গতিভঙ্গিতে কেমন বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে।

৫। অণুযতিলোপ—সব রীতির ছন্দে অণুযতি বা দলযতি লুপ্ত হয় না। আবার কোনো বিশেষ রীতির ছন্দ, প্রধানতঃ অণুযতিলোপের উপরেই নির্ভর করে। যথাস্থানে তা দেখানো যাবে। এখানে অণুযতি-লোপের নমুনা হিসাবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আকাশ্: ত.বু। সু.নীল্: থা.কে ॥ ম.ধুর্: ঠে.কে। ভো.রের্: আ.লো,
ম.রণ্: এ.লে। হ.ঠাৎ: দে.খি ॥ ম.রার্: চে.য়ে। বাঁ.চাই্: ভালো।

—ক্ষণিকা, বোঝাপড়া

এই দৃষ্টান্তে শব্দান্ত অণুযতি সর্বত্রই উহ্য আছে, লুপ্ত হয়নি। বাকি সব অণুযতিই সুব্যক্ত। অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্ক্তিতে চোদ্দ দলের পরে চোদ্দটি অণুযতি আছে। এটাই এই ছন্দোরীতির একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। অধিকন্তু এই দৃষ্টান্তে উপযতিও কোথাও লুপ্ত হয়নি। তবে এজাতীয় ছন্দে উপযতি প্রায়শঃই লুপ্ত হয়ে থাকে এবং তাতে পর্বের গতিবৈচিত্র্য বৃদ্ধির সহায়তাই হয়।

এবার অন্য রীতির দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১. চিত্.র.গুপ্.ত। হে.সে ব.লে ॥ 'ব.ড় শক্.ত। বু.ঝা,
যা.রে ব.লে। ভা.লো.বা.সা ॥ তা.রে ব.লে। পূ.জা'।

—চৈতালি, পুণ্যের হিসাব

২. এ-ক দি-ন্। এ-ই্ দে.খা ॥ হ.য়ে যা.বে। শে.ষ্
প.ড়ি.বে.ন: য়-ন 'প.রে। অন্.তি-ম নি: মে-ষ্।

—চৈতালি, দুর্লভ জন্ম

এই দুই দৃষ্টান্তই এক রীতির ছন্দে রচিত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে দুটি লঘুযতি (ত্রিবিন্দুদণ্ড-চিহ্নিত) লুপ্ত হয়েছে। অণুযতিলোপের চিহ্ন হাইফেন (-)।

একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে, প্রথম দৃষ্টান্তের দুই পঙ্ক্তিতেই চোদ্দ দলের পরে চোদ্দটি অণুযতি আছে। একটিও লুপ্ত হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম পঙ্ক্তিতে দশটি অণুযতি সুব্যক্ত আর চারটি অণুযতি লুপ্ত, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে এগারোটি অণুযতি সুব্যক্ত আর তিনটি লুপ্ত। অথচ কানের বিচারে বোঝা যায় —(১) দুই দৃষ্টান্তের ধ্বনিশ্রুতিতে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, তাছাড়া (২) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের দুই পঙ্ক্তিতে লুপ্ত ও অলুপ্ত অণুযতি-সংখ্যায় সমতা না থাকা সত্ত্বেও ওই দুই পঙ্ক্তির মধ্যেও ধ্বনিসাম্য বজায় আছে—কোথাও কানে খটকা লাগে না। কেমন করে এই সমতা রক্ষিত হয় তা বোঝানো যাবে ছন্দের রীতি-বিচার-প্রসঙ্গে।

এ প্রসঙ্গে আর-একটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে অণুযতিলোপ ঘটেছে শুধু শব্দের শেষাংশেই, অন্যত্র নয়।

এবারে আর-এক রীতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

৩। সূ-র্.য চ: লে-ন্ ধী.রে ॥ স-ন্.ন্যা.সী। -বে.শে
প-শ্.চি-ম। ন.দী.তী.রে ॥ স-ন.ধ্যা-র্। দে.শে
ব.ন, প.থে। প্রা-ন্.ত.রে ॥ লু-ণ্.ঠি.ত। ক.রি
গ-ই্.রি-ক্। গো.ধূ.লি-র ॥ ম্লা.ন উ-ৎ: ত.রী।

—চিত্রবিচিত্র, তপস্যা

উক্ত দ্বিতীয় রীতির 'এক দিন এই দেখা' ইত্যাদি দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের ন্যায় এই দৃষ্টান্তেও কোনো-কোনো স্থলে অণুযতি লুপ্ত হয়েছে, অন্যত্র হয়নি। তাছাড়া, বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে লুপ্ত এবং অলুপ্ত অণুযতির সংখ্যাতেও সমতা নেই। কিন্তু উক্ত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের সঙ্গে এই দৃষ্টান্তের একটি গুরুতর পার্থক্যও আছে। ওই দৃষ্টান্তে শব্দের শেষাংশ ছাড়া অন্যত্র অণুযতি লুপ্ত হয়নি, কিন্তু এই দৃষ্টান্তে শব্দের শুধু অন্তে নয়, আদিতেও অণুযতি লুপ্ত হয়েছে। তাই এই দৃষ্টান্তের শ্রুতিরূপেও অনুভবগম্য পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এর কারণ কি, তাও বোঝানো যাবে ছন্দের রীতিবিচার-প্রসঙ্গে। তার পূর্বে প্রয়োজন পর্বের দল-বিভাগের পরিচয় দেওয়া।

পর্বের দল-বিভাগ ও দলের রূপভেদ

পূর্বে বলা হয়েছে, পর্বের আকৃতি ও প্রকৃতির দ্বারাই রচনাবিশেষের ছন্দোবৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্বের আকৃতি ও প্রকৃতি নিরূপণ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পর্বের উপাদান নিরূপণ করা। বলা বাহুল্য, ছন্দের পর্ব গঠিত হয় বাক্যভুক্ত কয়েকটি ধ্বনিখণ্ড নিয়ে। বাক্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ডকে ইংরেজিতে বলা হয় 'সিলেব্‌ল্'। সিলেব্‌ল্-এর বাংলা পারিভাষিক নাম **দল**। যেমন—'দল্', 'ছন্-দ', 'ছান্.দ.সিক্', এই তিনটি শব্দে আছে যথাক্রমে একটি, দুটি ও তিনটি দল। তাই এই শব্দগুলিকে যথাক্রমে **একদল** (monosyllabic), **দ্বিদল** (dissyllabic) ও **ত্রিদল** (trisyllabic) বলে বর্ণনা করা যায়।

দলের রূপভেদ ও ছন্দপ্রয়োগে দলের গুরুত্ব নিরূপণের পূর্বে বাংলা স্বরবর্ণের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কেননা, স্বরবর্ণই হচ্ছে দলের মূল উপাদান।

বাংলা স্বরবর্ণের প্রকৃতি—এ সম্পর্কে প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বাংলায় সংস্কৃতের মতো স্বরবর্ণের নিত্যহ্রস্ব ও নিত্যদীর্ঘ ভেদ নেই। বাংলায় সব স্বরবর্ণই সাধারণতঃ হ্রস্বরূপে উচ্চারিত হয়। আবার অবস্থাবিশেষে সব স্বরবর্ণই দীর্ঘ রূপেও উচ্চারিত হতে পারে। বাংলায় ঈ এবং ঊ-কে দীর্ঘ বলা হলেও উচ্চারিত হয় হ্রস্বরূপেই। অর্থাৎ উচ্চারণের বিচারে ঈ এবং ঊ বর্ণ যথাক্রমে ই এবং উ বর্ণের লিখিত রূপভেদ মাত্র। যেমন, বাংলায় আদি ও নদী শব্দের দি ও দী দলের উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। নদী শব্দের দী দলটি আদি শব্দের দি দলের মতো হ্রস্বরূপেই উচ্চারিত হয়। তেমনি, বধূ শব্দের 'ধূ' দল মধু শব্দের 'ধু' দলের মতোই হ্রস্ব।

বাংলা স্বরবর্ণের রূপভেদ—বাংলায় মূল স্বরবর্ণ ছয়টি—অ আ, ই উ, এ ও। এই ছয়টি স্বনির্ভর পূর্ণস্বর (complete vowel)। অর্থাৎ, এই ছয়টি অন্য কোনো স্বরের সহায়তা ছাড়াই স্বতঃ উচ্চারিত হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে শেষ চারটি (ই উ, এ ও) স্বরের আবার একটি করে অপূর্ণ রূপও আছে। অপূর্ণ রূপে এগুলি কোনো-না-কোনো পূর্ববর্তী পূর্ণস্বরের আশ্রয় না নিয়ে উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন—কই্, ঢেউ্, খাত্র্

(লিখিত রূপ খায়্), যাও শব্দের ই্ উ্ এ্ ও্ পূর্ণ স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয় না এবং হতে পারে না। এ-রকম পরাশ্রিত অপূর্ণ স্বরকে ছন্দের পরিভাষায় বলা যায় **খণ্ডস্বর** (incomplete vowel বা vowel particle)। আর এই চারটি খণ্ডস্বরকে বলা যায় যথাক্রমে খণ্ড ই্, খণ্ড উ, খণ্ড এ্ এবং খণ্ড ও্। আর এই খণ্ডতার পরিচায়ক নিম্নগ তির্যক্ (্) চিহ্নটিকে বলা যায় **আশ্রয়চিহ্ন**। দিও, নিও, খেও শব্দের 'ও' পূর্ণস্বর, কিন্তু দাও্, নাও্, খাও্ শব্দের 'ও' খণ্ডস্বর। খণ্ড এ্ স্বরের লিখিত রূপ য়্।

খণ্ডস্বরকে 'অর্ধস্বর' বা 'semi-vowel' বলা অনুচিত। কেননা, যে ধ্বনি স্বরূপতঃ আধা-স্বর ও আধা-ব্যঞ্জন (অর্থাৎ একাধারে স্বর ও ব্যঞ্জন), তাকেই বলা যায় 'অর্ধস্বর' বা semi-vowel, যেমন—y, w। ভারতীয় পরিভাষায় এ-রকম ধ্বনি বা বর্ণকে বলা হয় 'অন্তঃস্থ' বর্ণ, যেমন—য়্ র্ ল্ ব্ (w)। সংস্কৃত বা ইংরেজিতে খণ্ডস্বর (ই্ উ্ এ্ ও্) স্বীকৃতি পায়নি। তাই ওই দুই ভাষায় খণ্ডস্বর-সূচক কোনো নামও নেই। বাংলায় খণ্ডস্বর স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই 'খণ্ডস্বর' ও 'vowel particle', এই দুটি পরিভাষা বানিয়ে নিতে হয়েছে।

বাংলায় ছয়টি পূর্ণস্বর (অ আ, ই উ, এ ও) এবং চারটি খণ্ডস্বরের (ই্ উ্ এ্ ও্) যোগে উৎপন্ন অন্ততঃ যোলোটি যুক্তস্বরের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

১। অই্—কই, সই (সখি); অউ্—বউ, মউ.চাক; **অএ্** (অয়্)—হয়, পয়.লা, ময়.না; **অও্** —হও, সও.দা।

২। আই্—নাই, পাই.কার, সে.লাই; **আউ্** —ফাউ, পাঁউ.রুটি; **আএ্** (আয়্)—যায়, আয়.না, কায়.দা, শে.খায়, কো.থায়; **আও্** —যাও, পো.লাও, পাও.না।

৩। ইউ্—শিউ.লি, মিউমিউ।

৪। উই্—দুই, পুঁই(শোক), বা.বুই।

৫। **এই্**—খেই, সেই, |ধেইধেই|(নাচ); এউ্—ঢেউ, কেউ.টে, দেউ.লে; **এএ্** (এয়্)—দেয়; এও্—শেও.লা, নেওটা, দেওদার।

৬। **ওএ্** (ওয়্)—শোয়; **ওও্** —ধোও।

অ আ প্রভৃতি ছয়টি পূর্ণস্বরকে ছন্দ-পরিভাষায় বলি **মুক্তস্বর** (open vowel). আর অই্, আউ্ প্রভৃতি যুক্তস্বরকে বলি **রুদ্ধস্বর** (closed vowel)। অন্যভাবে বলা যায়, যে পূর্ণস্বরের অন্তে কোনো কোনো খণ্ডস্বরকে আশ্রয় দেবার দুয়ার খোলা থাকে তাকে বলি **মুক্তস্বর**। আর, যে পূর্ণস্বরের অন্তে কোনো খণ্ডস্বরকে আশ্রয় দেবার ফলে সে দুয়ার আর খোলা থাকে না, তাকে বলি **রুদ্ধস্বর**। যেমন— পা দলে আ স্বরের পরে কোনো খণ্ডস্বরকে আশ্রিত রূপে গ্রহণের পথ খোলা আছে। কিন্তু পাই.কার, পাউ.ডার, পাও.না এই তিন শব্দে আ স্বরের একটি করে খণ্ডস্বর গ্রহণের ফলে সে পথ আর খোলা নেই। সুতরাং আ মুক্ত স্বর এবং আই্, আউ্, আও রুদ্ধস্বর।

রুদ্ধস্বরের বাহুল্য বাংলাভাষার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ, আর বাংলা ছন্দের একটা বড় সম্পদ্। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রুদ্ধস্বর আছে মাত্র দুটি—ঐ, ঔ। একবর্ণে লেখা হলেও উচ্চারণরূপে এই দুটিই আসলে জোড়াস্বর। যথাক্রমে অই, আউ্। মনে রাখা উচিত যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত 'অ' স্বরের উচ্চারণ হ্রস্ব আ। ফলে ঐ, ঔ উচ্চারিত হয় অনেকটা আই্, আউ্ রূপে। যেভাবেই উচ্চারিত হক ঐ্ ঔ্ যে রুদ্ধস্বর তাতে সন্দেহ

নেই। এইজন্যই বাংলায় খৈ, দৈ, বৌ, মৌচাক লেখা যেমন চলে, তেমনই চলে খই, দই, বউ, মউচাক লেখা। এ প্রসঙ্গে আর-একটি কথা মনে রাখা দরকার।—ই এবং উ পরে থাকলে বাংলায় 'অ' উচ্চারিত হয় 'ও' রূপে। ফলে খৈ-খই, বৌ-বউ যেভাবেই লেখা হক, উচ্চারিত হয় খোই, বোউ রূপে। কিন্তু খোই, বোউ ইত্যাদি রূপ লেখা চলে না। তাই রুদ্ধস্বরের তালিকায় ওই্, ওউ্ রূপ-দুটি গ্রহণ করা হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম 'ওই' শব্দটি। যেমন—আজকাল, প্রায়শঃ 'ঐ দেখ' কথাটিকে 'অই দেখ' রূপে না লিখে লেখা হয় 'ওই দেখ'।

খণ্ডবর্ণ ও তার রূপভেদ—দেখা গেল বাংলায় ই উ এ ও, এই চারটি স্বরবর্ণ সাধারণতঃ পূর্ণস্বর রূপে এবং অবস্থাবিশেষে খণ্ডস্বর রূপেও উচ্চারিত হয়। পক্ষান্তরে ব্যঞ্জনবর্ণ স্বভাবতঃই খণ্ডবর্ণ। খণ্ড ত্ (লিখিত রূপ ৎ), খণ্ড ন্, খণ্ড প্ প্রভৃতি খণ্ড ব্যঞ্জন পরবর্তী স্বরের সঙ্গে যুক্ত না হলে বা পূর্ববর্তী স্বরের আশ্রয় না পেলে উচ্চারণযোগ্যই হয় না। যেমন— ক.থা, তু.মি, দো.ষী; অগ্.নি, আল্.তা, ইন্.দু, উৎ.স; শক্.তি, এক্.লা, বাদ্.শা, রেশ্.মি।

অনুস্বার এবং বিসর্গও স্বভাবতঃই খণ্ডব্যঞ্জন। তবে এ-দুটি খণ্ডব্যঞ্জন শুধু পূর্ববর্তী স্বরের আশ্রিত রূপেই উচ্চারিত হয়, পরবর্তী স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় না। যেমন—রং, ব্যাং, সিং.হ হিং.সা; আঃ, উঃ, দুঃ.খ, নিঃ.স্ব।

এখানে দু-একটি আনুষঙ্গিক বিষয় বলে রাখা প্রয়োজন। ব্যঞ্জনবর্ণের সাংকেতিক নাম **হস্** বা **হল্**। তাই ব্যঞ্জনান্ত শব্দকে **'হসন্ত'** বা **'হলন্ত'** যে-কোনো নামেই অভিহিত করা যায়। কিন্তু বাংলায় হল্ ও হলন্ত, এই দুই শব্দের ব্যবহার খুব কমই দেখা যায়। বাংলায় **হস্ ও হসন্ত**, এই দুটি শব্দই বেশি ব্যবহৃত হয়। পৃথক্, শরৎ, বিপদ্, গুণবান্, বরং, জ্যোতিঃ প্রভৃতিকে বলা যায় **হসন্ত শব্দ**। অনুরূপভাবে একালা, রিক্সা, বাজ্না, বৎস, হল্দে, চশ্মা, মাংস, দুঃসহ প্রভৃতিকে বলা যায় **হস্মধ্য শব্দ**। তাছাড়া শুক্ল, রত্ন, বক্ষ, কণ্ঠ, বন্দী, তৃপ্তি, কৃষ্ণ, ধর্ম প্রভৃতিও আসলে হস্মধ্য শব্দ। যুক্তাক্ষর ভেঙে লিখলেই তা দৃশ্যমান হয়। ছন্দ-বিশ্লেষণে এসব শব্দের যুক্তাক্ষর ভেঙে দেখাতে হয় অনেক সময়।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত যে, পৃথক্ ও গুণবান্ এই দুটি শব্দই হসন্ত, কারণ ক্ এবং ন্ এই দুটি হস্বর্ণ আছে যথাক্রমে ওই দুই শব্দের অন্তে। তাই ক্ ও ন্ এই দুই হস্বর্ণকে 'হসন্তবর্ণ' বলা অনুচিত। একই কারণে এক্লা, বাজ্না, চক্র, বর্ষা প্রভৃতিকে 'হসন্তমধ্য' বলা অযৌক্তিক, বলা উচিত 'হস্মধ্য'।

উপরের বিবরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়। বাংলায় চারটি অপূর্ণ স্বর এবং অনুস্বার-বিসর্গ সহ সমস্ত স্বরাশ্রয়হীন ব্যঞ্জনবর্ণ, এই উভয় প্রকার বর্ণকে সমবেতভাবে বলা যায় **খণ্ডবর্ণ**। অর্থাৎ, খণ্ডবর্ণের দুই রূপ—খণ্ডস্বর ও খণ্ডব্যঞ্জন। কোনো প্রকার খণ্ডবর্ণই পূর্ববর্তী পূর্ণস্বরের আশ্রয় না পেলে উচ্চার্য হয় না। তাই সব খণ্ডবর্ণকেই 'আশ্রিতবর্ণ' বলেও বর্ণনা করা যায়। সুতরাং খণ্ডস্বর ও খণ্ডব্যঞ্জন, এই উভয় ক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত খণ্ডতাসূচক (্) এই আশ্রয়চিহ্নকে খণ্ডস্বর ও খণ্ডব্যঞ্জন উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে ব্যবহার করা চলে। যেমন—মই্, কেউ্, পই্তা, ছাউ্নি; হঠাত্, আলাপ্, শুক্নো, পাপ্ড়ি।

মনে রাখা দরকার (্) এই তির্যক্ চিহ্নটি দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচিত হয়ে আসছে 'হস্চিহ্ন' নামে। কিন্তু এতকাল খণ্ডস্বর সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। তাই 'হস্চিহ্ন' নামটার সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন খণ্ডস্বর

তথা রুদ্ধস্বর স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই এখন উক্ত চিহ্নটিকে 'হস্‌চিহ্ন' না বলে ব্যাপকার্থে 'আশ্রয়চিহ্ন' বলাই যুক্তিসংগত।—এবার দলের প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

দলের গঠন—দল গঠিত হয় অনধিক একটিমাত্র মুক্ত বা রুদ্ধ স্বরবর্ণকে অবলম্বন করে। অর্থাৎ, প্রত্যেক দলে অনধিক একটিমাত্র স্বরবর্ণ (মুক্ত বা রুদ্ধ) থাকা চাই। উভয়বিধ স্বরবর্ণই ব্যঞ্জনহীনও হতে পারে, ব্যঞ্জনযুক্তও হতে পারে। দলভেদে স্বরবর্ণের আগে বা পরে অথবা উভয় দিকে একটি বা একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত থাকে। দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা সহজ হবে। যেমন—

(১) অসি, আতা, ইতি, ঈশা, উমা, একা, ওঝা, ঐরাবত, ঔদরিক শব্দের প্রথমেই আছে একটি করে ব্যঞ্জনহীন স্বরবর্ণময় দল। এ-রকম স্বরবর্ণময় দল বেশি দেখা যায় না। এ-রকম দল সাধারণতঃ শব্দের আদিতেই থাকে।

(২) অগ্.নি, আল্.তা, ইন্.দু, উল্.কা, এক্.লা, ওষ্.ঠ শব্দের প্রথম দলের আদিতে আছে একটি স্বরবর্ণ আর তার পরে আছে একটি খণ্ড ব্যঞ্জন। এ-রকম স্বরব্যঞ্জনাময় দলও বেশি নয়। এ-জাতীয় দলও শব্দের আদিতেই থাকে।

(৩) একটি ব্যঞ্জন ও একটি মুক্তস্বর নিয়ে গঠিত দলের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি। উপরে প্রদত্ত অসি প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দের দ্বিতীয় দলটি এই শ্রেণীভুক্ত। এ-রকম মুক্তস্বরান্ত দলের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই—কে, তু.মি, বি.পু.লা, নি.রু-প.মা, সু.প.রি.চি.ত।

(৪) জল্, রাত্, দিন্, ফুল্, কেশ্, দোষ্, পাইক্, পৌষ্ ইত্যাদি রকম স্বরমধ্য দলের সংখ্যাও কম নয়।

(৫) স্বরবর্ণের পূর্বে একাধিক ব্যঞ্জনের সমাবেশও খুব বিরল নয়। যেমন— ক্লান্.তি (ক্‌ল্‌আন্), স্ত্রৈ.ণ (স্‌ত্‌র্‌অই)।

(৬) বাংলায় স্বরবর্ণের পরে একাধিক ব্যঞ্জনের সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। যেমন—ভর্ৎসনা (ভ অ র্ ত্), সংস্কৃত (স্ অ ং স্), দংষ্ট্রা (দ্ অ ং ষ্)। তবে বাংলায় গৃহীত বিদেশি শব্দে ও-রকম সমাবেশ কিছু বেশি দেখা যায়। যেমন—জবর-দস্ত্, বালি-গঞ্জ্; ব্যাঙ্ক্, সিল্ক্, ফিল্ম্, পার্ক্, স্পঞ্জ্।

দলের গড়ন-প্রসঙ্গে এখানে যেসব কথা বলা হল তাতে নানা আকার-আয়তনের দল চিনে নেবার সহায়তা হয়। ছন্দের বিচারে এসব আকার-আয়তনের কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই। ছন্দের বিচারে দলের রূপভেদ নিরূপণ করতে হয় কোন প্রণালীতে, এবার তাই দেখা যাক।

দলের রূপভেদ—বাংলা স্বরবর্ণের মতো দলেরও প্রধান রূপ দুটি—মুক্তদল ও রুদ্ধদল। যে দলের অন্তে কোনো খণ্ডবর্ণ (স্বর বা ব্যঞ্জন) থাকে না তাকে বলি **মুক্তদল** (open syllable)। আর, যে দলের অন্তে খণ্ডবর্ণ (এক বা একাধিক) থাকে তাকে বলি **রুদ্ধদল** (closed syllable)।

মুক্তদলেরও দুই রূপ—মুক্তস্বরময় ও মুক্তস্বরান্ত। যেমন—আ.শা, ই.রা.নী, অ.ব.হে.লা, উ.প.যো.গি.তা শব্দে আছে যথাক্রমে দুই, তিন, চার ও পাঁচটি মুক্তদল। আর, প্রত্যেক শব্দেরই প্রথম দলটি মুক্তস্বরময়, বাকি সব দলই মুক্তস্বরান্ত।

রুদ্ধদলের তিন রূপ—রুদ্ধস্বরময়, রুদ্ধস্বরান্ত ও হসন্ত (ব্যঞ্জনান্ত)। একটু ভেবে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে রুদ্ধস্বরান্ত দলকে বিকল্পে 'খণ্ডস্বরান্ত' দলও বলা যায়। যেমন—(১) ঐ.কান্.তিক্, ঔ.দ.রিক্, আই্.বু.ড়ো, আও্.তা, ইউ.নানী, উই, এই্, ওই্, এগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটি বহুদল শব্দের প্রথম দল 'রুদ্ধস্বরময়', আর বাকি তিনটি একদল শব্দের প্রত্যেকটি দলও 'রুদ্ধস্বরময়'। (২) বৈ.দান্.তিক্, গৌ.রব্, সাই্.কেল্, পাউ্.ডার, আও্.লাত, বেই্.মান্, দেও্.দার, প্রভৃতি শব্দের প্রথম দলটি 'রুদ্ধস্বরান্ত' বা 'খণ্ডস্বরান্ত' আর (৩) এই শব্দগুলির বাকি সব দলই 'হসন্ত'।

এখানে বলা উচিত যে, ছন্দ-বিশ্লেষণের পক্ষে দলের মুক্ত ও রুদ্ধ এই দুই রূপেই জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে দলের অন্যান্য যেসব রূপের কথা বলা হল তাতে শুধু মুক্ত ও রুদ্ধ দল বেছে নেবার সহায়তা হয়। এসব রূপভেদের জ্ঞান ছন্দ-বিশ্লেষণের পক্ষে আবশ্যক নয়।

দলের সংখ্যা নিরূপণ—কোনো শব্দে বা ছন্দপর্বে কয়টি দল (মুক্ত বা রুদ্ধ) আছে তা নিরূপণ করা যায় প্রধানতঃ দুই উপায়ে।—

(১) কোনো শব্দ বা ছন্দপর্ব বাক্‌যন্ত্রের কয় প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তা গণনা করা। যত প্রয়াস তত দল। কিন্তু এই উপায়ে দলসংখ্যা লিখে দেখানো, বা বোঝানো যায় না। দ্বিতীয় উপায়ে অতি সহজেই তা লিখে দেখানো ও বোঝানো যায়।

(২)কোনো শব্দে বা ছন্দপর্বে যতগুলি স্বরবর্ণ (মুক্ত বা রুদ্ধ) থাকে, দলের সংখ্যাও ততই হয়। কেননা, প্রত্যেক দলে অনধিক একটিমাত্র স্বরবর্ণ থাকে। যেমন—কৌ.তুক্, সাই্.কেল ও সাঁও্.তাল শব্দে স্বর তথা দল আছে দুটি করে; আর পাই্.কা.রি, ফৌজ্.দা.রি, ও পাও.না.দার্ শব্দে আছে তিনটি করে। আর একটি দৃষ্টান্ত—

ঘরের খবর। পাই নে কিছুই ॥ গুজোব শুনি। নাকি
কুলিশপাণি। পুলিস সেথায়। লাগায় হাঁকা। -হাঁকি।
শুনছি নাকি। বাংলাদেশের ॥ গান হাসি সব। ঠেলে
কুলুপ দিয়ে। করছে আটক ॥ আলিপুরের। জেলে।

—পূরবী, চিঠি (১৯২৪)

একটু হিসাব করলেই দেখা যাবে এই দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণ পর্বে দল আছে চারটি করে, আর পঙ্‌ক্তিশেষের অপূর্ণ পর্বে আছে দুটি করে। প্রথম পঙ্‌ক্তির পাই, ছুই, খায় ও গায়, এই চারটি দল রুদ্ধস্বরান্ত বা খণ্ডস্বরান্ত, বাকি সব দলই হসন্ত।

দলের উচ্চারণভেদ

দলের উচ্চারণভেদের উপরে পর্বের তথা ছন্দের প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর-করে। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাংলায় স্বরবর্ণের সুনির্দিষ্ট হ্রস্বদীর্ঘভেদ নেই। অর্থাৎ বাংলায় নিত্যহ্রস্ব ও নিত্যদীর্ঘ স্বরবর্ণ নেই। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘতা আছে। বাংলায় ছন্দের আলোচনায় শুধু স্বরবর্ণ নয়, সমগ্র দলকেই হ্রস্ব বা দীর্ঘ বলে গণ্য

করা সমীচীন মনে করি। অর্থাৎ, উচ্চারণভেদে দলের দুই রূপ—**হ্রস্বদল** (short syllable) এবং **দীর্ঘদল** (long syllable)।

বাংলায় মুক্তদল সাধারণতঃ হ্রস্ব বা লঘু রূপেই উচ্চারিত হয়। তবে কোনো মুক্তদল যদি কখনও পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বর্ণের সহিত সংলগ্ন না হয়ে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় তবে তা স্বভাবতঃই দীর্ঘত্ব লাভ করে। যেমন—

চলি চলি। পা- পা- | টলি টলি। যায়,
গরবিনী। হেসে হেসে। আড়ে আড়ে। চায়।

—কড়ি ও কোমল, হাসিরাশি

জাগিয়া উঠি | শয্যাতলে | শুধাল রাজ | -বালা—
'কে- পরালে | মালা।' |

—সোনার তরী, সুপ্তোত্থিতা

দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
'কে- তুমি।'
পেল না উত্তর।

—শেষ লেখা-১৩, 'প্রথম দিনের সূর্য'

একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে, প্রথম দৃষ্টান্তের দুই 'পা' এবং তার পরবর্তী দুই দৃষ্টান্তের দুই 'কে', এই চারটি বিচ্ছিন্ন একদল শব্দই দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হয়।

কবি কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' কাব্যের (১৮৮৯) 'সুখ' কবিতায় আছে—

বল্ ছিন্ন বীণে, | বল্ উচ্চৈঃস্বরে,
না, না, না, | মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, | সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি | কাঁদাতে নরে।

'না সৃজিলা' অংশে 'না' দলটি পরবর্তী শব্দের 'সৃ' দলের সঙ্গে যুক্তরূপে উচ্চারিত হয়। তাই 'না' দলের স্বাভাবিক হ্রস্বতা বজায় থাকে। কিন্তু 'না, না, না' অংশের তিনটি মুক্তদল অন্য কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পায় না। তাই এই তিনটি দলই আমাদের উচ্চারণে দীর্ঘত্ব লাভ করে।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'অপরাজিতা' কাব্যের (১৯১৩) 'অপরাজিতা' নামক প্রথম কবিতার আরম্ভেই আছে—

পরাজিত তুই | সকল ফুলের | কাছে,
তবু কেন তোর | অ-পরাজিতা | নাম?
গন্ধ কি তোর | বিন্দুমাত্র | আছে?

বর্ণ সেও তো | নয় নয়নাভি | -রাম।

আর ওই কাব্যেরই ‘শেষ' কবিতার আরম্ভে বলা হয়েছে—

শেষ অঞ্জলি | নিঃশেষ আজি,
শেষ সাজি যাহা | ভরিবার,
পরাজিত এই | ‘অপরাজিতার’
সময় হয়েছে | ঝরিবার।

একটু তুলনা করলেই বোঝা যাবে, আমাদের উচ্চারণে প্রথম ‘অ-পরাজিতা’ শব্দে ‘অ’ দল ও তার পরবর্তী ‘প’ দল গায়ে-গায়ে লাগা থাকে না। তাই ‘অ’ হয় দীর্ঘ। কিন্তু দ্বিতীয় ‘অপরাজিতা’ ‘অ’ ও ‘প’ গায়ে-গায়ে লাগা রূপেই উচ্চারিত হয়। তাই এই ‘অ’ হ্রস্বই থাকে।

বলা বাহুল্য, মুক্তদলের উক্ত দীর্ঘতা ঘটে ধ্বনির প্রসারণের দ্বারা। মুক্তদলের এ-রকম প্রসারণের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল এবং যদৃচ্ছাক্রমে এ-রকম প্রসারণ ঘটানো যায় না।

ছন্দের প্রয়োজনে বা ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে রুদ্ধদলও অনেক সময় বিশ্লিষ্ট (অর্থাৎ প্রসারিত) ভাবে উচ্চারিত হয়ে দীর্ঘত্ব লাভ করে, অর্থাৎ দুটি হ্রস্ব দলের কাজ করে। যথাস্থানে তা দেখানো যাবে।

পর্বের মাত্রা-নিরূপণ

পূর্বেই বলেছি পর্বের পরিচয়েই ছন্দের পরিচয়। আর, পরিমিত ধ্বনিবিন্যাসের নামই ছন্দ। সুতরাং ছন্দের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পর্বের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয় করা। আর পর্ব হচ্ছে কতকগুলি দলের সমষ্টি। কাজেই বিভিন্ন দলের আয়তন জানা গেলেই পর্বের আয়তন সহজেই নির্ণয় করা যায়।

যার সাহায্যে কোনো কিছুর আয়তন মাপা যায় সেই পরিমাপক উপকরণের পারিভাষিক নাম **মাত্রা** (unit of measure)। বাংলা ছন্দে পঙ্‌ক্তির মাত্রা ‘পদ’, পদের মাত্র ‘পর্ব’। আর, বাংলায় ছন্দপর্ব পরিমিত হয় দুই রকম মাত্রার সাহায্যে।—(১) এক শ্রেণীর ছন্দে প্রত্যেকটি দলই (মুক্ত বা রুদ্ধ) এক মাত্রা বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এ-রকম মাত্রাকে বলা যায় **দলমাত্রা** (syllabic unit)। (২) আর-এক শ্রেণীর ছন্দে প্রসারিত দল অপ্রসারিত দলের দ্বিগুণ বলে (অর্থাৎ দুইটি অপ্রসারিত দলের সমান বলে) স্বীকৃত হয়ে থাকে। একটি অপ্রসারিত দলের সমপরিমাণ ধ্বনিকে বলা হয় **কলা**, (mora)। সুতরাং অপ্রসারিত দলকে এক কলা এবং প্রসারিত দলকে দুই কলা বলে গণনা করলেই এই শ্রেণীর ছন্দপর্বের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণীত হয়। অর্থাৎ এই শ্রেণীর ছন্দে এক কলাই এক মাত্রা বলে স্বীকৃত। তাই এ-রকম মাত্রাকে বলতে পারি **কলামাত্রা** (moric unit)।

বাংলা ছন্দের তিন রীতি

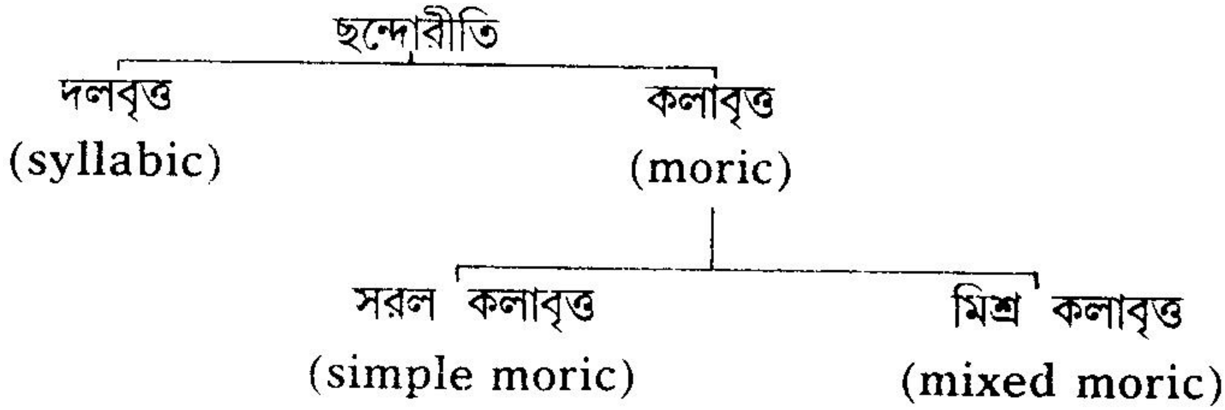
দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত

ছন্দের ধ্বনিপ্রকৃতি তথা শ্রুতিরূপ নির্ভর করে এই মাত্রাবিন্যাস-রীতির উপরেই। বাংলা ছন্দে মাত্রা বিন্যস্ত হয় তিনটি স্বতন্ত্র রীতিতে। তাই বলা যায় বাংলা ছন্দের তিন রীতি।—

১। এক শ্রেণীর ছন্দে পর্ব গঠিত হয় দলমাত্রার যোগে। অর্থাৎ এই শ্রেণীর ছন্দপর্ব গঠনের কাজে প্রত্যেক দলকে এক মাত্রা বলে স্বীকার করে নেওয়াই প্রচলিত রীতি। মাত্রাবিন্যাসের এই রীতিকে বলতে পারি **দলমাত্রক বা দলবৃত্ত** (syllabic) রীতি। সংক্ষেপে বলা যায়, যে রীতিতে দলমাত্রাই ছন্দপর্ব গঠনের উপাদান রূপে স্বীকৃত তারই নাম দলমাত্রক বা দলবৃত্ত রীতি।

২। যে রীতিতে ছন্দপর্ব গঠিত হয় কলামাত্রা নিয়ে তাকে বলা যায় **কলামাত্রক** বা **কলাবৃত্ত** (moric) রীতি। এই কলাবৃত্ত রীতির আবার দুই শাখা।—(১) এক শাখার কলাবৃত্ত রীতিতে সব রুদ্ধদলই প্রসারিত হয়, ফলে এই রীতির ছন্দে প্রতি মুক্তদলে এক কলামাত্রা ও প্রতি রুদ্ধদলে দুই কলামাত্রা হিসাবে গণনা করলেই পর্বের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণীত হয়। এই মাত্রাগণনা-রীতি অতি সরল। তাই একে বলা যায় **সরল কলামাত্রক বা সরল কলাবৃত্ত** রীতি। (২) আর-এক শাখার কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে ধ্বনিবিন্যাসে ও মাত্রাগণনায় কিছু বিশিষ্টতা দেখা যায়। তাতে প্রত্যেক মুক্তদল এক কলা বলে গণ্য হয় বটে, কিন্তু সব রুদ্ধদল দুই কলার মূল্য পায় না। এই রীতিতে স্থানবিশেষে রুদ্ধদলের প্রসারণ ঘটে, অন্যত্র তা ঘটে না। ফলে এই রীতির ছন্দে রুদ্ধদল স্থানবিশেষে দুই কলা ও অন্যত্র এক কলা বলে গণ্য হয়ে থাকে। রুদ্ধদলের এই দুই রূপের যোগে গঠিত বলে এই রীতিকে বলা যায় **'মিশ্র কলামিত্রক'** বা **'মিশ্র কলাবৃত্ত'** (mixed moric) রীতি।

ছন্দপর্বের মাত্রাবিন্যাসরীতিই **ছন্দোরীতি** (metrical style) বলে পরিচিত। এই ত্রিবিধ ছন্দোরীতিকে শাখানুক্রমে সাজিয়ে দেওয়া গেল। আশা করি তাতে বিষয়টা বোঝাবার ও মনে রাখবার সহায়তা হবে।—



সাধারণ ব্যবহারে 'সরল কলাবৃত্ত' না বলে **শুধু কলাবৃত্ত** বলাই যথেষ্ট। তেমনি 'মিশ্র কলাবৃত্ত'-কে সংক্ষেপে **মিশ্রবৃত্ত** (composite) বললে কাজ চালানো সহজ হয়।

এবার দৃষ্টান্ত দিয়ে এই তিন রীতির যথার্থ স্বরূপ ও তাদের পারস্পরিক পার্থক্য বোঝাতে চেষ্টা করছি।—

১। ঠাকুরদাদার | মতো বনে | আছেন ঋষি | মুনি,
তাঁদের পায়ে | প্রণাম করে | গল্প অনেক | শুনি।

—শিশু, বনবাস

২। ক-ল্‌লোলে | কোলাহলে | জাগে এ-ক্‌ | ধ্বনি,
অ-ন্‌ধে-র্‌ | ক-ণ্‌ঠে-র্‌ | গা-ন্‌ আগ | -মনী।

—চিত্রবিচিত্র, আগমনী

৩। ভালোমন্দ | দুঃখসু-খ্ | অন্ধকা-র | আলো,

মনে হ-য়্, | স-ব নিয়ে | এ ধরণী | ভালো।

—চৈতালী, ধরাতল

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃষ্টান্তে রুদ্ধদলের মধ্যবর্তী হাইফেন (-) চিহ্ন সেটির প্রসারণ-সূচক।

এই তিন দৃষ্টান্তের গড়ন বা আকৃতি একই রকম। তিন দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে তিনটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব। একটু পরেই দেখা যাবে তিন দৃষ্টান্তেই পূর্ণ ও অপূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যাও সমান। কিন্তু পার্থক্য আছে শুধু পর্বের মাত্রাগুলির রূপে ও উচ্চারণে। আর তাতেই তিন দৃষ্টান্তের ধ্বনিপ্রকৃতি ও শ্রুতিসৌন্দর্য হয়েছে তিন রকম।

দলসংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে, প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে চারটি করে দল, আর অপূর্ণ পর্বে দুটি করে। একটু মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে, আমাদের উচ্চারণে এই দৃষ্টান্তের রুদ্ধদলগুলি সংকুচিত হয়ে মুক্তদলের সমান হয়ে যায়, অর্থাৎ মুক্ত ও রুদ্ধ নির্বিশেষে সব দলই হয় সমান মানের। ফলে এই রীতির ছন্দে মুক্ত ও রুদ্ধ দলের কোনো ভেদ না মেনে সব দলই একমাত্রা বলে গণ্য করা হয়। হিসাব করলে দেখা যাবে, এই দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে চারটি করে দল, অপূর্ণ পূর্বে দুটি করে। দলসংখ্যার এই সমতার উপরেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত। ফলে এই রীতিতে এক দলই এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। তাই এই রীতিকে বলা যায় **দলমাত্রক** বা **দলবৃত্ত** (syllabic) রীতি।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণ পর্বে চার দল নেই। কিন্তু আমাদের উচ্চারণে এই দৃষ্টান্তের রুদ্ধদলগুলি প্রসারিত হয়ে মুক্তদলের দ্বিগুণ হয়ে যায়, অর্থাৎ দুটি মুক্তদলের সমান হয়। পূর্বে বলেছি একটি অনায়ত মুক্তদলের সমপরিমাণ ধ্বনির পারিভাষিক নাম **কলা** (mora)। প্রতি মুক্তদলে এক কলা এবং রুদ্ধদলে দুই কলা হিসাবে গণনা করলে এই দৃষ্টান্তের প্রতি পর্বে পাওয়া যাবে চার কলা, অপূর্ণ পর্বে দুই কলা। কলাসংখ্যার এই সমতার উপরেই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত। ফলে এই রীতিতে এক কলাই এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। তাই এই রীতিকে বলা যায় **কলামাত্রক** বা **কলাবৃত্ত** (moric) রীতি।

তৃতীয় দৃষ্টান্তের ছন্দোরীতিও আসলে কলাবৃত্ত রীতিরই রূপান্তর মাত্র। তাতে রুদ্ধদলের অবস্থানভেদে তার উচ্চারণে ও কলাগণনায় কিছু হেরফের ঘটে। এই রীতিতে শব্দের অন্তে অবস্থিত রুদ্ধদল আমাদের উচ্চারণে প্রসারিত হয়ে দুই কলা-পরিমিত হয়। একদল শব্দের রুদ্ধদলও **শব্দান্ত** বলে গণ্য হয়। আর, শব্দের অপ্রান্ত রুদ্ধদল সাধারণতঃ সঙ্কুচিত হয়ে এক কলা বলেই গণ্য হয়। এই হিসাবে তৃতীয় দৃষ্টান্তে ‘মন্দ’ শব্দের মন, ‘দুঃখ’ শব্দে দুঃ এবং ‘অন্ধকার’ শব্দের অন, এই তিন দলের প্রত্যেকটি এক কলার সমান এবং সুখ্, কার্, হয়্, সব্, এই চার দলের প্রত্যেকটি দুই কলার সমান। আর, মুক্ত দল তো স্বভাবতঃই এককলা-পরিমিত। সুতরাং মুক্তদল ও শব্দের অপ্রান্ত্য রুদ্ধদলে এক কলা, আর শব্দান্ত্য রুদ্ধদলে দুই কলা হিসাবে গণনা করলে এই তৃতীয় দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণপর্বে চার কলা এবং অপূর্ণ পর্বে দুই কলা পাওয়া যাবে। তাতেই বোঝা যায়, এই রীতিতেও কলা-কেই ছন্দের মাত্রা বলে গণ্য করা হয়। তার মানে এই রীতিও আসলে কলাবৃত্ত। তবে তাতে

রুদ্ধদলের দুই রূপের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। এই বিশিষ্টতার জন্য এই রীতির নাম হয়েছে **মিশ্র-কলাবৃত্ত,** সংক্ষেপে মিশ্রবৃত্ত (composite)।

এখানে বলে রাখা উচিত যে, ছন্দের রীতি-পরিচয়ে দলবৃত্ত বা কলাবৃত্ত নাম উল্লিখিত হলে তার পর্ব-পরিচয় প্রসঙ্গে 'দলমাত্রা' বা 'কলামাত্রা' না বলে শুধু 'মাত্রা' বলাই যথেষ্ট। দু-বার 'দল' বা 'কলা' শব্দের উল্লেখ অনাবশ্যক। যেমন, উপরের প্রথম দৃষ্টান্তটি রচিত হয়েছে 'দলবৃত্ত' রীতিতে, এর প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে চার 'মাত্রা'—এ-রকম বলাই যথেষ্ট। অথবা, যদি বিশেষ প্রয়োজনে বলতে হয় এই দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে চার 'দলমাত্রা', তবে তাতেই বোঝা যাবে এটি রচিত হয়েছে 'দলবৃত্ত' রীতিতে।

এবার অন্য রকমের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আশা করি তাতে বাংলা ছন্দের তিন রীতির বিষয়টা মর্মগত করার সহায়তা হবে।

১। কেউ বা তোমায় | ভালোবাসে,
কেউ বা বাসতে | পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে | আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা | ধারে না যে,
কতকটা সে | স্বভাব তাদের,
কতকটা বা | তোমারও ভাই,
কতকটা এ | ভবের গতিক,
সবার তরে | নহে সবাই।

—ক্ষণিকা, বোঝাপড়া

গণনা করলেই দেখা যাবে, এর প্রত্যেক পর্বেই আছে চারটি করে দল। অর্থাৎ দলসংখ্যার এই সমতার দ্বারাই রচনাটির সৌষম্য রক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং নিঃসন্দেহেই বলা যায়, এখানে **দলবৃত্ত** রীতি অনুসৃত হয়েছে।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

২। ত্রিভুবনের | গোপন কথা | -খানি
কে জাগিয়ে | তুলবে তাহার | মনে,
আমি যদি | আমার মুক্তি | লয়ে
যুক্তি করি | আপন গৃহ | -কোণে?

—ক্ষণিকা, কবির বয়স

পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের ন্যায় এটাও দলবৃত্ত রীতিতে রচিত। পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতি পদে আছে দুটি করে পূর্ণ পর্ব, আর এটির প্রতি পদে আছে দুটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব (দুই দল)।

৩। সুন্দরী | তুমি শুক | -তারা
'সুদূর শৈলশিখ' | -রান্তে,
শর্বরী | যবে হবে | সারা

দর্শন | দিয়ো দিগ্ | -ভ্রান্তে।

ধরা যেথা | অম্বরে | মেশে

আমি আধো | -জাগ্রত | চন্দ্র,

আঁধারের | বক্ষের | ’পরে

‘আধেক আ: লোক-রেখা’ | -রুদ্ধ।

—মহুয়া, শুকতারা

এর যতিগুলির প্রতি একটু মন্ দিলেই বোঝা যাবে, এর প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী, প্রতি পদে তিন পর্ব ও তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ। আরও বোঝা যাবে যে, প্রথম ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পদের প্রথম লঘুযতি বা পর্বযতিটি লুপ্ত। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ‘শৈল’ শব্দ ভেঙে লুপ্ত যতির অবস্থান দেখানো যায় না কারণ শৈ বা শই্ দলটি রুদ্ধ ও অবিভাজ্য। চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে ‘আলোক’ শব্দে ‘আ’ দলের পরে লুপ্তযতির অবস্থান দেখানো হল। আর, আবৃত্তিকালে এর দলগুলির উচ্চারণের প্রতি একটু নজর রাখলে অনায়াসেই ধরা পড়বে যে, এর প্রত্যেকটি রুদ্ধদলই প্রসারিত ও দুইকলা-পরিমিত। তদনুসারে হিসাব করলে বোঝা যাবে, এটির প্রত্যেক পূর্ণপর্বে আছে চার কলা, আর প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রথম পদের শেষ অর্থাৎ তৃতীয় (অপূর্ণ) পর্বে দুই কলা ও দ্বিতীয় পদের শেষ পর্বে তিন কলা। বোঝা গেল, এই অংশের ধ্বনিসামঞ্জস্য নির্ভর করছে এর পর্বগুলির কলাসংখ্যার সমতার উপরে। সুতরাং কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ছন্দ রচিত হয়েছে **কলামাত্রক** বা **কলাবৃত্ত** রীতিতে।

৪। আজি মো-র | দ্রাক্ষাকুঞ্জ | -বনে

গুচ্ছ গুচ্ছ | ধরিয়াছে | ফ-ল।...

বসন্তে-র | দুরন্ত বা: তাসে

নুয়ে বুঝি | আসিবে ভূ: ত-ল।

—চৈতালি, উৎসর্গ

৫। ব্রহ্ম হতে | কী-ট পর | -মাণু,

সর্বভূতে | সে-ই প্রেম | ম-য়,

ম-ন প্রা-ণ | শরী-র অর্: প-ণ

কর সখে | এ সবা-র | পা-য়।

বহুরূপে | সম্মুখে তো: মা-র,

ছাড়ি কোথা | খুঁজিছ ঈশ্ শ্ব-র?

জীবে প্রে-ম | করে যে-ই | জন

সে-ই জ-ন | সেবিছে ঈশ্: শ্ব-র।

—বিবেকানন্দ, বীরবাণী, সখার প্রতি

পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের মতো এ দুটিও দ্বিপদী, প্রতি পদে তিন পর্ব, তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ (দুই কলা)। কিন্তু এ দুটির মাত্রাসমাবেশ প্রণালী পৃথক্। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, সবগুলি শব্দান্ত রুদ্ধদলই প্রসারিত ও দুইকলা-পরিমিত, আর অপ্রান্ত রুদ্ধদলগুলি অপ্রসারিত ও এককলা-পরিমিত। অতএব বলা যায় এই অংশটি

মিশ্র কলাবৃত্ত, সংক্ষেপে **মিশ্রবৃত্ত** রীতিতে রচিত। এর প্রতি পূর্ণপর্বে চার ও অপূর্ণ পর্বে দুই কলামাত্রা। অর্থাৎ এর প্রতি পদের মাত্রাবিন্যাস যথাক্রমে চার-চার-দুই।

উপরের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্ত আকৃতিতে অর্থাৎ বাহ্য গঠনে একই রকম, কিন্তু কানের রুচিতে তিনটি তিন রকম লাগে। শ্রুতিরুচির এই ভিন্নতাই ছন্দপ্রকৃতির পরিচায়ক। শ্রুতিরুচি তথা ছন্দপ্রকৃতি এই পার্থক্যের হেতু দৃষ্টান্তগুলি মাত্রাবিন্যাসরীতির অর্থাৎ ছন্দোরীতির ভিন্নতা। বল নিষ্প্রয়োজন যে, চতুর্থ ও পঞ্চম দৃষ্টান্ত-দুটি আকৃতি ও প্রকৃতি দুই দিক্ থেকেই সম্পূর্ণ এক রকম।

তিন রীতির ব্যতিক্রম ও বিশেষ বিধি

বাংলা ছন্দের তিন রীতির যেসব সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করা গেল। কাব্যপ্রয়োগে সেগুলির কিছু-কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তাছাড়া, এমন কিছু বিশেষ নিয়মও আছে যা তিন রীতিতেই সমভাবে অনুসৃত হয়। আবার, শুধু কোনো-কোনো রীতির পক্ষেই প্রযোজ্য, এমন বিশেষ নিয়মও কিছু আছে। এসব ব্যতিক্রম ও বিশেষ বিধির কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে যথাস্থানে বলা হয়েছে। এখানে কয়েকটিমাত্র ব্যতিক্রম বা বিশেষ বিধির কথা উল্লেখ করা গেল।

দলবৃত্ত রীতিতে

পূর্বে বলা হয়েছে দলবৃত্ত রীতিতে সব রুদ্ধদল আমাদের উচ্চারণে সংকুচিত হয়ে মুক্তদলের সমান হয়। কিন্তু যদি একটি মাত্র রুদ্ধদল পঙ্ক্তির অন্তে থাকে, তবে আমাদের উচ্চারণে সেটি, প্রলম্বিত হয়ে দুই দলের আসন অধিকার করে। যেমন—

সবই হেথায়। একটা কোথাও ॥ করতে হয় রে। শেষ,
গান থামিলে। তাই তো কানে ॥ থাকে গানের। রেশ।
কাটলে বেলা। সাধের খেলা ॥ সমাপ্ত হয়। বলে
ভাবনাটি তার। মধুর থাকে। আকুল অশ্রু। জলে।

—ক্ষণিকা, শেষ

এই ‘শেষ’ কবিতাটি আগাগোড়াই ৪। ৪ ॥ ৪। ২ দলমাত্রার ছন্দে রচিত। অধিকাংশ স্থলেই পঙ্ক্তির শেষ অপূর্ণ পর্বে আছে দুটি মুক্তদল, মাঝে মাঝে একটি রুদ্ধদল। তাতে কানে খটকা লাগে না, ছন্দও কাত হয়ে পড়ে না। এর থেকেই বোঝা যায়, এসব স্থলে একটি রুদ্ধদল দুই মুক্ত দলের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে পারে। পঙ্ক্তির শেষে পূর্ণযতির অবকাশ থাকে বলেই এই সমতারক্ষা সম্ভব হয়। এ-রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন—

১। হায় রে কবে। কেটে গেছে ॥ কালিদাসের। **কাল,**
পণ্ডিতেরা। বিবাদ করে ॥ লয়ে তারিখ। সাল।...
আপাতত। এই আনন্দে ॥ গর্বে বেড়াই। নেচে,
কালিদাস তো। নামেই আছেন ॥ আমি আছি। বেঁচে।

—ক্ষণিকা, সেকাল

কানের বিচারেই বোঝা যায়, 'কাল' ও 'সাল', একটি রুদ্ধদল নিয়ে গড়া এই শব্দ-দুটি আমাদের 'উচ্চারণে অলক্ষিত ভাবেই দুই দল নিয়ে গড়া 'নেচে' ও 'বেঁচে' শব্দের সমান গুরুত্ব লাভ করে।

২। মৃতপারের। অন্ধকারে ॥ ফুট্‌ল আলো। উঠল যে জয়। **গান,**

আপনি ম'রে। বিশ্ব নরে ॥ দিলে তুমি। নবজীবন। **দান**।

স্বর্গে-মর্ত্যে। বাঁধলে সেতু ॥ ধন্য ধরা। তোমার আবির্। -ভাবে।

মরণজয়ী। দীক্ষা তোমার ॥ জয়জয়ে। অটল লাভা। -লাভে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বিদায়-আরতি, বড়-দিন

দেখা যাচ্ছে, 'গান' ও 'দান' শব্দ অনায়াসেই 'ভাবে' ও 'লাভে' শব্দের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করছে।

শুধু পঙ্‌ক্তির অন্তে নয়, অনেক সময় পদের অন্তস্থিত রুদ্ধদলও দুই মুক্তদলের সমান মর্যাদা পায়। যেমন—

সন্ধ্যা তারা। উঠে অস্তে। **গেল,**
চিতা নিবে। এল নদীর ধারে,
কৃষ্ণ পক্ষে। হলুদবর্ণ। **চাঁদ**
দেখা দিল। বনের একটি। পারে...
ওষ্ঠে কারো। সরল সাদা। **হাসি,**
কারো হাসি। আঁখির কোণে। কোণে;
কারো অশ্রু। উছলে পড়ে। **যায়,**
কারো অশ্রু। শুকায় মনে। মনে,
কেউবা থাকে। ঘরের কোণে। দোঁহে,
জগৎ মাঝে। কেউ বা হাঁকায়। **রথ,**
কেউ বা ঘরে। একলা ঘরের। শোকে,
জনারণ্যে। কেউ বা হারায়। **পথ**
সবাই মোরে। করেন ডাকা। ডাকি,
কখন শুনি। পরকালের। **ডাক**?
সবার আমি। সমান বয়।-সী যে
চুলে আমার। যত ধরুক। **পাক**।

—ক্ষণিকা, কবির বয়স

দলবৃত্ত রীতিতে রচিত এই দৃষ্টান্তে আছে মোট আট পঙ্‌ক্তি, প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দুই পদ এবং প্রতি পদে আছে চার মাত্রার দুটি পূর্ণ পর্ব এবং দুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়—একদিকে গেল-চাঁদ ও হাসি-যায় এই চার অপূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যাগত সমতা এবং অপর দিকে ধারে-পারে ও কোণে-মনে এই চারটি অপূর্ণ পর্বের সঙ্গে রথ-পথ ও ডাক-পাক এই চার অপূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যার সমতা। অর্থাৎ, এই দৃষ্টান্তের চাঁদ, যায়,

রথ, পথ, ডাক, পাক এই ছয়টি রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক (মানে দুটি করে মুক্তদলের সমান) বলে গণ্য হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এ-রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

উপরের দৃষ্টান্ত দ্বিমাত্রক রুদ্ধদল আছে পদের অন্তর্গত দুটি পূর্ণপর্বের পরবর্তী অপূর্ণ পর্বে। দুই পর্ব নিয়ে গড়া পদে দ্বিতীয় পূর্ণ পর্বের অন্তে একটি রুদ্ধদল নিয়ে দুই দলের কাজ চালানোর দৃষ্টান্তও আছে কিছু-কিছু। যেমন—

১। কোন্ দেশেতে। তরুলতা ॥ সকল দেশের। চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে। চলতে গেলেই ॥ দলতে হয় রে। দূর্বা কোমল?
কোথায় ফলে। সোনার ফসল ॥ সোনার কমল। ফোটে **রে?**
সে আমাদের। বাংলা **দেশ** ॥ আমাদেরি। বাংলা **রে**।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেণু ও বীণা, কোন্ দেশে

২। এক যে আছে। মজার **দেশ** ॥ সব রকমে। ভালো,
রাত্তিরেতে। বেজায় **রোদ** ॥ দিনে চাঁদের। আলো।

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার, হাসিরাশি, মজার মুল্লুক

এই দুই দৃষ্টান্তের প্রথম পদের অন্তে তিনটি রুদ্ধদল (দেশ, দেশ, রোদ) অতি অনায়াসেই দুই দলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কানে খটকা লাগে না। পরবর্তী অর্ধযতির অবকাশেই, সে সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। এ-রকম দৃষ্টান্ত বেশি দেখা যায় না। প্রথম দৃষ্টান্তের 'রে' মুক্তদলটিও কিভাবে দুই দলের কাজ চালাচ্ছে তাও লক্ষিতব্য।

এক দলের দ্বারা দুই দলের কাজ চালানো প্রসঙ্গে এখানে যা-যা বলা হল, সেগুলিকে দলবৃত্ত রীতির ব্যতিক্রম না বলে বিশেষ বিধি বলাই ভাল।

কলাবৃত্ত রীতিতে

পূর্বে বলা হয়েছে, রুদ্ধদলের সার্বত্রিক সম্প্রসারণ হল কলাবৃত্ত রীতির প্রধান নিয়ম। এই নিয়মটিরও কিছু-কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় এই রীতির প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই। এখানে এ-রকম ব্যতিক্রমের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

১। জগতে যত। মহৎ আছে
হইব নত। সবার কাছে,
হৃদয় যেন। প্রসাদ যাচে
তাঁদের দ্বারে দ্বারে।...
ক্ষুদ্র কাজ। ক্ষুদ্র নয়
এ কথা মনে। জাগিয়া রয়,
বৃহৎ বলে। না মনে হয়
'বৃহৎ কল্প'।-নারে।

—মানসী, দেশের উন্নতি

২।　　রাজার ছেলে। ফিরেছি দেশে। দেশে
　　　'সাত সমুদ্র তেরো নদীর। পার।
　　যেখানে যত। মধুর মুখ। আছে
　　　বাকি তো কিছু। রাখি নি দেখি।-বার।

—সোনার তরী, নিদ্রিতা

৩।　　ছিলাম যবে। মায়ের কোলে
　　বাঁশি বাজানো। শিখাবে বলে
　　　চোরাই করে। এনেছ মোরে। তুমি
　　　　বিচিত্রা হে। বিচিত্রা,
　　যেখানে তব। 'রঙের রঙ্গ'।-ভূমি।

—পরিশেষ, বিচিত্রা

৪।　　অনেক কথা। যাও যে বলে। কোনো কথা না। বলি',
　　তোমার ভাষা। বোঝার আশা। দিয়েছি 'জলাঞ্‌'।-জলি।

—গীতবিতান (প্রেম), 'অনেক কথা'

৫।　　কিনি বিনি কাশী। স্থির হয়ে থাকো,
　　'খবরদার কেউ'। নোড়ো চোড়ো নাকো।

—লক্ষ্মীর পরীক্ষা, দ্বিতীয় দৃশ্য, ক্ষীরো-র উক্তি

এই পাঁচ দৃষ্টান্তের পাঁচটি শব্দে (যথাক্রমে কল্পনা, সমুদ্র, রঙ্গভূমি, জলাঞ্জলি ও খবর্দার) একটি করে রুদ্ধদল প্রসারিত না হয়ে সংকুচিত রূপে উচ্চারিত হয়। এসব ব্যতিক্রম মেনে নেওয়া হয়েছে মূলতঃ কবির অভীষ্ট ভাব প্রকাশের ও স্বাভাবিক উচ্চারণ ভঙ্গি রক্ষার প্রয়োজনে। এ-রকম এক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন[১] —"মানুষ চাপা দেওয়ার চেয়ে মোটর ভাঙা ভালো।" অর্থাৎ, কবির অভিপ্রেত ভাবকে খর্ব করার চেয়ে ছন্দের আইন-কানুন একটু-আধটু হেরফের করাই ভাল। ছন্দের রীতি লঙ্ঘনের আরও দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি দু-জন পাকা ছন্দশিল্পীর রচনা থেকে।—

১।　　জ্যোৎস্নাটুকু। মিশায়, বায়ু। দোলায় কেশ-। -পাশ,
　　এখনি তবে। প্রভাত হবে। জাগিবে 'রশ্মি'। -ভাস।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেণু ও বীণা, জ্যোৎস্নালোকে

২।　　আয় তোর। মুণ্ডটা। দেখি,
　　　　আয় দেখি। 'ফুটোস্কোপ'। দিয়ে,
　　দেখি কত। ভেজালের। মেকি
　　　　আছে তোর। মগজের। ঘিয়ে।

—সুকুমার রায়, আবোল তাবোল, বিজ্ঞানশিক্ষা

দেখা যাচ্ছে, 'রশ্মি' ও 'ফুটোস্কোপ' শব্দে রুদ্ধদল (রশ্‌ ও টোস্‌) প্রসারিত না হয়ে সংকুচিত রূপে এক কলামাত্রায় পরিণত হয়েছে। এ-রকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। কেননা, একান্ত প্রয়োজন না হলে কলাবৃত্ত রীতির রুদ্ধদল-প্রসারণের নীতিটি লঙ্ঘন করা অবাঞ্ছিত।

কলাবৃত্ত রীতিতে রুদ্ধদলকে প্রসারিত করে তিন মাত্রায় পরিণত করার একটি দৃষ্টান্ত এই।—

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান্‌।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
'এ-ক' হউক, 'এ-ক' হউক, 'এ-ক' হউক, হে ভগবান্‌।

—গীতবিতান (স্বদেশ), 'বাংলার মাটি'

এখানে 'এক্‌' রুদ্ধদলটির ত্রিমাত্রক প্রয়োগ লক্ষণীয়। এই অতি প্রসারণ ঘটানো হয়েছে কবির ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে, অর্থাৎ 'এক' শব্দকে বিশেষ গুরুত্ব দেবার অভিপ্রায়ে। 'ক' অকারান্ত রূপে উচ্চারিত হলে 'এ' মুক্তদলটি স্বতঃই উচ্চারিত হবে দ্বিমাত্রক রূপে। মুক্তদলের এ-রকম প্রসারণও অনুরূপ অতিবিরল ব্যতিক্রমেরই নিদর্শন। এই অতিপ্রসারণ সংগীতের সুরবিস্তারের প্রয়োজনেও ঘটেনি। কেননা, সাধারণ কবিতা হিসাবে আবৃত্তি করলেও 'এক্‌' রুদ্ধদলটি স্বতঃই উচ্চারিত হয় ত্রিমাত্রক রূপে। আর তাতেই কবির অভিপ্রায় সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়।

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে

মিশ্রবৃত্ত রীতির মূলনীতি চারটি। এখানে একে একে এই চারটি প্রধান নীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে যথাক্রমে সেসব নীতি লঙ্ঘনের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল প্রয়োজনীয় মন্তব্যসহ।—

এক। সব রকম শব্দেরই অন্তস্থিত রুদ্ধদল সাধারণতঃ প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক হয়।—এই নীতির ব্যতিক্রম একান্তই বিরল, কিন্তু একেবারে অপ্রাপ্য হয়। যেমন—

১। না হেরিয়া শ্যামচাঁদে   তোরও কি পরান কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী।

—মধুসূদন, ব্রজাঙ্গনা, ময়ূরী

২। তাপস নিশ্বাস-বায়ে   মুমূর্ষুরে **দাও** উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।...
রসের আবেশরাশি   শুষ্ক করি 'দাও' আসি
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।

—নটরাজ (ঋতুরঙ্গশালা), বৈশাখ-আবাহন

৩। **দীয়তাং ভোজ্যতাং** বই অন্য কথা নাই,
যখন যে-দিকে যাই, তাই শুন্‌তে পাই।

—মদনমোহন, বাসবদত্তা

যে পদে আরাধে সাধে ‘স্বয়ং’ শঙ্কর,
তাহার মহিমা-সীমা কি জানে কিঙ্কর।

—মদনমোহন, বাসবদত্তা, জয়দুর্গার নিকট প্রার্থনা

যে বলিবে যেই বাক্য, তুমি যদি তাই,
‘সুতরাং’ অত্যুক্তি-প্রসক্তি আর নাই।

—মদনমোহন, বাসবদত্তা, সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা

৪। আমায় জানিলে আমি আর নাহি দায়,
অহং কার বোধ হলে অহংকার যায়।

—ঈশ্বর গুপ্ত, কে তুমি

৫। **স্বয়ং** ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বর-তনয়।
অবতীর্ণ অবনীতে খৃষ্ট-মহাশয়।।

—ঈশ্বর গুপ্ত, মৃত্যু

গোঁৎ করে সোঁৎ ঠেলে ভাটি ‘গাং’ ছেড়ে,
উজানের পথে চল দাঁড়ি-গোপ নেড়ে।

—ঈশ্বর গুপ্ত, তপস্যা মাছ

আদা দিয়া ‘হিং’ দিয়া রাঁধো যদি ঝোল,
থাবা থাবা মেরে দাও, কিছু নাই গোল।

—ঈশ্বর গুপ্ত, হেমন্তে বিবিধ খাদ্য

৬। মুক্তি সাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
মাভৈঃ বাজে নৈরাশ্য-নিশিথে।

—পরিশেষ, দুয়ার

দিনেরে ‘মাভৈঃ’ বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়।
অন্ধকার **অজানাকে**।

—পূরবী, সমাপন

দেখা যাচ্ছে, উদ্ধৃতিচিহ্ন-যুক্ত ছয়টি শব্দের (দাও, স্বয়ং, সুতরাং, গাং, হিং, মাভৈঃ) শব্দের অন্তিম রুদ্ধদল প্রসারিত হয়ে দুই মাত্রার মূল্য পেয়েছে। এটাই মিশ্রবৃত্তরীতির পক্ষে স্বাভাবিক এবং তার অন্যতম প্রধান নীতি। কিন্তু সাতটি শব্দের (স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত) অন্তিম রুদ্ধদল প্রসারিত হয়ে দুই মাত্রার মূল্য পায় নি,

সংকুচিত হয়ে একমাত্রক বলেই গণনীয় হয়েছে। তাতেই মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রথম নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। আরও লক্ষিতব্য এসব দৃষ্টান্তে কোনো শব্দের অন্তেই অনুস্বার বিসর্গ বাদে অন্যরকম হস্‌বর্ণান্ত রুদ্ধদল সংকুচিত ও একমাত্রক হয় নি। এ-রকম সংকোচনে মিশ্রবৃত্ত রীতির মূল প্রকৃতিই ব্যাহত হয়।

দুই। তৎসম শব্দের অপ্রান্ত রুদ্ধদল (যুক্তাক্ষরে লিখিত না হলেও) সাধারণতঃ সংকুচিত ও একমাত্রক হয়। অ-তৎসম শব্দের আদি ও মধ্যস্থিত রুদ্ধদলও যুক্তাক্ষরে প্রকাশিত হলে (যেমন—গিন্নি, গল্প, মস্ত, পর্দা, দস্তুর, বিস্কুট, ট্যাক্‌সি) একমাত্রক বলে গণ্য হয়। তেমনি অই্‌ অউ্‌ রুদ্ধস্বর-দুটি একাক্ষরে (ঐ ঔ লেখা হলে একমাত্রক আর দুই অক্ষরে লেখা হলে দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়। যেমন—রৈল-রই্‌ল, হৈবে-হই্‌বে, মৌচাক-মউ্‌চাক। এ-রকম সেকালের রচনাতেই বেশি দেখা যায়। একালে প্রায় অচল। এই নীতিরও কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে খুব বেশি নয়। যেমন—

১। আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ, তার পরে **নিস্তব্ধ,**
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

—জীবনস্মৃতি, কাব্যরচনাচর্চা

২। দোলে রে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্রকূলে,
‘উৎসব’ ভীষণ।
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দম পবন।

—মানসী, সিন্ধুতরঙ্গ

সুখে দুঃখে **উৎসবে** গান উঠে কলরবে
বিরল গ্রামের মাঝখানে,
তারি সাথে সুধাস্বরে মিশে ভালোবাসা ভরে
পাখিগানে মানবের গানে।

—মানসী, কুহুধ্বনি

৩। বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
‘চীৎকারি’ উঠিল বিপ্র, ‘রাখ্‌, রাখ্‌, রাখ্‌।’

—কথা, দেবতার গ্রাস

‘আহা আহা **চীৎকার** করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত।
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমন কায়

একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

—মানসী (সংযোজন)[১] নিষ্ফল উপহার

৪। ‘জ্যোৎস্না’-রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে-নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে।

—বলাকা-৭, ‘এ কথা জানিতে তুমি’

জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা **আল্পনা** আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানে আপনার।

—বনবাণী, চামেলি বিতান

৫। বড়ো বড়ো মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন **শীর্ষ**-সমেত।

—সোনার তরী, হিং টিং ছট্

৬। বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে
পান্তি-ঘাটায়।

—পরিশেষ (প্রথম সং, ১৯৩২), খ্যাতি

৭। মণিদিদি কেঁদে বলে, “তবে,
শুধু কি রইবে বাকি **কান্নার** খেলা?”

—পরিশেষ (প্রথম সং), খেলনার মুক্তি[১]

৮। গুরু গুরু **গর্জন** গুন্ গুন্ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।

—আরোগ্য-১০, ‘অলস সময়-ধারা’

৯। আসে **অবগুণ্ঠিতা** প্রভাতের অরুণ দুকূলে
শৈলতটমূলে
আত্মদান অর্ঘ্য আনে পায়।

—বীথিকা, মেঘমালা

১০। ডালিতে এনেছ ফুল **স্মৃতবিস্মৃত,**
কিছু বা অপরিচিত।

—সানাই, শেষ অভিসার

১১। **যুগান্তরের** ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে

মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল।...

—পূরবী, অতীত কাল

১২। পুঁথির প্রথম পাতে
অলংকরণ আঁকা, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কি লেখা,
বাকি সব আঁকাবাঁকা রেখা।

—জন্মদিনে-১৯, 'বয়স আমার বুঝি'

১৩। শূন্য **চৌকির** পানে চাহি,
সেথায় সান্ত্বনালেশ নাহি।...
চৌকির ভাষা যেন আরো বেশি করুণ কাতর।
শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়াহীন ঘর।

—শেষ লেখা-৪, 'রৌদ্রতাপ ঝাঁঝাঁ করে'

১৪। অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অস্ফুট গুঞ্জন-স্বরে
আরবার রচি দিবে নীড়।...
বাতায়নে রবে বাহু মেলি
বসন্তের সৌরভের পথে,
মহানিঃশব্দের পদধ্বনি
শোনা যাবে নিশীথজগতে।

—শেষ লেখা-৫, 'আরো একবার'

প্রয়োজনবোধে কোনো-কোনো স্থলে শব্দের সাধারণ প্রয়োগরূপ আগে দেখিয়ে পরে দেখানো হল তার ব্যতিক্রমরূপ (স্থূল লিপিতে মুদ্রিত)। অন্যত্র শুধু ব্যতিক্রমরূপেই দেখানো হল। পান্তি, কান্নার ও **আল্‌পনা**, এই তিন শব্দ অ-তৎসম। বাকি সব শব্দই তৎসম। উপরের সবগুলি দৃষ্টান্তই রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে সংকলিত। কিন্তু বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে, বস্তুতঃ সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই এ-রকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত অতি দুর্লভ। কারণ মিশ্রবৃত্ত রীতির স্বাভাবিক প্রবণতা অপ্রান্ত্য, রুদ্ধদলের সংকোচনের দিকেই, সম্প্রসারণের দিকে নয়।

তিন। অ-তৎসম শব্দের **অপ্রান্ত্য** রুদ্ধদল অযুক্তাক্ষরে প্রকাশিত হলে সাধারণতঃ দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়ে থাকে। তবে ভারতচন্দ্র-প্রমুখ অধুনাপূর্ব কবিদের রচনাতেও এ-রকম রুদ্ধদলের উচ্চারণগত সংকোচন তথা একমাত্রকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কারণ, পূর্বেই বলেছি, শব্দের **অপ্রান্ত্য** রুদ্ধদলের স্বাভাবিক প্রবণতা সংকোচনের দিকেই। এইজন্যই তৎসম শব্দের **অপ্রান্ত্য** রুদ্ধদল অযুক্তাক্ষরে প্রকাশিত হলেও সাধারণতঃ একমাত্রক বলেই স্বীকৃত হয়। এর নিদর্শন হিসাবে পূর্বোল্লিখিত উৎসব, চীৎকার, জ্যোৎস্না শব্দের প্রয়োগরূপের দৃষ্টান্তগুলি স্মরণীয়। এ-রকম আর-একটা দৃষ্টান্ত এই—

‘অপ্রগল্‌ভা’ ধরিত্রী সে প্রণামে লুণ্ঠিত,
পূজারিনী নিরবগুণ্ঠিত।

—মহুয়া, লগ্ন

অ-তৎসম শব্দের অযুক্তাক্ষরে প্রকাশিত রুদ্ধদলও সংকুচিত ও একমাত্রক হতে পারে, কিন্তু বিকল্পে। যেমন—

১। যত চাপিলাম মুঠি
পাপড়িগুলি গেল টুটি—
‘কান্না’ ওঠে, গান থেমে যায়।

—কড়ি ও কোমল, বিদেশী ফুলের গুচ্ছ-৪,
‘সারাদিন গিয়েছিনু বনে’

আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়।
‘পাপড়ি’ মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।

—পরিশেষ, বিস্ময়

২। **শুক্‌নো** কাশে আগুনের মতো
ছড়িয়ে ‘পড়ল’ খ্যাতি নিমেষে নিমেষে।...
আমার এ কুঞ্জলাল ‘তুবড়ি’র মতো
জ্বলে আর নেবে।

—পরিশেষ (প্রথম সং), খ্যাতি

পাপড়ি, কান্না, শুক্‌নো, পড়ল, তুবড়ি, এই পাঁচটি অ-তৎসম শব্দের মধ্যে ‘কান্না’ শব্দের রুদ্ধদল (কান্) যুক্তাক্ষরে প্রকাশিত, তাই একমাত্রক। কিন্তু দ্বিতীয় নিয়মের সপ্তম দৃষ্টান্তে ‘কান্’ হয়েছে দ্বিমাত্রক। আবার ‘পাপড়ি’ ও ‘শুকনো’ শব্দের দুটি রুদ্ধদলই (পাপ্, শুক্) একমাত্রক। কিন্তু পড়ল ও তুবড়ি শব্দের রুদ্ধদল দ্বিমাত্রিক। রবীন্দ্রসাহিত্যে অ-তৎসম শব্দের অপ্রান্ত্য রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক প্রয়োগই বেশি দেখা যায়, একমাত্রক প্রয়োগ খুবই কম। কিন্তু এ-রকম রুদ্ধদলের এই উভয়প্রকার প্রয়োগই যে রীতিসিদ্ধ, সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ছন্দ-আলোচনায়। তাঁর ‘ছন্দ’ গ্রন্থ (তৃতীয় সং, ১৯৭৬) থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

১। **টোটকা** এই মুষ্টিযোগ **লট্‌কানের** ছাল,
সিঁট্‌কে মুখ খাবি, জ্বর **আট্‌কে** যাবে কাল।

২। **একটি** কথা শুনিবারে **তিনটে** রাত্রি মাটি,
এর পরে **ঝগড়া** হবে, শেষে **দাঁতকপাটি**।

৩। **একটি** কথা শোনো, মনে **খটকা** নাহি রেখে,

টাটকা মাছ জুটল না তো **শুঁটকি** দেখো চেখে।

—ছন্দের হসন্ত-হলন্ত (দ্বিতীয় পর্যায়), পৃ ১০১

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটুকুও স্মরণীয়—"আপাতত মনে হয় এটা যথেচ্ছাচার। কিন্তু হিসাব করে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয়নি।" হিসাবটা এই যে, প্রত্যেক দৃষ্টান্তেই চারটি করে অ-তৎসম শব্দের আদিস্থিত রুদ্ধদল সংকুচিত হয়ে একমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধ থেকেই রবীন্দ্ররচিত এ-রকম আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত সংকলন করে দিলাম।—

১ মত্তরোষে বীরভদ্র **ছুট্‌ল** ঊর্ধ্বশ্বাসে,
ঘূর্ণিবেগে **উড়্‌ল** ধুলো রক্ত সন্ধ্যাকাশে।

২। বৈকালে বৈশাখী এল আকাশ-লুণ্ঠনে,
শুক্ল রাতি **ঢাক্‌ল** মেঘাবগুণ্ঠনে।

৩। কর্ণে দিলা **ঝুম্‌কা**-ফুল নাসিকায় নথ,
অঙ্গসজ্জা সমাধানে ভূরি মেহন্নত।

৪। **আইডিয়াল** নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে হাঁড়ি,
প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকে বলে, এ যে বাড়াবাড়ি।
শিবনেত্র হল বুঝি, এইবার মোলো,
অক্‌সিজেন নাকে দিয়ে চাঙ্গা করে তোলো।

—ছন্দের হসন্ত-হলন্ত (দ্বিতীয় পর্যায়ে), পৃ ১১৪-১৫ ও ১১৭

প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেই একটি বা একাধিক অ-তৎসম শব্দের অপ্রান্ত্য রুদ্ধদল (অযুক্তাক্ষরে প্রকাশিত) সংকুচিত ও একমাত্রক হয়েছে।

উক্ত প্রকার রুদ্ধদলের সংকোচন-প্রসারণ দুই-ই যে সমভাবে চলে, তার প্রমাণ হিসাবে রবীন্দ্র-রচিত দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি তাঁর মন্তব্যসহ।—

"**পাৎলা** করিয়া কাটো **কাৎলা** মাছেরে,
উৎসুক নাৎনি যে চাহিয়া আছে রে।

এই ছড়াটি পড়তে গেলে বাঙালি নিঃসংশয়ে স্বতই খণ্ডৎ-এর পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করে পড়বে। আবার তেমনি নিম্নের ছড়াটি সামনে ধরা—

পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে **কাৎলা** মাছটিরে,
টাট্‌কা তেলে ফেলে দাও **সর্‌ষে** আর জিরে।
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কা-বাটা,
যত্ন করে বেছে ফেলে **টুক্‌রো** যত কাঁটা।

অমনি প্রাকহসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মুহূর্তও দেরি হবে না।"

—ছন্দের হসন্ত-হলন্ত (দ্বিতীয় পর্যায়), পৃ ১০৪

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখা উচিত যে—এসব স্থলে আমরা শুধু স্বরবর্ণকে টেনে দীর্ঘ বা ঠেসে হ্রস্ব করি, এ-রকম না বলে রুদ্ধদলকেই দীর্ঘ বা হ্রস্ব করি এ কথা বলাই ভাল মনে করি। যেমন, আমাদের উচ্চারণে 'পাৎলা' শব্দের পাৎ দলটাই দীর্ঘ বা হ্রস্ব অর্থাৎ দ্বিমাত্রক বা একমাত্রক হয়, শুধু আ স্বরটা নয়। কারণ আ-স্বরের পূর্ব ও পর-বর্তী ব্যঞ্জন-দুটিও দুই মাত্রা বা এক মাত্রার বাইরে থাকে না। 'পাৎলা' শব্দের পাৎ দলে দুই মাত্রা এবং লা দলে এক মাত্রা, দুই দলে তিন মাত্রা—এ-রকম হিসাবই তো আমরা করে থাকি।

একই রচনায় বা পঙ্‌ক্তিতে ও-রকম রুদ্ধদলের সংকুচিত ও প্রসারিত রূপের একত্র সমাবেশ হতেও বাধা নেই। যেমন—

১। **চিমনি** ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ নেই 'ঠাকরুন'।

২। 'চিমনি' ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ,
ঝি বলে **ঠাকরুন** মোর নেই কোনো দোষ।

—ছন্দের হসন্ত-হলন্ত (দ্বিতীয় পর্যায়), পৃ ১১৬

প্রথম দৃষ্টান্তে 'চিম্‌নি' শব্দের চিম্ সংকুচিত ও একমাত্রক, কিন্তু 'ঠাক্‌রুন' শব্দের ঠাক্ প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে চিম্ হয়েছে দ্বিমাত্রক আর ঠাক্ হয়েছে একমাত্রক। তাতে কোনো দৃষ্টান্তেই ছন্দের দোষ ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত

'**শুকনো** কাশে আগুনের মত
ছড়িয়ে 'পড়ল' খ্যাতি নিমেষে।'

পঙ্‌ক্তিটির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে।

আসল কথা এই যে, অ-তৎসম শব্দের আদি ও মধ্য-স্থিত অযুক্তাক্ষরে প্রকাশিত হলে সাধারণতঃ প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক হয়। বাংলা সাহিত্যে এ-রকম দ্বিমাত্রক প্রয়োগই চলে আসছে দীর্ঘকাল যাবৎ। তবে এই সাধারণ ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও একেবারে অপ্রাপ্য নয়। পূর্বতন কবিদের রচনা থেকে এ-রকম ব্যতিক্রমের কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি। ভারতচন্দ্রের রচনাতেও এ-রকম ব্যতিক্রমের নজির আছে। তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য (দ্বিতীয় খণ্ড) থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। **উজ্‌বক** 'কজলবাস' 'হাবশী' জল্লাদ,
আশাওল মল্ল ঢালী চেলা খানেজাদ।

—রাজসভায় চোর আনয়ন

২। দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত **মুসলমান**,
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান।

—গড়বর্ণন

৩। দেবাসুরে সদা **দ্বন্দ্ব** সুধার লাগিয়া

ভয়ে বিধি তার মুখে **থুইলা** ‘লুকাইয়া’।
বৎসর পনর ষোল **হৈল** বয়ঃক্রম,
লক্ষ্মী সরস্বতী পতি **আইলে** রহে ভ্রম।

—বিদ্যার রূপবর্ণন

লক্ষণীয় পাঁচটি শব্দের অযুক্তাক্ষরে প্রকাশিত অপ্রান্ত্য রুদ্ধদল (উজ্, সল্, থুই, হই, আই) সংকুচিত ও একমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়। আরও লক্ষণীয় ‘মুসলমান’ শব্দের সল্ একমাত্রক, অথচ ‘কজলবাস’ শব্দের জল্ হয়েছে দ্বিমাত্রক, যদিও এই শব্দ দুটি সর্বতোভাবে পরস্পরের অনুরূপ। তেমনি ‘আইলে’ শব্দের আই্ একমাত্রক, অথচ ‘লুকাইয়া’ শব্দের কাই্ দ্বিমাত্রক। তাতেও বোঝা যায়, এসব ক্ষেত্রে অপ্রান্ত্য রুদ্ধদল একমাত্রক হয় বিকল্পে, সাধারণ নীতি অনুসারে নয়। ‘কজলবাস’ শব্দের জল্ দ্বিমাত্রক, কিন্তু ‘জল্লাদ’ শব্দের জল্ একমাত্রক। তার প্রধান কারণ দ্বিতীয় জল্ অ-যুক্তাক্ষরে প্রকাশিত নয়।

কবি মদনমোহনের **বাসবদত্তা** কাব্যেও এ-রকম ব্যতিক্রমের (অ-তৎসম শব্দের অপ্রান্ত্য ও অযুক্তাক্ষরে প্রকাশিত রুদ্ধদল সংকোচনের) দৃষ্টান্ত আছে। যেমন—

‘দীয়তাং ভোজ্যতাং’ বই অন্য কথা নাই,
এ-দিকে যে-দিকে যাই, তাই **শুনতে** পাই।...
ইহা শুনে **আইসে** যত ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ,
রাণী যত্নে রত্ন-দান করে অনুক্ষণ।...
কোন মহারাজ করে সাজ শিরে তাজ,
কেহ টেড়ি **পাগ্ড়ি** বান্ধে মস্তকসমাজ।

—স্বয়ং বরায়োজন ইত্যাদি

লক্ষণীয় তিনটি শব্দে উক্ত প্রকার তিন রুদ্ধদল (শুন্, আই্, পাগ্) সংকুচিত ও একমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়।

এবার কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

১। তুমি তো সুবোধ চণ্ডী বৈষ্ণবের ছেলে,
কোথা যাও মনোহর **মাল্সাভোগ** ফেলে।

—বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীষ্টধর্মানুরক্তি

২। মশারি খাটাতে আর হবে না জঞ্জাল,
ঝুলের ঝালর দেওয়া **মাকড়সার** জাল।

—বর্ষাবিদায়

৩। নেটিব কেরুর সাৎ **বল্তে কোর্তে** নেই বাৎ,
ক্যালাম্যান ড্যাম তোরা ড্যাম।

—বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব

৪। চেষ্টায় দেখিতে হয় যেমন বিহিত,

দেবী যদি দিন দেন হয়ে যাবে জিত।
আর জন বলে ভাই, এরূপে কি **পার্‌বি**?
যেয়ো নারে বাপ বাপ, সেখানেতে **হার্‌বি**।
আপনি মরিবি প্রাণে, আমাদের **মার্‌বি**,
'চাকরির' দফাটি কি একেবারে **সার্‌বি**?
কাঁচা-খেকো বোঁচা সেটা, কাছে যেতে **নার্‌বি**,
'হারবি'রে, 'হারবি'রে, 'হারবি'রে, **হার্‌বি**।।

—ছুটী

৫। বাপমার আশীর্বাদে আমি কি রে **হার্‌ব**?
স্বর্গমর্ত্য নখে তুলে, ফেলে দিতে **পার্‌ব**।
কার হেন সাধ্য আছে, আমার কি **কর্‌বে**?
মাথার উপরে কেটা দুটো মাথা **ধর্‌বে**?

—বোধেন্দু-বিকাস, দ্বিতীয় অঙ্ক, দম্ভের উক্তি

এ প্রসঙ্গে অধিকতর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হস্‌মধ্য ক্রিয়াপদ বল্‌তে, কোর্‌তে, পারবি প্রভৃতি হস্‌মধ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহারে ঈশ্বর গুপ্তের সাহসিকতাপূর্ণ কৃতিত্বটুকু। তাছাড়া, সংকুচিত রুদ্ধদলের অন্তে তিনি হস্‌চিহ্ন দিতেন আর প্রসারিত রুদ্ধদলে সে চিহ্ন বর্জন করতেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রথানিরপেক্ষ প্রখর ছন্দশ্রুতি ও ছন্দসচেতনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় চতুর্থ দৃষ্টান্তের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে। তাতে দেখা যায় পঙ্‌ক্তিশেষের সবগুলি ক্রিয়াপদের প্রথম রুদ্ধদলটি হয়েছে একমাত্রক। কিন্তু শেষ পঙ্‌ক্তির প্রথম তিনটি 'হারবি' শব্দের রুদ্ধদল হয়েছে দ্বিমাত্রক। পঙ্‌ক্তির মধ্যস্থিত এ-রকম রুদ্ধদলের একমাত্র প্রয়োগের নিদর্শন পাওয়া যায় তৃতীয় দৃষ্টান্তের 'বলতে-কোরতে' শব্দ-দুটিতে। অর্থাৎ, পঙ্‌ক্তির আদি, মধ্য ও অন্ত যেখানেই থাকুক এ-রকম রুদ্ধদল বিকল্পে একমাত্রক বা দ্বিমাত্রক দুই-ই হতে পারে। তার আর-এক প্রমাণ পাওয়া যায় 'চাকরীর দফাটি কি একেবারে সারবি' পঙ্‌ক্তিতে। এই পঙ্‌ক্তির আদিতে 'চাক্' হয়েছে দ্বিমাত্রক, অন্তে 'সার্' হয়েছে একমাত্রক। এর আগের পঙ্‌ক্তিতে 'মরিবি' না লিখে 'মর্‌বি' লিখলেও ছন্দ ঠিক থাকত। আবৃত্তিকালে 'মর্' স্বতঃই দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারিত হত।

বর্তমান কালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের রচনায় মিশ্রবৃত্ত রীতির এই তৃতীয় নিয়মটির অতি সুনিপুণ প্রয়োগের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

চার। সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের সন্ধিস্থলবর্তী (অর্থাৎ সমাসবদ্ধ শব্দের প্রথমাংশের শেষ) রুদ্ধদলের সংকোচন-প্রসারণ, মানে একমাত্রক বা দ্বিমাত্রক প্রয়োগও হয় বিকল্পে। তাছাড়া, প্রত্যক্ষতঃ অর্থাৎ ব্যাকরণের বিচারে সমাসবদ্ধ বলে স্বীকৃত নয় এমন দুই ভাবগত তথা উচ্চারণগত সান্নিধ্যের ফলে ছন্দপ্রয়োগে সমাসবদ্ধ শব্দের মর্যাদা পেতে পারে। অর্থাৎ পরস্পর সন্নিহিত এমন দুই শব্দের মধ্যস্থিত, আসলে প্রথম শব্দের অন্তস্থিত রুদ্ধদল বিকল্পে একমাত্রক বলে গণ্য হয়ে থাকে। প্রথমে তৎসম শব্দের বিষয়টাই ধরা যাক।[১]

১। সেই নির্ঝরিণী ধারা রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা

দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে আনন্দের গীতা।

—**ছন্দ** (১৯৭৬), ছন্দের হসন্ত-হলন্ত (দ্বিতীয়), পৃ ১০৮

কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে ‘দিক্‌দিগন্তর’

করি অন্তরাল...

—কল্পনা, বর্ষশেষ

২। উদয় **দিক্‌প্রান্ত**-তলে নেমে এসে...

—পূরবী, পঁচিশে বৈশাখ

চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার

‘দিক্‌প্রান্তে’ নামে অন্ধকার।

—মহুয়া, নববধূ

৩। জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে

মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।

—বলাকা-৭, ‘এ কথা জানিতে তুমি’

৪। আশঙ্কার পরশনে

হরিণের থরথর **হৃৎপিণ্ড** যেমন[২]

—পূরবী, পদধ্বনি

৫। আনন্দের হৃৎস্পন্দনে

আন্দোলিছে ‘ক্ষণে ক্ষণে’

বেদনার রুদ্রদেবতা যে।

—পূরবী, উৎসবের দিন

বলা বাহুল্য, হৃৎপাত্র, হৃৎপিণ্ড, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি শব্দের ‘হৃৎ’ দলটিকে অনায়াসেই দ্বিমাত্রক রূপেও প্রয়োগ করা যায়। বাংলা সাহিত্যে তার নিদর্শন আছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা উচিত যে, পঞ্চম দৃষ্টান্তের ‘ক্ষণে ক্ষণে’ আমাদের মুখে স্বতঃই সমাসবদ্ধ রূপ ধারণ করে এবং উচ্চারিত হয় ‘ক্ষণেক্‌ক্ষণে’ রূপে। আর, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে এই ‘ণেক্‌’ দলটি একমাত্রক বলেই গণ্য হয়। কিন্তু কলাবৃত্ত রীতিতে ‘ণেক্‌’ স্বভাবতঃই হয় দ্বিমাত্রক। যেমন—

ওগো সন্ন্যাসী,। কি গান ঘনাল। মনে

গুরু গুরু গুরু। নাচের ডমরু। বাজিল ‘ক্ষণে। ক্ষণে’।

—নটরাজ, বর্ষামঙ্গল

বলা বাহুল্য, এখানেও ‘ক্ষণে ক্ষণে’ শব্দ-দুটির উচ্চারণরূপ ‘ক্ষণেক্‌ ক্ষণে’, কিন্তু ‘ণেক’ দলটি উচ্চারিত হয় দ্বিমাত্রক রূপে।

৬। তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা **তড়িৎপ্রভাবৎ**

এসেছিল নামি...

—পূরবী (সংযোজন), শিবাজি-উৎসব

এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
'তড়িৎ-চকিত' দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।

—মানসী/একাল ও সেকাল

এবার দুটি অ-তৎসম বাংলা শব্দের সমাসবদ্ধ অথবা দুটি সন্নিহিত স্বতন্ত্র শব্দের মধ্যে প্রথম শব্দের অন্তস্থিত রুদ্ধদলের একমাত্রক রূপে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কবি মদনমোহনের 'বাসবদত্তা' কাব্যের দুটি অংশ এই—

১। **মুখপোড়া** বানর সম অতি মনোলোভা,
উল্লুক লুকায় লাজে দেখে তার শোভা।

—স্বয়ংবরায়োজন...

২। আর রামা বলে ব্যাধি বটে আমি জানি,
'সাপের হাই বেদে চিনে', শুনেছ ত বাণী।

—কামিনীর বিরহ লক্ষণ দৃষ্টে...

'মুখপোড়া' শব্দের 'মুখ' দল এবং 'সাপের হাই' অংশের 'পের' দল উচ্চারিত হয় একমাত্রক রূপে। কবি **ঈশ্বর** গুপ্তের রচনায় আছে—

ঠাকুরঝি-র **ছেলেগুলো** খায় ঠেসে ঠেসে,
আমার গোপাল যেন আসিয়াছে ভেসে।

—পৌষপার্বণ

লক্ষণীয় 'ঠাকুরঝি' শব্দে 'কুর্' দলটির একমাত্রক উচ্চারণ ও প্রয়োগ। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ২১-সংখ্যক গ্রন্থে সংকলিত কবি দীনবন্ধু মিত্রের একটি রচনাতেও (পৃ ২৬-৩৫) এরূপ প্রয়োগের নিদর্শন পাওয়া যায়।—

কাল্‌নাগিনী-পেড়ে ধুতি, পরে সমাদরে।
কোঁচার শেষের ফুল, ভাল শোভা করে।।...
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুজ্‌ঝি-র ঠাঁই।
তুমি প্রাণ, হও মোর ঠাকুর-জামাই।।

—জামাই-ষষ্ঠী। (সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫২ মে ২৫)

এখানে 'কাল্‌নাগিনী' শব্দে 'কাল্' দলের সংকোচন ও একমাত্রকতা সুস্পষ্ট। তাছাড়া, ঈশ্বর গুপ্তের 'ঠাকুরঝি' আর দীনবন্ধুর 'ঠাকুজ্‌ঝি' উচ্চারণে পৃথক্ হলেও ছন্দব্যবহারে অভিন্ন। কুজ্ ও কুর্, এই দুটি দলই একমাত্রক রূপে উচ্চার্য। পক্ষান্তরে 'ঠাকুর-জামাই' শব্দের 'কুর্' দ্বিমাত্রক।

একথা বলা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথের 'এক্‌টি কথা শুনিবারে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তে 'দাঁত কপাটি' শব্দের 'দাঁত' এবং 'আনন্দের হৃৎস্পন্দনে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তে 'ক্ষণে ক্ষণে', উচ্চারণরূপে 'ক্ষণেক্ ক্ষণে' শব্দদ্বয়ের 'ণেক্', এই দুটি দলের সংকোচন এবং একমাত্রকতাও এই চতুর্থ নীতি অনুসারেই সিদ্ধ।

অনুষঙ্গ

বাংলা ছন্দে অন্তঃস্থ য় ও অন্তস্থ ব-এর প্রচ্ছন্ন রূপ

১। অন্তঃস্থ য়

অন্ধকারে। 'লুকিয়ে' **আপন**। মনে
কাহারে তুই। পূজিস সংগো।-পনে

—গীতাঞ্জলি-১১৯, 'ভজন পূজন'

এই অংশের 'লুকিয়ে আপন' পর্বটিতে পাঁচ দল গণনা না করে চার দলই গণনা করতে হবে। কারণ 'লুকিয়ে' শব্দের লিখিত ও দৃষ্ট-রূপে তিন দল আছে বটে, কিন্তু এটির উচ্চারিত ও শ্রুত-রূপে দুই দলের বেশি নেই। এই অংশটির আবৃত্তির প্রতি একটু নিবিষ্টভাবে মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে যে, 'লুকিয়ে' শব্দটি একটু সংকুচিত হয়ে উচ্চারিত হয় 'লুক্‌য়ে' রূপে। এই শ্রুতরূপটিই গ্রাহ্য, দৃষ্টরূপটি নয়। ছন্দের আলোচনায় দৃষ্টি ও শ্রুতির বিরোধ ঘটলে শ্রুতিই মান্য, দৃষ্টি নয়। অর্থাৎ চক্ষুকর্ণের বিবাদে ছান্দসিকের রায় সর্বদাই যায় কর্ণের পক্ষে ও চক্ষুর বিপক্ষে।

এ প্রসঙ্গে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেননা, ওই 'লুকিয়ে' শব্দটার মধ্যেই ছন্দতত্ত্বের একটা বিশেষ রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। সে রহস্যটি এই। বাংলা বর্ণমালা থেকে যথার্থ অন্তঃস্থ য় (ya) লুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু বাংলা ভাষার উচ্চারিত ধ্বনিমালা থেকে হয়নি। তাই আমাদের উচ্চারণে যখনই যথার্থ অন্তঃস্থ য় ধ্বনির আবির্ভাব হয় তখনই তাকে লিখতে হয় 'ইয়' রূপে। এখানেও তাই হয়েছে। এখানে 'লুকিয়ে' শব্দটি আপন উচ্চারিত রূপ (তথা শ্রুতরূপ) হচ্ছে 'লুক্‌য়ে' (lukye)। এই রহস্যটুকু ধরতে পারলেই বোঝা যাবে এখানে 'লুকিয়ে' শব্দের শ্রুত দলসংখ্যা দুই, তিন নয়। তাহলে উদ্ধৃত পদ্যাংশের দ্বিতীয় পর্বে দলমাত্রার সংখ্যা হবে চার। পাঁচ নয়।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইয়ে-ভাগান্ত শব্দমাত্রেই যে এই নীতি প্রযোজ্য হবে তা নয়। যেখানে 'ইয়'র উচ্চারণ অন্তঃস্থ য় হবে, কেবল সেখানেই ইয়-কে একদল বলে গণ্য করতে হবে, অন্যত্র নয়। যেমন —

প্রিয় নামটি। শিখিয়ে দিত ॥ সাধের সারি। -কারে,
নাচিয়ে দিত। ময়ূরটিরে ॥ কঙ্কণ ঝং। -কারে।...
প্রিয়ে তোমার। তরুণ আঁখির ॥ প্রসাদ যেচে। যেচে
কালিদাসকে। হারিয়ে দিয়ে ॥ গর্বে বেড়াই। নেচে।

—ক্ষণিকা, সেকাল

এখানে শিখিয়ে, নাচিয়ে, হারিয়ে এই তিন শব্দের ইয়ে ভাগের উচ্চারণরূপ 'য়ে'। কিন্তু 'প্রিয়ে' ও 'দিয়ে' উচ্চারণে তা হয় না। 'প্রিয়ে' শব্দের ইয়ে শব্দেরই অঙ্গ, অন্যরকম উচ্চারণ করে শব্দবিকৃতি ঘটানো চলে না। দিয়ে, নিয়ে, গিয়ে প্রভৃতি দ্বিদল ক্রিয়াপদের আদিস্থিত ইয়ে-র উচ্চারণও সাধারণতঃ সংকুচিত হয় না। অর্থাৎ দিয়ে, নিয়ে লিখে এসব শব্দের নে, দে উচ্চারণ চালানো যায় না। তবে অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে তাও চলে। যেমন, একটি ছড়ায় আছে—

ছিপ নিয়ে গেল। কোলা ব্যাঙে ॥ মাছ নিয়ে গেল। চিলে।

এখানে নিয়ে-র উচ্চারণ ন্যে (=ন্য়ে) বা নে। কিন্তু সাহিত্যে এ-রকম প্রয়োগ চলে না। দিয়ে, নিয়ে প্রভৃতি শব্দের ন্যায় দিয়েছি প্রভৃতি শব্দের আদিস্থিত 'ইয়ে' অংশেরও সংকোচন ঘটে না।

লুকিয়ে, শিখিয়ে প্রভৃতি ত্রিদল ক্রিয়াপদের অন্তস্থিত ইয়ে-র উচ্চারণ সংকোচও সার্বত্রিক নয়, অর্থাৎ ছন্দের প্রয়োজনে ইয়ে-র অসংকুচিত রূপও স্বীকৃত হয়। যেমন,

আমাকে মা,। যখন তুমি ॥ ঘুম 'পাড়িয়ে'। রাখ,
তখন তুমি। 'হারিয়ে' গিয়ে ॥ তবু হারাও। নাক।

—শিশু ভোলানাথ, ঘুমের তত্ত্ব

এখানে 'পাড়িয়ে' শব্দের ইয়ে-অংশটুকুর অসংকুচিত প্রয়োগ লক্ষণীয়। অথচ 'হারিয়ে' শব্দের 'ইয়ে' সংকুচিত হয়েছে। এ-রকম সংকোচন সাধারণতঃ দেখা যায় পর্বের প্রথমাংশে স্থিত শব্দে, শেষাংশে স্থিত শব্দে নয়। পর্বের প্রথম দলের উপরে যে প্রস্বর বা ঝোঁক পড়ে তার প্রভাবে দ্বিতীয় দলের উচ্চারণ দুর্বল হয়। সেজন্যই পর্বের আদিস্থিত শিখিয়ে, নাচিয়ে, হারিয়ে প্রভৃতি শব্দের 'ইয়ে' আমাদের উচ্চারণে সংকুচিত হয়ে 'য়ে' রূপধারণ করে। পর্বের শেষাংশে প্রস্বরের প্রভাব থাকে না, তাই ক্রিয়াপদের শেষাংশে ইয়ে-র সংকোচন ঘটে না। এজন্যেই এখানে 'ঘুম পাড়িয়ে' পর্বে ইয়ে-র সংকোচন ঘটে না।

কিন্তু যে সব ইয়ে-ভাগান্ত ক্রিয়াপদের চলতি উচ্চারণে 'ইয়ে' স্বতঃই সংকুচিত হয়ে থাকে, ছন্দ-প্রয়োগে পর্বের অন্তে থাকলেও এই স্বতঃসংকুচিত রূপটাকেই মেনে নেওয়া হয়। এইজন্যই চলতি উচ্চারণে লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখিয়ে-দেখিয়ে, শুনিয়ে-শুনিয়ে প্রভৃতি জোড়াশব্দের দুটো 'ইয়ে'ই সংকুচিত হয়। যেমন—

'লুকিয়ে লুকিয়ে'। আমি
মেয়ের মায়ের। স্বামী,
'লুকিয়ে আমি'। কবি
তুলে নিলাম। ছবি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, নূতন মাতা

এখানেও প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম পর্বের উচ্চারিত দলমাত্রার সংখ্যা চার, ছয় বা পাঁচ নয়।

আরও অভ্যাস। দুবেলা
'বাজিয়ে বাজিয়ে'। তবলা,
সকল সময়। জ্ঞান থাকে না ॥ তবলা কি অবলা।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আষাঢ়ে, কেরানী

এখানেও 'বাজিয়ে বাজিয়ে' পর্বে চার দলমাত্রাই গণনীয়, ছয় মাত্রা নয়।

মায়া কাটিয়ে, কলা দেখিয়ে, কথা শুনিয়ে, দেব গুঁড়িয়ে (মাথা), দেব শুনিয়ে (দু-কথা) প্রভৃতি জোড়া-কথার শেষের ইয়ে-টাও সংকুচিত হয় চলতি উচ্চারণে। চলতি ভাষার ছন্দে (অর্থাৎ দলবৃত্ত রীতির ছন্দে) স্বভাবতঃই এই চলতি উচ্চারণটাকে মেনে নেওয়া হয়। যেমন—

এমন সময়। এসে কে গো ॥ আমার কুঁড়ে ঘরে
'আগুন ধরিয়ে'। দিল।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, বিপত্নীক (৫ম চিত্র)

'মায়া কাটিয়ে'। চলে সে ত ॥ গেছে এখান। থেকে
তোকে যাদু। আমার কাছে। রেখে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, মাতৃহারা (৬ষ্ট চিত্র)

তখন তুমি। ঘুমিয়ে পোড়ো, ॥ আমি জেগে। থেকে
নানা রকম। খেলায় তাদের ॥ 'দেব ভুলিয়ে'। রেখে।

—শিশু ভোলানাথ, ঘুমের তত্ত্ব

এ-রকম পর্বান্তে 'ইয়ে'-ভাগান্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ খুব কমই দেখা যায়। বিশেষ লক্ষণীয়, 'আগুন ধরিয়ে', 'মায়া কাটিয়ে' ও 'দেব ভুলিয়ে' এই তিন পর্বের ইয়ে-ভাগান্ত শব্দগুলি স্বতঃই অপেক্ষাকৃত দ্রুত উচ্চারিত হয়। তার ফলে এসব স্থলেও 'ইয়ে' সংকুচিত হয়ে 'য়ে' রূপে পরিণত হয়। আর সেজন্যেই অন্যান্য পর্বের সঙ্গে এই তিন পর্বের ধ্বনিসাম্য রক্ষিত হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, শব্দান্তস্থিত ইয়ে-র এ-রকম সংকুচিত প্রয়োগ শুধু দলবৃত্ত রীতির ছন্দেই চলে, অমিশ্র বা মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে চলে না।

২। অন্তঃস্থ ব

অন্তঃস্থ য়-এর ন্যায় অন্তঃস্থ ব(=wa)-ও বাংলা বর্ণমালা (তথা লিপিমালা) থেকে নির্বাসিত হয়েছে, কিন্তু উচ্চারিত 'ধ্বনিমালা'য় তার আসন অব্যাহত রয়েছে। বাংলা লিপিতেও সে তার কাজ করে চলেছে, কিন্তু ছদ্মবেশে। তাই তাকে সহজে চেনা যায় না। সে ছদ্মরূপটি হচ্ছে 'ওয়্'। যেমন—'হাওয়া' শব্দটির আসল উচ্চারণরূপ হাও্-য়া নয়, আসল রূপ হচ্ছে হা-ওয়া (ha-wa)। অর্থাৎ 'ওয়া' ধ্বনির মধ্যে অন্তঃস্থ ব লুকিয়ে রয়েছে। তেমনি ওয়ালা (wa-la) কথার 'ওয়া'র মধ্যেই গুপ্ত রয়েছে বাংলা অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি। অর্থাৎ 'ওয়া' শব্দাংশে দুটি মুক্তদল নেই, আছে একটি মুক্তদল। তেমনি ওয়ালা-তে মুক্তদলের সংখ্যা তিন নয়, দুই। ছন্দপ্রয়োগেও উচ্চারিত দলসংখ্যা অনুসারেই মাত্রাসংখ্যা গণনা করা হয়।

বাংলা ছন্দে অন্তঃস্থ য় ও আন্তঃস্থ ব-এর প্রয়োগে একটু পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য এই যে, অন্তঃস্থ য়-ধ্বনি প্রচ্ছন্নরূপে (অথং ইয়া-রূপে) দেখা দেয় শুধু দলবৃত্ত রীতির ছন্দে এবং তাও সব সময় বা সর্বত্র নয়। কিন্তু অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি সব রীতির ছন্দেই এবং সর্বদাই 'কাজ করে যায় গোপনে গোপনে'। যেমন—

১। দলবৃত্ত রীতির ছন্দে

শুনি নাই তে। মানুষের কি বাণী
মহাকালের। বীণায় বাজে, ॥ আমি কেবল। জানি
রাঁধার পরে। 'খাওয়া', আবার ॥ 'খাওয়ার' পরে। রাঁধা—
বাইশ বছর। এক চাকাতেই। বাঁধা।

—পলাতকা, মুক্তি

'ফেরিওয়ালার'। ডাক শোনা যায় ॥ গলির ওপার। থেকে,
দূরের ছাদে। ঘুড়ি ওড়ায়। সে কে।
'ঘড়িওয়ালা'। কোনবাড়িতে ॥ ঘণ্টাধ্বনি। বাজে।
সামনে বিরাট। অজানিত, ॥ সামনে দৃষ্টি। 'পেরিয়ে-যাওয়া'। দূর
বাজাত কোন। ঘর-ভোলানো। সুর।

—পরিশেষ, বালক

২। কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে

না জানিল তারা। সাহিত্যরস,
ইতিহাস নাহি। করিল পরশ,
'ওয়াশিংটনের'। জন্মবরষ
মুখস্থ হল। নাকো।

—মানসী, বঙ্গবীর

কোন সাগরের। পার হতে আনে ॥ কোন্ সুদূরের। ধন।
ভেসে যেতে চায়। মন,
ফেলে যেতে তায়। এই কিনারায় ॥ সব 'চাওয়া' সব। 'পাওয়া'।

—গীতাঞ্জলি-১২, 'অমল ধবল'

চিরদিবসের। 'ভুলে-যাওয়া' বাণী ॥ কোন্ কথা মনে। আনে সে,
অনাদি-উষার। বন্ধু আমার ॥ তাকায় আমার। পানে সে

—উৎসর্গ-১৪. 'সব ঠাঁই মোর'

৩। মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে

বারে বারে। 'ফিরে-যাওয়া' ॥ অন্ধকারে। বাজিবে হৃদয়ে
বারে বারে। ফিরে-আসা হয়ে।

—বলাকা-৪২, 'তোমারে কি বারবার'

বাজা তোরা। বাজা বাঁশি, ॥ মৃদঙ্গ উঠুক: তালে। মেতে
দুরন্ত: তালের: নেশা। 'পাওয়া'।
নদীপ্রান্তে। তরুরাশি ॥ ঐ দেখ্। আছে কান। পেতে,
ঐ সূর্য। চাহে শেষ। 'চাওয়া'।

—মহুয়া, মিলন

দু-এক স্থানে 'ওয়ালা' কথাটার ত্রিমাত্রক প্রয়োগও দেখা যায়। এগুলিকে আদর্শ বা শিষ্ট প্রয়োগ বলে স্বীকার করা যায় না। কোথাও-কোথাও 'ওয়ালা'-র 'ওলা' রূপও দেখা যায়। তাতে আপত্তির কারণ নেই।

---

১. দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের (১৯৩২) ভূমিকা অথবা 'ছন্দ' গ্রন্থ (তৃতীয় সং, ১৯৭৬), পৃ: ২০২।

১। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থ (তৃতীয় সং ১৯৭৬), দিলীপকুমার রায়-কে লেখা চিঠি, পৃ ৮০

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার), ১৯৮০ সংস্করণ।

১. খ্যাতি ও খেলনার মুক্তি, এ কবিতা দুটি পরে 'পুনশ্চ' কাব্যে স্থানান্তরিত হয়। এই কবিতা-দুটিই পরিমিত মাত্রার মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত, গদ্য রীতিতে নয়। তবে এ-দুটিতে কোনো নির্দিষ্ট ছন্দোবন্ধ নেই, মিলও নেই।

১। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থ (তৃতীয় সং ১৯৭৬), ছন্দের হসন্ত-হলন্ত (তৃতীয় পর্যায়), পৃ ১১৮-২০ এবং বর্তমান লেখকের 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ (১৯৭৪), 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ (তৃতীয় পর্যায়), পৃ ২৫০-৫৩।

২। দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রবন্ধ (তৃতীয় পর্যায়), পৃ ১২০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যমক ও উপযমক

দুটি স্বতন্ত্র দল বা দলগুচ্ছের সব স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির যথানুক্রমিক শ্রুতিসাম্যের পারিভাষিক নাম **যমক**। তাই যমকের প্রথম ব্যঞ্জন বাদে বাকি সব ধ্বনির অনুরূপ শ্রুতিসাম্যের পারিভাষিক নাম হতে পারে **উপযমক**। এই উপযমকেরই প্রচলিত নাম **মিল** (rime)। বাংলা ছন্দশাস্ত্রে যমক ও উপযমকের আলোচনা অপরিহার্য। কেননা, এ-দুটি বাংলা ছন্দের শ্রুতরূপের একটি প্রধান অঙ্গ। তবে যমকের চেয়ে উপযমকের গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই উপযমক বা মিলের কথাই আগে বলা যাচ্ছে।

উপযমক বা মিলের রূপভেদ

যে দুই শব্দ বা শব্দাংশের মধ্যে মিল ঘটানো হয়, সেসব শব্দ বা শব্দাংশের দলসংখ্যাভেদে মিলের অনেক রূপ দেখা যায়। আবার মিলিত শব্দ বা শব্দাংশে মুক্ত ও রুদ্ধ দলের অবস্থানভেদেও মিলের রূপভেদ ঘটে। এস্থলে এসব রুপভেদের কিছু পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন।

একদল মিলের রূপভেদ

একদল মিলের দুই রূপ—একক মুক্তদলের মিল ও একক রুদ্ধদলের মিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দুটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। উপযমক বা মিলের সংজ্ঞাসূত্র থেকেই বোঝা যায়—দুটি স্বতন্ত্র (বা বিচ্ছিন্ন) মুক্তদলের মিল মানে আসলে দুটি মুক্তস্বরের শ্রুতিসাম্য (যেমন পা-না), আর দুটি স্বরান্ত রুদ্ধদলের মিল মানে দুটি রুদ্ধস্বরের শ্রুতিসাম্য (যেমন পাই-নাই)। কিন্তু দুটি হসন্ত রুদ্ধদলের মিল মানে দুটি মুক্তস্বর ও দুটি হসবর্ণের শ্রুতিসাম্য (যেমন দান-গান)। এবার যথাক্রমে একদল মিলের উক্ত দুই রূপের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। একক মুক্তদলের মিল

ধুলার মাঝে। না যদি দেন। পা,
তা হলে পায়ে। ধুলা তো লাগে। না।

—কল্পনা, জুতা-আবিষ্কার

সেদিন বরষা। ঝরঝর ঝরে, ॥ কহিল কবির। স্ত্রী,...
মাথার উপরে। বাড়ি পড়ো-পড়ো ॥ তার খোঁজ রাখ। কি?

—সোনার তরী, পুরস্কার

সখী, প্রতিদিন হায়। এসে ফিরে যায়। কে।
তারে আমার মাথার। একটি কুসুম। দে।...
সে যে করুণা জাগায়। সকরুণ নয়। -নে

কেন   কী বলিতে চায়। না বলিয়া যায়। সে।

—কল্পনা, সকরুণা

নন্দ বলিল, “ভায়ের জন্য ॥ জীবনটা যদি। দিই,
না-হয় দিলাম,। কিন্তু অভাগা ॥ দেশের হইবে। কি?”

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান, নন্দলাল

লক্ষণীয় পা-না প্রভৃতি দুই মিলিত শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন-দুটি (প্‌ ন্‌) ভিন্ন, কিন্তু শেষে স্বর-দুটি (আ-আ) অভিন্ন। অর্থাৎ মিল শুধু স্বরবর্ণের ব্যঞ্জনবর্ণের নয়। এ-রকম ব্যঞ্জননিরপেক্ষ মিলকে, অর্থাৎ শুধু স্বরধ্বনির শ্রুতিসাম্যকে বলি **স্বরানুপ্রাস** (assonance)। বস্তুতঃ সব-রকম মিলেরই আদিতে থাকে এই স্বরানুপ্রাস। কোনো দুই শব্দের (বা শব্দাংশের) আদিতে এই স্বরানুপ্রাস না থাকলে বাকি অংশের মিলকে যথার্থ মিল বলা যাবে না। (যেমন—আকাশে-বিকাশে, গুঞ্জিত-রঞ্জিত যথার্থ মিল নয়। এই দুই জোড়া শব্দের শেষাংশে আছে যমক। মিলের বদলে অনেক সময় যমক দিয়েও শ্রুতিসাম্য রক্ষার কাজ চালানো যায়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে পঙ্‌ক্তিশেষের সব স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন মুক্তদল স্বতঃই দ্বিমাত্রক (দুই কলামাত্রা) রূপে উচ্চারিত হয় এবং ছন্দের বিচারেও এগুলি দ্বিমাত্রক বলেই স্বীকার্য। এই জন্যেই শেষ দৃষ্টান্তে মুক্তদল ‘কি’ রুদ্ধদল ‘দিই’-এর সঙ্গে ধ্বনিগত সমতা রক্ষা করতে পেরেছে। পা, না প্রভৃতি আটটি ‘স্বতন্ত্র’ মুক্তদল, আর (নয়)-নে, এই একটি ‘বিচ্ছিন্ন’ মুক্তদল।

দুই শব্দের প্রথমে স্বরানুপ্রাস না থাকলে যেমন যথার্থ মিল হয় না, তেমনি প্রাথমিক স্বরানুপ্রাসের পরবর্তী সমস্ত ব্যঞ্জন ও স্বর-ধ্বনির যথানুক্রমিক শ্রুতিসাম্য না থাকলেও যথার্থ মিল হয় না। পরে যথাস্থানে এ-রকম অপূর্ণ মিলের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে।

২। একক রুদ্ধদলের মিল

যাবার দিনে। এই কথাটি ।। বলে যেন। যাই—
যা দেখেছি,। যা পেয়েছি, ॥ তুলনা তার। নাই।

—গীতাঞ্জলি-১৪২, ‘যাবার দিনে এই কথাটি’

অরূপ তোমার। রূপের লীলায় ।। জাগে হৃদয়।-পুর,
আমার মধ্যে। তোমার শোভা ॥ এমন সুম।-ধুর।

—গীতাঞ্জলি-১২০, ‘সীমার মধ্যে অসীম তুমি’

এই দুটিই (যাই-নাই, পুর-ধুর) রুদ্ধদলের মিল। প্রথম ব্যঞ্জন বাদে বাকি অংশ (আই-আই, উর-উর) যথানুক্রমিকভাবে অবিকল এক।

দ্বিদল মিলের রূপভেদ

দ্বিদল মিলের চার রূপ। একে-একে এই চার রূপের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

১। দুই মুক্তদলের মিল বা দ্বিলঘু মিল।

সুন্দর, তুমি। এসেছিলে আজ। প্রাতে
অরুণ-বরন। পারিজাত লয়ে। হাতে।

—গীতাঞ্জলি-৬৭, 'সুন্দর, তুমি'

একক মুক্তদলের মিল (পা-না, স্ত্রী-কি, দে-কে) বেশি দেখা যায় না। একক রুদ্ধদলের মিল (যাই-নাই, পুর-ধুর) এবং দুই মুক্তদলের মিল (প্রাতে-হাতে), এই দু-রকম মিলই দেখা যায় সবচেয়ে বেশি।

২-৩। আদিগুরু ও অন্ত্যগুরু দ্বিদল মিল

কোথা গেল সেই। মহান্ শান্ত
নব নির্মল। শ্যামল কান্ত
উজ্জ্বলনীল। বসন-প্রান্ত
    সুন্দর শুভ। ধরণী।
আকাশ আলোক পুলক-পুঞ্জ,
ছায়া-সুশীতল নিভৃত কুঞ্জ,
কোথা সে গভীর ভ্রমর-গুঞ্জ,
    কোথা নিয়ে এল তরণী।

—চিত্রা, নগর-সংগীত

আমি নাব্ব। মহাকাব্য। -সংরচনে
    ছিল মনে,
ঠেকল কখন। তোমার কাঁকন। -কিংকিণীতে,
কল্পনাটি। গেল ফাটি। হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।...
রইল মাত্র দিবারাত্র প্রেমের প্রলাপ,
দিলাম ফেলে ভাবীকেলে কীর্তি-কলাপ।

—ক্ষণিকা, ক্ষতিপূরণ

একটি রুদ্ধদল ও এক মুক্তদল নিয়ে গঠিত মিল, সংক্ষেপে **আদিগুরু দ্বিদল** মিলও (শান্ত-কান্ত, পুঞ্জ-কুঞ্জ, নাব্ব-কাব্য, মাত্র-রাত্র) ছন্দোবিলাসী কবিদের খুব প্রিয়। **অন্ত্যগুরু দ্বিদল মিল** (টনায়-কণায়, প্রলাপ-কলাপ) তার তুলনায় বিরল। —বলা বাহুল্য, আদিগুরু ও অন্ত্যগুরু এই উভয়বিধ দ্বিদল মিলই কলামাত্রার হিসাবে ত্রিমাত্রক, আর দলমাত্রার হিসাবে দ্বিমাত্রক।

৪। দ্বিগুরু মিল

'পাক-প্রণালী'র মতে করো তুমি রন্ধন,

জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।
    চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
    স্বরচিত বলে দাবি নাহি করে মুচিটা,
পাতে বসি পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন।

—প্রহাসিনী, পরিণয়মঙ্গল

এই দৃষ্টান্তে আছে দু-রকম মিল—**দ্বিগুরু মিল** (রন্ধন-বন্ধন-ক্রন্দন) এবং **ত্রিলঘু মিল** (লুচিটা-মুচিটা)। পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তের 'ধরণী-তরণী' মিলটাও ত্রিলঘু। বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত দু-রকম মিলের দলসংখ্যাও যথাক্রমে দুই এবং তিন। এ-রকম দ্বিগুরু ও ত্রিলঘু মিলের প্রয়োগও যথেষ্ট দেখা যায়। কলামাত্রার হিসাবে দ্বিগুরু মিল চতুর্মাত্রক, আর দলমাত্রার হিসাবে দ্বিমাত্রক।

মোট কথা। একদল মিল হতে পারে দু-রকম—মুক্তদলের লঘু মিল (কে-সে) ও রুদ্ধদলের গুরুমিল (সুখ-দুখ)। দ্বিদল মিল চার রকম—আদিগুরু বা অন্ত্যলঘু (সিক্ত-রিক্ত), অন্ত্যগুরু বা আদিলঘু (করুণ-তরুণ), দ্বিলঘু (লীনা-বীণা) এবং দ্বিগুরু (অঞ্চল-চঞ্চল)। এই চার রকম মিলের দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া গেল।

ত্রিদল মিলের রূপভেদ

গণিতের হিসাবে ত্রিদল মিল হতে পারে আট রকম। তার মধ্যে যে-কয় রকম মিলের প্রয়োগ সাধারণতঃ দেখা যায় তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

১। ত্রিলধু মিল

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে,
শশীতারাহীন অন্ধতামসী যামিনী;
    কোথা তোরা পুর-কামিনী।
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
    চমকে দীপ্ত দামিনী;
শূন্য শয়নে কোথা জাগে পুর-কামিনী।

—কল্পনা, বর্ষামঙ্গল

যামিনী-কামিনী-দামিনী এবং ভবনে-পবনে, এ-দুটি নিখুঁত ত্রিলঘু মিল। দিবসে-আবেশে এই ত্রিদল মিলটা ত্রিলঘু বটে, কিন্তু ত্রুটিহীন নয়।
দিবসে-নিবসে, আবেশে-যাবে সে, নিখুঁত ত্রিলঘু মিল।

২। আদিগুরু ত্রিদল মিল

এত দিনে সেথা বনবনান্ত নন্দিয়া

নব বসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি।
তরুণ আশার সোনার প্রতিমা বন্দিয়া
নব আনন্দে ফিরিছে যুবক-যুবতী।
বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া
ডাকিছে সবারে আছে যারা দূর প্রবাসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি,
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

—কল্পনা, অসময়

নন্দিয়া-বন্দিয়া-ক্রন্দিয়া আদিগুরু ত্রিদল মিল। এই মিলও ছন্দোবিলাসী কবিদের বিশেষ প্রিয়। ভূপতি-যুবতী, এই ত্রিলঘু মিলটাতে একটু খুঁত আছে। প-ফ এবং ব-ভ, এর ধ্বনিগত পার্থক্য যত সহজে মেনে নেওয়া হয়, প-ব এর পার্থক্য তত সহজে মানা হয় না। প্রবাসে-আকাশে মিলটা ত্রিদল মিল বলে স্বীকার্য নয়। এখানে শুধু বাসে-কাশে এই দ্বিদলটুকুই গ্রাহ্য। তাও একেবারে নির্দোষ নয়। কেন নয়, সেকথা একটু পরেই বলা যাবে। আসল কথা এই যে, ত্রিদল প্রভৃতি দীর্ঘ মিলে নিখুঁত প্রয়োগ খুবই দুঃসাধ্য। তাই কবিরা কাব্যের ভাবসৌন্দর্য রক্ষার প্রয়োজনে মিলের শিল্পসৌন্দর্যের কিছু দোষও অগত্যা মেনে নেন।

৩। মধ্যগুরু ত্রিদল মিল

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা 'কে জানত'।
তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে
জীবন বহে যেত 'অশান্ত'।...
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত না বন-'বনান্ত'।

—গীতাঞ্জলি-৬৮, 'আমার খেলা যখন'

ত্রিদল মিল হিসাবে 'কে জানত-অশান্ত' মিলে একটু ত্রুটি (এ-ও স্বরের ভিন্নতা) আছে। তবে বাকি অংশের (জান্‌ত-শান্ত) মিলটুকু নির্দোষ। 'অশান্ত-বনান্ত' ত্রিদল মিল হিসাবে নিখুঁত নয়। এ-রকম মিল অপেক্ষাকৃত বিরল।

৪। অন্ত্যগুরু ত্রিদল মিল

পরিপূর্ণ বরষায় ॥ আছি তব ভরসায়
কাজকর্মে করো সায় ॥ এসো চট্ পট্।
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য ॥ তুমি করো ডেপুটিত্ব
একা পড়ে মোর চিত্ত ॥ করে ছট্ ফট্।

—মানসী, শ্রাবণের পত্র

বরষায়-ভরষায়-করো সায়, এই তিনটি অন্ত্যগুরু ত্রিদল মিল। কলামাত্রার হিসাবে চতুর্মাত্রক মিল। এ-রকম মিল খুব কমই দেখা যায়। নিত্য-টিত্ব-চিত্ত, এই তিনটি আদিগুরু দ্বিদল মিল। চট্পট্ এবং ছট্ফট্, এই দুটি আসলে দুটি করে একক গুরু মিলের সমবায় বলেই স্বীকার্য। বিশেষতঃ আবৃত্তিকালে এ-দুটির মধ্যে থাকে একটি করে লঘুযতি। অর্থাৎ, এখানে আছে চট্-ছট্ এবং পট্-ফট্ এই দুটি একক গুরুমিল। তাছাড়া, লঘুযতির প্রভাবে চ-ছ এবং প-ফ এর ধ্বনিগত পার্থক্যটুকুও সুস্পষ্টরূপে কানে ধরা পড়ে।

৫। আদিলঘু ত্রিদল মিল

তার পরে এল গণৎকার,
গণনায় রাজা চমৎকার,
টাকা ঝন্ঝন্ ঝনৎকার
　　বাজায়ে সে গেল চলি।

—সোনার তরী, পুরস্কার

'গণৎকার-ঝনৎকার' তিন দলের পূর্ণ মিল। 'চমৎকার'—এই মিলটা নিখুঁত নয়। খুঁত হয়েছে ন-এর স্থলে ম-স্থাপনে। এ-রকম মিলও তাতি দুর্লভ।

বলা বাহুল্য আদিগুরু, মধ্যগুরু ও অন্ত্যগুরু এই তিন রকম ত্রিদল মিলেই কলাবৃত্ত রীতির হিসাবে থাকে চার কলামাত্রা, আর আদিলঘু ত্রিদল মিলে থাকে পাঁচ কলামাত্রা।

মিলসমাবেশ

চার বা পাঁচ দলের মিল আরও দুর্লভ। অতি দীর্ঘ মিলে ধ্বনিসৌন্দর্যের হানি ঘটার আশঙ্কা থাকে। কবিরাও তাই দীর্ঘ মিলের বদলে একাধিক ছোট মিলের একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে থাকেন। এবার তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। —

নানা বেশভূষা হীরা-রূপা-সোনা
এনেছি পাড়ার করি উপাসনা,
সাজ করে লও পুরায়ে বাসনা,
　　　　রসনা ক্ষান্ত হোক।...
আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিমাখা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজস্তরণ
　　　　পবিত্র পদপঙ্কে।

—সোনার তরী, পুরস্কার

'রূপাসোনা-উপাসনা' পূর্ণ চতুর্দল বলেই স্বীকার্য। তার সঙ্গে 'বাসনা'র মিলটা সবাঙ্গীণ নয়। আবার 'বাসনা-রসনা' মিলটাও ত্রুটিহীন নয়। 'বৈয়াকরণ-লইয়া চরণ' চতুর্দল মিল বলে স্বীকার্য নয়। আসলে এখানে দুটি স্বতন্ত্র মিলের (বৈয়া-লইয়া, করণ-চরণ) সমাবেশ ঘটেছে। আর 'রাজাস্তরণ' শব্দের 'তরণ' মিলেছে 'চরণ' শব্দের সঙ্গে। 'চরণ-তরণ' সাধারণ অন্ত্যগুরু দ্বিদল মিল। আর,
'গুটি-দুটি সাধারণ দ্বিলঘু মিল।

রূপযৌবন উপঢৌকন
  দেবেন কন্যা তাহারে।
তাই পরেছেন চীনাংশুকের
  পট্টবসন বাহারে।

—ছন্দ (১৯৭৬), ছন্দের হসন্ত-হলন্ত-২, পৃ ১১৭

'রূপযৌবন-উপঢৌকন' মিলটাও চার দলের মিল নয় এটি আসলে একটি দ্বিদল ও দুটি একদল মিলের যথাক্রমে রূপ-যৌ-বন, উপ-ঢৌ-কন এই তিন মিলের সমাবেশ মাত্র। মাত্রার হিসাবে ছয় কলামাত্রার মিল। আর, 'তাহারে-বাহারে' সাধারণ ত্রিলঘু মিল। এ-রকম মিলসমাবেশের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

লোভ নাহি থেমে থাকে খাই তাই চোটে,
পিঠে পুলি পেটে যেন ছিটে-গুলী ফোটে।

—ঈশ্বর গুপ্ত, পৌষ পার্বন

ঐ শেফালিকা-তলে
  কে বালিকা চলে?

—নজরুল, অগ্নিবীণা, আগমনী

যাস্ কোথা সই একলা ও সই, অলস বৈশাখে?
জল নিতে যে যাবি ওলো, কলস কই কাঁখে?

—নজরুল, ছায়ানট, দুপুর-অভিসার

ছোট্ট লেবুর ফুলটি আমার, ছোট্ট লেবুর ফুল,
স্বর্ণ ঊষার কর্ণভূষার বর্ণ তুষার দুল।
  চন্দ্রধবল সরস কান্তি
  চন্দনজল পরশশান্তি,
মন্দমারুত বন্দনারত গন্ধ তব অতুল।

—যতীন্দ্রমোহন, নীহারিকা, লেবুফুল

রজনীগন্ধা বাস বিলালো,
সজনি, সন্ধ্যা, আসবি নালো?
বঁধুর চিত্তে দোলা রে ছন্দ,

মধুর নৃত্যে ভোলা রে বন্ধ।

—যতীন্দ্রমোহন, নীহারিকা, সন্ধ্যায়

মিলগুলি স্বতঃপ্রকাশ। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে 'মন্দমারুত-বন্দনারত' মিলটা নিখুঁত নয়। আর এ-কথা বলা অনাবশ্যক যে, অতিদীর্ঘ মিলের ন্যায় ছোট মিলের অতিবাহুল্যেও অনেক স্থলেই কাব্যমূল্যের হানি ঘটবার আশঙ্কা থাকে।

মিলের ত্রুটি বা অপূর্ণতা

একক রুদ্ধদলের কিংবা দুই মুক্তদলের মিল অপূর্ণ হলে (যেমন—মান-দিন, শেষ-বিষ, কানু-বেণু, পাখি-শিখী) তা অসহনীয় হয়। কিন্তু তিন ও তার চেয়ে বেশিসংখ্যক দলের মিল অনেক সময়ই অপূর্ণ থাকে। ভাবসংগতি বা ছন্দের ধ্বনিগত সংগতি রক্ষার প্রয়োজনে কবিরা মিলের এ-রকম অপূর্ণতাকেও স্বীকার করে নেন। রচনার অন্যবিধ গুণে মিলের এসব ত্রুটি পীড়াদায়ক হয় না। মিলের রূপভেদ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কোনো-কোনো রচনায় মিলগত ত্রুটির কথা বলা হয়েছে। এখানে মিলের ত্রুটি বা অপূর্ণতার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন।—

আর নাই রে বেলা, নামলো ছায়া ধরণীতে,
এখন চল্ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।

—গীতাঞ্জলি-২৬. 'আর নাই রে বেলা'

'ধরণীতে-ভরে নিতে' পূর্ণ মিল নয়। 'র-রে' অমিল। 'ধরণীতে-তরণীতে' পূর্ণ মিল।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
    তুমি বিচিত্র-রূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে-ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে
    তুমি চঞ্চল-গামিনী।

—চিত্রা, চিত্রা

রূপিণী-গামিনী, আলোকে-পুলকে, ঝলসিছ-উলসিছ-বিলসিছ, নীল-ফুল-চল, গগনে-কাননে-চরণে—এই সবগুলি মিলই অপূর্ণ। এগুলির মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ মিলই সবচেয়ে দোষাবহ। এই দুই স্থলে মিলের মূলগত আশ্রয় যে স্বরানুপ্রাস, তাতেই ত্রুটি ঘটেছে। অর্থাৎ ঝ-উ-বি এবং নী-ফু-চ, কোনোটিতেই স্বরানুপ্রাস নেই। প্রথম দৃষ্টান্তের পিণী-মিনী এবং পঞ্চম দৃষ্টান্তের গনে-ননে-রণে, দ্বিদল মিল হিসাবে গ্রহণীয়, ত্রিদল মিল হিসাবে নয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'লোকে-লকে' মিল নয়, কারণ আদি ব্যঞ্জনধ্বনির ভিন্নতা নেই। এটি যমক বলে গণ্য হতে পারে, কারণ ও-অ এই দুই স্বরধ্বনি প্রায় অভিন্ন রূপেই উচ্চারিত হয়। তাই 'পুলকে-দ্যুলোকে-ভূলোকে মিলটাকে বলা যায় পূর্ণ ত্রিদল মিল।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,

সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে
দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

—কল্পনা, দুঃসময়

'মন্থরে-মন্তরে' যথার্থ মিল নয়, তার কারণ আদি ব্যঞ্জনের অভিন্নতা। 'মন্থরে-অম্বরে' মিলও ত্রুটিহীন নয়, তার কারণ মধ্যব্যঞ্জনের ভিন্নতা। এসব ত্রুটির ক্ষতি কিছু-পরিমাণে পূরণ ওই তিন শব্দের স্বরানুপ্রাস অর্থাৎ অ-অ-এ এই তিন স্বরের যথানুক্রমিক বিন্যাস-জাত ধ্বনিসংগতি এবং রচনাটির স্পন্দসৌষম্যের দ্বারা। তাছাড়া 'থরে-বরে-তরে' এই নিখুঁত দ্বিদল মিলেও কান প্রসন্ন থাকে। এই দৃষ্টান্তের আর-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এটির উপান্ত্য পদের নিঃসঙ্গতা। অন্য কোনো পদের সঙ্গে এই পদের মিল নেই, অর্থাৎ এই পদের অন্তঃস্থিত 'মোর' শব্দের কোনো দোসর নেই। ছন্দরচনায় স্পন্দসৌষম্য এবং কোনো পদের এ-রকম নিঃসঙ্গতা অর্থাৎ মিলহীনতার গুরুত্ব কম নয়। তাই ছন্দশাস্ত্রে এই দুই বিষয়ের কিছু পরিচয় দেবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

স্পন্দানুপ্রাস ও স্পন্দসৌষম্য

উল্লিখিত দৃষ্টান্তের আবৃত্তিভঙ্গির প্রতি একটু মনোনিবেশ করলে বোঝা যাবে, বাংলা ছন্দের সাধারণ নিয়ম অনুসারেই প্রত্যেক পর্বের প্রথম দলের উপরে পড়ে একটা ঝোঁকের আঘাত—ছন্দপরিভাষায় **ঘাতপ্রস্বর** (stress accent), আর ওই আঘাতের বেগ শেষ হয়ে যায় পর্বের অন্তে। সেখানেই পড়ে পর্বযতি। তার পরে আবার আঘাতের বেগ ও তার বিরতি বা যতি। প্রত্যেক ঝোঁক বা প্রস্বরের আঘাতে ধ্বনিপ্রবাহ উত্তাল হয়ে ওঠে ও ক্রমে নেমে যায়। আবার উঠে ক্রমে নেমে যায়। ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ এভাবে ঢেউ খেলিয়ে চলে। ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির এই ঢেউ-খেলানো তালকে ছন্দপরিভাষায় বলা হয় **ছন্দস্পন্দ**, সংক্ষেপে শুধু স্পন্দ (rhythm)। ধ্বনির এই তরঙ্গলীলাই ছন্দের প্রাণ।

যদিও সঙ্গী। নাহি অনন্ত। অম্‌বরে,
যদিও ক্লান্তি। আসিছে অঙ্গে। নামিয়া।

প্রত্যেক পদে তিন তরঙ্গ বা পর্ব। দুই পদে এক পঙ্‌ক্তি। প্রথম পদে ঝোঁকের আঘাত অর্থাৎ প্রস্বর পড়েছে য, না, অম্‌ এই তিন দলের উপরে, আর দ্বিতীয় পদে পড়েছে য, আ, না এই তিন দলের উপরে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক পদের তিন প্রস্বর সমদূরত্বে অবস্থিত, আর প্রস্বরচালিত পর্বগুলিও তাই সমায়তন। কেবল প্রতি পদের শেষ পর্ব খণ্ডিত বা অপূর্ণ।—এই হল এ-রচনাটির সাধারণ ছন্দপরিচয়। এবার তার বিশেষ পরিচয়ের কথা বলি।

প্রথমে বলা উচিত যে, কোনো পদ্যরচনার পর্বপ্রস্বরজাত স্পন্দের সমদূরত্বে অবস্থানকে স্পন্দসৌষম্য বলে নির্দেশ করার কোনো বিশেষ সার্থকতা নেই। কেননা, পর্বস্পন্দের সমদূরত্ব তো বাংলা ছন্দের একটা সাধারণ লক্ষণমত্র। একটু নিবিষ্ট মনে শুনলে 'দুঃসময়' রচনাটির প্রথম পাঁচটি পদের প্রত্যেক পূর্ণপর্বে একটি করে **অনুস্পন্দ** কানে বাজে এবং এই অনুস্পন্দগুলি সমদূরত্বে অবস্থিত। এই অনুস্পন্দগুলি প্রস্বরজাত নয়, রুদ্ধদলজাত। একটু হিসাব করলেই দেখা যাবে, প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পদের প্রত্যেক পূর্ণপর্বে তিন মুক্তদলের পরেই আছে একটি করে রুদ্ধদল (**সন্, মন্** ইত্যাদি), কেবল দ্বিতীয় পদে রুদ্ধদল আছে দুই মুক্তদলের পরে—কিন্তু তাও সমদূরত্বে। এই রুদ্ধদলগুলিই আমাদের কানে অনুস্পন্দ-রূপে ঝংকৃত হয়। একাধিক অনুস্পন্দের কাছাকাছি অবস্থানকে বলা যায় **স্পন্দানুপ্রাস,** আর অনুস্পন্দের সমদূরত্বে (বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে) অবস্থিতিকে বলা হয়েছে **স্পন্দসৌষম্য**। আসলে স্পন্দসৌষম্য স্পন্দানুপ্রাসেরই প্রকারভেদ মাত্র।

এখানে বলে রাখা উচিত যে, রুদ্ধদল শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত হলেই অনুস্পন্দ অনুভূত হয়, শব্দের অন্তে থাকলে হয় না। যেমন—কণ্ঠ, হস্ত বন্দনা, তরঙ্গ প্রভৃতি শব্দে অনুস্পন্দ আছে; কিন্তু চাঁদ, কিরণ প্রভৃতি শব্দে নেই। 'ঝংকার' শব্দে ঝংকার (অনুস্পন্দ) আছে তার আদিতেই, অন্তে নয়। শব্দের অন্তিম রুদ্ধদল পর্বের আদ্যে বা মধ্যে স্থিত হলেও তাতে অনুস্পন্দ-সঞ্চার হয় না। এই নীতি সাধারণতঃ খাটে কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দেই, দলবৃত্ত রীতির ছন্দে নয়। দলবৃত্ত রীতিতে শব্দের অন্তিম রুদ্ধদল পর্বের অন্তে থাকলেই শুধু নিস্পন্দ হয়, অন্যত্র নয়। যেমন—

কেশে আমার। 'পাক ধরেছে' বটে
 'তাহার পানে'। 'নজর এত'। কেন?
'পাড়ার যত'। ছেলে এবং। বুড়ো,
 'সবার আমি'। 'এক-বয়সী'। জেনো।

—ক্ষণিকা, কবির বয়স

এই দুই পঙ্‌ক্তিতে ছয়টি শব্দের অন্তিম রুদ্ধদল পর্বের আদ্যে বা মধ্যে থেকে ছন্দের ধ্বনিতে এক-একটি মৃদু দোলা বা ঢেউ জাগিয়ে তুলছে। এই ঢেউগুলিই অনুস্পন্দ। দুটি শব্দের (আমার, এবং) অন্তিম রুদ্ধদল আছে পর্বের অন্তে। এই দুই রুদ্ধদলে কোনো দোলা অনুভব করা যায় না।—এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

'যদিও সন্ধ্যা' ইত্যাদি পদ্যাংশে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পদে আছে তিনটি করে অনুস্পন্দ—প্রথম দুটি পূর্ণপর্বের মধ্যে অবস্থিত, তৃতীয়টি অপূর্ণ পর্বের আদিতে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে আছে দুটি করে অনুস্পন্দ—দুটিরই অবস্থান পূর্ণপর্বের মধ্যে, তৃতীয় অপূর্ণ পর্ব অনুস্পন্দহীন। রুদ্ধদল পর্বের আদিতে থাকলে অনুস্পন্দের যোগে ছন্দের স্বাভাবিক পর্বস্পন্দ প্রবলতর হয়ে ওঠে। আর, পরপর কয়েকটি পর্বের আদিতে রুদ্ধদল স্থাপিত হলে ছন্দপঙ্‌ক্তিতে দেখা দেয় এক-একটি ধ্বনি-তরঙ্গমালা। যেমন—

১। মোর সন্ধ্যায় তুমি | সুন্দর বেশে | এসেছ,
 তোমায় করি গো নমস্কার।

মোর   অন্ধকারের | অন্তরে তুমি | হেসেছ,

তোমায়   করি গো নমস্কার।

—গীতিমাল্য-১১১, ‘মোর সন্ধ্যায়’

২। সুন্দর হৃদি। -রঞ্জন তুমি। নন্দনফুল। -হার,...

অঞ্চল ঘেরি। সংগীত যত। গুঞ্জরে অনি। -বার।

—গীতিবিতান (প্রেম), ‘সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি’

৩। দুর্গম গিরি। কান্তার মরু,। দুস্তর পারা। -বার

লঙ্ঘিতে হবে। রাত্রি-নিশীথে,। যাত্রীরা, হুঁশি। -য়ার।

—নজরুল, সর্বহারা, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

৪। নীল) অঞ্জন ঘন। পুঞ্জছায়ায়। সম্বৃত অম্। -বর।

—বনবাণী, বর্ষামঙ্গল

এসব ধ্বনিস্পন্দও সমদূরত্বে অবস্থিত। তাতেও স্পন্দসৌষম্য উৎপন্ন হয়েছে। পর্বের আদিস্থিত এ-রকম স্পন্দসৌষম্য প্রধানতঃ দেখা যায় পদ বা পঙ্‌ক্তির মিলে। ‘যদিও সন্ধ্যা’ ইত্যাদি পদ্যাংশটিতে দু-রকম মিল আছে—‘মন্থরে-অম্বরে-মন্তরে’ এই তিন অপূর্ণ পর্বের আদ্য স্পন্দের মিল এবং ‘থামিয়া-নামিয়া’ শব্দের অনুস্পন্দহীন সাধারণ মিল। এই দু-রকম মিলকে বলা যায় যথাক্রমে **স্পন্দিত মিল** ও **নিস্পন্দ মিল**। আরও লক্ষণীয় এই অংশের স্পন্দসৌষম্যও দু-রকম—সন্ধ্যা-মন্দ, সংগীত-ইঙ্গিতে প্রভৃতি পদ বা পঙ্‌ক্তিগত অনুস্পন্দের সৌষম্য এবং ‘মন্থরে-অম্বরে-মন্তরে’ এই মিলগত পর্বস্পন্দের সৌষম্য এই দ্বিতীয় প্রকার স্পন্দসৌষম্যের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়, তার তুলনায় প্রথম প্রকার সৌষম্যের প্রয়োগ খুবই কম। আর-একটা দৃষ্টান্ত এই—

মনোমন্দির-সুন্দরী, মণিমঞ্জীর গুঞ্জরি

স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা, অয়ি মঞ্জুলা মুঞ্জরী।

রোষারুণরাগ-রঞ্জিতা বঙ্কিম-ভুরু-ভঙ্গিতা,

গোপন-হাস্য কুটিল-আস্য, কপটকলহ-গঞ্জিতা।...

অয়ি খলছল-গুণ্ঠিতা, মধুকরভর-কুণ্ঠিতা,

লুব্ধপবন-ক্ষুব্ধলোভন মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা।

—গীতবিতান (নাট্যগীতি), ‘মনোমন্দির-সুন্দরী’

এই অংশটিতে সুন্দরী-গুঞ্জরি-মুঞ্জরী, রঞ্জিতা-গঞ্জিতা, গুণ্ঠিতা-কুণ্ঠিত-লুণ্ঠিতা এই তিন প্রধান স্পন্দিত মিলে আছে এক প্রকার স্পন্দসৌষম্য। অন্য-রকম স্পন্দসৌষম্যের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।—এবার আর-এক রকম স্পন্দসৌষম্যের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

‘ঐ আসে ঐ’। অতি ভৈরব। হরষে

জলসিঞ্চিত। ক্ষিতিসৌরভ। -রভসে
ঘনগৌরবে। নবযৌবনা। বরষা
    শ্যামগম্ভীর। সরসা।
গুরুগর্জনে। নীল অরণ্য। শিহরে,
উতলা কলাপী। কেকাকলরবে। বিহরে;
    নিখিল-চিত্ত। -হরষা
ঘনগৌরবে। আসিছে মত্ত। বরষা।

—কল্পনা (সাধারণ), বর্ষামঙ্গল

এর প্রথম চার পঙ্‌ক্তিতে পূর্ণপর্ব আছে সাতটি। এগুলির মধ্যে প্রথমটি বাদে বাকি ছয়টি পূর্ণপর্বেই আছে একটি রুদ্ধদল ও চারটি মুক্ত দল ('ভৈরব' প্রভৃতি অকারান্ত শব্দ অকারান্তরূপেই উচ্চার্য)। আর সবগুলি রুদ্ধদলই অবস্থিত চার মুক্তদলের মধ্যস্থলে। রুদ্ধদলজাত অনুস্পন্দগুলির এই সৌষম্যটুকুই এই চার পঙ্‌ক্তির ধ্বনিসৌন্দর্যের প্রধান অবলম্বন। বাকি চার পঙ্‌ক্তিতে আছে কিছু স্পন্দানুপ্রাস আর কিছু সাধারণ বর্ণানুপ্রাস, স্পন্দসৌষম্য নেই। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে এই চার পঙ্‌ক্তিতেও স্পন্দসৌষম্য সঞ্চার করেন।—

গুরুগর্জনে। নীপমঞ্জরী। শিহরে,
শিখীদম্পতি। কেকাকল্লোলে। বিহরে।
    'দিগ্বধূচিত'। -হরষা।
ঘনগৌরবে। আসে উন্মদ। বরষা।

—কল্পনা (সঞ্চয়িতা), বর্ষামঙ্গল

এই পরিমার্জিত রূপেও দুটি পর্বে (ঐ আসে ঐ' এবং 'দিগ্বধূচিত') স্পন্দসৌষম্য রক্ষিত হয়নি। যদি লেখা হত

১। 'আসে ঐ আসে'। অতি ভৈরব। হরষে।

২। 'বন-প্রান্তর'। -হরষা

তাহলে এই অভাবটুকুও থাকত না। আসল কথা এই যে, বাংলায় প্রতি পদে বা পঙ্‌ক্তিতে স্পন্দসৌষম্য রাখা সম্ভব নয়। তাতে কবির ভাবপ্রকাশের বাধা হয়। ছন্দের ধ্বনিসৌন্দর্যের খাতিরে কবিতার ভাবসৌন্দর্যের হানি ঘটানো যায় না। এইজন্যই কবি 'দুঃসময়' ও 'বর্ষামঙ্গল' কবিতার শুধু প্রথম স্তবকেই স্পন্দসৌষম্য রেখেছেন। পরবর্তী কোনো স্তবকেই তা দেখা যায় না। তবে কবিতা-রচনাকালে যেমন এখানে-সেখানে কিছু বর্ণানুপ্রাস ভাবের বেগেই এসে যায়, তেমনি স্পন্দানুপ্রাস, এমন কি স্পন্দসৌষম্যও মাঝে-মাঝে এসে যায়। তাতে ভাবসৌন্দর্যবৃদ্ধি সহায়তাই হয়, অন্তরায় হয় না। যেমন—'দুঃসময়' কবিতার 'ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে', 'বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি' এবং 'দূরদিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক আঁকা', এই তিন পদেই আছে স্পন্দসৌষম্য। কিন্তু তিন পদের স্পন্দসৌষম্য তিন রকম। কারণ রুদ্ধদলগুলি প্রথম পদে আছে পর্বের মধ্যে,

দ্বিতীয় পদে আছে পর্বের আদিতে আর তৃতীয় পদে আছে পর্বের উপান্তে। রুদ্ধদলের এই অবস্থানগত পার্থক্যে ছন্দের স্পন্দসৌষমে যে বৈচিত্র্য দেখা দেয়, ছন্দের ধ্বনিসৌন্দর্যের বিচারে তার মূল্যও কম নয়। তেমনি 'বর্ষামঙ্গল' কবিতার 'ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণ-রসনা' এই পঙ্‌ক্তিতে আছে স্পন্দসৌষম্য, আর 'গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে' এবং 'স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে' এই দুই পঙ্‌ক্তিতে আছে শুধু স্পন্দানুপ্রাস, সৌষম্য নেই। আর 'কেতকী-কেশরে কেশপাশ কর সুরভি' এই পঙ্‌ক্তিতে আছে শুধু বর্ণানুপ্রাস। স্পন্দানুপ্রাস ও বর্ণানুপ্রাস ছন্দের অলংকার মাত্র, কোনোটাই ছন্দের অঙ্গ নয়।

পদগত বা পঙ্‌ক্তিগত স্পন্দানুপ্রাসের সৌষম্য খুব কমই দেখা যায়। সাধারণ বর্ণানুপ্রাসের মতো শুধু মাঝে-মাঝেই দেখা যায়। কিন্তু মিলগত স্পন্দানুপ্রাসের সৌষম্য রাখতেই হয়, নতুবা মিলই হয় না। 'দুঃসময়' কবিতা থেকেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ঊর্ধ্ব আকাশে। তারাগুলি মেলি। অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি। তোমা পানে আছে। চাহিয়া।
নিম্নে গভীর। অধীর মরণ। উচ্ছলি
শত তরঙ্গে। তোমা পানে উঠে। ধাইয়া।
বহুদূর তীরে। কারা ডাকে বাঁধি। অঞ্জলি
এসো এসো সুরে। করুণ মিনতি। -মাখা।
ওরে বিহঙ্গ,। ওরে বিহঙ্গ। **মোর,**
এখনি অন্ধ,। বন্ধ কোরো না। পাখা।

অঙ্গুলি-উচ্ছলি-অঞ্জলি, এই তিন শব্দে মিল প্রায় নেই। কিন্তু তিন শব্দেরই আদিতে একটি করে রুদ্ধদলের স্পন্দ আছে। এই স্পন্দসৌষম্যই মিলের ধ্বনিসংগতি রক্ষা করছে।

শরৎ তোমার। অরুণ আলোর। অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল। ছাপিয়ে মোহন। অঙ্গুলি।
শরৎ তোমার। শিশির-ধোয়া। কুন্তলে,
বনের পথে। লুটিয়ে-পড়া। অঞ্চলে
আজ প্রভাতের। হৃদয় ওঠে। চঞ্চলি।

—গীতালি-২৬, 'শরৎ তোমার'

অঞ্জলি-অঙ্গুলি-চঞ্চলি এবং কুন্তলে-অঞ্চলে ত্রিদল মিল হিসাবে নির্দোষ নয়। তবে জলি-চলি এবং তলে-চলে নির্দোষ দ্বিদল মিল। কিন্তু ওই পাঁচ শব্দেরই আদিতে একটি করে রুদ্ধদলের স্পন্দ আছে। তাতে যে স্পন্দসৌষম্য উৎপন্ন হয়েছে তারই প্রভাবে এই দুই শব্দগুচ্ছ ত্রিদল মিলের মর্যাদা পেয়েছে।

কখনও কখনও কবির পরিকল্পনা-নিরপেক্ষ ভাবে মিল বা স্পন্দানুপ্রাস (এমন কি, স্পন্দসৌষম্যও) ভাবের প্রেরণায় আপনা থেকেই ছন্দপ্রবাহে ভেসে আসে। এ-রকম অনপেক্ষিত ধ্বনিসুষমাতেই শ্রুতিরুচি তৃপ্ত হয় সবচেয়ে বেশি। যেমন—

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
   সেই তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো।
   সেই তোমার ভালো।

—গীতালি-৯৯, 'অন্ধকারের উৎস'

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।

—নটরাজ, 'নৃত্যের তালে'

এই দুই দৃষ্টান্তের প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম তিন পর্বের আদিতে দেখা দিয়েছে একটি করে ঝোঁকের আঘাত বা ধ্বনিস্পন্দ। এই স্পন্দসুষমা আকস্মিক। আর তাতেই কান পায় আশাতীত পরিতৃপ্তি। তেমনি তৃপ্তি দেয় 'ঘিরে-জীরে' এই অপ্রত্যাশিত মিলটি। অনুরূপ আর-একটি দৃষ্টান্ত—

নির্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে সন্ন্যাসী একা যাত্রী।...
এত দিন পরে এসেছে কি তাঁর আজি অভিসার-রাত্রি।

—কথা, অভিসার

এটিতে আকস্মিক মিলের চমক নেই। কিন্তু অনপেক্ষিত স্পন্দসুষমা আছে প্রথম চার পর্বেই। এটুকুই এই পঙ্‌ক্তিটির সৌষ্ঠব তথা গৌরব বেড়েছে।

স্পন্দানুপ্রাস তথা স্পন্দসৌষম্য সবচেয়ে বেশি শোভা পায় কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে। তার পরেই দলবৃত্তের স্থান। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ধ্বনিস্পন্দের সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ খুবই কম দেখা যায়। তবে একেবারে যে নেই তা নয়। যেমন—

সকল অভ্যাস-ছাড়া
সর্ব আবরণ-হারা।
   সদ্যশিশু সম
নগ্নমূর্তি মরণের
নিষ্কলঙ্ক চরণের
   সম্মুখে প্রণমো।

—চিত্র মৃত্যুর পর

আনন্দে আতঙ্কে মিশি ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
   মত্তহাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
   নৃত্য হোক তবে।

—কল্পনা বর্ষশেষ

এ-রকম অনতিপ্রকট স্পন্দসুষমা মনের প্রায় অগোচরে থেকেই নেপথ্যসংগীতের মতো কবিতার ভাবরসগ্রহণে সহায়তা করে।

সবশেষে বলা উচিত যে, নিয়ন্ত্রিত স্পন্দানুপ্রাসই সংস্কৃত বর্ণবৃত্ত ছন্দ এবং সর্ববিধ ইংরেজি ছন্দের প্রাণ। আর বাংলায় স্পন্দানুপ্রাস ছন্দের ভূষণ মাত্র, প্রাণ বা অঙ্গ নয়। তাছাড়া, ভাষার প্রকৃতিভেদে তার স্পন্দপ্রকৃতিও ভিন্ন হয়। সংস্কৃত বর্ণবৃত্ত ছন্দে স্পন্দনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব এতই বেশি যে, তাতে মিল রাখার কোনো প্রয়োজন হয় না। ইংরেজি ছন্দ স্পন্দনির্ভর হলেও তাতে মিল রাখার প্রয়োজনও থাকে। বাংলায় মিল ছন্দের প্রাণ বা অঙ্গ না হলেও তার বসন তো বটেই। আর এই বসনই অবস্থাবিশেষে সুরঞ্জিত বা সুচিত্রিত হয়ে ভূষণের কাজও করে।

পদ ও পঙ্‌ক্তির নিঃসঙ্গতা এবং মিলের ফাঁক

কয়েকটি পদে বা পঙ্‌ক্তিতে যখন ধারাবাহিকভাবে একই মিল থাকে তখন মাঝে-মাঝে একটি মিল ছেড়ে দেওয়া হয়। এ-রকম মিলছুট (rimeless) পদ বা পঙ্‌ক্তিকে বলা যায় **নিঃসঙ্গ পদ বা নিঃসঙ্গ পঙ্‌ক্তি**। আমরা দেখেছি 'কল্পনা' কাব্যে 'দুঃসময়' কবিতাটিতে প্রত্যেক স্তবকের উপান্ত্য পদটি—'তবু (বা ওরে) বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর' মিলহীন বা নিঃসঙ্গ। আর-একটা নিঃসঙ্গ পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

বরং থাকো। মৌন হয়ে ॥ সসংকোচ। লাজে।
অত্যাচারে। মত্তপারা
কভু কি হও। আত্মহারা?
তপ্ত হয়ে। রক্ত-ধারা
ফুকি কি দেহ।-মাঝে?
অহর্নিশি। হেলার হাসি ॥ তীব্র অপ।-**মান**
মর্মতল। বিদ্ধ করি ॥ বজ্রসম। বাজে?

—মানসী, দুরন্ত আশা

মোট চার পঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থে মিল (লাজে-মাঝে-বাজে) আছে। তৃতীয়টিতে নেই। তাই এটিকে চিহ্নিত করা যায় 'নিঃসঙ্গ পঙ্‌ক্তি' অভিধায়।—বিশেষ লক্ষণীয়: অত্যা-মত্ত, মত্ত-আত্ম, তপ্ত-রক্ত এবং মর্ম-বিদ্ধ-বজ্র, এই চতুর্বিধ স্পন্দসৌষম্য। এই সৌষম্যই এই স্তবকটিকে একপ্রকার শ্রুতিবৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে একটু দূরান্বিত স্পন্দসৌষম্য (বরং-সসং) আছে বটে। কিন্তু তার গুরুত্ব নেই।—অন্য রকম একটি দৃষ্টান্ত এই—

তুমি চুরি করি কেন। এস চোর,
ওগো মরণ, হে মোর। মরণ।
শুধু নীরবে কখন। নিশি-ভোর,
শুধু অশ্রু-নিঝর। -ঝরন।

তুমি উৎসব করো। সারা রাত
তব বিজয়-শঙ্খ। বাজায়ে,
তুমি কেড়ে নাও মোরে। ধরি হাত
নব রক্তবসনে। সাজায়ে।
তুমি কারে করিও না। দৃক্‌পাত,
আমি নিজে লব তব। শরণ,
যদি গৌরবে মোরে। **লয়ে যাও**
ওগো মরণ, হে মোর। মরণ।

—উৎসর্গ-৪৭, 'অত চুপি চুপি কেন'

এখানে আছে মোট ছয় পঙ্‌ক্তি—প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দুই পদ। অর্থবোধের প্রয়োজনে সবটুকুই উদ্ধৃত হল। আমাদের আলোচ্য শেষের চার পঙ্‌ক্তির মিলপ্রসঙ্গ। এই চার পঙ্‌ক্তির আট পদে মিল রাখা হয়েছে প্রথম-তৃতীয়-পঞ্চম (রাত-হাত-পাত) এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ (বাজায়ে-সাজায়ে) ক্রমে। তার পরের মিল ষষ্ঠ ও অষ্টম পদে (শরণ-মরণ) সপ্তম পদ মিলহীন। অর্থাৎ এই স্তবকের উপান্ত্য পদ নিঃসঙ্গ। সর্বশেষে আর-এক রকম দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

করিল না যারা জীবনে ভুল,
দলিল না কাঁটা, ছেড়েনি ফুল,
দারোয়ান হয়ে সারা **জীবন**
আগুলিল বেড়া, ছুঁল না গুল—
যেতে নারে তারা এ জল্‌সায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়।।

বুড়ো নীতিবিদ্—নুড়ির প্রায়
পেল নাক এক বিন্দু **রস**
চিরকাল জলে রহিয়া হায়।—
কাঁটা বেঁধে যায় ক্ষত **আঙুল**
দোলে ফুলমালা তারি গলায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

—নজরুল, জিঞ্জির, আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়

প্রথম স্তবকে তৃতীয় পঙ্‌ক্তি নিঃসঙ্গ। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকে নিঃসঙ্গ দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি।

সবশেষে বলা উচিত যে—গানের তালরক্ষায় ফাঁকের যে কাজ, ছন্দের মিলরক্ষায় নিঃসঙ্গতার সেই কাজ। বস্তুতঃ পদ্যরচনায় কোনো পদ বা পঙ্‌ক্তির নিঃসঙ্গতাকে বলা যায় **মিলের ফাঁক**। গানে তালের ফাঁক আসলে তালাঘাত বা তালিরই শামিল, অর্থাৎ তালির নিঃশব্দ প্রকাশ মাত্র। ছন্দে মিলের ফাঁকও তেমনি মিলেরই প্রতিভূ, অর্থাৎ মিলের ঝংকারহীন প্রকাশ মাত্র। তাই আবৃত্তিকালে মিলের অভাব অনুভূত হয় না। বরং বহু মিলের একঘেয়েমি থেকে কানকে একটু নিষ্কৃতি দেয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানেই বলে রাখি, মিলের ফাঁকের ন্যায় **মাত্রার ফাঁকও** কদাচিৎ দেখা যায়। যেমন—

চিরকাল একি। লীলা গো...।। অনন্ত কল। -রোল,
অশ্রুত কোন্। গানের ছন্দে ॥ অদ্ভুত এই। দোল।

—উৎসর্গ-৩৮, 'চিরকাল একি'

আমি চঞ্চল। হে...। আমি সুদূরের। পিয়াসি।...
ওগো প্রাণে মনে। আমি যে তাহার। পরশ পাবার। প্রয়াসী।

—উৎসর্গ-৮, 'আমি চঞ্চল হে'

লেগেছে অমল। ধবল পা-লে ।। মন্দ মধুর। হাওয়া।
দেখি নাই কভু। দেখি নাই...।। এমন তরণী। বাওয়া।

—গীতাঞ্জলি-১২, 'লেগেছে অমল'

এই তিন দৃষ্টান্তে আছে তিন, পাঁচ এবং এক ও দুই মাত্রার ফাঁক। এই ফাঁকগুলি আসলে ভাবাবেগের অবকাশ। গানে হয় সুরবিস্তারের অবকাশ। কবির পক্ষে কথা দিয়ে এসব ফাঁক-পূরণ কঠিন কাজ নয়। কিন্তু তিনি তা করেননি ইচ্ছা করেই, আবেগ বোঝাবার প্রয়োজনে। এ-রকম মাত্রার ফাঁক খুবই কম দেখা যায়, বিশেষতঃ কবিতায়।

মিলের অবস্থান

মিলের অবস্থানটাও লক্ষণীয়। পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মিল রাখাই বাংলা ছন্দের সাধারণ রীতি। আধুনিক কালে অবশ্য কোনো-কোনো বিশেষ শ্রেণীর ছন্দে পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মিল বর্জন করাও চলে। যথাস্থানে তার পরিচয় দেওয়া যাবে। পদান্ত্য মিলের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম। সব চেয়ে কম পর্বান্ত্য মিল। একে-একে এই ত্রিবিধ মিলের পরিচয় দিচ্ছি।

পঙ্‌ক্তির **অন্ত্য** ও **উপান্ত** মিল। পর পর দুই পঙ্‌ক্তির অন্তে মিল রাখার রীতিই সর্বাধিক প্রচলিত। যেমন—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়।...
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

—নৈবেদ্য-৪৮, 'এ দুর্ভাগা দেশ হতে'

ময়-ভয় একক রুদ্ধদলের মিল। আকাশে-বাতাসে যথার্থ ত্রিদল মিল নয়। কারণ মধ্য ব্যঞ্জনের ('ক-ত' এর) ভিন্নতা। কিন্তু তিন স্বরানুপ্রাসের ('আ-আ-এ'র) প্রভাবে এটি ত্রিদল মিলের মর্যাদা পেয়েছে।—অধুনাপূর্ব কালে এ-রকম ধারাবাহিক মিল দেওয়াই ছিল একমাত্র রীতি। আধুনিক কালেও এটাই পঙ্‌ক্তিমিলের প্রধান রীতি। তবে আজকাল পঙ্‌ক্তিস্তবক রচনায় আরও নানাভাবে মিলস্থাপনের রীতি দেখা যায়। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

—কড়ি ও কোমল, প্রাণ

এখানে মিল আছে প্রথম-তৃতীয় ও দ্বিতীয়-চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে (ভুবনে-কাননে, চাই-পাই)। ভুবনে-কাননে ত্রিদল মিল হিসাবে গ্রহণীয় নয়। দ্বিদল মিল (বনে-বনে) বলেই স্বীকার্য।

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোটো-ছোটো ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।

—কড়ি ও কোমল, ছোটো ফুল

এখানে মিল আছে প্রথম-চতুর্থ এবং দ্বিতীয়-তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে। চারের অধিক-সংখ্যক পঙ্‌ক্তি স্তবকে মিল সাজানো যায় নানা ভাবেই। এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম-প্রণালী নেই।

এ প্রসঙ্গে সবশেষে বলা উচিত যে—অনেক সময় দুই পঙ্‌ক্তির অন্তে একটি করে অভিন্ন শব্দ থাকে, সেক্ষেত্রে যথার্থ মিলটা স্থাপিত হয় ওই অভিন্ন শব্দের পূর্বে। আর পঙক্তিপ্রান্তের ওই অভিন্ন শব্দটাই তার পূর্ববর্তী মিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যেমন—

বলছে, কবি তোমার ছবি আঁকছে **গানে**,
প্রণয়গীতি গাচ্ছে নিতি তোমার **কানে**।
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে **তুচ্ছ** কথা।
ঢাকছে শেষে বাংলা দেশে **উচ্চ** কথা।

—ক্ষণিকা, ক্ষতিপূরণ

লক্ষণীয় প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে মিল (গানে-কানে) আছে পঙ্‌ক্তির অন্তে। কিন্তু পরের দুই পঙ্‌ক্তির মিল (তুচ্ছ-উচ্চ) স্থাপিত হয়েছে দুই পঙ্‌ক্তির অন্তিম শব্দের পূর্ব শব্দে। এ-রকম আরও কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

১। এই আবরণ ক্ষয় হবে গো **ক্ষয়** হবে,
এই দেহমন ভূমানন্দ-**ময়** হবে।...

কাঁপবে তোমার আলো-বীণার **তারে** সে,
দুলবে তোমার তারামণির **হারে** সে
বাসনা মোর ছড়িয়ে দিয়ে **লয়** হবে।

—গীতালি-৭১, 'এই আবরণ'

২। আর ভালো নয় মোটর গাড়ির ঘোর বেসুরো **হাঁক** দেওয়া,
নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে **পাঁক** দেওয়া।...
বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো **কাজ** বাকি,
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনও তার **সাজ** বাকি।

—পূরবী, শিলঙের চিঠি

৩। আঁধার নিশার বক্ষে যেমন **তারা** জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নির্ঝর-**ধারা** জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের **মন্দ্র** জাগে,
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন **ছন্দ** জাগে
তেমনি আমায় দোল দিয়ে দাও
যাবার পথে **আগিয়ে** দিয়ে
কাঁদন-বাঁধন **ভাগিয়ে** গিয়ে।

—নটরাজ, শেষের রঙ ('রাঙিয়ে দিয়ে যাও')

৪। কোকিল কালো, **ভোমরা** কালো,
আমরা কালো, **তোমরা** কালো,
কিন্তু জানো না, কি কালো সেই কালো রঙ।
কালী কালো, **মিশি** কালো,
অমাবস্যার **নিশি** কালো,
গদাধরের **পিসি** কালো,
কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো বরণ,
ওগো সে কালো বরণ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান, কালো রূপ

এ-রকম মিলকে বলা যায় **উপান্ত্য মিল**। উপান্ত্য মিলের এ-রকম ধারাবাহিক প্রয়োগ সাধারণতঃ দেখা যায় না। সাধারণ অন্ত্যমিলের ধারাবাহিক প্রয়োগের মধ্যে ছড়ানো থাকে এই উপান্ত্য মিল। এখানে বেছে-বেছে ধারাবাহিক উপান্ত্য মিলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল পাঠকের সহজ বোধের উদ্দেশ্যে।

উপান্ত্য মিলের একটা বিশিষ্টতা এই যে, পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দের প্রথম দলে প্রস্বর প্রায় থাকে না এবং তার পূর্বে থাকে একটা উপযতি। কিন্তু উপান্ত্য শব্দটির প্রথম দলে উপরে পড়ে একটি সুস্পষ্ট প্রস্বর (ঝোঁক) এবং

তার আগে থাকে একটি পর্বযতি। এই পর্বযতি ও প্রস্বরের প্রভাবেই উপান্ত্য মিলের ধ্বনিসৌন্দর্য বাড়ে। যেমন—

অমা: বস্যার। **নিশি**: কালো,
গদা: ধরের। **পিসি**: কালো

'নিশি-পিসি'র আগে আছে পর্বযতি আর পরে উপযতি। 'কা' দলটির উপরে কোনো সুস্পষ্ট ঝোঁক নেই, আছে নি-পি এই দুটি দলের উপরে। এই ঝোঁকের আঘাতেই মিলের ধ্বনি বেজে ওঠে একটু উঁচু গ্রামে। আর তাতেই আমাদের শ্রুতি রুচি তৃপ্ত হয়।

পদান্ত্য মিল।—পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মিলের পরেই পদপ্রান্তিক মিলের স্থান। কোনো বিশেষ ছন্দোবন্ধ ছাড়া অন্য সর্বত্র পঙ্‌ক্তির অন্তে বা উপান্তে মিল রাখাই সাধারণ নিয়ম। পদপ্রান্তে মিল রাখার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম। দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিতে পাশাপাশি দুই পদে মিল থাকে না। যেমন—

ভালোমন্দ দুঃখসুখ ।। অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে ॥ এ ধরণী ভালো।

—চৈতালী, ধরাতল

নিশার আকাশ কেমন করিয়া ॥ তাকায় আমার পানে সে।
লক্ষ যোজন দূরের তারকা ।। মোর নাম যেন জানে সে।

—উৎসর্গ-১৪, 'সব ঠাঁই মোর'

এই দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিগুলিতে প্রথম পদের সঙ্গে দ্বিতীয় পদের মিল নেই। কোনো রকম দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিতেই থাকে না। তবে অবস্থাবিশেষে দুটি দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পদে মিল রাখা যেতে পারে। যেমন—

আমি পরী **অপ্সরী** ॥ বিদ্যুৎপর্ণা,
মন্দার কেশে **পরি**, ।। পারিজাত-কর্ণা।...
মোরা খুশি **নই শুধু** ॥ দেবতার অর্ঘ্যে,
কোনো মতে **রই, বঁধু** ॥ স্বর্গের বর্গে।...
শাপে মোরা মানি **বর** ॥ কৌতুক চিত্তে
নেমে আসি ধরা **'পর** ॥ সাধনার তীর্থে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, তুলির লিখন, বিদ্যুৎপর্ণা

প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির প্রথম পদের সঙ্গে পরবর্তী পঙ্‌ক্তির প্রথম পদের মিল (সরী-পরি, নই শুধু-রই-বঁধু, বর-পর) লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, শুধু বঁধু মিলটা নিখুঁত নয়। ছোট-ছোট পদের এ-রকম পর্যায়-ক্রমিক মিল বেশি দেখা যায় না। এর চেয়ে বড় আয়তনের পদেই এ-রকম পর্যায়ক্রমিক মিল বেশি দেখা যায়। এ-প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত 'যদিও সন্ধ্যা' ইত্যাদি 'দুঃসময়'-শীর্ষক কবিতাটির পর্যায়ক্রমিক পদান্ত্য মিলগুলি স্মরণীয়।

ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পদে মিল রাখাই সাধারণ রীতি। তবে এ-রকম মিল রাখা অত্যাবশ্যক নয়। মিলরক্ষা ও মিলবর্জনের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যথাক্রমে—

কর্মভার নব**প্রাতে** নব সেবকের **হাতে**
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠ**স্বরে** যাইব ঘোষণা **করে**
তোমার আহ্বান।

—কল্পনা, অশেষ

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা **করে,**
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের **তরে**
পরি’ তারি বেশ।

—কল্পনা, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

তোমারে করিল **বিধি** ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন।
পালিবে যে রাজ**ধর্ম** জেনো তাহা মোর **কর্ম**,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

—কথা, প্রতিনিধি

স্বপ্নের সুধীর স্রোতে দূরে ভেসে যায় প্রাণ
স্বপ্ন হতে নিঃস্বপ্ন অতলে,
ভাসানো প্রদীপ যথা নিবে গিয়ে সন্ধ্যাবায়ে
ডুবে যায় জাহ্নবীর জলে।

—মানসী, শ্রান্তি

চৌপদী পঙ্‌ক্তিতে প্রথম তিন পদে অথবা প্রথম দুই পদে মিল রাখাই সাধারণ রীতি। প্রথমে দিচ্ছি তিন পদে মিলের দৃষ্টান্ত।—

১ ফুটে উঠি হাসি সম
খড়্‌গের ঝলকে,
মোরা করি মনোরম
মৃত্যুরে পলকে।
উৎসবে দীপা**বলী**
সনে মোরা নিবি **জ্বলি**,
সুরাসম **উচ্ছলি**

চঞ্চল পুলকে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, তুলির লিখন, বিদ্যুৎপর্ণা

‘মনোরম’ শব্দটা অকারান্ত রূপে উচ্চার্য। নতুবা সম-রম্ মিল নিখুঁত হয় না। না হলেও ক্ষতি নেই। কেননা দুই দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পদে মিল রাখা অত্যাবশক নয়। এখানে লক্ষণীয় পরবর্তী চৌপদী পঙ্‌ক্তির প্রথম তিন পদের মিল (বলী-জ্বলি-ছলি)।

২। ভুলিয়ে যারে আত্ম**পর**,
পরকে নিয়ে আপন **কর্**,
বিশ্ব তোর নিজের **ঘর**—
আবার তোরা মানুষ হ।...
মিত্র হোক ভণ্ড **যে**,
তাহারে দূর করিয়া **দে**,
সবার বাড়া শত্রু **সে** —
আবার তোরা মানুষ হ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, গান (মেবার পতন), ‘কিসের শোক করিস ভাই’

এই দুটি চৌপদী পঙ্‌ক্তির প্রতি পদে আছে দুটি করে পাঁচ কলামাত্রার পর্ব। বিশেষ লক্ষণীয়—পদান্তে বা পঙ্‌ক্তিপ্রান্তে অবস্থিত যে, দে, সে এবং হ, এই চারটি একদল শব্দ স্বতঃই দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়। সেজন্যই পর-কর-ঘর মিলের সঙ্গে যে-দে-সে মিল সমায়তন হতে পেরেছে।

৩। ওগো ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি।
এত শেখিয়াছ এটুকু শেখ নি।
কিসে কড়ি আসে দুটো।

—সোনার তরী, পুরস্কার

উদ্ধৃত তিনটি দৃষ্টান্তই কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। এগুলির প্রতি পর্বে আছে যথাক্রমে চার, পাঁচ ও ছয় কলামাত্রা। এবার দিচ্ছি দলবৃত্ত রীতির চৌপদী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত।—

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইকো পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে।
ভুলিয়ে দিয়ে সত্যি মিথ্যে,

খুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে,
দুধারে সব উদার-চিত্তে
বিধিবিধান ছড়িয়ে চলে।

—ক্ষণিক, অতিবাদ

সবশেষে মিশ্রবৃত্ত রীতির চৌপদী পঙ্‌ক্তি দৃষ্টান্ত।—

নৈরাশ্য কভু না জানে,
বিপত্তি কিছু না মানে,
অপূর্ব অমৃতপানে
অনন্ত নবীন—
এমন মায়ের প্রাণ
যে বিশ্বের কোনোখান
তিলেক পেয়েছে স্থান
সে কি মাতৃহীন?

—মানসী, সিন্ধুতরঙ্গ

চৌপদী পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পদে মিল রাখার দৃষ্টান্ত এই—

১। দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে?

—সোনার তরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা

২। তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান নি মহাকবি।
বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী,

মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তার ছবি।

— ক্ষণিকা, সেকাল

৩। হয়তো মৃত্যুর পারে
ঢাকা সব অন্ধকারে,
স্বপ্নহীন চিরসুপ্তি
চক্ষে চেপে রহে,
গীতগান হেথাকার
সেথা নাহি বাজে আর,
হেথাকার বনগন্ধ
সেথা নাহি বহে।

—চিত্রা, স্নেহস্মৃতি

পর্বান্ত্য মিল।—আধুনিক কালে মিশ্রবৃত্ত রীতির চতুর্মাত্রক পর্বের অন্তে মিল দেওয়া চলে না। সেকালে চলত। এমন কি, কবি ঈশ্বর গুপ্ত বা রঙ্গলালের আমলেও চলত। দৃষ্টান্ত—

করে রব কলরব ধরে সব সঙ্গে,
নদী-নদ পেয়ে পদ গদ্‌গদ অঙ্গে।
তদুপরি যত তরী নৃত্য করি যায়,
প্রেমিকের হৃদয়ের আকাশের প্রায়। ...
দামোদর খরতর কলেবর ধরে,
এ কি লগ্ন বাঁধ ভগ্ন দেশ মগ্ন করে।

—ঈশ্বর গুপ্ত, বর্ষার ঝড়বৃষ্টি

ঠুকে তাল আঁখি লাল কি করাল মূর্তি,
মহাকায় হরি-প্রায় যেন পায় স্ফূর্তি।
চল্যে যায়, পদ-ঘায় বসুধায় কম্প,
কভু ধায় ঠায় ঠায়, মেরে যায় ঝম্প। ...
দু-জনায় এই চায় এ উহায় জিতে,
করে দারি ভূরি ভারী ধেয়ে চারি ভিতে।

—রঙ্গলাল, কর্মদেবী (১৮৬২)

সেকালে এই ছন্দ পরিচিত ছিল **মালঝাঁপ** নামে। আসলে এটি পয়ার, শুধু প্রথম তিন পর্বে মিল-দেওয়া। পয়ারের প্রথম দুই পর্বে মিল-দেওয়া আর-একটি রূপও সেকালে চলত। তার নাম ছিল **তরল পয়ার**।

জয়গোপাল তর্কালংকার-সম্পাদিত (১৮৩৬) কাশীরাম দাসের মহাভারত (আদিপর্ব) থেকে তরল পয়ারের একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।—

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি,
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল-আভা
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল,
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।...
এই ক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য,
কাশী ভণে কৃষ্ণজনে কি কর্ম অশক্য।

—অর্জুনের লক্ষ্যবেধ

এখানে পত্র-নেত্র, রতি-শ্রুতি, পম-শ্যাম, আভা-শোভা, এই চারটি মিল নির্দোষ নয়। আর তুল-অতুল যথার্থ মিল নয়, যমকের প্রকারভেদ মাত্র। যা হক, 'তরল পয়ার' নামেই প্রকাশ যে, এ ছন্দ পয়ারের প্রকারভেদ বলেই স্বীকৃত ছিল। এই আদর্শের বিচারে 'মালঝাঁপ'-এর নাম হতে পারত 'তরলতর পয়ার'। কিন্তু 'মালঝাঁপ' কখনও পয়ারের রূপভেদ বলে স্বীকৃত হয়নি। অন্যত্র ('বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ') তা দেখাতে চেষ্টা করেছি।

আধুনিক কালে শুধু মিশ্রবৃত্ত নয়, কলাবৃত্ত রীতিতেও চতুর্মাত্রক পর্বের অন্তে মিল রাখা হয় না। তবে দলবৃত্ত রীতির পর্বান্ত্য মিল ব্যবহারের কিছু নির্দশন আছে।—

হায় রে কোথা। যুদ্ধ-কথা। হৈল গত
 স্বপ্নমতো।
পুরাণ-চিত্র। বীর-চরিত্র। অষ্ট সর্গ
কৈল খণ্ড। তোমার চণ্ড। নয়ন-খড়্গ।
রইল মাত্র। দিবারাত্র। প্রেমের প্রলাপ,
দিলাম ফেলে। ভাবী কেলে। কীর্তি-কলাপ।

—ক্ষণিকা, ক্ষতিপূরণ

এ-রকম দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তেমনি বিরল কলাবৃত্ত রীতির পঞ্চমাত্রক পর্বের অন্ত্য মিল।—

আবার কবে। ধরণী হবে। তরুণা?
কাহার প্রেমে। আসিবে নেমে ॥ স্বরগ হতে। করুণা।
 নিশীথ-নভে। শুনিব কবে। গভীর গান,
 যে-দিকে চাব। দেখিতে পাব। নবীন প্রাণ,

নবীন প্রীতি। আনিবে নিতি ॥ কুমারী উষা। অরুণা।
আবার কবে। ধরণী হবে। তরুণা?

—মানসী, শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা

লক্ষণীয় সর্বত্রই শুধু প্রথম দুই পর্বে মিল রাখা হয়েছে। —'মানসী'পূর্ব কালে মিশ্রবৃত্ত রীতির ষণ্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী বন্ধে প্রথম দুই পর্বের অন্তে মিল রাখাই ছিল প্রচলিত রীতি। এ-রকম ছন্দে মিল-বর্জনের দৃষ্টান্ত ছিল খুবই কম। 'মানসী' কাব্য রচনার সময় (১৮৮৭-৯০) থেকে রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দকে ক্রমে-ক্রমে কলাবৃত্ত রীতিতে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু পর্বে-পর্বে মিল রাখার প্রথাটা অপরিবর্তিতই থাকে। ফলে আধুনিক কালেও কলাবৃত্ত রীতির ষণ্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী বন্ধে প্রথম দুই পর্বের অন্তে মিল রাখার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট দেখা যায়। মিল বর্জনের দৃষ্টান্তও তার চেয়ে কম নয়। যথাক্রমে দু-রকম দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। রণধারা বাহি। জয়গান গাহি ॥ উন্মাদ কল। -রবে
ভেদি মরুপথ। গিরি-পর্বত ।। যারা এসেছিল। সবে,
তারা মোর মাঝে। সবাই বিরাজে ॥ কেহ নহে নহে। দূর,
আমার শোণিতে। রয়েছে ধ্বনিতে ।। তার বিচিত্র। সুর।

—গীতাঞ্জলি-১০৬, 'হে মোর চিত্ত'

২। কাছে যাই যার। দেখিতে দেখিতে ॥ চলে যায় সেই। দূরে,
হাতে পাই যারে। পলক ফেলিতে ॥ তারে ছুঁয়ে যাই। ঘুরে।
কোথাও থাকিতে। পারি না ক্ষণেক, ॥ রাখিতে পারি না। কিছু,
মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যায় ।। ফেনপুঞ্জের। পিছু।

—উৎসর্গ-১৫, 'আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই'

সাত মাত্রার কলাবৃত্ত পর্বের দ্বিপদী বন্ধেও অনুরূপভাবে বিকল্পে পবান্ত্য মিল রক্ষা বা বর্জন করা চলে। যেমন—

১। যে ফুল না ফুটিতে। ঝরিল ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে। হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও। হয় নি হারা। ...
আমার অনাগত। আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে। বাজিছে তারা,
জানি হে জানি তাও। হয় নি হারা।

—গীতাঞ্জলি-১৪৭, 'জীবনে যত পূজা'

উদ্ধৃত অংশের প্রথম ও তৃতীয় পঙ্ক্তি দ্বিপদী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্ক্তি একপদী। দ্বিপদী পঙ্ক্তি-দুটির প্রথম পদে দুই পর্বের অন্ত্য মিল লক্ষণীয়। এ-রকম পর্বান্ত্য মিল বর্জনের দৃষ্টান্ত এই—

২। জীবন-মরণের। বাজায়ে খঞ্জনি

নাচিয়া ফাল্গুন। গাহিছে।
অধীরা হল ধরা। মাটির বন্দিনী
বাতাসে উড়ে যেতে। চাহিছে। ...
বিরহে টানে মিড়। মিলন-বীণাতারে,
সুখের বুকে বাজে। বেদনা
কপোত-কাকলিতে। করুণা সঞ্চারে,
কানন-দেবী হল। বিমনা।

—পরিশেষ (সংযোজন), জীবন-মরণ

এটিতে পবান্ত্য মিল নেই। কিন্তু পর্যায়ক্রমে পদান্ত্য মিল আছে। 'খঞ্জনি-বন্দিনী' যথার্থ মিল নয়। কারণ যথাক্রমিক স্বরানুপ্রাস নেই। কিন্তু স্পন্দানুপ্রাস আছে। তাতেই কানের প্রসন্নতা রক্ষা হয়। 'বেদনা-বিমনা', মিলটাও ত্রিদল মিল হিসাবে অপূর্ণ। তবে 'দনা-মনা' এই দ্বিদল মিলটুকুতেই কাজ চলে যায়।

পদ ও পর্বের অন্তে যেমন মিল থাকে, তেমনি তাদের আদিতেও মিল থাকতে পারে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় পদাদ্য ও পর্বাদ্য মিলের প্রচুর নিদর্শন আছে। কিন্তু সেসব আদ্য মিল অন্ত্য মিলের মতো ধারাবাহিক নয়। মাঝে-মাঝে দেখা দিয়ে কানের তৃপ্তি সাধন করে। অর্থাৎ এসব আদ্য মিল ছন্দের অঙ্গ নয়, প্রসাধন মাত্র। বলা বাহুল্য, অতিপ্রসাধনে সৌন্দর্যের হানি ঘটে। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় সে দোষ যথেষ্টই আছে। সে কথা বর্তমান আলোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকে দ্বিবিধ আদ্য মিলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

পদাদ্য মিল। —যে-কোনো রকম ছন্দপঙ্‌ক্তির প্রতি পদের আদিতে একটি করে সুস্পষ্ট প্রস্বর (ঝোঁক) থাকে। ফলে পদের আদিস্থিত মিলগুলিও সুস্পষ্ট রূপে ঝংকৃত হয়। তাই সুপরিমিত রূপে প্রযুক্ত পদাদ্য মিলের ধ্বনিতে কান পরিতৃপ্ত হয়। যেমন—

১. 'বিশ্ব'-রূপ নাট্যশালা, 'দৃশ্য' মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো, সূর্য শশধর।

—মায়া

২. লোভ নাহি থেমে থাকে খাই তাই চোটে,
'পিঠে পুলি' পেটে যেন 'ছিটেগুলী' ফোটে।

—পৌষ পার্বণ

৩. ক্ষুদ্রের স্বভাব সব, বিষম বিকট,
'রুদ্রের' প্রতাপ ধরে, 'শূদ্রের' নিকট। ...
কোথায় হইব সুখী, সুখের আশ্বিনে,
'রোদনের' ধ্বনি হল, 'বোধনের' দিনে।

—শারদাগমে লোকের অবস্থা

৪. ‘নিশির’ না যায় রিষ্টি, ‘শিশির’ সতত বৃষ্টি,
‘ঋষির’ তাহাতে ভাঙে ধ্যান।
বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীম,
স্পর্শমাত্র হবে তার জ্ঞান।

—শীত

এ-রকম পদাদ্য মিলের গুণেই ঈশ্বর গুপ্তের অনেক উক্তি এখনও প্রবাদবাক্যের মতো স্মরণীয় হয়ে আছে। —ঈশ্বর গুপ্তের পরে একমাত্র সুকুমার রায়ের (১৮৮৭–১৯২৩) একটি রচনায় এ-রকম পদাদ্য মিলের প্রয়োগ আমার কানে ধরা পড়েছে।—

চট্ ক'রে মনে পড়ে, **মট্**কার কাছে
মালপোয়া আধখানা, **কাল** থেকে আছে।
দুড়্ দুড়্ ছুটে যাই, **দূর** থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে, **কান**-কাটা নেকী।
গালফোলা মুখে তার, **মাল**পোয়া ঠাসা,
ধুক্ করে নিভে গেল, **বুক**-ভরা আশা।
মন বলে আর কেন, **সং**সারে থাকি,
‘বিলকুল্’ সব যেন, ‘ভেলকির’ ফাঁকি।
‘সব’ যেন বিচ্ছিরি, ‘সব’ যেন খালি,
গিন্নীর মুখ যেন, **চিম্‌নির** কালি।

—আবোল তাবোল, হুলোর গান

পদাদ্য মিলের এ-রকম সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য এই রচনাটি বাংলা ছন্দের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। এ-বিষয়ে সুকুমার রায়ের দুটি বিশেষ কৃতিত্বের কথাও বলা উচিত। প্রথমতঃ, এমন ধারাবাহিক ও প্রায় নিখুঁত পদাদ্য মিল প্রয়োগ অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। এ-ক্ষেত্রে সুকুমার রায় অদ্বিতীয়। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর গুপ্ত পদাদ্য মিল ব্যবহার করেছেন মিশ্রবৃত্ত রীতিতে, আর সুকুমার রায় করেছেন কলাবৃত্ত রীতিতে। তাতে এই ধারাবাহিক পদাদ্য মিলের ধ্বনিসংগীত শিশুবৃদ্ধনির্বিশেষে সকলকেই মুগ্ধ করে। —‘প্রায় নিখুঁত’ বলার কারণ দুটি। এক, ‘বিল্‌কুল্-ভেল্‌কির’ যথার্থ মিল নয়। তবে দুই রুদ্ধদলের স্পন্দানুপ্রাস আছে, এই দ্বিবিধ অনুপ্রাস এখানে মিলের কাজ চালাচ্ছে পরোক্ষে। দুই, উপান্ত্য পঙ্‌ক্তির দুটি ‘সব’ মিলও নয়, যমকও নয়। একই শব্দের দ্বিরুক্তি মাত্র। এটাই এই রচনাটির সব চেয়ে বড় দুর্বলতা।

পর্বাদ্য মিল।—বাংলা ছন্দে পদাদ্য প্রস্বরের তুলনায় কিছু দুর্বল হলেও পর্বাদ্য প্রস্বরের গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নয়। তাই পর্বাদ্য প্রস্বরের আশ্রিত মিলও বাজে বেশ উঁচু স্বরেই। দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। সবগুলি দৃষ্টান্তই ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকে গৃহীত।—

১। **জ্বাল** দিতে। **কাল** যায়, ॥ **লাল** পড়ে। গালে।
‘কাটনা’ কামাই হয় ॥ ‘বাটনা’র কালে।···
মজা-দাতা। **অজা** তোর ॥ কি লিখিব। যশ,
যত ‘চুষি’। **তত** ‘খুশি’, ॥ হাড়ে হাড়ে। রস। —পাঁঠা

২। দুই পার্শ্বে পরিজন, মধ্যে বুড়ো বোসে
চিটে গুড় **ছিটে** দিয়ে **পিঠে** খায় কোষে। —পৌষপার্বণ

৩। আমরা **ভুষি** পেলেই **খুসি** হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না। —নীলকর-১

৪। এরা **বেদ** পুরাণের **ভেদ** মানে না,
খেদ কার আর কে বোঝাবে? —দুর্ভিক্ষ

এই পর্বাদ্য মিলগুলির শ্রুতিরোচকতাও সুস্পষ্ট। প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে আছে একটি পদাদ্য মিল (কাটনা-বাটনা), আর চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে আছে পর্বান্ত্য মিল (চুষি-খুসি)। এগুলিও কম শ্রুতিরোচক নয়।

সবশেষে বলা উচিত যে, বাংলা সাহিত্যে মিল জিনিসটা চিরকাল চলে আসছে প্রধানতঃ পূর্ণযতি ও অর্ধযতির সূচক রূপে এবং ছন্দ-বিশেষে লঘুযতির সূচক রূপে। ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেই প্রথম মিলের প্রয়োগ দেখা গেল পদপ্রস্বর ও পর্বপ্রস্বরের ভূষণ রূপে। এটাও তাঁর অন্যতম কৃতিত্বের পরিচায়ক।

আদর্শ মিলের লক্ষণ ও ছন্দের রীতিভেদে মিলের প্রয়োগ

মিলের (অর্থাৎ উপযমকের) সাধারণ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে এই অধ্যায়ের আরম্ভেই। কিন্তু মিলের কিছু বিশেষ লক্ষণও আছে। এই বিশেষ লক্ষণের পরিচয় দেওয়াও প্রয়োজন। কারণ সাধারণ ও বিশেষ, এই উভয়বিধ লক্ষণের যোগেই তৈরি হয় আদর্শ মিল। এই দুই বিশেষ লক্ষণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পঙ্‌ক্তির উপান্ত্য মিলের প্রসঙ্গে। এখানে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন।

সখি প্রতি দিন হায়। এসে ফিরে যায়। **কে**?
তারে আমার মাথার। একটি কুসুম। **দে**।

—কল্পনা, সকরুণা

“এমন করে। আর কেন দিন। কাটাই মিছি। **মিছি**।”
“না না, ছিছি ছি। **ছি** ছি।”

—পলাতকা, নিষ্কৃতি

নিবেদনম্। অধ্যাপকি।-**নীষু,**
কর্তা তোমার। নিতান্ত নন। **শিশু**।

—প্রহাসিনী (প্রথম সং), অপাক-বিপাক

বলা বাহুল্য, এই তিন দৃষ্টান্তেই মিলের পূর্বে আছে একটি করে পর্বসূচক লঘুযতি। বাংলায় প্রত্যেক পর্বের প্রথম দলের উপরে একটা করে ঝোঁক থাকে বটে। কিন্তু একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে শেষ অপূর্ণ পর্বের

(এখানে মিলের) ঝোঁকটা অন্যগুলির তুলনায় কিছু বেশি জোরালো। তাই মিলের ধ্বনি কানে বাজে স্পষ্টতর রূপে। উপরের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'মিছি মিছি' ও 'ছিছি ছিছি' এই দুই ধ্বনিগুচ্ছের উচ্চারণভঙ্গির প্রতি একটু মনোনিবেশ করলেই টের পাওয়া যাবে, যথাক্রমে দ্বিতীয় 'মি' ও তৃতীয় 'ছি', এই দুটি দলের আওয়াজ কিছু বেশি। এই আওয়াজই মিলকে পাঠকের কর্ণগোচর করে সংশয়তীত রূপে।

মিলের পূর্বে যদি উপযতি থাকে তবে মিলের প্রথম দলের জোর কমে যায় এবং মিলের ধ্বনি কর্ণগোচর হয় অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে। যেমন—

পরজন্ম। সত্য হলে ॥ কি ঘটে মোর। সেটা : জানি—
আবার আমায়। টানবে ধরে ॥ বাংলা দেশের। এ রাজ : ধানী।…
তত দিনে। দৈবে যদি ॥ পক্ষপাতী। পাঠক : থাকে,
কর্ণ হবে। রক্তবর্ণ ॥ এমনি কটু। বল্‌ব : তাকে।

—ক্ষণিকা, কর্মফল

এখানে শুধু শেষ পর্বের উপযতি দেখানো হল। শেষ পর্বের প্রস্বর পড়েছে সে, এ, পা এবং বল্‌, এই চার দলের উপরে। তাই মিলগুলির (জানি-ধানী, থাকে-তাকে) আওয়াজ হয়েছে অপেক্ষা মৃদু।

মিলের প্রথমে যদি রুদ্ধদল থাকে তবে তার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় অপেক্ষাকৃত প্রবল ভাবে। তবে পূর্ববর্তী যতির গুরুত্বভেদে (অর্থাৎ লঘু বা উপ-যতি ভেদে) এই প্রবলতারও তারতম্য ঘটে। মানে লঘুযতির পরবর্তী মিলের আদি রুদ্ধ দলের ধ্বনি উপযতির পরবর্তী মিলের আদি রুদ্ধদলের চেয়েও প্রবলতর হয়। এই অধ্যায়ে পূর্বে যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে সেগুলি থেকেই এ-কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে। তবু আশুবোধের জন্য আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

আজি কি তোমার। মধুর মূরতি ॥ হেরিনু শারদ। প্রভাতে।
হে মাত, : **বঙ্গ**। শ্যামল : **অঙ্গ** ॥ ঝলিছে অমল। শোভাতে।

—কল্পনা, শরৎ

ক্ষুদ্র শান্তি। করিব : **তুচ্ছ**,
পড়িব নিম্নে। চড়িব : **উচ্চ**,
ধরিব ধূম্র। কেতুর : **পুচ্ছ**,
    বাহু বাড়াইব। তপনে।

—চিত্রা, নগর-সংগীত

লোকটি কে ইনি। যেন চিনি-চিনি ॥ বাঙালি মুখের। **ছন্দ**,
ধরনে ধারণে। অতি অকারণে ॥ ইংরেজিতরো। **গন্ধ**।

—কল্পনা, উন্নতি লক্ষণ

তিন দৃষ্টান্তেই পঙ্‌ক্তির শেষ লঘুযতির পরবর্তী অপূর্ণ পর্বের আদিদলের উপরে প্রস্বরের আঘাতটা পড়ে একটু বেশি জোরে । তাই তার ধ্বনি বাজেও একটু বেশি। আর মিলের আদিতে যদি থাকে রুদ্ধদল, তবে তার ধ্বনিটা অনুরুপ প্রস্বরিত মুক্তদলের তুলনায় বাজে আরও একটু উঁচু সুরে। একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা

যাবে 'প্র-শো-ত এর তুলনায় 'ছন্-গন্' এর ঝংকার কিছু বেশি। তেমনি উপযতির পরবর্তী অঙ্গ-বঙ্গ বা তুচ্ছ-পুচ্ছ প্রভৃতির তুলনায় লঘুযতির পরবর্তী 'ছন্দ-গন্ধ' শব্দের ছন্-গন্ দল-দুটির ঝংকার বেশি। এসব সূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করা কিঞ্চিৎ অভ্যাস বা অনুশীলন-সাপেক্ষ।

মিলের প্রয়োগ সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। মিল রচনায় শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশের, অর্থাৎ মিলের সম্পন্দ বা নিস্পন্দ ধ্বনিঝংকার তোলার, প্রধানতম ক্ষেত্র হল কলাবৃত রীতির ছন্দ। এই রীতির ছন্দে পদের আয়তন চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার হতে পারে। আর পঙ্ক্তি বা পদের অন্তিম পর্ব অপূর্ণ বা পূর্ণায়ত হতে বাধা নেই। তাই মিলের ধ্বনিকে নাচিয়ে বা বাজিয়ে তোলবার সুযোগ বেশি পাওয়া যায়। দলবৃত্ত রীতির ছন্দে সে সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম। কেননা, এই রীতির ছন্দে পূর্ণপর্বের আয়তন চার মাত্রার বেশি হয় না। তবে এই রীতিতে পঙ্ক্তি বা পদের অন্তে দুই থেকে চার পর্যন্ত যে-কোনো সংখ্যার দলমাত্রা থাকতে পারে। তাই মিলের সৌন্দর্যসৃষ্টির অবকাশও খুব কম নয়। তবে কলাবৃত্ত বা দলবৃত্ত রীতিতে মিলের সৌন্দর্য থাকবে কিনা বা কতখানি থাকবে তা একান্তভাবেই নির্ভর করে কবির ভাবগত বা শিল্পগত প্রয়োজনের উপরে।

পক্ষান্তরে মিশ্রবৃত্ত মিলের সৌন্দর্য প্রকাশের কোনো অবকাশই নেই। আধুনিক কালে এই রীতিতে পূর্ণপর্বের আয়তন চার কলামাত্রার বেশি হয় না। আর অপূর্ণ পর্বের আয়তন দুই কলামাত্রার বেশি হয় না, কমও হয় না। তাছাড়া মিলের পর্বে সংশ্লিষ্ট রুদ্ধদলও সাধাণতঃ থাকে না। ফলে মিলের স্পন্দসৃষ্টির সুযোগও থাকে না। মোট কথা, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে মিল রচিত হয় সাধারণতঃ একটি বিশ্লিষ্ট রুদ্ধদল অথবা দুটি মুক্ত দল নিয়ে। অধিকন্তু এই রীতিতে মিলের পূর্ববর্তী পর্বযতিটাও প্রায়শঃ লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে মিলের প্রথম দলের উপরে প্রত্যাশিত ঝোঁকের মৃদু স্পন্দনটুকুও থাকে না। অর্থাৎ কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তের তুলনায় মিশ্রবৃত্তের মিল একেবারেই নিষ্প্রাণ, নিস্পন্দ। কিন্তু মিলের এই মৃদুতা বা অনতিস্পষ্টতাই মিশ্রবৃত্ত রীতির উপযোগী। কেননা, এই রীতির ছন্দই এখন বক্তব্যপ্রধান এবং গুরুগম্ভীর ভাব প্রকাশের মুখ্য বাহন হয়ে উঠেছে। ধ্বনির নৃত্যপরায়ণতা বা গীতময়তা এই রীতির স্বধর্ম অর্থাৎ প্রকৃতিগত নয়। মিলের ঝংকার তার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। যেমন—

> যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
> পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।···
> তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
> অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

—গীতাঞ্জলি-১০৮, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'

এখানে মিলের নৃত্য বা গীতময়তা দেখাবার অবকাশ কোথায়? এখানে মিল আছে, কিন্তু অনতিপ্রকট। অর্থাৎ এই রীতিতে মিল অনেক সময় প্রায়-প্রচ্ছন্ন থেকেই কানের তৃপ্তিসাধন করে তথা পদ ও পঙ্ক্তির সমাপ্তিবোধ জাগায়। কেননা এটাই তার প্রধান কাজ।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বাংলা কলাবৃত্ত রীতির আবির্ভাব হয়নি, দলবৃত্ত রীতিরও পূর্ণ বিকাশ হয়নি। তাই তাঁকে প্রধাণতঃ মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই মিলের নানা কলাকৌশল দেখাতে হয়েছিল। তাতে তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে তাতে মিলের স্পন্দনলীলা বা গীতসুষমা ছিল না।

যমক ও অর্ধযমক

এখানে যমকের এই অধ্যায়ের গোড়াতেই উপযমক (মিল) ও যমকের পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে অতি সংক্ষেপে। এখানে দৃষ্টান্ত দিয়ে এই পার্থক্যের বিশদ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।—

নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়।
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়!

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান, নন্দলাল

গেল চলে জেলে জ্বালাইয়া রেখে পুণ্য-জ্যোতির জ্বালা
ভয়-তরণের সুধা-ক্ষরণের উদাহরণের মালা।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, গান্ধীজি

প্রথম দৃষ্টান্তের 'ফি সন-ভীষণ-লিশন', দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'তরণের-ক্ষরণের-হরণের' এবং 'ক্ষুধা-উদা', এই তিনটি মিলই নিখুঁত আদর্শ মিল। অনুরূপ আর-একটি দৃষ্টান্ত এই।—

কি আছে পাত্রে যাহার গাত্রে বসেছে তৃষিত মক্ষী?
শলাকা-বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ মনু-নিষিদ্ধ পক্ষী।

—কল্পনা, উন্নতিলক্ষণ

এখানে 'বিদ্ধ-সিদ্ধ' যথার্থ মিল (উপযমক) বটে। কিন্তু 'সিদ্ধ-ষিদ্ধ' যথার্থ মিল নয়। কারণ প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির অভিন্নতা অথাৎ পূর্ণ ধ্বনিসাম্য। কবি ঈশ্বর গুপ্ত-রচিত।

বিবিজান চলে যান লবেজান করে

এই পঙ্‌ক্তিটির ('ইংরাজি নববর্ষ') 'জান-যান-জান'ও যথার্থ মিল নয়, একই কারণে। তেমনি রবীন্দ্র-রচিত।

ভুপুরাম অবিরাম বিশ্রাম-শালী সে

এই পঙ্‌ক্তির (খাপছাড়া-৪৬, 'সময় চলেই যায়'), 'রাম-রাম-রাম'-কেও মিল বলা যায় না। এ-রকম পূর্ণ ধ্বনিসাম্যকে বলা যায় 'যমক' উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকেই বোঝা যায়, যমকও অনায়াসেই মিলের কাজ চালাতে পারে। তাই মিলের প্রসঙ্গে যমকেরও বিশদ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

এ কথা সকলেই জানে যে, একই শব্দের বা শব্দগুচ্ছের একাধিক বার ভিন্নার্থ-প্রয়োগের নাম **যমক**। ভিন্নার্থে প্রযুক্ত শব্দ বা শব্দ-গুচ্ছগুলি বর্ণবিন্যাসে একরূপ না হলেও চলে। কিন্তু শ্রুতধ্বনিতে একরূপ হওয়া চাই। যেমন—'প্রভাকরে-প্রভা করে' এই যমকটা শুধু শ্রুতধ্বনিতে নয়, বর্ণবিন্যাসেও একরূপ। কিন্তু 'বাঁদর-বাঁ দোর', 'হাসিতে-হা সীতে' বা 'লক্ষণেই-লক্ষ্মণেই-লক্ষ্য নেই', এসব স্থলে বর্ণসাম্য না থাকলেও ধ্বনিসাম্য (তথা শ্রুতিসাম্য) আছে। অতএব এগুলিও যমক।

যমক শব্দালংকার বলেই স্বীকৃত, অর্থালংকার বলে নয়। কিন্তু এই মত সর্বতোভাবে সমর্থনীয় নয়। যমক অংশতঃ অর্থালংকার বলেও স্বীকার্য। তা না হলে তার সংজ্ঞাসূত্রে 'ভিন্নার্থ'-প্রয়োগের কথা থাকত না। বস্তুতঃ যমক অনুপ্রাসের ন্যায় বিশুদ্ধ ধ্বনিগত অলংকার নয়, অংশতঃ অর্থগতও বটে। তবে ছন্দের আলোচনায়

যমকের প্রসঙ্গ আসে ধ্বনিগত অলংকার হিসাবেই, অর্থগত অলংকার হিসাবে নয়। কারণ ছন্দের কারবার ধ্বনি নিয়ে। এ ক্ষেত্রে যমক মিলেরই স্থলবর্তী।

কিন্তু আধুনিক কালের কবিরা মিলের বৈচিত্র্যসাধনে যত উৎসুক, যমক-প্রয়োগ সম্বন্ধে ততই বিমুখ। রবীন্দ্রসাহিত্যেও মিলবৈচিত্র্যের প্রাচুর্য যেমন অপরিমেয়, যমকের নিদর্শন তেমনি দুর্লভ। অথচ এক সময়ে যমক-রচনার নৈপুণ্য পরম কৃতিত্বের বিষয় বলে গণ্য হত। বোধ করি, কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেই যমকের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশি। তাঁর রচনা (গ্রন্থাবলী, বসুমতী) থেকেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

কুসুমের বাস ছেড়ে কুসুমের 'বাস'
বায়ু ভরে এসে করে নাসিকায় 'বাস'।

—প্রণাম তোমায় (পারমার্থক ও নৈতিক)

নিজ মান চাই শুধু, কারে নাহি 'মানি'।
সে মানে কে মানে ভাই, কিসে হব 'মানী'?
সরলতা কর যদি সবার 'সহিত',
তবেই সন্তোষ লাভ, সহজে 'স্বহিত'।

—সাম্য (পারমার্থিক ও নৈতিক)

আমার কি বল গিরি, আমি 'জেতে নারী',
আমার কি বল গিরি, আমি 'যেতে নারি'।

—সারদামঙ্গল, মেনকার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়

যমক-প্রয়োগের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিগত দিন' বইটি (১৯৫৭। বাং ১৩৬৪) থেকে।—

টালায় প্রকাশ নামে থাকে এক 'ডাক্তার',
ভারি তার হাতযশ, ভারি নাম-'ডাক তার'।
মাঠ দিয়ে হন হন চ'ড়ে যায় 'পালকি'
ও গ্রামের জমিদার নটবর 'পাল কি'?
কবিতা বেরিয়েছিল বসুমতী 'মাসিকে',
পড়ে তাই শোনালাম বিনোদিনী 'মাসিকে'।
টেবিলেতে ভালো করে দিয়েছিস 'বার্নিস'?
দাম চাস্? আজ নয়, মঙ্গল-'বার নিস্'।

—বিগত দিন, পরিচ্ছেদ ৯, পৃ ৪৭–৪৮

বলা বাহুল্য, কিছু কৌতুক বা হাস্যরস ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যরস সৃষ্টির পক্ষে যমক অলংকার বিশেষ সহায়ক নয়, বরং অন্তরায় হবার সম্ভাবনাই বেশি। এমন কি, হাস্যরস বা কৌতুক-সৃষ্টিতেও যমকের চেয়ে

মিলেরই ক্ষমতা বেশি। তার বহু প্রমাণ আছে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আরও অভ্যেস দুবেলা
বাজিয়ে বাজি তবলা—
সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা।

—আষাঢ়ে, কেরানী

এই অতি গম্ভীর সভা,
সবাই ধ্যানে মগ্ন;
ছুরি এবং ফর্কে,
ধারাল সব তর্কে,
কঠিন এবং কোমল প্রশ্ন
করছেন বসে ভগ্ন।

—আষাঢ়ে, শ্রীহরি গোস্বামী

পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মতো ছেলেবেলায় খান নি কে?
ভবনদীর পাড়ে গিয়ে বিড়াল বসছেন আহ্নিকে।

—হাসির গান, হল কি

পত্নীর চাইতে কুমীর ভালো বলেন সর্ব শাস্ত্রী,
কুমীর ধরলে ছাড়ে তবু, ধরলে ছাড়ে না স্ত্রী।

—হাসির গান, সংসার

রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও (বিশেষতঃ খাপছাড়া, প্রহাসিনী, ছড়া প্রভৃতি গ্রন্থে) এ-রকম কৌতুকাত্মক মিল-প্রয়োগের প্রচুর নিদর্শন আছে। এখানে শুধু দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ।
আসল কথা লাগে ভালো থাকতে পড়ে সদা চিৎ।···
তাই বসেছি ডেস্‌কে আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে—
'কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালী লে আও ধাঁ কর্‌কে'।

—পূরবী, শিলঙের চিঠি

এ-জাতীয় মিল রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রচুর। কিন্তু যমক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত (এমন কি, কৌতুক বা হাস্যরসের প্রয়োজনেও) অতি বিরল। তা হলেও একেবারে অপ্রাপ্য নয়। যেমন—

১. যে যায় চলে বিরাগভরে
তারেই শুধু আপন 'জেনেই'
বিলাপ করে কাটাই, এমন

সময় যে নেই, সময় ‘যে নেই’।

—ক্ষণিকা, অনবসর

২. খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে ‘আঁকা সে’,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে,
যেন গো আস্ত-‘আকাশে’।

—গীতিমাল্য-৩০ ‘সুন্দর বটে’

৩. শাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুসি
নামজাদা সে ‘বর নিয়া’,
ভাটের দল চেঁচিয়ে মরে
নামের গুণ ‘বর্ণিয়া’

—খাপছাড়া-৪৩, ‘আদর করে মেয়ের নাম’

৪. চিন্তাহরণ দালালের বাড়ি গিয়ে
একশো টাকার একখানি নোট দিয়ে
তিনখানা নোট আনে সে ‘দশ টাকার’।
কাগজ-গন্‌তি মুনফা যতই বাড়ে
টাকার গন্‌তি লক্ষ্মী ততই ছাড়ে,
কিছুতে বুঝিতে পারে না ‘দোষটা কার’।

—খাপছাড়া-৭৯, ‘চিন্তাহরণ দালালের’

‘দশ টাকার-দোষটা কার’ এই যমকে একটু খুঁত (অ-ও স্বরের ভিন্নতা) থাকলেও সেটুকু উপেক্ষণীয়।

এ-রকম পূর্ণ যমকের দৃষ্টান্ত বিরল হলেও আধুনিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ রবীন্দ্ররচনায়, একপ্রকার অপূর্ণ যমকের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন—

নদীতীরে। বৃন্দাবনে
সনাতন। একমনে
জপিছেন। ‘নাম’,
হেনকালে। দীনবেশে
ব্রাহ্মণ চ: রণে এসে
করল প্র: ‘ণাম’।

—কথা, স্পর্শমণি

এখানে 'নাম-ণাম' যথার্থ মিল বা উপযমক নয়। কেননা, এই অংশের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিতে ভিন্নতা নেই, অর্থাৎ পূর্ণ ধ্বনিসাম্য ঘটেছে। অথচ পূর্ণ ধ্বনিসাম্য সত্ত্বেও একে যথার্থ যমকও বলা যায় না। কেননা, এই দুই অংশ ভিন্নার্থ-জ্ঞাপক নয়। বস্তুতঃ এখানে 'ণাম' অংশটার কোনো অর্থই নেই। এ-রকম অপূর্ণ যমককে বলা যায় **অর্ধযমক**। এ-রকম অর্ধযমকের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।—

হে মোর : দুর্ভাগা : দেশ ॥ যাদের : করেছ : অপ ⁝ 'মান',
অপমানে । হতে হবে ॥ তাহাদের । সবার স ⁝ 'মান' ।

—গীতাঞ্জলি-১০৮, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'

বন্দীরে । দিয়ে গেছ ॥ মুক্তির । 'সুধা',
সত্যের । করমালে ॥ সাজালে ব : 'সুধা' ।

—গীতবিতান-৬১৩, 'মরণসাগর-পারে'

মালাখানি লয়ে। আপন গলায়
আদরে পরিলা। 'সতী',
ভক্তি-আবেগে। কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেম। -পূর্ণ বদনে—
বাঁধা প'ল এক। মাল্য-বাঁধনে
লক্ষ্মীসরস্। -'স্বতী'।

—সোনার তরী, পুরস্কার

বলো দেখি মোরে। শুধাই তোমায়
অপরি : -'চিতা',
ওই যেথা জ্বলে। সন্ধ্যার কূলে
দিনের : 'চিতা'···

—সোনার তরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা

একগাছি চুল। বায়ু-উচ্ছ্বাসে। কাঁপা
ললাটের ধারে। থাকে যেন অশা। -'সনে'।
ডাহিন অলকে। একটি দোলন।-চাঁপা
দুলিয়া উঠকু। গ্রীবাভঙ্গীর। 'সনে'।

—বীথিকা, নিমন্ত্রণ

উপযমক (মিল) চলে ধারাবাহিক ভাবে। ওই ধারাতেই মাঝে-মাঝে দেখা দেয় অর্ধযমক বা যমক। উপযমকের তুলনায় অর্ধযমকের প্রয়োগ খুবই বিরল। আর যথার্থ যমকের প্রয়োগ আজকাল প্রায় উঠেই গেছে।

গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে

তরুণী ঊষার শিশির-স্নানের কালে
আলো-আঁধারের আনন্দ বিপ্লবে।

বাংলা ছন্দের রূপবৈচিত্র

Morphology of Bengali Versification

দ্বৈমাত্রিক এবং ত্রৈমাত্রিক ছন্দে বাংলা কাব্যের আরম্ভ। এখনো পর্যন্ত ঐ দুই জাতের মাত্রাকে নানা প্রকারে সাজিয়ে বাংলা ছন্দের লীলা চলছে।

মোট কথা বলা যায়, দুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলার সকল ছন্দের মূলে। তার **রূপের বৈচিত্র** ঘটে যতিবিভাগের বৈচিত্র্যে এবং নানা ওজনের পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে। এই রকম বিভিন্ন বিভাগের যতি ও পঙ্‌ক্তি নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলি বেড়ে চলেছে।

১৩৪৫ (ইং ১৯৩৮) কার্তিক

—রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ছন্দের চতুরঙ্গ রূপ

ছন্দের রীতি (বা অন্তঃপ্রকৃতি) নিয়ন্ত্রিত হয় দলের উচ্চারণগত বিশিষ্টতা ও মাত্রা-গণনা প্রণালীর দ্বারা । আর, ছন্দের রূপ (বা বহিরাকৃতি) নিয়ন্ত্রিত হয় উচ্চারিত ধ্বনির মাত্রা-সমাবেশের দ্বারা। এই মাত্রাসমাবেশেরই নামান্তর ছন্দোবন্ধ। আসলে উপপর্ব, পর্ব, পদ ও পঙ্‌ক্তি, বাংলা ছন্দের এই চার অঙ্গের মাত্রাসমাবেশজাত রূপের সমন্বয়কেই বলা হয় **ছন্দোরূপ** (metrical forms)। অতএব ছন্দোরূপের পরিচয় দিতে হলে উপপর্বরূপ, পর্বরূপ, পদরূপ ও পঙ্‌ক্তিরূপ, একে-একে এই চার অঙ্গরূপের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ছন্দের তিন রীতিভেদে উপপর্ব প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গের রূপে ও প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য দেখা দেয় তাও জানা দরকার।

বাংলা ছন্দের উক্ত চতুরঙ্গ রূপের পরিচয় দেবার পূর্বে উপপর্ব, পর্ব ও পদ এই তিন অঙ্গের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দেশ করা কর্তব্য।—

(১) পর্বগঠনে উপপর্বের আয়তন ও সংখ্যা সর্বত্র সমান থাকে না। প্রায়শঃ উপপর্বের আয়তনে ও সংখ্যায় অসমতা ঘটে। তাই ছন্দ-পরিচয়ের পক্ষে উপপর্বের উপরে নির্ভর করা চলে না। এই হিসাবে উপপর্বের গুরুত্ব বেশি নয়।

(২) পঙ্‌ক্তিগঠনে পদের আয়তনে ও সংখ্যায় যে সামান্য অসমতা দেখা যায় তাতে পঙ্‌ক্তিরূপের বৈচিত্র্যসাধনে যথেষ্ট সহায়তা হয়। এই হিসাবে ছন্দ-পরিচয়ের পক্ষে পদের আয়তন ও সংখ্যার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

(৩) কিন্তু পদ ও পঙ্‌ক্তি গঠনে পর্বের আয়তন, পদ ও পঙ্‌ক্তির অন্ত ছাড়া, অন্য সর্বত্রই সাধারণতঃ সমান থাকে। ফলে পর্বের রীতি ও রূপের বর্ণনাতেই ছন্দোরূপের আসল পরিচয় পাওয়া যায়। এই হিসাবে ছন্দ-পরিচয়ের পক্ষে পর্বের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি।

ছন্দ-রচনার রীতিভেদে পর্বের আয়তন ও প্রয়োগ-বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ তথ্য জেনে রাখা প্রয়োজন।—

(১) দলবৃত্ত রীতির ছন্দে দুই, তিন, চার, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব দেখা যায় বিভিন্ন কবির রচনায়। দুই ও তিন দলমাত্রার পর্ব প্রবর্তন করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। পাঁচ দলমাত্রার পর্ব দেখা যায় না কারও রচনাতেই। ছয় দলমাত্রার পর্ব পাওয়া যায় শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আলেখ্য’ কাব্যের (১৯০৭) কোনো-কোনো রচনায়। সাত দলমাত্রার পর্বের নিদর্শন আছে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কোনো-কোনো কবির রচনায়। কিন্তু তার সংখ্যা বেশি নয়। আসলে চার মাত্রার পর্বই দলবৃত্ত রীতির প্রধানতম বাহন বলে স্বীকৃত। সাত মাত্রার পর্ব বিরল হলেও উপেক্ষণীয় নয়।

(২) বাংলা ছন্দ রচনায় কলাবৃত্ত রীতি প্রবর্তিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' রচনার সময়ে (১৮৮৭-৯০)। আর, ওই সময় থেকেই চার, পাঁচ, ছয় ও সাত কলামাত্রার পর্ব বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচলিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সাত মাত্রার পর্ব প্রয়োগের নিদর্শন খুব বিরল। এই রীতিতে ছয় ও পাঁচ মাত্রার পর্বই প্রাধান্য পেয়েছে। চার মাত্রার পর্ব শুধু এই রীতিতেই যথোচিত মর্যাদা লাভ করতে পারেনি।

(৩) মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দেও এক কালে চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব প্রচলিত ছিল। তবে সেকালে চার ও ছয় মাত্রার পর্বই ছিল বাংলা কাব্যের প্রধান অবলম্বন। সাত মাত্রার পর্ব রচনার দৃষ্টান্ত সেকালের কাব্যে বেশি নেই। পাঁচ মাত্রার পর্ব ছিল বিরলতম। 'মানসী' কাব্যে নূতন কলাবৃত্ত রীতি প্রবর্তিত হবার ফলে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে পাঁচ ও সাত মাত্রার পর্ব অচল হয়ে যায়। 'মানসী'-পূর্ব কালে রবীন্দ্রকাব্যেরও প্রধান বাহন ছিল চার ও ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পর্ব। 'মানসী' কাব্য প্রকাশের পরে রবীন্দ্র-রচনা থেকে ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পর্ব ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে বাংলা সাহিত্যেই ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পর্ব অচল হয়ে গেল। এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' (১৯০২) কাব্যের কয়েকটিমাত্র কবিতায়। তাই বলা যায় বিংশ শতকের প্রায় প্রথম থেকেই মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে পূর্বতন চার বাহনের মধ্যে অবশিষ্ট থাকল শুধু চার মাত্রার পর্ব। ফলে বাংলা ছন্দের এই সুপ্রাচীন ও সুসমৃদ্ধ রীতির রাজ্যে এখন চতুর্মাত্রক পর্বেরই একাধিপত্য চলছে। এটা চতুর্মাত্রক পর্বের শক্তি ও সৌন্দর্যেরই পরিচায়ক।

(৪) কোনো রীতিতেই আট মাত্রার পর্ব স্বীকার্য নয়। তিন রীতিতেই লঘুযতিলোপের ফলে দুটি চতুর্মাত্রক পর্ব মাঝে-মাঝে একত্র জুড়ে যায়। এ-রকম আট মাত্রার জোড়া-পর্বের পরে স্বভাবতঃই থাকে একটি অর্ধযতি। তাই এ-রকম আট মাত্রার বিভাগকে 'পদ' বলাই যুক্তিসংগত, 'পর্ব' বলা যায় না কিছুতেই। এ-রকম লঘুযতিহীন জোড়া-পর্বকে বলা যায় '**অবিভক্ত পদ**' বা '**যুক্তপর্বক পদ**'। অনুরূপ ভাবে গঠিত চার-দুই মাত্রার জোড়া-পর্বকে বলা যায় 'অবিভক্ত বা যুক্তপর্বক অপূর্ণ পদ' । যথাস্থানে এই দু-রকম লঘুযতিহীন অবিভক্ত পদের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে।

উল্লিখিত বিবরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়—বাংলা ছন্দের তিন রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্বের প্রয়োগই সবচেয়ে বেশি, আর সবচেয়ে কম দলবৃত্ত রীতির দ্বিমাত্রক ও ত্রিমাত্রক পর্বের প্রয়োগ।—এবার বাংলা ছন্দের উপপর্বাদি চতুরঙ্গ রূপের কিছু পরিচয় দিচ্ছি একে একে।

উপপর্ব রূপ (sub-foot forms)

উপপর্ব গঠিত হয় দুই বা তিন মাত্রা নিয়ে। আর, প্রতি পর্বের অন্তর্গত উপপর্বের আয়তন ও সংখ্যা নির্ভর করে ছন্দোরীতিভেদে পর্বের মোট মাত্রাসংখ্যার উপরে। আয়তনভেদে উপপর্বের দুই রূপের দৃষ্টান্ত এই—

১। দ্বিমাত্রক উপপর্ব

জীবন : তরী। বহে : যেত ॥ মন্দা : ক্রান্তা। তালে
আমি : যদি। জন্ম : নিতেম ॥ কালি : দাসের। কালে।

—ক্ষণিকা, সেকাল

রীতি দলবৃত্ত। প্রতি পূর্ণপর্বে দুই উপপর্ব, অপূর্ণ পর্বে এক উপপর্ব। প্রতি উপপর্বে দুই দলমাত্রা।

২। ত্রিমাত্রক উপপর্ব

আজি কি : তোমার। মধুর : মূরতি ॥ হেরিনু : শারদ। প্রভাতে,

হে মাত : বঙ্গ। শ্যামল : অঙ্গ ॥ ঝলিছে : অমল। শোভাতে।

—কল্পনা, শরৎ

রীতি কলাবৃত্ত। প্রতি পূর্ণপর্বে দুই উপপর্ব, অপূর্ণ পর্বে এক উপপর্ব। প্রতি উপপর্বে তিন কলামাত্রা।

উপপর্বের অধিকতর পরিচয় দেওয়া যাবে প্রধানতঃ পর্বরূপের প্রসঙ্গে এবং অংশতঃ পদরূপের প্রসঙ্গে।

পর্বরূপ (foot forms)

পর্ব গঠিত হয় দুই বা তিন উপপর্ব নিয়ে। পর্বের রূপ সাধারণতঃ বর্ণিত হয় তার অন্তর্গত উপপর্বগুলির মোট মাত্রাসংখ্যা ধরে। এই মোট মাত্রাসংখ্যা ছন্দের রীতিভেদে দুই বা তিন উপপর্বে বিন্যস্ত হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্রমে। এই মোট মাত্রাসংখ্যা এবং বিন্যাসক্রম অনুসারে এখানে বাংলা পর্বরূপের কিছু পরিচয় দেওয়া গেল দৃষ্টান্ত সহ।

দ্বিমাত্রক পর্ব

দ্বিমাত্রক পর্ব দেখা যায় শুধু দলবৃত্ত রীতিতে। সহজেই বোঝা যায়, এ-রকম স্বল্পায়ত পর্বে কোনো উপপর্ব-বিভাগ থাকা সম্ভব নয়। যেমন—

মেঘ্লা। থম্থম্ ॥ সূর্য।-ইন্দু

ডুব্ল। বাদ্লায় ॥ দুল্ল। সিন্ধু।···

মৌন। নৃত্যে ॥ মগ্ন। খঞ্জন,

মেঘ্ স ।-মুদ্রে ॥ চলছে। মন্থন।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, ছন্দ-হিন্দোল

ইচ্ছা করলে এই রচনাটিকে চতুর্মাত্রক পর্বের ভঙ্গিতেও পড়া যায়। কিন্তু দ্বিমাত্রক পর্বের ভঙ্গিতে পড়াই কবির অভিপ্রেত ছিল বলে মনে হয়।

ত্রিমাত্রক পর্ব

ত্রিমাত্রক পর্বও শুধু দলবৃত্ত রীতিতেই দেখা যায়। এই ক্ষুদ্রায়ত পর্বকেও উপপর্বে বিভক্ত করা যায় না। যেমন—

তুহিনলীন। কোন্ মুনির ॥ ছিলাম কোন্। স্বপ্নেতে,

জন্ম মোর। কোন্ চোখের ॥ কটাক্ষের। সংকেতে।

কোন্ গিরির। হিম ললাট ॥ ঘাম্ল মোর। উদ্ভবে,

কোন্ পরীর। টুটল হার । কোন্ নাচের। উৎসবে।

—সত্যেনাথ, বিদায়-আরতি, ঝর্ণার গান

লক্ষণীয়—এই দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণপর্বে পাঁচ কলামাত্রা এবং অপূর্ণ পর্বে চার কলামাত্রার হিসাবও স্থির আছে। তাই কলাবৃত্ত রীতি অনুসারে এসব পর্বকে পঞ্চমাত্রক পর্ব বলেও গণ্য করা যায়।

চতুর্মাত্রক পর্ব

চতুর্মাত্রক পর্ব তিন রীতিতেই সাধারণতঃ দুটি সমায়তন উপপর্বে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ তিন রীতিতেই চার মাত্রার পর্বে দুটি করে দ্বিমাত্রক উপপর্ব থাকে। দৃষ্টান্ত—

ক. দলবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্ব

বাহুর : দম্ভ। রাহুর : মতো ॥ একটু : সময়। পেলে
নিত্য : কালের। সূর্য : কে সে ॥ এক গ : -রাসে। গেলে।
নিমেষ : পরেই। উগরে : দিয়ে ॥ মিলায় : ছায়ার ।মতো,
সূর্য : দেবের। গায়ে : কোথাও ॥ রয় না : কোনো। ক্ষত।

—পূরবী, চিঠি

খ. কলাবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্ব

দুন্ : দুভি ।বেজে : ওঠে ॥ ডিম : ডিম্। রবে,
সাঁও : তাল ।পল্ : লীতে ॥ উৎ : সব। হবে।…
ওই : শুনি। পথে : পথে ॥ হৈ : হৈ। ডাক,
বং : শীর। সুরে : তালে ॥ বাজে : ঢোল। ঢাক।
নন্ : দিত। কণ্ : ঠের ॥ হাস্ : স্যের। রোল
অম্ : বর ।তলে : দিল। উল্ : লাস ।দোল।

—চিত্রবিচিত্র, উৎসব

গ: মিশ্রবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্ব

সাধু : মহা ।রেগে : বলে, ॥ যৌব : নের। পাতে
এত : পুণ্য। কেন : লেখ ॥ দেব :-পূজা। খাতে।
চিত্র : গুপ্ত। হেসে : বলে, ॥ বড় : শক্ত। বুঝা—
যারে : বলে। ভালো : বাসা, ॥ তারে : বলে। পূজা।

—চৈতালি, পুণ্যের হিসাব

এই চতুর্মাত্রক পর্বই বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ বাহন। উপরের তিন দৃষ্টান্তে দেখানো হল এই চতুর্মাত্রক পর্বের আদর্শরূপ বা মূলরূপ। কিন্তু কবিপ্রয়োগে তিন রীতির চতুর্মাত্রক পর্বেই মাঝে-মাঝে **উপযতি লোপ** ঘটে। তাতে ছন্দের ধ্বনিগতিতে কিছু বৈচিত্র দেখা যায়, অর্থাৎ ছন্দের একঘেয়েমি ঘোচাবার কিছু সহায়তা হয়। যেমন—

ক. দলবৃত্ত পর্বে উপযতি-লোপ

এই যে : নেশা। লাগল : চোখে ॥ এই টু   কু যেই । ছোটে,
অমনি : যেন। সময় : আমার ॥ বাকি : না রয়। মোটে।
জ্ঞানের : চক্ষু। স্বর্গে : গিয়ে। যায় য   দি যাক। খুলি,
মর্তে : যেন। না ভে   ঙে যায় । মিথ্যে : মায়া। গুলি।

—ক্ষণিকা, শেষ

খ. কলাবৃত্ত পর্বে উপযতি-লোপ ।

হিল্ : লোলে। হেথা : দোলে ॥ লাব   ণ্ ণ্য। পান্ : নার,
বিভূ : তির। বিভা : ছায় ॥ সারা : গায়। হোথা : কার।···
অপ : রূপ। অপ : রূপ ॥ আন   ন্দ। -মল্লী,
অপরা : জিতার : হারে ॥ পারি : জাত।-বল্লী।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, যুক্তবেণী

গ. মিশ্রবৃত্ত পর্বে উপযতি-লোপ

দুর্ল   ভ্ এ। ধর : ণীর ॥ লেশ : তম। স্থান,
দুর্ল   ভ্ এ। জগ : তের ॥ ব্যর্থ : তম। প্রাণ।
যা পা   ই্ নি। তাও : থাক্, ॥ যা পে   য়েছি। তাও,
তুচ্ছ : বলে। যা চা   ই্ নি, ॥ তাই : মোরে। দাও।

—চৈতালি, দুর্লভ জন্ম

আমি : কহি। ছাড় : স্বার্থ, ॥ মুক্তি : পথ। দেখ্;
প্রেম : কহে,। তা হ   লে তো ॥ তুমি : আমি। এক।

—কণিকা, অনুরাগ ও বৈরাগ্য

সত্য : মূল্য। না দি   য়েই ॥ সাহি : ত্যের। খ্যাতি : করা। চুরি
ভালো : নয়,। ভালো : নয়। নক ○ ল্ সে॥ শৌখি ○ ন মজ্। দুরি।

— জন্মদিনে-১০, ‘বিপুলা এ পৃথিবীর’

এই তিন রীতির পাঁচটি দৃষ্টান্তের আবৃত্তিকালে মোট চোদ্দটি পর্বের মধ্যবর্তী উপযতি লুপ্ত হয় অর্থাৎ আমাদের উচ্চারণে অব্যক্ত থাকে। ফলে এই পর্বগুলি অখণ্ড বা অবিভক্তরূপেই উচ্চারিত হয়। এই চোদ্দটি পর্বের মধ্যে ছয়টি পর্বে লুপ্ত-উপযতির অবস্থান দেখানো হয়েছে দুটি করে মুক্তদলের (টু ○ কু, য ○ দি, ভে ○ ঙে, পে ○ য়ে, হ ○ লে, দি ○ য়ে) মধ্যে লোপচিহ্ন দিয়ে। ইচ্ছা করলে এই পর্বগুলিকে কৃত্রিম উচ্চারণের দ্বারা এই টু : কু যেই, যায় য : দি যাক ইত্যাদি রূপে উপযতি দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। বাকি আট পর্বে লুপ্ত উপযতির অবস্থান দেখানো হয়েছে এক-একটি রুদ্ধদলের (ব ○ ণ্, ন ○ ন্, ল ○ ভ্, ল ○ ভ্, পা ○ ই্, চা ○ ই্, ক ○ ল্, খি ○ ন্) মধ্যে একটি শূন্য (○) বসিয়ে। এ-রকম পর্বকে কৃত্রিম উচ্চারণেও বিভক্ত করা যায় না। মোট কথা, উপযতিহীন অবিভক্ত পর্বেরও দুই রূপ—**বিভাজ্য ও অবিভাজ্য**।

দলবৃত্ত রীতিতে রুদ্ধদল এক মাত্রা হিসাবেই গণ্য হয়। তাই রুদ্ধদলের মধ্যে লুপ্ত উপযতি থাকা সম্ভব নয়। এইজন্যেই দলবৃত্ত রীতিতে শুধু বিভাজ্য অবিভক্ত পর্বই দেখা যায়, অবিভাজ্য পর্ব গঠিত হবার কোনো অবকাশই থাকে না।

বাংলা কাব্যে চতুর্মাত্রক কলাবৃত্ত পর্বের রচনা অপেক্ষাকৃত কম। তাই এই রীতিতে অবিভক্ত বা অবিভাজ্য চতুর্মাত্রক পর্বের দৃষ্টান্ত বেশি দেখা যায় না। উপরের কলাবৃত্ত দৃষ্টান্তের উপযতিহীন দুটি পর্বই (লাবণ্য, আনন্দ) অবিভাজ্য। উপযতিহীন বিভাজ্য পর্ব রচনাও কঠিন নয়। যেমন—

> 'কি কথা যে'। প্রাণে মোর ॥ 'সে যদি তা'। জান্‌ত,
>
> 'অসিক্ত' । 'রইত না' ॥ তারও আঁখি ।-প্রান্ত।

'অসিক্ত', এই পর্বটি শুধু অবিভক্ত নয়, অবিভাজ্যও বটে। কিন্তু 'কি কথা যে', 'সে যদি তা' এবং 'রইত না' এই তিন পর্ব অবিভক্ত, অথচ বিভাজ্য।

চতুর্দল পর্বে মাত্রাবিন্যাস

দলবৃত্ত রীতিতে চতুর্মাত্রক পর্ব রচনায় কবিদের অনুসৃত দলবিন্যাস-প্রণালী এই।—

(১) প্রতি পর্বে সাধারণতঃ একটি বা দুটি রুদ্ধদল থাকে।

(২) কোনো পর্বে একটিমাত্র রুদ্ধদল থাকলে সেটি পর্বের যে-কোনো স্থানে বিন্যস্ত হতে পারে।

(৩) দুই রুদ্ধদল প্রায়শঃ পর্বের প্রথম-চতুর্থ বা দ্বিতীয়-চতুর্থ মাত্রা রূপে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু অন্য যে-কোনো রকম বিন্যাসেও কোনো বাধা নেই।

(৪) রুদ্ধদলহীন পর্ব, চার মুক্তদল দিয়ে গড়া পর্বও মাঝে-মাঝে দেখা যায়। কিন্তু খুব বেশি নয়। কারণ এ-রকম নিস্তরঙ্গ পর্বের ঘন-ঘন প্রয়োগে ছন্দ দুর্বল হয় এবং তার গতিসৌন্দর্য ব্যাহত হয়। এই নিয়মটিকে উল্লিখিত প্রথম নিয়মের উপবিধি বলে গণ্য করা যায়, ব্যতিক্রম বলে নয়।

(৫) চতুর্দল পর্ব রচনায় তিন রুদ্ধদলের প্রয়োগ, এমন কি চার রুদ্ধদলের প্রয়োগও দেখা যায়। তবে এ-রকম প্রয়োগের দৃষ্টান্ত খুবই কম। ভাবপ্রকাশের বিশেষ প্রয়োজনে এ-রকম পর্ব রচনায় কবিরা দ্বিধাবোধ করেন না। যেমন—

> 'গঙ্গাপ্রাপ্তির' আশা করে গঙ্গাযাত্রা করেছিলাম,
>
> তোমাদের না বলে কয়ে আস্তে আস্তে সরেছিলেন।

—কড়ি ও কোমল, পত্র

> সূর্য গেল অস্ত পারে, লাগল গ্রামের ঘাটে
>
> আমার জীর্ণ তরী,
>
> 'শেষ বসন্তের' সন্ধ্যা-হাওয়া শস্যশূন্য মাঠে
>
> উঠল হা হা করি।

—ক্ষণিকা, পরামর্শ

তোমরা যাদের বাক্য হয় না আমার পক্ষে মুখরোচক,
তোমরা যদি পুনর্জন্মে ‘হও পুনর্বার’ সমালোচক···

—ক্ষণিকা, কর্মফল

হায় কি হলো, ‘বঙ্গদর্শন’ বঙ্কিম দেছে ছেড়ে,
হায় কি হলো, দেশটা গেল সাপ্তাহিকে জুড়ে।

—হেমচন্দ্র, বিবিধ-কবিতায়; ‘হায় কি হলো’

সেথা পুঁটি মাছে বিয়োয় নাকো টিয়ে পাখির ছা,
আর ‘চতুষ্পদ সব’ জন্তুগুলোর চারটে-চারটে পা।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান, বিলেত

‘সত্যের চাইতে’ মিথ্যা বেশি, ‘ধর্মের চাইতে’ তন্ত্র,
‘ভক্তির চাইতে’ কীর্তন বেশি, পূজার চাইতে মন্ত্র।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান, সংসার

সে যদি তোর থাকত, খানিক
‘আব্‌দার কর্‌তিস্‌’ শোবার আগে,
দাবি করতিস চুমা।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, মাতৃহারা (ষষ্ঠ চিত্র)

অনেক বাক্য হানাহানি
‘গর্জন-বর্ষণ’ অনেকখানি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, বিবাহযাত্রী (৭ম চিত্র)

সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাকবে কি?
রোগের ঋণের শেষ রাখ না, ‘কলঙ্কের শেষ’ রাখবে কি?

—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, মৃত-স্বয়ম্বর

আমরা রাঁধব, আমরা বাড়্‌ব, আমরা খাব পায়েস,
‘চব্বিশ ঘণ্টার’ চৌদ্দ ঘণ্টা ঘুমিয়ে করব আয়েস।

—সত্যেন্দ্রনাথ ধূপের ধোঁয়ায়, প্রথম অঙ্ক (১ দৃশ্য)

চতুর্দল পর্বে তিনটি বা চারটি রুদ্ধদল থাকলে আমাদের উচ্চারণে স্বতঃই একটু বেশি ধ্বনিসংকোচ ঘটে, আর তাতেই অন্যান্য লঘুভার পর্বের সঙ্গে, এমন কি চর্তুলঘু পর্বের সঙ্গেও এসব গুরুভার পর্বের সমতা রক্ষিত হয়। এটা সম্ভব হয় বাংলা ভাষা ও উচ্চারণের স্বাভাবিক নমনীয়তাগুণে। এই নমনীয়তাগুণের প্রকাশ বেশি দেখা যায় দলবৃত্ত রীতির ছন্দে। এই নমনীয়তাগুণের সুযোগ নিয়ে বিশেষ ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে চতুর্দল পর্বের আসনে পাঁচ দলও বসানো যায়। যেমন,

তবে কিনা, দেশটা বিলেত, আর জাতটা বিলিতি,
কাজেই একটু ‘সাহেবী রকম’ তাদের রীতি-নীতি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান, বিলেত

নিত্যানন্দ, বিদ্বান্ বলে করতে চায় সে প্রমাণ,
করতে এল তর্ক সেদিন আমার সঙ্গে সমান।
আমি বললাম—'তবে রে বেটা', আয় না দেখি 'তবে রে বেটা',
আমি একটা philosopher, গাধা শুয়র, জানিস্ সেটা?

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান, বেশ করেছো

'ঘুঘু দেখেছ', ফাঁদ দেখ নি,
টেরটা পাবে আজ এখনি।

—সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল, নারদ-নারদ

সাহেবী-রকম, তবে রে বেটা, ঘুঘু দেখেছ প্রভৃতি পাঁচ দলের বুলি আমাদের মুখে স্বতঃই একটু দ্রুত উচ্চারিত হয়। তারই ফলে পাঁচ দলের পূর্ব চতুর্দল পর্বের সমতা লাভ করে, অর্থাৎ চতুর্দল পর্বের আসনেই পাঁচ দলের স্থান-সংকুলান হয়ে যায়। দলবৃত্ত রীতির ছন্দ আমাদের নিত্যকথিত বুলি ও বাচনভঙ্গির অনুবর্তী। এই বাচনভঙ্গি অনুসরণের ফলেই এসব বিশেষ ক্ষেত্রে চতুর্দল পর্বের পঙ্ক্তিতে পাঁচ দলের প্রয়োগ বেমানান হয় নি। মনে রাখতে হবে এগুলি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র, এবং অত্যন্ত দুর্লভ ব্যতিক্রম। চতুর্দল পর্বের পঙ্ক্তিতে যেখানে-সেখানে যথেচ্ছভাবে পাঁচ দলের পর্ব বসালে আমাদের অভ্যস্ত শ্রুতিরুচি পীড়িত হয়, অর্থাৎ কানে খটকা লাগে। যেমন—

পুরুষরা সব শুনছে বসে, 'মেয়েরা আসর' জমকাচ্ছে,
গাচ্ছে এমন তালকানা যে, 'শুনে তা পীলে' চমকাচ্ছে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান, হ'ল কি

এবার বলি চতুর্দল পর্বে দলসংখ্যাগত অন্যরকম ব্যতিক্রমের কথা।—

(১) দলবৃত্ত রীতির রচনায় যদি তিনটি রুদ্ধদল একত্র থাকে তবে ওই তিন দলেই এক পর্ব হয়। অর্থাৎ তিন রুদ্ধদলই সাধারণ চতুর্দল পর্বের কাজ করে। যেমন,

চোদ্দ বছর। ক'দিনে হয় ॥ জানি নে মা । ঠিক,
'দণ্ডক বন'। আছে কোথায় ॥ এই মাঠে কোন্ দিক্।
কিন্তু আমি। পারি যেতে ॥ ভয় করি নে। তাতে,
'লক্ষ্মণ ভাই'। যদি আমার ॥ থাকত সাথে। সাথে···
আমাকে মা। শিখিয়ে দিবি ॥ 'রাম-যাত্রার'। গান,
মাথায় বেঁধে । দিবি চূড়ো, ॥ হাতে ধনুক।-বাণ।

—শিশু, বনবাস

এখানে তিনটি ত্রিদল পর্ব (দণ্ডক বন, লক্ষ্মণ ভাই, রাম যাত্রার) কিভাবে অন্যসব চতুর্দল পর্বের সঙ্গে সমতা বজায় রেখেছে সেটুকুই লক্ষণীয়। —অনেক সময় প্রথমে দুটি রুদ্ধদল এবং তার পরে একটি মুক্তদল দিয়েও

চতুর্দল পর্বে কাজ চালানো হয়। যেমন,

'বর-কন্যা'। যেন ছবির। মতো
আঁচলবাঁধা। দাঁড়িয়ে আঁখি। -নত।···
যুদ্ধ বাধে। বিদ্রোহীদের। সনে,
'রামসিংহ। রানা চলেন। রণে।

—কথা, বিবাহ

'কোন্ স্বর্গে। নিয়ে গেল ॥ বরমাল্যের। থাল,
হায় রে কবে। কেটে গেছে ॥ কালিদাসের। কাল।···
তাঁহার কালের। 'স্বাদগন্ধ'
আমি তো পাই। মৃদুমন্দ,
আমার কালের। কণামাত্র ॥ পান নি মহা।-কবি।

—ক্ষণিকা, সেকাল

এই দুই দৃষ্টান্তে মোট চারটি ত্রিদল পর্বের তৃতীয় দলটি লঘু। কিন্তু তাতেও চতুর্দল পর্বের সঙ্গে এগুলির ভারসাম্য ব্যাহত হয় নি। 'স্বাদগন্ধ' ও 'মৃদুমন্দ', এই দুই পর্বের দলসংখ্যায় পার্থক্য আছে। তা সত্ত্বেও আমাদের কানে এই দুই পর্বের মধ্যে কিছুমাত্র ধ্বনিবৈষম্য অনুভূত হয় না, এটুকু বিশেষভাবে লক্ষ করার যোগ্য।

মোট কথা, চতুর্দল পর্বের রচনায় এই দু-রকম ত্রিদল পর্বের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তাই এ-রকম প্রয়োগকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম না বলে উপবিধি বলাই উচিত মনে করি। ত্রিদল পর্বের আরও দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

'বাপ বললেন', কঠিন হেসে—"তোমরা মায়ে ঝিয়ে
'এক লগ্নেই' বিয়ে কোরো আমার মরার পরে।"···
'মা বললেন'—"উঃ কী কঠিন প্রাণ,
স্নেহমায়া কিছু কি নেই ঘটে।"

—পলাতকা, নিষ্কৃতি

এই দৃষ্টান্তের তিনটি ত্রিদল পর্বের মধ্যে তৃতীয়টির প্রথমেই আছে একটি মুক্তদল। তবু অন্য দুটির সঙ্গে এটির ধ্বনিগত সাম্য বজায় আছে। তার কারণ পর্বের আদিস্থিত মা, না, কি প্রভৃতি একক মুক্তদল শব্দ স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হলে আমাদের মুখে সেটি স্বতঃই প্রস্বরিত হয়ে রুদ্ধদলের সমান গুরুত্ব লাভ করে। একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে আমাদের উচ্চারণে 'মা' শব্দের উপরে একটা বিশেষ ঝোঁক পড়ে, আর তাতেই 'মা' শব্দ 'বাপ' শব্দের সমান গুরুত্ব পায়। অতএব 'মা বললেন' পর্বেও তিন রুদ্ধদল গণনা করতে হবে। কিন্তু

মা কেঁদে কয়, "মঞ্জুলী মোর ওই তো কচি মেয়ে···" (নিষ্কৃতি) এ-রকম চতুর্দল পর্বে 'মা' শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় না। তার উপরে কোনো বিশেষ ঝোঁকও পড়ে না। তাই এসব স্থলে 'মা' প্রভৃতি

একক মুক্তদল শব্দ রুদ্ধদলের মর্যাদা পায় না। এবার অন্যরকম একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

গ্রহবিপ্র 'আশীর্বাদ' করি
'ধানদূর্বা' দিল তাহার মাথে।

—কথা, বিবাহ

'ধানদূর্বা, এই ত্রিদল পর্বের প্রথম দুই দল রুদ্ধ, তৃতীয়টি মুক্ত। তাই এই ত্রিদল পর্বটি পূর্বোক্ত উপবিধি অনুসারেই সাধারণ চতুর্দল পর্বের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু 'আশীর্বাদ' পর্বের প্রথম দলটি মুক্ত, শেষ দুটি রুদ্ধ। তবু এই আদি লঘু ত্রিদল পর্বটি চতুর্দলের মর্যাদা পেয়েছে। কারণ এ ক্ষেত্রে শব্দের অন্তিম রুদ্ধদলটি স্বতঃই একটু বিশ্লিষ্ট হয়ে দুই মুক্তদলের স্থান অধিকার করে। এ-রকম ব্যতিক্রমের আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন—

১। 'ফুলের বার' 'নাই কো আর', 'ফসল যার' ফলল না,
'চোখের জল ফেলতে হাসি পায়—
দিনের আলো যার ফুরাল, সাঁঝোর আলো জ্বলল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।

—খেয়া, শেষ খেয়া

২। যেমন করে মাতা বারংবার
শিশু ছেলের সহস্র আবদার
হেসে সকল বহন করেন 'স্নেহের কৌ'-তুকে,
তেমনি করেই সুপ্রসন্ন মুখে
মঞ্জুলী তার বাপের নালিশ দণ্ডে দণ্ডে শোনে,
হাসে আপন মনে।

—পলাতক, নিস্কৃতি

পূর্বোক্ত 'আশীর্বাদ' এবং 'ফুলের বার' প্রভৃতি চারটি পর্বের মতো 'স্নেহের কৌ' পর্বের শেষ দল 'কৌ'-কেই দ্বিমাত্রক বলে গণ্য করা সমীচীন। তবে 'স্নেহের কৌ' অখণ্ড শব্দ নয় বলে 'হের' দলকে দ্বিমাত্রক বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু ছন্দের গতিভঙ্গির প্রতি লক্ষ রাখলে বোঝা যাবে 'কৌ' দলই দ্বিমাত্রক, 'হের' দল নয়।

এ-রকম আদিলঘু ত্রিদল পর্বের আরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি রবীন্দ্রপূর্ব কালের রচনা থেকে।—

হাসিও পায় কান্না ধরে,
'এবার ভাই' অনেক ঘরে
বৌ-শাশুড়ী ননদ-ভেজের
চুকলি-করা গেল উঠে।

—ঈশ্বর গুপ্ত, গ্রন্থাবলী (বসু.) পৌষড়ার গীত

একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে, ‘এবার ভাই’ পর্বের শেষ দলটিই দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়। যা হক, দলবৃত্ত রীতিতে এ-রকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত খুবই দুর্লভ।

এবার মধ্যলঘু ত্রিদল পর্বের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

বন্ধুজনে বন্ধ করে প্রাণ,
‘দীর্ঘদিন’ ‘সঙ্গীহীন’ একা,
হঠাৎ পড়ে ঋণশোধেরই পালা
ঋণীজনের না যায় পাওয়া দেখা।

—ক্ষণিকা, যথাসময়

এখানেও ‘দীর্ঘদিন’ ও ‘সঙ্গীহীন’ শব্দের তৃতীয় রুদ্ধদলটি স্বতঃই দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়ে চতুর্মাত্রক পর্বের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে। আরও লক্ষণীয় প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম পদের অন্তস্থিত ‘প্রাণ’ রুদ্ধদলটিও স্বতঃই দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়ে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ‘পালা’ শব্দের সঙ্গে সমতা রক্ষা করছে। এখানে পরবর্তী অর্ধযতিটি ‘প্রাণ’ রুদ্ধদলটির দীর্ঘতালাভের সহায়ক হয়েছে। অনেক সময় পূর্ণযতি ও অর্ধযতির পূর্বে (বিশেষ ক্ষেত্রে লঘুযতির পূর্বেও) এক **মাত্রার ফাঁক** রাখা যায়। এ-রকম ফাঁকের মাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন **যতির মাত্রা**।

সবশেষে দিচ্ছি মধ্যগুরু ত্রিদল পর্বের দুটি দৃষ্টান্ত।—

১। চেয়ে আছে নিমেষহারা ॥ ‘নয়ন অ ⁝ রুণ’
হাজার লোকের মেলাটিরে ॥ ‘করেছে ক ⁝ রুণ’।

—ক্ষণিকা, সুখদুঃখ

২। ও পারেতে ধানের খোলা, ॥ এই পারেতে হাট,
মাঝে শীর্ণ নদী—
সন্ধ্যাসকাল করবি শুধু ॥ ‘এ-ঘাট ও : ঘাট’,
ইচ্ছা করিস যদি।

—ক্ষণিকা, পরামর্শ

এই দুই দৃষ্টান্তের ‘নয়ন অরুণ’, ‘করেছে করুণ’ এবং ‘এ-ঘাট ও-ঘাট’, এই তিনটি অপূর্ণ পদে একটি করে লঘুযতি লুপ্ত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ‘করেছে ক’ পর্বে আছে চারটি মুক্তদল। এ-রকম পর্ব ব্যতিক্রম বলে গণ্য নয়। পক্ষান্তরে ‘নয়ন্ অ’ এবং ‘এ-ঘাট্ ও’, এ-রকম মধ্যগুরু ত্রিদল পর্ব যথার্থ ব্যতিক্রম বলেই স্বীকার্য। কারণ দলবৃত্ত রীতির ছন্দে এ-রকম ত্রিদল পর্বের শেষ মুক্তদল বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের সুযোগ (অর্থাৎ লঘুযতির সহায়তা) পায় না। তাই কানের সমর্থনও পায় না। কিন্তু মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ‘নয়ন অরুণ’ এবং ‘এ-ঘাট ও-ঘাট’ খুবই স্বাভাবিক। কেননা ও-রীতিতে শব্দান্ত্য রুদ্ধদল স্বতঃই বিশিষ্ট (দ্বিমাত্রক) রূপে উচ্চারিত হয়। তাই এই দুই দৃষ্টান্তে ‘নয়ন অরুণ’ এবং ‘এ-ঘাট ও-ঘাট’, এই দুটি পদকে মিশ্রবৃত্ত ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে ছন্দের মর্যাদা রক্ষা করতে হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে বাংলা ভাষার উচ্চারণগত নমনীয়তাগুণের প্রকাশ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় দলবৃত্ত রীতির ছন্দে। এই নমনীয়তার আর-একটু পরিচয়। দিচ্ছি।—

আমি যদি। জন্ম নিতেম ॥ কালিদাসের। কালে,
দৈবে হতেম। দশম রত্ন ॥ নবরত্নের। মালে,…

—ক্ষণিকা, সেকাল

দেখা যাচ্ছে, এর কোনো পর্বে রুদ্ধদল একটিও নেই, কোথাও আছে একটি, কোথাও দুটি। তাছাড়া রুদ্ধদলের অবস্থানেরও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ-রকম অসমতা এবং অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও পর্বগুলির ছন্দোগত সমতা বজায় আছে। এটা সম্ভব হয় বাংলা ভাষার উক্ত নমনীয়তাগুণে। যদি লেখা হত

দৈবে হতেম। দশম রত্ন ॥ 'নয় রত্নের'। মালে

তা হলেও ছন্দ অটুট থাকত। তাতেই বোঝা যায়, আমাদের উচ্চারণের গুণে 'নবরত্নের' ও 'নয় রত্নের' এই দুই পর্বের মধ্যে সমতা থেকে যায় আমাদের অজ্ঞাতসারেই। এমন কি,

দৈবে হতেম। 'এক রত্ন' ॥ নয় রত্নের। মালে

এ-রকম লিখলেও, অর্থাৎ 'দশম রত্ন-কে 'এক রত্ন' করলেও ছন্দের তালভঙ্গ হত না। বোঝা গেল উক্ত নমনীয়তাগুণের পরিসরও নেহাত কম নয়।

দলবৃত্ত রীতিতে উচ্চারণগত নমনীয়তার প্রকাশ যেমন বেশি, বাংলা বাচনভঙ্গির প্রতিফলনও তেমনি বেশি। এই বাচনভঙ্গির প্রভাবেই পূর্বোক্ত 'সাহেবি রকম', 'তবে রে বেটা' ও 'ঘুঘু দেখেছ', এসব পাঁচ দলের পর্ব চতুর্দল পর্বের পঙ্‌ক্তিতে নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছে। আবার কখনও-কখনও এই বাচন ভঙ্গি প্রকাশের প্রয়োজনে এক দলের দ্বারাই দুই দলের কাজ চালানো হয়। ফলে সেসব স্থলে তিন দলেই এক পর্ব হয়। যেমন,

১. যদি খোকা না- ! হয়ে
আমি হতেম কুকুর। -ছানা,
তবে পাছে তোমার। পাতে
আমি মুখ দিতে যাই। ভাতে
তুমি করতে আমায়। মানা?

—শিশু, সমব্যথী

২. না- জানে। নাচতে, ॥ না- জানে। গাইতে,
না- জানে। শৌখিন রকম ॥ চক্ষু তুলে। চাইতে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান, জানে না

৩. মেঘের উপর। মেঘ করেছে ॥ রঙের উপর। রঙ,
মন্দিরেতে। কাসর-ঘন্টা ॥ বাজল **ঠ-ঙ্**। ঠঙ্।

—কড়ি ও কোমল, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপর

৪. 'তোমরা এসো। তারি নিমন্।-ত্রণে
যে যে আছ। মর্তিয়া রাজ।-পুত।'
'**জ-য়** রাণা। **রা-ম** সিঙের। জয়',
গর্জি উঠে। মাড়োয়ারের। দূত।

—কথা, বিবাহ

৫. **ফি-ক্** করে। নিত্যানন্দ ॥ হেসে ফেললেন। আবার।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আষাঢ়ে, নিত্যানন্দের উপাখ্যান

৬. "তুমি থাকবে। আমার বলে ॥ অদ্য এবং পরে নিত্য,
মনে থাকে। যেন, সুরা, ॥ তুমি আমার। বাঁধা ভৃত্য;
সর্প নিয়ে। খেলার মত ॥ আমি তোমায়। নিয়ে খেলি"—
এই কথাটি। বলে তারে ॥ **ঢ-ক্** করে। গিলে ফেলি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, মদ্যপ

৭. 'চুড়ি **চা-ই**। চুড়ি চাই' সে। হাঁকে,
চীনের পুতুল। ঝুড়িতে তার। থাকে।

—শিশু, বিচিত্র সাধ

লক্ষিতব্য—(১) প্রথম দুই দৃষ্টান্তে 'না' এই মুক্ত স্বরান্ত একদল শব্দটি বিশেষ বাচনভঙ্গির ফলে কয়েক স্থানে পরবর্তী শব্দ থেকে বিযুক্ত ভাবে উচ্চারিত ও প্রস্বরিত হয়ে দুই দলমাত্রার মর্যাদা পেয়েছে; (২) তার পরবর্তী চার দৃষ্টান্তে পাঁচটি হসন্ত একদল শব্দও (ঠে-ঙ, জ-য়, রা-ম, ফি-ক, ঢ-ক) অনুরূপভাবে দুই দলমাত্রার, মূল্য পেয়েছে; (৩) সপ্তম দৃষ্টান্তে দ্বিতীয় 'চাই' পরবর্তী 'সে' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট রূপে উচ্চারিত হয়, কিন্তু প্রথম 'চাই' উচ্চারিত হয় বিযুক্ত ও বিশ্লিষ্ট রূপে, তাই দ্বিতীয় 'চাই' একমাত্রক ও প্রথম 'চাই' দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়েছে।

ঠিক এই প্রণালীতেই অন্যরকম ভাব প্রকাশের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

তুমি ডাক,। "দাঁড়াও পথে,
সূর্য আসেন। স্বর্ণরথে,
রাত্রি ন-য়,। রাত্রি ন-য়,॥ রাত্রি ন-য়,। নয়।"
এত আঁধার। মাঝে তোমার ॥ এতই অসং।-শয়।

—উৎসর্গ-১, 'ভোরের পাখি ডাকে কোথায়'

এখানে সুদৃঢ় অসংশয় প্রকাশিত হয়েছে 'রাত্রি নয়' কথার পুনরুক্তিতে এবং 'নয়' দলের দ্বিমাত্রক উচ্চারণে। সেজন্যই তিন দলের দ্বারা চার দলমাত্রার কাজ চালানো গেছে। এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত মধ্যলঘু ত্রিদল পর্বের দৃষ্টান্তটিও স্মরণীয়।

শুধু তাই নয়, ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে উচ্চারণবিস্তারের সাহায্যে অবস্থাবিশেষে দুই দলের দ্বারাও চার দলমাত্রার কাজ চালানো যায়। যেমন,

আজকে এমন। বিজন রাতে ॥ আর কারে কি। চাই?
সে কহিল, । ভাই,
না-ই, না-ই। নাই গো আমার ॥ কারেও কাজ। নাই।

—ক্ষণিকা, কূলে

পূর্বোদ্ধৃত সপ্তম দৃষ্টান্তের দুই ‘চাই’ শব্দের এবং এই দৃষ্টান্তের তিন ‘নাই’ শব্দের প্রয়োগগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এ-রকম আরও দুটি দৃষ্টান্ত এই।—

বাইরে কেবল। জলের শব্দ ॥ ঝু-প্ ঝু-প্। ঝুপ্,
দস্যি ছেলে। গল্প শোনে ॥ একেবারে। চুপ।

—কড়ি ও কোমল, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

‘সারিয়ে দেবে। বলেছিলে, ॥ ‘দাও এঁটে ইস্ ।-স্ক্রুপ।’
অমি বললে। কানে কানে, ॥ ‘চু-প্ চু-প্। চুপ্।’

—পরিশেষ, নূতন শ্রোতা

চতুর্দল পর্বের ছন্দেই বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক নমনীয়তা ও ভঙ্গিবৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয় সবচেয়ে বেশি। তাই এই বিষয়টা কিছু সবিস্তারে আলোচিত হল।

চতুষ্কল পর্বে মাত্রাবিন্যাস

অমিশ্র বা মিশ্র কোনো প্রকার কলাবৃত্ত রীতিই বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণভঙ্গির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই এই দুই রীতির ছন্দে আমাদের উচ্চারণবৈচিত্রের বা অনুকরণজাত ধ্বনিবৈচিত্র্যের প্রতিফলন বেশি দেখা যায় না। ফলে এই দুই রীতির ছন্দে পর্বের মাত্রাবিন্যাসেও বেশি হেরফের হয় না। যা হয়, তার গুরুত্বও বেশি নয়। তবু দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১. অমিশ্র চতুষ্কল পর্বে।

চরকার। ঘর্ঘর ॥ পড়শীর। ঘর-ঘর,
ঘর-ঘর। ক্ষীর-সর, ॥ আপনায়। নির্ভর।
পড়শীর। কণ্ঠে- ॥ জাগল- । সা-ড়া-,
দাঁ-ড়া- । আপ্নার ॥ পা-য়ে- । দাঁ-ড়া-।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বিদায়-আরতি, চরকা

প্রথম দুই পঙ্ক্তিতে চরকার চলার ধ্বনি এবং শেষ দুই পঙ্ক্তিতে চরকার থামার ধ্বনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা সুস্পষ্ট। প্রথম দুই পঙ্ক্তিতে রুদ্ধ দলের ঘনঘন পদপাতে শোনা যাচ্ছে চলন্ত চরকার দ্রুত শব্দ, আর শেষ দুই

পঙ্‌ক্তিতে মুক্তদলগুলির দীর্ঘ পদক্ষেপে শোনা যাচ্ছে ক্রমে-থেমে-যাওয়া চরকার ক্ষীয়মাণ মন্থর শব্দ। মুক্তদলের দ্বিমাত্রক প্রয়োগেই প্রকাশ পেয়েছে এই রচনার গত অভিনবত্ব।

২. মিশ্র চতুষ্কল পর্ব

এ যে বাজী, টাকা-বাজী, বাজী বড় জোর।
বা-জী, কি বাজী হুয়া, বাজী হুয়া ভোর॥
দেখিয়া অবাক্ হয়ে সকলেই আছে।
কোথায় দিল্লীর লাড়ু এ বাজীর কাছে?

—ঈশ্বর গুপ্ত, গ্রন্থাবলী, বাজী

'বা-জী, শব্দে বাহবা-সূচক মনোভাব ও উচ্চারণভাঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে 'বা'-দলের দীর্ঘতার দ্বারা। এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পঞ্চমাত্রক পর্ব

দলবৃত্ত রীতিতে পঞ্চমাত্রক পর্বের প্রয়োগ নেই। অধুনাপূর্ব কালের মিশ্র কলাবৃত্ত রচনায় পঞ্চমাত্রক পর্ব প্রয়োগের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু সেসব রচনা শিল্পগুণে যেমন অকিঞ্চিৎকর, পরিমাণেও তেমনি উপেক্ষণীয়। পঞ্চমাত্রক পর্ব রবীন্দ্রনাথের হাতে মিশ্র কলাবৃত্ত রীতি থেকে রূপান্তরিত হয়েছে অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে। শুধু রূপান্তরিত নয়, পঞ্চমাত্রক পর্ব তাঁর হাতেই অসামান্য শক্তি ও সৌন্দর্যলাভ করেছে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকেও তা বোঝা যাবে।—

১. মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে পঞ্চমাত্রক পর্ব

আমি হে সতী। নব যুবতী,
আয়ান পতি! দুর্জন আতি।···
'পাপ আয়ানে'। শুনিলে কানে,
গঞ্জনা-বাণে। বধিবে প্রাণে।···
বংশীর ধ্বনি। যেন হে ফণী,
'আমি রমণী'। প্রমাদ গণি।
নিদয় বাঁশী। হৃদয়-ফাঁসি।
'করে উদাসী',। ছুটিয়া আসি।

—কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা

ব্রিটিস-গণে। অভয় মনে
শিখের সনে। সাজিছে রণে।···
স্বরূপ বটে। সকলে রটে,

শতুদ্র-তটে। পাছে কি ঘটে।...
সমর-স্থলে। কামান-কলে
বিপক্ষ দলে। বধিবে বলে।...
বিকট বেশে। রুধিরে ভেসে
লাহোর দেশে। কি হবে শেষে।

—ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়

পাঁচ মাত্রার পর্বে সাধারণতঃ তিন মাত্রার পরে একটি উপযতি থাকে। ফলে পর্বটি যথাক্রমে তিন ও দুই মাত্রার দুটি উপপর্বে বিভক্ত হয়। নির্দিষ্ট ও প্রত্যাশিত উপযতিটি মাঝে মাঝে লুপ্ত হয়। ফলে পাঁচ মাত্রার পর্ব তখন তিন-দুই মাত্রার পরিবর্তে দুই-তিন মাত্রার দুই উপপর্বে বিভক্ত হয়। উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্তে এ-রকম ব্যতিক্রম অর্থাৎ উপযতি-লোপ ঘটেছে তিনটি পর্বে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে কোথাও তা হয় নি।

২. অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে পঞ্চমাত্রক পর্ব

ভরিয়া উঠে। নিখিল ভব ॥ 'রতি-বিলাপ'।-সংগীতে,
সকল দিক্। কাঁদিয়া উঠে। আপনি।
ফাগুন মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মূরছি পড়ে অবনী।
আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সাবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।

—কল্পনা, মদনভস্মের পর

শুধু একটি পর্বে ('রতি-বিলাপ') উপযতি-লোপের ফলে উপপর্ব-বিভাগ হয়েছে দুই-তিন মাত্রায়। এ-রকম উপযতি-লোপের আরও কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

'নিরাবরণ' বক্ষে তব 'নিরাভরণ' দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকরচূড় মুকুটখানি 'পরি ললাট' পরে
ধনুক-বাণ 'ধরি দখিন' করে
দাঁড়ানু রাজ-বেশী—
কহিনু "আমি এসেছি পরদেশী।"
চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি 'শিলা-আসন' ফেলে,

শুধালে, "কেন এলে।"

—মহুয়া, সাগরিকা

এখানে পাঁচটি পর্বে উপযতি লুপ্ত হয়েছে। সাধারণতঃ এত ঘন ঘন উপযতি-লোপ ঘটে না। তাতে ছন্দের তালভঙ্গ হয়, অর্থাৎ ছন্দের গতিভঙ্গি ব্যাহত হয়।

ষণ্মাত্রক পর্ব

অধুনাপূর্ব কালে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ছয় মাত্রার পর্ব সুপ্রচলিত ছিল। 'মানসী' কাব্য রচনাকালে (১৮৮৭-৯০) রবীন্দ্রনাথ ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পর্বকে কলাবৃত্ত পর্বে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু তার পরেও তিনি কিছুকাল কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত, এই দুই রীতিতেই ছয় মাত্রার পর্ব রচনা করেছেন। এই সময়ে কবি দ্বিজেন্দ্রলালও ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পর্ব রচনায় যথেষ্ট দক্ষতা ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। বিংশ শতকের প্রথম থেকে ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পর্ব রচনা অপ্রচলিত হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন[১]—"অসমমাত্রার ছন্দে [মানে ছয় মাত্রার ছন্দে] যুক্তধ্বনির বন্ধুরতা আবার একদিন ফিরে আসতেও পারে, কিন্তু আজ এটার চল নেই।"

দলবৃত্ত রীতিতে ছয় মাত্রার পর্ব রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর 'আলেখ্য' কাব্যের (১৯০৭) কয়েকটি রচনায় তাঁর এই প্রচেষ্টার নিদর্শন আছে। তাতেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আর কারও রচনায় ছয় মাত্রার দলবৃত্ত পর্ব দেখেছি বলে মনে হয় না।

তিন রীতিতেই ছয় মাত্রার পর্ব মূলতঃ একটি উপযতির দ্বারা দুটি ত্রিমাত্রক উপপর্বে বিভাজ্য। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ ষণ্মাত্র পর্বের ছন্দকে তিনমাত্রা-মূলক, ত্রৈমাত্রিক বা অসমমাত্রার ছন্দ নামে আখ্যাত করেছেন। কিন্তু ষণ্মাত্রক পর্বের মৌলিক উপযতিটি প্রায়শঃ লুপ্ত হয়। ফলে ওই ছয় মাত্রা একটি উপযতির দ্বারা দুটি ত্রিমাত্রক উপপর্বে বিভক্ত না হয়ে দুটি উপযতির দ্বারা তিনটি দ্বিমাত্রক উপপর্বে বিভক্ত হয়। কোনো পঙ্‌ক্তিতে ত্রিমাত্রক উপপর্বের প্রাধান্য ঘটে, আবার কোনো পঙ্‌ক্তিতে দ্বিমাত্রক উপপর্বের। আসলে এই দু-রকম উপপর্বের একত্র সমাবেশই এ-জাতীয় ছন্দের সাধারণ নীতি।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে

১। দলবৃত্ত রীতিতে **ষণ্মাত্রক পর্ব**

দেশের জন্য ভাবা,। মায়ের জন্য কাঁদা, ॥ ভায়ের জন্য দেওয়া। একালে
'এই' বঙ্গদেশে। 'আজো যে সম্ভব তা', ॥ হে মহাত্মা, তুমি। শেখালে।···
ওরে মূর্খ, জানিস্। মা মা বলে শখের ॥ অশ্রু ফেলা বেশি। শক্ত নয়,
যে-জন চেঁচায় বেশি। 'দীনবন্ধু' বলে ॥ সে-জন সত্যই। বেশি। ভক্ত নয়।
যে-জন কার্য করে। 'নিস্তব্ধে নিভৃতে' ॥ 'নির্জনে জননীর'। জন্য, সে-ই
যোগ্য সুসন্তান, সেই। মায়ের প্রিয় পুত্র, ॥ সেই সে জগন্মান্য, । ধন্য সেই।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, ভক্ত (১৫শ চিত্র)

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'এই' শব্দে একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়ে ও একটু বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারণ করতে হয় 'এ-ই' রূপে। এইজন্য এ শব্দটি দ্বিমাত্রক বলেই স্বীকার্য। এই দৃষ্টান্তে তিনটি পর্বে (আজো যে সম্ভব তা, নিস্তব্ধে

নিভৃতে, নির্জনে জননীর) আছে দুটি করে ত্রিমাত্রক উপপর্ব, আর বাকি সব পূর্ণ পর্বে আছে তিনটি করে দ্বিমাত্রক উপপর্ব।—দলবৃত্ত রীতিতে এ-রকম ছয় মাত্রার পর্ব খুবই দুর্লভ।

২। কলাবৃত্ত রীতিতে ষণ্‌মাত্রক পর্ব।

হাজার হাজার। বছর কেটেছে, ॥ কেহ তো কহে নি। কথা,
ভ্রমর ফিরেছে। মাধবী-কুঞ্জে, ॥ তরুরে ঘিরেছে। লতা।···
শুনিয়া তপন। অস্তে নামিল, ॥ শরমে গগন। ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র। থমকি রহিল, ॥ বনের আড়াল। ধরি।

—কল্পনা, প্রকাশ

এখানে সব পূর্ণপর্বে আছে দুটি করে ত্রিমাত্রক উপপর্ব। এটাই হল ষণ্মাত্রক পর্বের আসল বা আদি রূপ। আর,

আমি কহিলাম,। "শুধু দুটি আম ॥ ভিখ মাগি মহা।-শয়,"
বাবু কহে হেসে,। "বেটা সাধুবেশে ॥ পাকা চোর অতি।-শয়।"
আমি শুনে হাসি,। আখিঁজলে ভাসি, ॥ এই ছিল মোর। ঘটে,
তুমি মহারাজ। সাধু হলে আজ,। আমি আজ চোর। বটে।

—চিত্রা, দুই বিঘা জমি

এখানে প্রতি পূর্ণপর্বে আছে তিনটি করে দ্বিমাত্রক উপপর্ব। এটা হল ষন্মাত্রক পর্বের দ্বিতীয় রূপ। কিন্তু কবিপ্রয়োগে সাধারণতঃ এই দুই রূপের একত্র সমাবেশ ঘটে। যেমন,

পরে মাস-দেড়ে। ভিটেমাটি ছেড়ে ॥ বাহির হইনু। পথে,
করিল ডিক্রি। সকলি বিক্রি ॥ মিথ্যা দেনার। খতে।
এ জগতে হায়,। সেই বেশি চায় ॥ আছে যার ভূরি। ভূরি,
রাজার হস্ত। করে সমস্ত ॥ কাঙালের ধন। চুরি।

—চিত্রা, দুই বিঘা জমি

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির সব উপপর্বই (শেষটা বাদে) ত্রিমাত্রক, আর তৃতীয় পঙ্‌ক্তির সব উপপর্ব দ্বিমাত্রক। কিন্তু প্রথম ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে এই দুই রূপই আছে পাশাপাশি। কবির প্রয়োজনমতো এ দু-রকম উপপর্বের যথেচ্ছ সমাবেশই ষণ্‌মাত্রক পর্ব রচনার সাধারণ নীতি। আজকাল ষণ্‌মাত্রক পর্বের এই কলাবৃত্ত রূপেরই একাধিপত্য।

৩। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ষণ্‌মাত্রক পর্ব

উঠ, বঙ্গকবি,। মায়ের ভাষায় ॥ মুমূর্ষরে দাও। প্রাণ,
জগতের লোক। সুধার আশায় ॥ সে ভাষা করিবে। পান।···
বিশ্বের মাঝারে। ঠাঁই নাই বলে ॥ কাঁদিতেছে বঙ্গ।-ভূমি,
গান গেয়ে কবি। জগতের তলে ॥ স্থান কিনে দাও। তুমি।

—কড়ি ও কোমল, আহ্বান গীত

এখানেও ত্রিমাত্রক ও দ্বিমাত্রক উপপর্বের যথেচ্ছ সমাবেশ লক্ষণীয়। ষণ্মাত্রক পর্বের এই মিশ্রবৃত্ত রূপ আজকাল আর চলে না।

সপ্তমাত্রক পর্ব

তিন রীতিতেই সাত মাত্রার পর্ব দুই উপযতির দ্বারা তিন-দুই-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে বিভক্ত হয়। উপপর্বের মাত্রাবিন্যাসের ব্যতিক্রম খুব কমই দেখা যায়।

১। দলবৃত্ত রীতি সপ্তমাত্রক পর্ব

মরি কার পরশমণি। গগনে ফলায় সোনা;
হৃদয়ে নূপুর-ধ্বনি। অজানার আনাগোনায়।···
অলকার রত্নাগারে। ঢুকেছি হঠাৎ যেন,
ডুবে যাই চমৎকারে। সায়রে শিশির হেন।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, সানাই

সাত মাত্রার দলবৃত্ত পর্ব কবি ঈশ্বর গুপ্তের আমলেও অজানা ছিল না। আধুনিক কালেও কারও কারও রচনায় এর প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু খুবই কম।

২। কলাবৃত্ত রীতিতে সপ্তমাত্রক পর্ব

মন্ত্রে সে যে পূত। রাখীর রাঙা সুতো, ॥ বাঁধন দিয়েছিনু । হাতে,
আজ কি আছে সেটি। সাথে?···
পথ যে কতখানি। কিছুই নাহি জানি, ॥ মাঠের গেছে কোন্। শেষে
চৈত্র-ফসলের। দেশে।

—উৎসর্গ-৪২, 'মন্ত্রে সে যে পূত'

সাত মাত্রার কলাবৃত্ত পর্ব প্রবর্তিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্য রচনাকালে। কিন্তু এর প্রয়োগও বেশি দেখা যায় না। সাত মাত্রার পর্বে তিন উপপর্বে মাত্রাবিন্যাসগত ব্যতিক্রমের একটা দৃষ্টান্ত এই।—

গভীর থির নীরে। ভাসিয়া যাই ধীরে, ॥
'পিক কুহরে তীরে'। অমিয়-মাখা;
'পথে আসিতে ফিরে'। আঁধার তরুশিরে ॥
সহসা দেখি চাঁদ। আকাশে আঁকা।

—মানসী, বধূ

দুটি পর্বে প্রথম উপযতি লুপ্ত হয়েছে। ফলে প্রথম দুই উপপর্বের আসন-বদল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় পঞ্চমাত্রক পর্বে উপযতি লোপের কথা।

৩। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সপ্তমাত্রক পর্ব

আনন্দে ত্রিনয়ন। সহিত দেবগণ ॥ পূজেন নানা আয়ো।-জনে।

সুধন্য চৈত্র মাস। অষ্টমী সুপ্রকাশ ॥ বিশদ পক্ষ শুভ। ক্ষণে ॥···
দেউল-বেদীপর। প্রতিমা মনোহর ॥ তাহাতে অধিষ্ঠিত । মাতা।
সর্বতোভদ্র নাম। মণ্ডল চিত্র-ধাম ॥ লিখিলা আপনি বি ⁝ ধাতা ॥

— ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, শিবের অন্নদা-পূজা

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে শেষ লঘুযতি লুপ্ত হয়েছে। আর-একটা দৃষ্টান্ত এই।—

কমল-পরিমল। 'লয়ে শীতল জল' ॥ পবনে ঢলঢল। উছলে কূলে।
বসন্ত-রাজা আনি। 'ছয় রাগিনী রানী' ॥ করিলা রাজধানী।
অশোক-মূলে॥

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান

এই দৃষ্টান্তের দুটি পর্বে প্রথম উপযতি-লোপের ফলে দুই উপপর্বের স্থান-বিনিময় হয়েছে। এই দৃষ্টান্তের সঙ্গে কলাবৃত্তরীতির শেষ দৃষ্টান্তটির গঠনগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

পদরূপ (Clause forms)

পর্বের উপাদান মাত্রা (দলমাত্রা বা কলামাত্রা), আর মাত্রাসংখ্যার দ্বারা নিরূপিত হয় পর্বের রূপ, অর্থাৎ পর্বের আয়তনগত আকৃতি। তেমনি পদের প্রত্যক্ষ উপাদান পর্ব, আর পর্বসংখ্যার দ্বারা নিরূপিত হয় পদের রূপ, অর্থাৎ পদের আয়তনগত আকৃতি।

দলবৃত্ত, কলাবৃত ও মিশ্রবৃত্ত, এই তিন রীতিতেই পদ গঠিত হয় সাধারণতঃ দুই ও তিন পর্ব নিয়ে। পদের শেষ পর্ব অনেক সময় অপূর্ণ থাকে। এই অপূর্ণতার দ্বারাও পদের তথা পঙ্‌ক্তির রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়। পূর্ববর্তী অনেক দৃষ্টান্তেই তার নিদর্শন আছে। আর পরবর্তী বহু দৃষ্টান্ত থেকে এই উক্তির সার্থকতা স্পষ্টতর হবে।

চতুর্মাত্রক পর্বের যুক্তরূপ ও অবিভক্ত পদ

চতুর্মাত্রক পর্ব নিয়ে গড়া পদে অনেক সময় দুই পর্বের মধ্যস্থিত লঘুযতি লুপ্ত হয়। ফলে দুই পর্ব পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবিভক্ত রূপ ধারণ করে। এ-রকম যুক্তপর্ব নিয়ে গড়া পদকে বলা যায় **অবিভক্ত পদ বা যুক্তপর্বক পদ**। দুটি পূর্ণ-পর্ব যুক্ত হলে গঠিত হয় 'অবিভক্ত পূর্ণপদ', একটি পূর্ণপর্ব ও একটি অপূর্ণপর্ব হলে গঠিত হয় 'অবিভক্ত অপূর্ণ পদ'। তিন রীতিতেই এই দু-রকম যুক্তপর্ব বা অবিভক্ত পদ দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মিশ্রবৃত্ত রীতিতে।

দুই পর্বের পদ সম্পর্কে 'যুক্তপদ' ও 'অবিভক্ত পদ' কার্যতঃ সমার্থক বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু তিন পর্বের পদ সম্পর্কে তা পারে না। কেননা, তিন পর্বের পদে দুই লঘুযতি একসঙ্গে লুপ্ত হয় না। অর্থাৎ, তিন পর্ব একত্র যুক্ত হয়ে অবিভক্ত রূপ ধারণ করে না। ফলে অবিভক্ত পদও হয় না। দুই পর্বের পদে লঘুযতি লুপ্ত হলে, হয় আট মাত্রার একটি পূর্ণ যুক্তপর্ব, না-হয় ছয় মাত্রার একটি অপূর্ণ যুক্তপর্ব উৎপন্ন হয়। তিন রীতিতেই এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য।

চার মাত্রার পূর্ণপর্বে থাকে দুটি দ্বিমাত্রক উপপর্ব। কিন্তু আট মাত্রার পূর্ণ যুক্তপর্বে থাকে তিন-তিন-দুই মাত্রার তিনটি উপপর্ব, আর ছয় মাত্রার অপূর্ণ যুক্তপর্বে থাকে তিন-তিন মাত্রার দুটি উপপর্ব।

১। **মিশ্রবৃত্ত** রীতিতে দুই পর্বের অবিভক্ত পদ

রথ : যাত্রা। লোকা : রণ্য ॥ মহা : ধুম। ধাম,
ভক্তেরা : লুটায়ে : পথে ॥ করিছে : প্রণাম।
পথ : ভাবে। আমি : দেব, ॥ রথ : ভাবে। আমি।
মূর্তি : ভাবে। আমি : দেব, ॥ হাসে : অন্তর্। যামী।

—কণিকা, ভক্তিভাজন

এর তিন পঙ্‌ক্তিতে দুটি করে লঘুযতি সুব্যক্ত। ফলে উপযতি-স্থাপন ও উপপর্ব-গঠন, দুই-ই হয়েছে সাধারণ নিয়ন অনুসারে। কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে এই সাধারণ নিয়ম মানা হয়নি। কেননা, এই পঙ্‌ক্তিতে দুটি নির্দিষ্ট স্থানে লঘুযতি লুপ্ত হয়, অর্থাৎ আবৃত্তিকালে ওই দুই স্থানে উচ্চারণবিরতি ঘটে না। যেমন,

ভক্তেরা লু : টায়ে পথে ॥ করিছে প্র : ণাম

এই হল চতুর্মাত্রক পর্বের নির্দিষ্ট যতি ও গতিক্রম। কিন্তু আমাদের উচ্চারণ দুটি নির্দিষ্ট স্থানে না থেমে অনায়াসেই প্রথম ও তৃতীয় পর্বের সীমানা ডিঙিয়ে চলে এবং থামে যথাক্রমে আট মাত্রা ও ছয় মাত্রার দুই অবিভক্ত পদের পরে। আমাদের উচ্চারণক্রম অনুসারে আট মাত্রার অবিভক্ত পূর্ণপদ স্বতঃই দুটি লঘুতর যতির, মানে উপযতির দ্বারা তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে বিভক্ত হয়; আর ছয় মাত্রার অবিভক্ত অপূর্ণপদ একটি উপযতির দ্বারা বিভক্ত হয় তিন-তিন মাত্রার দুই উপপর্বে। যেমন—

ভক্তেরা লুটায়ে : পথে ॥ করিছে : প্রণাম।

ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে বা অন্য বিশেষ কারণে তিন-তিন-দুই মাত্রার বিন্যাসক্রম কখনও কখনও বিপর্যস্ত হয়। যেমন—

'দ্বিরদ-রদ-নির্মিত' ॥ গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃত যেন
ঊষা। সাথে মন্মথ, হাতে ফুলধনু,
পৃষ্ঠে তৃণ, খরতর ফুলশরে ভরা—
'কন্টকময় মৃণালে' ॥ ফুটিল নলিনী।

—মধুসূদন, মেঘনাদবধ, দ্বিতীয় সর্গ

মহাজ্ঞানী মহাজন 'যে পথে : করে গমন'
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।

—হেমচন্দ্র, কবিতাবলী, জীবন-সংগীত

আজি হতে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের ॥ ‘আনন্দ-অভিবাদন’
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।

—চিত্রা, ১৪০০ সাল

‘না জানে : অভিবাদন’ ॥ না জানে : কুশল,
পিতৃনাম। শুধাইলে ॥ উদ্যত : মুষল।

—সোনার তরী, হিং টিং ছট

এই চার দৃষ্টান্তে আছে পাঁচটি আট-মাত্রার অবিভক্ত পূর্ণপদ। সবগুলিতেই তিন-তিন-দুই মাত্রার বিন্যাসক্রম বিপর্যস্ত হয়ে তিন-দুই-তিন মাত্রার ক্রমে পরিণত হয়েছে। শেষ তিন দৃষ্টান্তের আবৃত্তিকালে প্রত্যেকটিতে একটি করে অবিভক্ত পদের প্রথম নির্দিষ্ট উপযতিটি যথাযথরূপে ব্যক্ত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় নির্দিষ্ট উপযতিটি অব্যক্ত থাকে, অর্থাৎ লুপ্ত হয়। এ-সম্পর্কে স্মরণীয় পাঁচ মাত্রার কলাবৃত্ত পর্বে উপযতি-লোপের প্রসঙ্গ। পক্ষান্তরে প্রথম দৃষ্টান্তের আবৃত্তিকালে দুটি অবিভক্ত পদের প্রত্যেকটিতে নির্দিষ্ট দুটি উপযতিই অব্যক্ত থাকে, অর্থাৎ লুপ্ত হয়। কবির ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে বা অন্য বিশেষ কারণে কখনও কখনও দুই-তিন-তিন ক্রমেও মাত্রাবিন্যাস করা হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রেও অবিভক্ত পদের নির্দিষ্ট দুটি উপযতিই অব্যক্ত থাকে, অথাৎ লুপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, তিন-তিন-দুই ক্রমের উভয়বিধ বিপর্যয়ই সাধারণ উপবিধির ব্যতিক্রম বলে স্বীকার্য।

২। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে তিন পর্বের পদে যুক্তপর্ব

আনন্দ : ময়ীর। আগমনে ॥ আনন্দে : গিয়েছে : দেশ। ছেয়ে,
হের ওই। ধনীর : দুয়ারে ॥ দাঁড়াইয়া। কাঙালিনী। মেয়ে।···
আজি এই। উৎসবের। দিনে ॥ কত লোক। ফেলে অশ্রু।-ধার,
গেহ নেই,। স্নেহ নেই। আহা, ॥ সংসারেতে। কেহ নেই। তার।

—কড়ি ও কোমল, কাঙালিনী

এর শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে এই ছন্দোবন্ধের আদর্শ রূপ। এই চার পঙ্‌ক্তিতেই চতুর্মাত্রক পূর্ণ পর্বের উপযতি-চিহ্ন উহ্য রাখা হয়েছে। উক্ত আদর্শ অংশের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে দুই পদ, প্রতি পদ দুটি লঘুযতির দ্বারা তিন পর্বে বিভক্ত—দুটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ। পূর্ণপর্বে দুটি দ্বিমাত্রক উপপর্ব, অপূর্ণ পর্বে একটি। প্রতি পদে মোট দশ মাত্রা। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির প্রথম তিন পদে একটি করে লঘুযতি (প্রথম বা দ্বিতীয়) লুপ্ত হয়েছে। ফলে এই তিন পদের প্রথম বা শেষ দিকে একটি করে যুক্তপর্ব উৎপন্ন হয়েছে। এই যুক্তপর্বগুলি

নূতন উপযতিযোগে তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে অথবা তিন-তিন মাত্রার দুই উপপর্বে বিভক্ত হয়েছে। তাতে ছন্দের গতিভঙ্গিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়তা হয়েছে। একঘেয়েমি দেখা দিতে পারে নি।

দুটি চতুর্মাত্রক কলাবৃত্ত নিয়ে গড়া পদেও লঘুযতি প্রায়শঃ লুপ্ত হয়, আর তার ফালে যুক্তপর্ব (অবিভক্ত পদ) উৎপন্ন হয়। এসব যুক্তপর্ব নূতন উপযতিযোগে তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে অথবা তিন-তিন মাত্রার দুই উপপর্বে বিভক্ত হয়ে থাকে। তিন পর্বের পদেও এই নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। —দুই দৃষ্টান্তেই চতুর্মাত্রক পূর্ণপর্বের উপযতি চিহ্ন উহ্য রাখা হল।—

৩। **কলাবৃত্ত** রীতিতে দুই পর্বের অবিভক্ত পদ

পূর্ণিমা। চন্দ্রের ॥ জ্যোৎস্না : ধারায়
সান্ধ্য : বসুন্ : ধরা ॥ তন্দ্রা : হারায়। ···
অতিদূর। প্রান্তরে ॥ শৈল : চূড়ায়
মেঘেরা : চীনাং : শুক ॥ পতাকা : উড়ায়।···
ধীরে ধীরে। শর্বরী ॥ হয় অব।-সান,
উঠিল : বিহঙ্ : গের ॥ প্রত্যুষ। গান

—চিত্র-বিচিত্র, উৎসব

৪। **কলাবৃত্ত** রীতিতে তিন পর্বের পদে যুক্তপর্ব

সুন্দরী। তুমি শুক।-তারা ॥ সুদূর : শৈল : শিখ :-রান্তে,
শর্বরী। যবে হবে। সারা ॥ দর্শন দিয়ো দিক্।-প্রান্তে।
ধরা যেখা। অম্বরে। মেশে ॥ আমি আধো।-জাগ্রত। চন্দ্র,
আঁধারের। বক্ষের। পরে ॥ আধেক : আলোক : রেখা। রন্ধ্র।
আমার : আসন : রাখে। পেতে ॥ নিদ্রা : গহন : মহা। শূন্য,
তন্ত্রী : বাজাই : স্বপ। নেতে ॥ তন্দ্রা : ঈষৎ : করি। ক্ষুণ্ণ।

— মহুয়া, শুকতারা

প্রথম দৃষ্টান্তের আদর্শ চার-চার এবং চার-দুই মাত্রার দুই পদ নিয়ে গঠিত পঙ্ক্তি। এই আদর্শ রূপ পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছে পঞ্চম পঙক্তিতে। বাকি পাঁচ পঙ্ক্তির তিনটি পূর্ণপদে লঘুযতি-লোপের ফলে চার-চার মাত্রার দুই পর্ব লঘুতর যতি (উপযতি) যোগে তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে পরিণত হয়েছে। আর, একই কারণে চারটি অপূর্ণ পদের চার-দুই মাত্রার দুই পর্ব তিন-তিন মাত্রার দুই উপপদের রূপ ধারণ করেছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের আদর্শ চার-চার-দুই এবং চার-চার-তিন মাত্রার দুই পদ নিয়ে গঠিত পঙ্ক্তি। এই আদর্শ রূপ পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্ক্তিতে। প্রথম ও চতুর্থ পঙ্ক্তির প্রথম পদেও এই আদর্শ

রূপ অব্যাহত আছে। এই দুই পঙ্‌ক্তির শেষ দুই পদ এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির চার পদ, এই ছয়টি পদের প্রথম লঘুযতি লুপ্ত হবার ফলে চার-চার মাত্রার দুই পর্ব তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে পরিণত হয়েছে।

চতুর্মাত্রক দলবৃত্ত পর্বের ছন্দেও অনায়াসেই লঘুযতি লোপ ঘটিয়ে আট মাত্রা ও ছয় মাত্রার যুক্তপর্ব রচনা করা যেতে পারে। এ-জাতীয় ছন্দের চালে দৃঢ়তা, মন্থরতা ও গাম্ভীর্য আনা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু এখনও এ রীতির ছন্দে যুক্তপর্ব রচনা সুপ্রচলিত হয়নি। সুপ্রচলিত না হলেও দলবৃত্ত রীতির যুক্তপর্ব খুব দুর্লভও নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

৫। **দলবৃত্ত** রীতিতে দুই পর্বের অবিভক্ত পদ

‘ঘরেতে : দুরন্ত : ছেলে’ ॥ করে দাপা।-দাপি,
বাইরেতে মেঘ। ডেকে ওঠে, ॥ সৃষ্টি ওঠে। কাঁপি।

—কড়ি ও কোমল, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

কে কারে কী। বলেছে গো, ॥ ‘কার প্রাণে : বেজেছে : ব্যথা’ ;
করুণায় যে। ভরে এল ॥ দুখানি তার। আঁখির পাতা।
খেলতে খেলতে। মায়ের আমার। ‘আর বুঝি : হল না : খেলা’,
ফুলের গুচ্ছ। কোলে প’ড়ে ॥ কেন মা এ হেলাফেলা।···
থামো, থামো,। ওর কাছেতে ॥ কোয়ো না কেউ। কঠোর কথা,
করুণ আঁখির। বালাই নিয়ে ॥ ‘কেউ কারে : দিও না : ব্যথা’।

—কড়ি ও কোমল, মা লক্ষ্মী

এটা কিছু। অপূর্ব নয়, ॥ ‘ঘটনা : সামান্য : খুবই’,
শঙ্কা যেথায়। করো না কেউ ॥ সেইখানে হয়। জাহাজ-ডুবি।

—ক্ষণিকা, বোঝাপড়া

বজ্রে তোমার। বাজে বাঁশি, ॥ সে কি সহজ। গান।···
আরাম হতে। ছিন্ন করে ॥ সেই গভীরে। লও গো মোরে
‘অশান্তির : অন্তরে : যেথায়’ ॥ শান্তি সুম ।-হান্।

—গীতাঞ্জলি-৭৪, ‘বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি

৬। **দলবৃত্ত** রীতিতে তিন পর্বের পদে যুক্তপর্ব

দেবতা জেনে। ‘দূরে রই : দাঁড়ায়ে’, ॥ আপন জেনে। আদর করি। নে,
পিতা বলে। প্রণাম করি। পায়ে, ॥ বন্ধু বলে। দু হাত ধরি। নে।

—গীতাঞ্জলি-৯২, ‘দেবতা যেনে’

‘তাই তোমার : আনন্দ : আমার’। ‘পর, ॥
তুমি তাই এসেছ। নীচে,
আমায় নইলে। ত্রিভুবনেশ্।-শ্বর,
তোমার প্রেম হত যে। মিছে।

—গীতাঞ্জল-১২১, ‘তাই তোমার আনন্দ

দেখা যাচ্ছে চার-চার-দুই মাত্রা নিয়ে গঠিত তিন পর্বের দলবৃত্ত পদেও প্রথম লঘুযতিলোপের ফলে চার-চার মাত্রার দুই পর্ব তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে পরিণত হয় অথবা দ্বিতীয় লঘুযতিলোপের ফলে চার-দুই মাত্রার দুই পর্ব তিন-তিন মাত্রার দুই উপপর্বের রূপ নেয়।—বস্তুতঃ সব রকম ছন্দোবন্ধেই এভাবে লঘুযতি লুপ্ত হবার ফলে উক্ত দু-রকম যুক্তপর্ব গঠিত হয়ে থাকে যেমন,

বিদায় বেলায়। মেয়েকে বাপ ॥ বলে দিলেন। মাথায় হস্ত। ধরি—
‘হও তুমি : সাবিত্রীর : মতো’, ॥ এই কামনা। করি।···
‘রাঁধুনে : ব্রাহ্মণের : হাতে’ ॥ খেতে করেন। ঘৃণা,
স্ত্রীর রান্না। বিনা
অন্নপানে। হত না তাঁর। রুচি।···
মঞ্জুলী সব। সহ্য করে, ॥ সর্বদা সে। শান্ত,
‘কাজ করে : অক্লান্ত’।

—পলাতকা, নিষ্কৃত

সর্ব দিকেই। ‘সর্বদা : উন্মুখ’
‘আপনারি : চাঞ্চল্য : নিয়ে’ ॥ আপনি সমুৎ। সুক।

—পরিশেষ, অবুঝ মন

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় এ-রকম যুক্তপর্বের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা যায়। তাঁর রচিত কয়েকটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত এই—

প্রাণ রাখিতে। সদাই যে : প্রাণান্ত।
জন্মিতে কে। চাইত যদি ॥ আগে সেটা। জানত।···
দিনে গা : গড়াবা : মাত্র
বসে মাছি । সর্ব গাত্র,
রাত্রে মশার। ব্যবহারও ॥ অভদ্র : নিতান্ত।
তদুপরি। ভার্যার অর্ধ-

-রজনীতে। গয়নার ফর্দ,
নাসিকা : ডাকা : পর্যন্ত ॥ 'নাহি হন'। ক্ষান্ত।
'কিনিলেই'। কোনো দ্রব্য
দাম চাহে : যত : অসভ্য,
রাস্তা জুড়ে। বসে আছে ॥ পাওনাদার : দুর্দান্ত।

—হাসির গান, প্রাণান্ত

দু-চার বর্ষা। হলে অতীত
চাষায় জমি। রাখে পতিত
নইলে সে : উর্বরা : হলেও ॥ বেশি দিন আর। ফলে না।…
এক স্ত্রী নিয়ে। হলে কারবার
ঝালিয়ে নিতে। হয় দু-চার বার,
বিরহ : আহুতি : ভিন্ন ॥ প্রেমের আগুন। জ্বলে না।

—হাসির গান, নূতন তাই

শমন এসে। বলবে হেসে, ॥ এখন কোথায়। যাবে, চাঁদ,
ঘুঘু দেখেছ তো : শুধু ॥ এখন তবে। দেখ ফাঁদ।

—আনন্দ-বিদায়, প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য

প্রথম দৃষ্টান্তের 'নাহি হন' এবং 'কিনিলেই' এই দুটি পর্বে মাত্রাবিন্যাস করা হয়েছে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে। দ্বিজেন্দ্রলালের দলবৃত্ত রচনায় মাঝে-মাঝে এ-রকম মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। 'হতে চান না' এবং 'কিনে নিলেই' লিখলে যথাক্রমে ওই দুই পর্বের দলবৃত্ত প্রকৃতি বজায় থাকত। 'নাসিকা ডাকা' এবং 'দাম চাহে' ইত্যাদি দুটি যুক্তপর্বে (অর্থাৎ অবিভক্ত পদের) দ্বিতীয় উপযতিটি লুপ্ত বলেই স্বীকার্য। তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'ঘুঘু দেখেছ' ইত্যাদি অবিভক্ত পদের প্রথম উপযতিটি লুপ্ত হয়েছে। যদি লেখা হত 'ঘুঘু তো: দেখেছ; শুধু'—তাহলে প্রচলিত সাধারণ বিন্যাসক্রম বজায় থাকত এবং দুটি উপযতিও সুব্যক্ত হত।

রামপ্রসাদ সেন এবং ঈশ্বর গুপ্তের দলবৃত্ত রচনাতেও মাঝে-মাঝে যুক্তপর্বের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু মিশ্রবৃত্তের তুলনায় দলবৃত্ত রীতিতে যুক্তপর্ব প্রয়োগের পরিমাণ প্রায় নগণ্য। যুক্তপর্বের এই বিরলতার জন্যই দলবৃত্ত রীতির ছন্দ কবিভাবনার বাহন হিসাবে এখনও মিশ্রবৃত্তের সমান শক্তি ও মর্দাদা অর্জন করতে পারে নি। কখনও পারবে না, এমন কথা অবশ্য বলা যায় না।

পঞ্চমাত্রক পর্ব-গঠিত অবিভক্ত পদ

পাঁচ মাত্রার পর্ব নিয়ে গড়া দুই পর্বের মধ্যবর্তী লঘুযতি সাধারণতঃ লুপ্ত হয় না। ফলে যুক্তপর্ব বা অবিভক্ত পদও গঠিত হয় না। অর্থাৎ পঞ্চমাত্রক পর্বের ছন্দে লঘুযতিলোপ ও তজ্জাত অবিভক্ত পদের প্রয়োগ খুব

কমই দেখা যায়। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

ত্বরিত পদে। চলিছে গেহে,
সিক্ত বাস। লিপ্ত দেহে
'যৌবন-লা : বণ্য যেন'।
লইতে চাহে। কেড়ে।

—মানসী, অপেক্ষা

ভদ্র মোরা। শান্ত বড়ো, ॥ পোষ-মানা এ। প্রাণ
বোতাম-আঁটা। জামার নীচে ॥ শান্তিতে শ : য়ান।···
মাথায় ছোটো। বহরে বড়ো ॥ বাঙালি সন্। তান।
ইহার চেয়ে। হতেম যদি ॥ আরব বেদু।-য়িন,
চরণতলে। বিশাল মরু ॥ দিগন্তে বি : লীন।

—মানসী, দুরন্ত আশা

একদা তুমি। অঙ্গ ধরি ॥ ফিরিতে নব। ভুবনে,
মরি মরি অ : নঙ্গ দেব : তা।
কুসুম রথে। মকরকেতু ॥ উড়িত মধু। পবনে,
পথিকবধূ। চরণে প্রণ : তা।

—কল্পনা, মদনভস্মের পূর্বে

প্রথম ও তৃতীয় দৃষ্টান্তে একটি করে দশ মাত্রার পূর্ণপদের মধ্যবর্তী লঘুযতি আবৃত্তিকালে আমাদের উচ্চারণে ব্যক্ত হয় না, অর্থাৎ লুপ্ত হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দুটি সাত মাত্রার অপূর্ণ পদের (শান্তিতে শয়ান, দিগন্তে বিলীন) লঘুযতি-দুটিও অনুরূপভাবে লুপ্ত হয়। আর, অন্য দুটি অপূর্ণ পদের (বাঙালি সন্তান, আরব বেদুয়িন) লঘুযতি-দুটি বিকল্পে উপযতিতে পরিণত হয়। যদি 'সন্' ও 'বে' দলের উপরে ঝোঁক (প্রস্বর) রেখে পড়া যায় তবে পরবর্তী প্রত্যাশিত লঘুযতি-দুটি উপযতিতে পরিণত হয়। আর যদি লঘুযতি-দুটি বজায় রেখে পড়া যায় তবে ঝোঁক পড়বে 'তান' ও 'য়িন' দলের উপরে। পাঠকের রুচিভেদে দুই ভঙ্গিতেই পড়া চলে। তবে বোধ করি 'সন্তান' ও 'বেদুয়িন' শব্দের প্রথম দলের উপরে ঝোঁক রেখে পরবর্তী নির্দিষ্ট লঘুযতিকে লঘুতর যতিতে (অর্থাৎ উপযতিতে) নামিয়ে আনাই বেশি ভাল। তাতে কবির অভিপ্রায়ও সুরক্ষিত হয়। তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'দেবতা' ও 'প্রণতা' শব্দের মধ্যবর্তী ছন্দোনির্দিষ্ট লঘুযতি বিকল্পে লুপ্ত হয়। ছন্দের গতিভঙ্গি মেনে 'তা' দলের পূর্বে লঘুযতি রাখলে দুটি 'তা' দলই উচ্চারিত হবে দ্বিমাত্রক রূপে। এটা হল ছন্দ বাঁচিয়ে চলার সহজ উপায়। আর, ওই লঘুযতি-দুটিকে অব্যক্ত রেখে পড়লেও ছন্দের মর্যাদাহানি হবে না, আর কবির অভিপ্রায়টুকু হবে স্পষ্টতর। —এ প্রসঙ্গে আসল কথা এই যে, পঞ্চমাত্রক পর্বের ছন্দে লঘুযতি-লোপের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল আর দশ মাত্রার পূর্ণপদে লঘুযতিলোপের দৃষ্টান্ত বিরলতর।

ষণ্মাত্রক ও সপ্তমাত্রক পর্বের ছন্দে লঘুযতি লুপ্ত হয় না। আর তাতেই ছন্দের সৌষ্ঠব সুরক্ষিত হয়।

কয়েকটি বিশেষ পদরূপ

পূর্বেই বলা হয়েছে, পদের প্রত্যক্ষ উপাদান পর্ব। তাই পদের আয়তন বা আকৃতি-গত রূপবৈচিত্র্য প্রত্যক্ষতঃ নিরূপিত হয় পর্বের সংখ্যা ও নানারূপ সমাবেশপ্রণালীর দ্বারা। নিম্নে কতকগুলি বিশেষ পদরূপের দৃষ্টান্ত শ্রেণীবদ্ধ করে সাজিয়ে দেওয়া গেল। এই দৃষ্টান্তগুলির পদরূপ বর্ণনার অনুষঙ্গ হিসাবে পঙ্‌ক্তিরূপের (অর্থাৎ একপদী, দ্বিপদী প্রভৃতি বন্ধের) উল্লেখও করা যাবে। কেননা, ছন্দের পদ ও পঙ্‌ক্তি প্রায় অচ্ছেদ্যভাবেই সম্পৃক্ত।—

১। দলবৃত্ত রীতিতে দুই পর্বের পদ—প্রতি পঙ্‌ক্তি ত্রিপদী

দূরে অশথ।-তলায়।
পুঁতির কণ্ঠিখানি। গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন। আছ?
সামনে আঙি।-নাতে।
তোমার একতারাটি। হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে। নাচ।

—শিশু ভোলানাথ, বাউল

২। কলাবৃত্ত রীতিতে দুই পর্বের পদ—প্রতি পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী

যদি দেখি ঘন ঘোর। মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে। আকাশে,
যদি বিদ্যুৎ ফণী। জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা। বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি। মিছা ভয়,
আমি নীরবে করিব। তরণ
সেই মহাবরষার। রাঙাজল,
ওগো মরণ, হে মোর। মরণ।

—উৎসর্গ-৪৭, ‘অত চুপি চুপি’

এই দুটি দৃষ্টান্তেই কয়েকটি শব্দকে রচনার মূল দেহ থেকে একটু দূরে সরিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হয়েছে। এগুলিকে একটু আলগাভাবে উচ্চারণ করতে হয়, অর্থাৎ এগুলির উপরে কোনো প্রস্বর (ঝোঁক) থাকে না। এগুলি বক্তব্য বিষয়ের অত্যাজ্য অংশ বটে, কিন্তু ছন্দের পক্ষে অত্যাজ্য না হয়েও তার ধ্বনিতরঙ্গে অর্থাৎ

ছন্দোভঙ্গিতে একটু বৈচিত্র ঘটায়। এ-রকম বিচ্ছিন্ন অংশকে ছন্দ-পরিভাষায় বলা হয় **অতিপর্ব** (Anacrusis)। ছন্দের মূলরূপ অতিপর্বের উপরে নির্ভর করে না। তাই ছন্দের রূপবর্ণনায় ছন্দের মূল অঙ্গেরই পরিচয় দিতে হয়। অতিপর্বগুলির শুধু উল্লেখ করাই যথেষ্ঠ। অতিপর্বের আর কোনো পরিচয় দিতে হয় না। প্রথম দৃষ্টান্তের শেষ দুই পদে, আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের দুই পদেই অতিপর্ব।

প্রথম দৃষ্টান্তে আছে দুই পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে তিন পদ, তিন ছত্রে সাজানো। প্রত্যেক পদে দুই পর্ব। প্রথম পূর্ণপর্বে চার দলমাত্রা, দ্বিতীয় অপূর্ণ পর্বে দুই দলমাত্রা। দুই পঙ্‌ক্তিতে মিল (আছ-নাচ) এবং প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে প্রথম দুই পদে মিল (তলায়-গলায়, নাতে-হাতে)।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আছে চার পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে দুই পদ, দুই ছত্রে সাজানো। প্রথম পদের পরে অর্ধযতি, দ্বিতীয় পদের পরে পূর্ণযতি। প্রত্যেক পদে দুই পর্ব। প্রথম পর্ব পূর্ণ (ছয় কলামাত্রা), দ্বিতীয় পর্ব অপূর্ণ (পর্যায়ক্রমে চার ও তিন কলামাত্রা)। প্রথম তিন পঙ্‌ক্তির প্রথম পদে মিল (দয়-ময়-ভয়), প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পদে মিল (আকাশে-বিকাশে) এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পদে মিল(তরণ-মরণ)। চতুর্থ পঙ্‌ক্তির প্রথম পদ মিলহীন। এ-রকম মিলহীন পদকে বলি **নিঃসঙ্গ** পদ। গানের পরিভাষায় একে বলা যায় মিলের 'ফাঁক'। সাধারণতঃ এ-রকম ফাঁক থাকে শেষ মিলের ঠিক আগেই।

৩। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে দুই পর্বের পদ—প্রতি পঙ্‌ক্তি ত্রিপদী

যে তোমারে। দূরে রাখি ॥ নিত্য ঘৃণা। করে, ॥ হে মোর : স্বদেশ
মোরা তারি। কাছে ফিরি ॥ সম্মানের। তরে, ॥ পরি তারি। বেশ।

—কল্পনা, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

এই দৃষ্টান্তের দুটি পঙ্‌ক্তিই ত্রিপদী। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির তিন পদ এক ছত্রে সাজানো। পঙ্‌ক্তির প্রথম পদে দুই পূর্ণপর্ব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে একটি পূর্ণপর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে তৃতীয় পদের অন্তর্গত লঘুযতি লুপ্ত অর্থাৎ অব্যক্ত। পূর্ণপর্বে চার অপূর্ণ পর্বে দুই কলামাত্রা।

১। দলবৃত্ত রীতিতে তিন পর্বের পদ—প্রতি পঙ্‌ক্তি ত্রিপদী

শরৎ তোমার। শিশির-ধোওয়া। কুন্তলে,
বনের পথে। লুটিয়ে-পড়া। অঞ্চলে,
    আজ প্রভাতের। হৃদয় ওঠে। চঞ্চলি।···
কুঞ্জ-ছায়া। গুঞ্জরণের। সংগীতে।
ওড়না ওড়ায়। এ কী নাচের। ভঙ্গিতে,
    শিউলি-বনের। বুক যে ওঠে। আন্দোলি।

—গীতালি-২৬, 'শরৎ তোমার'

মোট দুই পঙ্‌ক্তির প্রতি পঙ্‌ক্তিতে তিন পদ, তিন ছত্রে সাজানো। প্রতি পদে তিন পর্ব—প্রথম দুটি পূর্ণ, তৃতীয়টি অপূর্ণ। পূর্ণপর্বে চার দলমাত্রা, অপূর্ণ পর্বে তিন। দুই পঙ্‌ক্তিতে মিল এবং প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই

পদে মিল।

২। কলাবৃত্ত রীতিতে তিন পর্বের পদ—প্রতি পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী

এ নহে মুখর। বনমর্মর। গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর। -গরজে সাগর। ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ। কুন্দ কুসুম।-রঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল। কলকল্লোলে। দুলিছে।
কোথা রে সে তীর। ফুলপল্লব।-পুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়,। কোথা আশ্রয়।-শাখা।
তবু বিহঙ্গ,। ওরে বিহঙ্গ। মোর,
এখনি অন্ধ,। বন্ধ করো না। পাখা।

—কল্পনা, দুঃসময়

এই দৃষ্টান্তে আছে চার পঙ্‌ক্তি। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে দুই পদ, দুই ছত্রে সাজানো। প্রথম পদের পরে অর্ধযতি, দ্বিতীয় পদের পরে পূর্ণযতি। প্রত্যেক পদে তিন পর্ব—প্রথম দুটি পূর্ণ, তৃতীয়টি অপূর্ণ। পূর্ণপর্বে ছয় কলামাত্রা, অপূর্ণ পর্বে পর্যায়ক্রমে চার ও তিন কলামাত্রা। কিন্তু শেষ তিন পদের অপূর্ণ পর্বে দুই কলামাত্রা। প্রথম তিন পঙ্‌ক্তির প্রথম পদে মিল (গুঞ্জিত-রঞ্জিত-পুঞ্জিত), প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পদে মিল (ফুলিছে-দুলিছে) আর তৃতীয়-চতুর্থ পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পদে মিল (শাখা-পাখা)। চতুর্থ পঙ্‌ক্তির প্রথম পদ **নিঃসঙ্গ** এ-রকম নিঃসঙ্গ পদ ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য বৃদ্ধির সহায়তা করে। একঘেয়েমিও নিবৃত্ত হয়।

৩। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে তিন পর্বের পদ—প্রতি পঙ্‌ক্তি ত্রিপদী

আকাশের। একবিন্দু। নীলে
তোমার : পরান : ডুবা। ইলে,
শিখে নিলে। আনন্দের। ভাষা।
বক্ষে তব। শুভ্র রেখা। এঁকে
আপন : স্বাক্ষর : গেছে। রেখে
রবির : সুদূর : ভাল।-বাসা।

—পূরবী, আকন্দ

মোট দুই পঙ্‌ক্তি। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে তিন পদ—তিন ছত্রে সাজানো। প্রতি পদে তিন পর্ব, দুটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ। পূর্ণ পর্বে চার কলামাত্রা, অপূর্ণ পর্বে দুই। প্রথম পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পদ এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ, এই তিন পদের প্রত্যেকটিতে প্রথম লঘুযতি লুপ্ত হয়েছে। তাতে ওই তিন পদেই একটি করে পূর্ণ যুক্তপর্ব তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে বিভক্ত হয়েছে।

পঙ্‌ক্তিরূপ (Verse forms)

পদের প্রত্যক্ষ উপাদান পর্ব এবং পর্বসংখ্যার দ্বারাই নিরূপিত হয় পদের আকৃতি বা রূপ। তেমনি পঙ্‌ক্তির প্রত্যক্ষ উপাদান পদ আর পদসংখ্যা দ্বারাই নিরূপিত হয় পঙ্‌ক্তির আকৃতি বা রূপ। পঙ্‌ক্তিরূপেরই নামান্তর **পঙ্‌ক্তিবন্ধ**।

পদসংখ্যাভেদে পঙ্‌ক্তির চার রূপ বা বন্ধ—একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী। আবার পদেরও দুইরূপ—দুই পর্বের পদ ও তিন পর্বের পদ। সুতরাং পদের পর্বসংখ্যাভেদে একপদী প্রভৃতি প্রত্যেক বন্ধই দু-রকম হতে পারে—হ্রস্ব ও দীর্ঘ। তেমনি পর্বেরও প্রধান রূপ চারটি—চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব। অতএব পর্বের মাত্রাসংখ্যাভেদে একপদী প্রভৃতি চার বন্ধের হ্রস্ব এবং দীর্ঘ রূপও চতুর্গুণ হতে পারে। তাছাড়া, দলবৃত্ত প্রভৃতি তিন রীতিভেদে ওই সংখ্যা আরও তিন গুণ হতে পারে। অঙ্ক কষলে মনে হবে বাংলা ছন্দরূপের মোট সংখ্যা ছিয়ানব্বুই। কিন্তু কার্যতঃ তা হয় না। যেমন পাঁচ ও ছয় মাত্রার পর্ব দলবৃত্ত রীতিতে চলে না, মিশ্রবৃত্ত রীতিতেও পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব এখন অচল হয়ে গেছে। তা ছাড়া, অনেক সম্ভাব্য রূপও কার্যতঃ চলে না। পক্ষান্তরে নানা আয়তনের পদ একত্র সমাবিষ্ট করে পঙ্‌ক্তিরূপের বৈচিত্র্য সাধন করা হয়। এ ক্ষেত্রে পদের বা পর্বের নানারূপ অপূর্ণতাও পঙ্‌ক্তির রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টির একটা বড় উপায় বলে গণ্য হয়। এসব নানা উপায়ে সৃষ্ট পঙ্‌ক্তিরূপের সংখ্যা উল্লিখিত গাণিতিক হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। আরও নূতন রূপ সৃষ্টির পথও খোলা আছে। এখানে সব প্রচলিত পঙ্‌ক্তিরূপের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও নেই। এখানে শুধু একপদী প্রভৃতি চার বন্ধ-ভুক্ত কতকগুলি প্রধান পঙ্‌ক্তিরূপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে। এই পঙ্‌ক্তিরূপগুলির নিয়মপ্রণালী আয়ত্ত হয়ে গেলে অন্যান্য পঙ্‌ক্তিরূপ নিরূপণ করা কঠিন হবে না। পূর্বে নানা প্রসঙ্গে যেসব পঙ্‌ক্তি রূপের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, আশা করি তার থেকেও বিভিন্ন প্রকার পঙ্‌ক্তিরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে।

একপদী পঙ্‌ক্তি

যে ছন্দপঙ্‌ক্তি কোনো অর্ধযতির দ্বারা বিভক্ত নয়, তাকে বলা হয় **একপদী।** নিম্নে বিভিন্ন প্রকার একপদী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত শ্রেণীবদ্ধ রূপে সাজিয়ে দেওয়া গেল।

এক। চতুর্মাত্রক পর্বের একপদী পঙ্‌ক্তি

১। দলবৃও একপদী—এক পর্বের পদ

গগন-তলে
আগুন জ্বলে।…
ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি
পাটায় ব'সে

দুধের চাছি
শুষছে মাছি।…
কুকুর গুলো
শুঁকছে ধুলো,
ধুঁকছে কেহ

—সতেন্দ্রনাথ, কুহু ও কেকা, পালকীর গান

২। কলাবৃত্ত একপদী—এক পর্বের পদ

যত কয় কোথা রাখী
তত নয়। তোতাপাখি।
শিখি নাই খৈ খাই
লিখি তাই দৈ চাই।

—মদনমোহন, শিশুশিক্ষা (প্রথম ভাগ)

আলো হয় দীঘি-জল
গেল ভয়। ঝলমল।
চারি দিক ঝাউ-ডাল
ঝিকিমিকি দেয় তাল।

—রবীন্দ্রনাথ, সহজ পাঠ (প্রথম ভাগ)

এই দৃষ্টান্তের কোনোটিতেই রুদ্ধদলের দ্বিবিধ উচ্চারণের মিশ্রণ ঘটেনি। তাই এই দৃষ্টান্তের ছন্দোরীতিকে অমিশ্র কলাবৃত্ত বলেই গণ্য করা গেল। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে এ-রকম এক পর্বের একপদী পঙ্‌ক্তি দুর্লভ। তাছাড়া, কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত ক্ষুদে একপদী পঙক্তি সাধারণতঃ শিশুপাঠ্য পুস্তকেই দেখা যায়।

৩। দলবৃত্ত একপদী—দুই পর্বের পদ, অপূর্ণ

চাঁদটি ব'সে। হাসে হাসে মেয়ে, ডাকে
শান্ত নীলা। কাশে।··· শরচ্চন্দ্রমাকে,
ডাকে মা—"চাঁদ, আ'রে, সঙ্গে সঙ্গে—"আ'রে,
চি-ক্ দিয়ে যা রে।" চি-ক্ দিয়ে যা রে।"
একবার তাকায় সাধে হাসে মেয়ে, হাসে
আকাশের ঐ চাঁদে, চন্দ্র নীলাকাশে,
আবার তাকায় সুখে হাসে মা, এ ধরায়,
কোলের চাঁদের মুখে। তিনের হাসি গড়ায়।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, নতুন মাতা (তৃতীয় চিত্র)

এক যে ছিল রাজা সেদিন হল মানা
সেদিন আমায় দিল সাজা। আমার পেয়ারা পেড়ে আনা,
ভোরে রাতে উঠে রথ দেখতে যাওয়া,
আমি গিয়েছিলুম ছুটে, আমার চিঁড়ের পুলি খাওয়া।
দেখতে ডালিম গাছে কে দিল সেই সাজা,
বনের পিরভু কেমন নাচে। জান কে ছিল সেই রাজা?
ডালে ছিলেম চড়ে,

সেটা ভেঙেই গেল পড়ে।

—শিশু ভোলানাথ, রাজা ও রাণী

'পেয়ারা' শব্দটি দ্রুত উচ্চারিত হয়ে এখানে দুই দলমাত্রার মূল্য পেয়েছে। পেয়ারী, চেয়ারে প্রভৃতি শব্দ অবস্থাবিশেষে প্যারী, চ্যারে রূপে উচ্চারিত হয়।

৪। দলবৃত্ত একপদী—দুই পর্বের পদ, পূর্ণ

মেঘ মুলুকে। ঝাপ্‌সা রাতে আলোয় ঢাকা অন্ধকার
রামধনুকের। আব্‌ছায়াতে, ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।···
তাল-বেতালে খেয়াল সুরে আদিম রাতের চাঁদিম হিম
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।··· তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
আজকে দাদা যাবার আগে ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
বলব যা মোর চিত্তে জাগে।··· গানের পালা সাঙ্গ মোর।

—সুকুমার রায়, 'আবোল-তাবোল', আবোল তাবোল

৫। কলাবৃত্ত একপদী—দুই পর্বের পদ, পূর্ণ

প্যাঁচা কয়। প্যাঁচানি, যত ভয় যত দুখ
খাসা তোর। চ্যাচানি। দুরুদুরু ধুক্‌ধুক,
শুনে শুনে আনমন তোর গানে পেঁচি রে
নাচে মোর প্রাণমন। সব ভুলে গেছি রে—
মাজা-গলা চাঁচা সুর চাঁদমুখে মিঠে গান
আহ্লাদে ভরপুর। শুনে ঝরে দুনয়ান।

—সুকুমার রায়, আবোল তাবোল, প্যাঁচা আর প্যাঁচানি

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই দৃষ্টান্তে চার পঙ্‌ক্তির শেষ পর্বে আছে তিন কলামাত্রা। কিন্তু একটু মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে, ও চার পর্বের শেষ দলটি আবৃত্তির টানে দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ চারটি পর্বে আসলে চার কলামাত্রাই আছে। এইজন্যই অন্যান্য পঙ্‌ক্তির সঙ্গে এই চার পঙক্তির ছন্দোগত সমতা অনুভূত হয়।

৬। মিশ্রবৃত্ত একপদী—দুই পর্বের পদ, পূর্ণ

অলক্ষ্মীর। আগমনে কি হইল হায় হায়,
সবাই : প্রমাদ : গণে। অনাহারে মারা যায়।
জিনিসের অগ্নিদর, অকাল হইল শেষে,
বাঁচে কিসে দুঃখী নর। মহামারী দেশে দেশে।

—ঈশ্বর গুপ্ত, গ্রন্থাবলী (বসুমতী), বর্ষবিদায়

৭। দলবৃত্ত একপদী—তিন পর্বের পদ, অপূর্ণ ও পূর্ণ

দেয় যে জনা। কী দশা পায়। তাকে
দেওয়ার কথা। কেনই মনে। রাখে।
পাকা যে ফল। পড়ল মাটির। টানে
শাখা আবার। চায় কি তাহার পানে?

—পূরবী, দান

শরৎ তোমার। অরুণ আলোর। অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল। ছাপিয়ে মোহন। অঙ্গুলি।···
মানিক-গাঁথা। ওই যে তোমার। কঙ্কণে।
ঝিলিক লাগায়। তোমার শ্যামল। অঙ্গনে।

—গীতালি-২৬, 'শরৎ তোমার'

তোমার পূজার। ছলে তোমায়। ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি। কখন তুমি। দাও যে ফাঁকি।···
দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তো মোর তৃষা-কাতর আপন আঁখি।

—গীতিমাল্য-৮১, 'তোমার পূজার'

৮। কলাবৃত্ত একপদী—তিন পর্বের পদ, পূর্ণ

খ্যাতি আছে। সুন্দরী। বলে তার,
ত্রুটি ঘটে। নুন দিতে। ঝোলে তার,
চিনি কম পড়ে বটে পায়সে
স্বামী তবু চোখ বুজে খায় সে,
যা পায় তাহাই মুখে তোলে তার,
দোষ দিতে মুখ নাহি খোলে তার ।

—খাপছাড়া-৩৪, 'খ্যাতি আছে'

৯। মিশ্রবৃত্ত একপদী—তিন পর্বের পদ, অপূর্ণ

কহিল সে। নমি সবা।-কাছে—
"শুধু এই। ভিক্ষামাত্র। আছে।···
আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে

তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।···
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা,
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।"

—কথা, নগরলক্ষ্মী

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখি, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে তিন পর্বের একপদী পঙ্‌ক্তির শেষ পর্ব সাধারণতঃ অপূর্ণই থাকে এবং ওই অপূর্ণ পর্ব হয় দ্বিমাত্রক। মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী, ত্রিপদী এবং চৌপদী পঙ্‌ক্তির শেষেও এ-রকম দুই মাত্রার একটি অর্ধপর্ব থাকে আর ওই অর্ধপর্বটি গঠিত হয় একটি বিশ্লিষ্ট (দ্বিমাত্রক) রুদ্ধদল নিয়ে অথবা দুটি একমাত্রক মুক্তদল নিয়ে। মিশ্রবৃত্ত পঙ্‌ক্তির শেষ অর্ধপর্বটি একটি সংশ্লিষ্ট রুদ্ধদল ও একটি একমাত্রক মুক্তদল নিয়ে গঠিত হলে শুনতে ভাল হয় না। তাই মিশ্রবৃত্ত পঙ্‌ক্তির শেষে সাধারণতঃ বক্র, শঙ্খ, গর্ব, বাদ্য প্রভৃতি শব্দ রাখা হয় না।

চতুর্মাত্রক পর্ব-রচিত একপদী পঙ্‌ক্তির ধারাবাহিক প্রয়োগ খুবই বিরল। পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব-রচিত একপদী পঙ্‌ক্তির এ-রকম প্রয়োগ বিরলতর। সব রকম একপদী পঙ্‌ক্তির সাধারণতঃ বৃহত্তর পঙ্‌ক্তিবন্ধের অনুষঙ্গ হিসাবেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নানা দৃষ্টান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে।

এখানে যথাক্রমে পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব নিয়ে গড়া একপদী পঙ্‌ক্তির কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

দুই। পঞ্চমাত্রক পর্বের একপদী পঙ্‌ক্তি

পূর্বেই বলা হয়েছে দলবৃত্ত রীতিতে পাঁচ মাত্রার পর্ব রচনার চল নেই। মিশ্রবৃত্ত রীতিতেও নেই। তবে একসময়ে চলত, কিন্তু তারও দৃষ্টান্ত খুব কম। এখানে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকে।

১। মিশ্রবৃত্ত একপদী—এক পর্বের পদ (চপলাবলী ছন্দ)

ব্রিটিস, গণে।   শতদ্রু, তটে।
অভয়, মনে॥   পাছে কি, ঘটে।···
শিখের, সনে।   সমর, স্থলে।
সেজেছে, রণে॥   কামান, কলে॥
লাহোরা, ধিপ।   বিপক্ষ, দলে।
শিশু দ, লিপ॥   বধিবে, বলে।
তার স, মীপ।   শিখের, পাপে
সমর, দীপ॥···   তোমার, দাপে॥
স্বরূপ, বটে॥   রণ প্র, তাপে।
সকলে, রটে॥   অবনী, কাঁপে॥

—ঈশ্বর গুপ্ত, ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়

২। মিশ্রবৃত্ত একপদী—দুই পর্বের পদ (তড়িৎগতি ছন্দ)

পাপ আয়ানে শুনিলে কানে।
গঞ্জনা-বাণে বধিবে প্রাণে॥···
বংশীর ধ্বনি যেন হে ফণী।
আমি রমণী প্রমাদ গণি॥
নিদয় বাঁশী হৃদয়-ফাঁসী।
করে উদাসী ছুটিয়া আসি॥

—ঈশ্বর গুপ্ত, কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা

প্রথম দৃষ্টান্তে কবি ঈশ্বর গুপ্ত যেভাবে কমা-চিহ্ন দিয়ে প্রত্যেক পর্বের উপযতি-বিভাগ নির্দেশ করেছেন, তাতে বোঝা যায় তাঁর ছন্দসচেতন কান কত প্রখর ছিল। আরও লক্ষণীয়, প্রথম দৃষ্টান্তে তিনি প্রথম পর্বের পরে এক দাঁড়ি আর দ্বিতীয় পর্বের পরে দিয়েছেন দুই দাঁড়ি। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে এক-দাঁড়ি ও দুই-দাঁড়ি চিহ্ন আছে দুই-দুই পর্বের পরে! তাতে বোঝা যায়, কবির মতে প্রথম দৃষ্টান্তে আছে এক পর্বের একপদী প্ঙক্তি আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আছে দুই পর্বের একপদী পঙ্‌ক্তি। কবির দেওয়া দুই দৃষ্টান্তের দুই নামের (চপলাবলী ও তড়িৎগতি) দ্বারাও কবির অভিপ্রেত এই পার্থক্যই সূচিত হয় (যদিও এই নাম-দুটি প্রায় অভিন্নার্থক)। কিন্তু গোলযোগ ঘটিয়েছে কবির অত্যধিক মিলপ্রিয়তা। যদি উভয় ক্ষেত্রেই পরপর চার পর্বে একই মিল না থাকত তবে এই পার্থক্য স্পষ্টতর হত। বর্তমানে যা আছে তাতে অনায়াসেই প্রথম দৃষ্টান্তকে দ্বিতীয়ের মতো অথবা দ্বিতীয়কে প্রথমের মতো সাজানো যায়। ফলে দুই দৃষ্টান্তকেই যে-কোনো এক বর্গের বলে নির্দেশ করা যায়।

১। কলাবৃত্ত একপদী—এক পর্বের পদ

সরস-দল শমন-ঘরে
পনস ফল। গমন করে।
সরল নল বসন পরে
তরল জল। শয়ন করে।

—মদনমোহন, শিশুশিক্ষা (প্রথম ভাগ)

২। কলাবৃত্ত একপদী—তিন পর্বের পদ (৫+৫+২, ৩, ৫ মাত্রা)

ক. নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।···
সেদিন হতে চলিল জুতো পরা,
বাঁচিল গোরু, রক্ষা পেল ধরা।

—কল্পনা, জুতা-আবিষ্কার

খ. আবার কবে ধরণী হবে তরুণা?

কাহার প্রেমে আসিবে নেমে ॥ স্বরগ হতে করুণা?
অনেক দিন পরানহীন ধরণী।
বসনাবৃত খাঁচার মতো ॥ তামসঘন-বরনী।

—মানসী, শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি একপদী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী, কেননা এই দুই পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্বের পরে আছে অর্ধযতি।

গ. দানব-হেন আছে কে যেন দুয়ার আঁটি।
কাহার কাছে না জানি আছে সোনার কাঠি?···
সে হাসিখানি আনিবে টানি সবার হাসি,
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ, জীবনরাশি।···
আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি আকুল নীরে,
ঝরনা-সম জগৎ মম ঝরিবে শিরে।

—মানসী, শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা

শেষ দুই দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পর্বের অন্তে মিল আছে! এ-রকম মিল থাকা অত্যাবশ্যক নয়,। প্রথম দৃষ্টান্তেই এ-রকম মিল নেই।

এই তিন দৃষ্টান্তের তৃতীয় পর্বে আছে যথাক্রমে দুই, তিন ও পাঁচ মাত্রা। তাই প্রথম দু-রকম পঙ্‌ক্তিই অপূর্ণ একপদী। আর তৃতীয় দৃষ্টান্তের পঙ্‌ক্তিকে বলা যায় পূর্ণ একপদী।

তিন। ষন্মাত্রক পর্বের একপদী পঙ্‌ক্তি

১। কলাবৃত্ত একপদী—দুই পর্বের পদ, পূর্ণ ও অপূর্ণ

ক. তুমি রানী, আছে। টাকা শত শত,
খেলাছলে কর। দানধ্যান কত।
তোমার তো শুধু হুকুম মাত্র,
খাটুনি আমার দিবসরাত্র।

খ. তাই তো ভরসা। মরণ মোরে
নেবে না সহসা। ভরসা করে।
ওই যে তোমার দরজা জুড়ে
বসে আছে যত দেশের কুঁড়ে।

—লক্ষ্মীর পরীক্ষা, প্রথম দৃশ্য, ক্ষীরোর উক্তি

গ. ওই বসেছ শুভ্র। আসনে

আজি নিখিলের সম্।-ভাষণে।
আহা শ্বেতচন্দন।-তিলকে।
আজি তোমাকে সাজিয়ে দিল কে।
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখশয়ন তেয়াজি।

—গীতবিতান (প্রকৃতি, শরৎ), ওগো শেফালি-বনের'

ঘ. ওরে এ কী শুনি কোলা।-হল,
হেরি এ কী ঘননীল। জল।
ওই বুঝি রে সাগর হোথা,
উহার কিনারা না জানি কোথা
ওই লাখে লাখে ঢেউ ওঠে,
সদাই মরিতেছে মাথা কুটে।।

—নদী (সাগর বর্ণনা)

প্রথম দৃষ্টান্তের সব পঙ্‌ক্তি পূর্ণ একপদী। বাকি তিন দৃষ্টান্তের শেষ পর্বে আছে যথাক্রমে পাঁচ, তিন ও দুই কলামাত্রা। অর্থাৎ এই তিন দৃষ্টান্তেরই সব পঙ্‌ক্তি অপূর্ণ একপদী।

২। কলাবৃত্ত একপদী—তিন পর্বের পদ, অপূর্ণ

পথের প্রান্তে। আমার তীর্থ। নয়,
পথের দু' ধারে। আছে মোর দেবা।-লয়।

—লেখন, 'পথের প্রান্তে'

চার। সপ্তমাত্রক পর্বের একপদী পঙ্‌ক্তি

১। দলবৃত্ত একপদী—এক পর্বের পূর্ণপদ ও দুই পর্বের অপূর্ণ পদ

আলো যে যায় রে দেখা
হৃদয়ের পুব-গগনে। সোনার রেখা।···
কারে ওই যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগর-তীরে। দাঁড়ায় একা?

—গীতালি-৫, 'আলো যে'

আগুনের পরশমণি! ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীবন পূণ্য করো। দহন-দানে।···

আকাশের গায়ে গায়ে। পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা। নব নব

—গীতালি-১৮, 'আগুনের পরশমণি'

২। কলাবৃত্ত একপদী—দুই পর্বের পদ, পূর্ণ
গভীর রজনীর। রিক্ত ভিখারীকে
ভোরের বেলাকার। কী লিপি দিলে লিখে।···
অস্ত উদয়ের। মাঝেতে তুমি এসে
প্রাচীন-নবীনেরে। টানিছ ভালবেসে,
বধূ ও বর রূপে। করিলে এক-হিয়া
অরুণ কিরণের। গ্রন্থি বাঁধি দিয়া।

—শিশু, অস্তসখী

৩। কলাবৃত্ত একপদী—তিন পর্বের পদ, পূর্ণ।
ললাটে জয়টীকা, প্রসূনহার গলে, চলে রে বীর চলে;
সে কারা নহে কারা যেখানে ভৈরব রুদ্র-শিখা জ্বলে।

—নজরুল, বিয়ের বাঁশি, বন্দী-বন্দনা

মিশ্রবৃত্ত সপ্তমাত্রক পর্বের একপদী পঙ্‌ক্তি দেখা যায় না। —একপদী পঙ্‌ক্তির পরিচয় যথেষ্ট সবিস্তাবে দেওয়া গেল। দ্বিপদীর ত্রিপদী ও চৌপদী পঙ্‌ক্তির পরিচয় এত সবিস্তারে দেওয়া অনাবশ্যক। তাই এখানে এই ত্রিবিধি ছন্দপঙ্‌ক্তির বহু প্রচলিত কয়েকটি প্রধান রূপের পরিচয় দেওয়াই যথেষ্ট। কেননা, একপদী পঙ্‌ক্তির বিভিন্ন রূপের সহায়তায় অন্যান্য পঙ্‌ক্তিরূপের পদগত বিশিষ্টতা নিরূপণ করা পাঠকের পক্ষে কঠিন হবে না।

দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি

যে ছন্দপঙ্‌ক্তি একটিমাত্র অর্ধযতির দ্বারা দুই ভাগে (অর্থাৎ দুই পদে) বিভক্ত হয় তাকে বলে **দ্বিপদী**। নিম্নে দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির কয়েকটি প্রধান রূপের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

এক। চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি

১। দলবৃত্ত দ্বিপদী (পয়ার)—৪+৪। ৪+২ মাত্রা
ক. আজ বিকালে কোকিল ডাকে। শুনে মনে লাগে
বাংলাদেশে ছিলাম যেন। তিন শো বছর আগে।

—খেয়া, কোকিল

খ. সেই আমাদের দেশের পদ্ম। তেমনি মধুর হেসে,

ফুটেছে ভাই অন্য নামে। অন্য সুদূর দেশে।

—স্ফুলিঙ্গ-২৪৫, 'সেই আমাদের'

২। কলাবৃত্ত দ্বিপদী (পয়ার)—৪+৪ । ৪+২ মাত্রা

ক. পূর্ণিমা রাত্রের। জ্যোৎস্না-ধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা। তন্দ্রা হারায়।

—চিত্রবিচিত্র, উৎসব

খ. সংসারে জ্বেলে গেলে। যে নব আলোক,
জয় হোক, জয় হোক। তারি জয় হোক।
বন্দীরে দিয়ে গেছ। মুক্তির সুধা,
সত্যের বরমালে। সাজালে বসুধা।

—গীতিবিতান, পূজা, 'মবণ-সাগর-পারে'

৩। মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী (পয়ার)—৪+৪ । ৪+২ মাত্রা

ক. জন্মেছি যে মর্ত্যকোলে!। ঘৃণা করি তারে
ছুটির না স্বর্গ আর। মুক্তি খুঁজিবারে।

—সোনার তরী, আত্মসমর্পণ

খ. সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে । মেঘে মায়া ঢালে,
ভরিল সন্ধ্যার খেয়া। সোনার খেয়ালে।

—স্ফুলিঙ্গ-২৪৩, 'সুন্দরের'

এই দৃষ্টান্তগুলিতে পর্ববিভাগ উহ্য রাখা হয়েছে। তাই একদণ্ডচিহ্ন (।) দিয়েই পদবিভাগ দেখানো হল।

ত্রিবিধ দৃষ্টান্তেরই পঙ্‌ক্তিগুলি একটি করে অর্ধযতির দুই ভাগে (মানে দুই পদে) বিভক্ত। অতএব এগুলি দ্বিপদী। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উদ্ধৃত ত্রিবিধ দৃষ্টান্তেরই প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে চোদ্দ মাত্রা, আর ওই চোদ্দমাত্রা আট ও ছয় মাত্রার দুই পদে বিভক্ত। এ-রকম আট-ছয় মাত্রায় বিভক্ত দ্বিপদী বন্ধেরই প্রয়োগসিদ্ধ বিশেষ নাম **পয়ার**।

আধুনিক কালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মিনী উপখ্যান' কাব্যে (১৮৫৮) আট-দশ মাত্রার দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি রচনার আদর্শ স্থাপন করেন। কালক্রমে এই দীর্ঘ দ্বিপদী বন্ধ (পঙ্‌ক্তিরূপ) পরিচিত হয়েছে **দীর্ঘ পয়ার** বা **মহাপয়ার** নামে। রঙ্গলাল এই মহাপয়ার রচনা করেছিলেন মিশ্রবৃত্ত রীতিতে। দীর্ঘকাল পরে দলবৃত্ত রীতিতেও মহাপয়ার রচনা প্রচলিত হয়। কলাবৃত্ত রীতিতে মহাপয়ার রচনা এখনও সুপ্রচলিত হয়নি। কালক্রম অনুসারে এই তিন রীতির রীতির মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

১। মিশ্রবৃত্ত দীর্ঘ দ্বিপদী (মহাপয়ার)—৪+৪। ৪+৪+২ মাত্রা

সেই দিন রাজা তথা। পরিহরি ছত্র-সিংহাসনে
রাজপাটে যথাবিধি। বরিলেন প্রথম নন্দনে।
অরিসিংহ নাম তাঁর, অরিপক্ষে সিংহের সমান,
তিন দিন পরে শূর সসৈন্যেতে রণভূমে যান।

—রঙ্গলাল, পদ্মিনী-উপাখ্যান, অরিসিংহের যুদ্ধ

পূর্ণ করি মহাকাল। পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রামগ্ন মহাদেব। দেখিছেন মহান্ স্বপন।···
উঠিতেছে চন্দ্র সূর্য,। উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ। নক্ষত্রের জ্যোতি-পরিবার।

—প্রভাত সংগীত, মহাস্বপ্ন

২। দলবৃত্ত দীর্ঘ দ্বিপদী (মহাপয়ার)—৪+৪। ৪+৪+২ মাত্রা

ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আর,। এই এসিয়ায় দাঁড়াও সরে এসে
বৃদ্ধ-জনক-কবীর নানক। নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে।
ভাবসাধনার এই ভুবনে। এস তোমার নূতন বাণী লয়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার। ভক্তমালে নূতন মণি হয়ে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র আবীর, বড়দিনে

৩। কলাবৃত্ত দীর্ঘ দ্বিপদী (মহাপয়ার)—৪+৪। ৪+৪+২ মাত্রা

কখনো বা ফাগুনের। অস্থির এলোমেলো চাল,
    জোগাইত নাচনের তাল।···
সখে অজানা পথ। ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে। যাত্রীর পাত্রটি পুরে
সদয় অতীত কিছু। সঞ্জয় দান করে তারে
    পিপাসার গ্লানি মিটাবারে।

—নবজাতক, শেষবেলা

কলাবৃত্ত মহাপয়ারের দৃষ্টান্তটির দ্বিতীয় এবং শেষ পঙ্‌ক্তি খণ্ডিত, অর্থাৎ এই দুই পঙ্‌ক্তির প্রথম পদের আট মাত্রা বর্জিত এবং দ্বিতীয় পদের দশ মাত্রা রক্ষিত হয়েছে।

সাধারণ পয়ারের ন্যায় মহাপয়ারও একটি অর্ধযতির দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। সুতরাং বলা বাহুল্য, সাধারণ পয়ারের ন্যায় মহাপয়ার ও দ্বিপদী বন্ধেরই প্রকারভেদ মাত্র। সাধারণ পয়ার ও মহাপয়ার অনেক সময় যথাক্রমে **ছোট পয়ার ও বড় পয়ার** নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।

তিন রীতির সাধারণ পয়ার (ছোট পয়ার) এবং তিন রীতির মহাপয়ার (বড় পয়ার), এই ছয় প্রকার পয়ার বন্ধের কথা মনে না রাখলে পয়ার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। আরও মনে রাখা উচিত যে, এই ছয়-রকম পয়ারই আসলে দ্বিপদী। এগুলি ছাড়া আরও নানারকম দ্বিপদী আছে। কিন্তু সেগুলিকে পয়ার বলা হয় না। এবার অ-পয়ার শ্রেণীর দ্বিপদীর কিছু পরিচয় দিচ্ছি।—

১। দলবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী—৪+৪ । ৪+৪ মাত্রা

তোমার মাপে হয় নি সবাই,। তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মরো কারও ঠেলায়,। কেউ বা মরে তোমার চাপে।
তবু ভেবে দেখতে গেলে। এমনি কিসের টানাটানি।
তেমন করে হাত বাড়ালে। সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে। মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি। মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।

—ক্ষণিকা, বোঝাপড়া

২। কলাবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী—৪+৪ । ৪+৪ মাত্রা।

চম্পক তরু মোরে। প্রিয়সখা জানে সে,
গন্ধের ইঙ্গিতে। কাছে তাই টানে যে।
মধুকর-বন্দিত। নন্দিত সহকার
মুকুলিত নতশাখে। মুখে তাহে কহ কার।

—বীথিকা, কবি

৩। মিশ্রবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী—৪+৪ । ৪+৪ মাত্রা।

এখন বিশ্বের তুমি,। গুন্‌গুন্ মধুকর
চারি দিকে তুলিয়াছে। বিস্ময়-ব্যাকুল স্বর।
গাহে পাখি, বহে বায়ু,। প্রমোদ-হিল্লোল-ধারা
নবস্ফুট জীবনেরে। করিতেছে দিশাহারা।

—মানসী, শেষ উপহার

আট-আট মাত্রার দ্বিপদীকে বলা যায় পূর্ণ দ্বিপদী। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে এ-রকম পূর্ণ দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির প্রয়োগ অতি বিরল। —এবার আর-এক রকম দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১। মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী—৪+৪+২। ৪+৪+২ মাত্রা

শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ,
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে।
কী দিবে কিছুই নেই তার,
চোখে শুধু অশ্রুজল আছে।

—কড়ি ও কোমল, কাঙালিনী

২। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৪+৪+২। ৪+৪+২/৩ মাত্রা

ক. সুন্দরী ওগো শুক তারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ,
স্বপ্নে যে বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

—মহুয়া, শুকতারা

খ. মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ,
দহে অন্তরে নির্বাক্‌ বহ্নি।
ওষ্ঠে কী নিষ্ঠুর হাস,
তব মর্মে যে ক্রন্দন, তন্বী।

—গীতবিতান (প্রেম), ‘প্রাণ চায়’

গ. কাত হয়ে কান ধরে দাঁড়া,
জিভখানা উল্‌টিয়ে দেখা।
ভাল করে বুঝে শুনে দেখি
বিজ্ঞানে যে-রকম লেখা।

—সুকুমার রায়, অবোল তাবোল, বিজ্ঞানশিক্ষা

৩। দলবৃত্ত দ্বিপদী—৪+৪+২। ৪+৪+২ মাত্রা

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পরে নজর এত কেন?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো,
সবার আমি একবয়সী জেনো।

—ক্ষণিকা, কবির বয়স

৪। দলবৃত্ত দ্বিপদী—৪+৪+৪। ৪+৪+২ মাত্রা

কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে,
গানে গানে ছেয়ে পড়ল দেশটা।
কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কো নেড়েচেড়ে
কি-রকম যে দাঁড়ায় এখন শেষটা।
সভায় সভায়, মাঠে হাটে, গোলেমালে,
বক্তৃতাতে আকাশ-পাতাল ফাটছে;
যাদের সময় কাট্‌ত না কো কোনো কালে,
তাদের এখন খাসা সময় কাটছে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, নেতা (১৪শ চিত্র)

অন্যান্য বহু দৃষ্টান্তের ন্যায় এখানেও পর্ববিভাগ উহ্য আছে। আর পদবিভাগ দেখানো হল দুই পদ দুই ছত্রে সাজিয়ে। প্রথম তিন দৃষ্টান্তের প্রতি পদে আছে তিন পর্ব, দুটি পূর্ণ আর একটি অপূর্ণ। প্রতি পূর্ণ পর্বে চার মাত্রা, অপূর্ণ পর্বে দুই বা তিন মাত্রা। চতুর্থ দৃষ্টান্তে প্রথম পদের শেষ পর্ব পূর্ণ। আর কোনো পার্থক্য নেই। আসলে কথা এই যে, আট-ছয় এবং আট-দশ মাত্রার দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি ‘পয়ার’ নামে চিহ্নিত হলেও আট-আট এবং দশ-দশ মাত্রার দ্বিপদী পঙক্তি পয়ার বলে গণ্য হয় না।

দুই। পঞ্চমাত্রক পর্বের দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি

দলবৃত্ত রীতিতে পঞ্চমাত্রক পর্ব রচনার চল নেই। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে পঞ্চমাত্রক পর্ব আগে চলত, কিন্তু অতি সামান্যই। তার দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছে। একপদী পঙ্‌ক্তির প্রসঙ্গে। আধুনিক কালে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে পাঁচ মাত্রার পর্ব অচল হয়ে গেছে। এখন শুধু কলাবৃত্ত রীতিতেই পাঁচ মাত্রার পর্ব রচনাই চলে।

১। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৫+৫ ।৫+২ মাত্রা

ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে। বসায়ে আপনারে
আপন পায়ে না দিই যেন। অর্ঘ্য ভারে ভারে।…
সবাই বড়ো হইলে তবে। স্বদেশ বড়ো হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত। সিদ্ধ হবে তবে।

—মানসী, দেশের উন্নতি

২। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৫+৫। ৫+৫ মাত্রা

ঘুচাতে চাস যদি রে এই। হতাশাময় বর্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল্। ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।…
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা। পরস্পরে রাঙায় চোখ,
পূণ্য-সেনা নিজের কর্। পাপের সেনা শত্রু হোক।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, মেধার পতন, পঞ্চম অঙ্ক, কিসের শোক করিস ভাই

৩। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৫+৫+২। ৫+৫+৩ মাত্রা

রাজার পদ চর্ম-আবরণে।
ঢাকিল বুড়ো হাসিয়া পদোপান্তে।
মন্ত্রী কহে, আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।

—কল্পনা, জুতা-আবিষ্কার

তিন। ষণ্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি

অধুনাপূর্ব কালে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত ছয় মাত্রার পর্ব ছিল কবিদের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। আধুনিক কালে ছয় মাত্রার পর্ব রচিত হয় একমাত্র কলাবৃত্ত রীতিতে। আর ছয় মাত্রার দলবৃত্ত পর্ব দেখা যায় বোধকরি শুধু কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটিমাত্র রচনায়।

১। দলবৃত্ত দ্বিপদী—৬+৬। ৬+৩ মাত্রা

ওরে মূর্খ জানিস্। 'মা মা' বলে সখের
অশ্রু ফেলা বেশি | শক্ত নয়,
যে-জন চেঁচায় বেশি। 'দীনবন্ধু' বলে
সে-জন সত্যই বেশি | ভক্ত নয়।
যেজন কার্য করে নিস্তব্ধে নিভৃতে
নির্জনে, জননীর জন্য, সেই
যোগ্য সুসন্তান, সেই মায়ের প্রিয়পুত্র,
সেই সে জগন্মান্য, ধন্য সেই।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, ভক্ত (১৫শ চিত্র)

২। দলবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী—৬+৬। ৬+৬ মাত্রা।

ওরে ও ভাই চাষি, | ওরে ও ভাই তাঁতি,
পড়িস্ না কো নুয়ে, | জানিস্ এসব ফাঁকি।
তোদের অন্নে পুষ্ট, | তোদের বস্ত্র গায়ে,
করবে তোদর উপর | রক্তবর্ণ আঁখি?
সারিবদ্ধ হয়ে একবার মাথা তুলে।
দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজা ভাবে—
দেখ্‌বি এই যে দম্ভ, দেখ্‌বি এই যে দর্প,

দেখ্‌বি এই যে স্পর্ধা, চূর্ণ হয়ে যাবে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, রাজা (১৬শ চিত্র)

এই দুটি দৃষ্টান্তের উচ্চারণের প্রতি একটু মনোনিবেশ করলে বোঝা যাবে, উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম ও তৃতীয় ষণ্মাত্রক বিভাগের পরে আছে লঘুযতি, দ্বিতীয় বিভাগের পরে অর্ধযতি, আর চতুর্থ বিভাগের (অপূর্ণ বা পূর্ণ) পরে পূর্ণযতি। লঘুযতির বিভাগের নাম পর্ব, আর অর্ধযতির বিভাগের নাম পদ। প্রতি পদে আছে দুই পর্ব। সে হিসাবে দুটি দৃষ্টান্তই দ্বিপদী। কিন্তু সেকালে লঘুযতি ও অর্ধযতির পার্থক্যবোধ ছিল না। ফলে পদ-পর্বের পার্থক্যও সেকালের চেতনায় ধরা পড়ে নি। তাই সেকালের আদর্শে প্রথম দৃষ্টান্তটিকে বলতে হবে ছয়-ছয়-নয় মাত্রার 'ত্রিপদী' এবং দ্বিতীয়টিকে বলতে হবে ছয়-ছয়-ছয়-ছয় মাত্রার 'চৌপদী'। কিন্তু এ-রকম নামকরণ আধুনিক কালের সূক্ষ্ম যতিবোধের বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়।

আরও লক্ষণীয়, এই দুই দৃষ্টান্তের অধিকাংশ স্থলেই ছয় মাত্রার পর্ব তিন-তিন মাত্রার দুই উপপর্বে বিভক্ত না হয়ে দুই-দুই-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে বিভক্ত হয় এবং তৃতীয় উপপর্বের আদিতে একটি করে বিশেষ ঝোঁক (প্রস্বর) পড়ে। তাতে ষণ্মাত্রক দলবৃত্ত পর্বের গতিভঙ্গিতে একরকম বিশিষ্টতা অনুভূত হয়। এই বিশিষ্টতাই এ-রকম রচনার প্রধান গুণ। এ সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর আলোচনার স্থান এটা নয়।

১। মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী—৬+৬। ৬+২ মাত্রা

ক. কৈলাস ভূধর   অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ,
গন্ধর্ব কিন্নর   যক্ষবিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস।···
নন্দী দ্বারপাল   ভৈরব বেতাল
কার্তিকেয় গণপতি,
ভূত প্রেত যক্ষ   ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ
গণিতে কার শকতি।

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, কৈলাস-বর্ণন

খ. পৃথিবী ডাকিছে আপন সন্তানে,
বাতাস ছুটিছে তাই—
গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের সন্ধানে
চলিয়াছে কত ভাই।
বঙ্গের কুটীরে এসেছে বারতা,
শুনিছে কি তাহা সবে।
জেগেছে কি কবি শুনাতে সেকথা

জলদ-গম্ভীর রবে?

—কড়ি ও কোমল, আহ্বানগীত

অধুনাপূর্ব কালে ছয়-ছয়-আট মাত্রার তিনটি বিভাগকে বলা হত 'পদ'। তাই এ-রকম ছন্দপঙ্‌ক্তি পরিচিত হয়েছিল 'ত্রিপদী' (লঘু) নামে আর এই পদবিভাগ বোঝানো হত প্রথম দুই পদের অন্তে মিল দিয়ে। তার কারণ সেকালে যতিবোধ ছিল অতি ক্ষীণ। লঘুযতি-অর্ধযতির পার্থক্যবোধ তো একেবারেই ছিল না। ফলে পদ ও পর্বের পার্থক্যও তখনকার ছন্দচেতনায় ধরা পড়ে নি। আধুনিক কালের সূক্ষ্ম যতিবোধের বিচারে ছয় মাত্রার প্রথম বিভাগের পরবর্তী যতির তুলনায় দ্বিতীয় বিভাগের পরবর্তী যতির গুরুত্ব বেশি, আর পঙ্‌ক্তির পরবর্তী যতির গুরুত্ব আরও বেশি। তাই এই তিন স্তরের যতি আজকাল পরিচিত হয়েছে যথাক্রমে লঘুযতি, অর্ধযতি ও পূর্ণযতি নামে। আর লঘুযতি ও অর্ধযতি-বিভাগের নাম হয়েছে যথাক্রমে পর্ব ও পদ। উপরের দুটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পঙ্‌ক্তি একটি করে অর্ধযতির দ্বারা দুই ভাগে অর্থাৎ দুই পদে বিভক্ত। অতএব এসব পঙ্‌ক্তিকে ত্রিপদী না বলে দ্বিপদী বলাই সমীচীন। আরও লক্ষণীয়, প্রথম দৃষ্টান্তে মিল রাখা হয়েছে প্রথম দুই পর্বের (তখনকার বিচারে প্রথম দুই পদের) অন্তে। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মিল রাখা হয়েছে প্রথম দুই পূর্ণ পদের (তানে-ধানে, রতা-কথা) এবং শেষ দুই অপূর্ণ পদের (তাই-ভাই, সবে-রবে) অন্তে। এর থেকেও বোঝা যায়, আধুনিক কালে লঘুযতি ও অর্ধযতির তথা পর্ব ও পদের পার্থক্যচেতনা সেকালের তুলনায় কত গভীর হয়েছে।

আর-একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সেকালে এ-জাতীয় পঙ্‌ক্তির তৃতীয় বিভাগটিকে আট মাত্রার অখণ্ড পদ বলেই মনে করা হত। ওই বিভাগটি আসলে ছয়-দুই মাত্রার দুই ভাগে বিভাজ্য, তা সেকালে কবিদেরও চেতনাগত হয় নি। আধুনিক কালে তা হয়েছে। উপরের দুই দৃষ্টান্তের শেষ বিভাগের তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে। আধুনিক কালে কবিরা অনেক বেশি ছন্দসচেতন। তাই তাঁরা শেষাংশে আট (ছয়-দুই) মাত্রার স্থলে নয় (ছয়-তিন) চালাতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

২। মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী—৬+৬। ৬+৩ মাত্রা

প্রতিদিন আমি, হে জীবন -স্বামী,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।···
তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে
কর্মপারাবার-**পারে হে**,
নিখিল-জগৎ-জনের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

—নৈবেদ্য-১, 'প্রতিদিন আমি'

লক্ষণীয়, প্রথম অংশে মিল আছে প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পর্বে (আমি-স্বামী, কর-শ্বর), আর শেষাংশে মিল আছে দুই পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পদে (সারে-ঝারে)। এই দ্বিতীয় প্রকার মিলই আছে এই রচনাটির অন্য সব

স্থলেই। 'পারে হে' ভাগান্ত পদটি মিলহীন, **নিঃসঙ্গ**।

৩। মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী—৬+৬। ৬+৫ মাত্রা

ক. চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশে নি যারে।

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সদ্ভাবশতক, সুখী দুঃখীর দুঃখ বুঝে না

খ. দেখেছি সন্ধ্যায়, শান্ত হৈম করে
রঞ্জিত মেঘের গরিমাদীপ্ত,
দেখেছি ঊষায়, নীল সরোবরে
অমল কমল শিশির-লিপ্ত।···
এ বিশ্বে সৌন্দর্য যেই দিকে চাই
রাশি রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট,
তেমন সৌন্দর্য কিন্তু দেখি নাই
শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্দ্র, জীবন-পথের নবীন পান্থ

আগেকার দিনে এ-রকম ছন্দপঙ্‌ক্তিকে বলা হত 'চৌপদী' (লঘু) এবং এর প্রথম তিন পদে (আসলে পর্বে) মিল দিয়ে ওই পদবিভাগ বোঝানো হত। এর নমুনা দেখানো গেল উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্তটিতে! আসলে কিন্তু অর্ধযতির বিচারে এটাও দ্বিপদী, চৌপদী নয়। আধুনিক কালে এ-রকম ছন্দের প্রথম তিন পর্বে মিল দেওয়া অনাবশ্যক বলেই বিবেচিত হয়। যদি মিল দিতেই হয় তবে পর-পর দুই পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পদে মিল রাখা হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে উদ্ধৃত দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে করে-বরে, দীপ্ত-লিপ্ত ইত্যাদি পর্যায়ক্রমিক মিলের প্রতি একটু নজর দিলেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পর্ব রচনা আজকাল আর চলে না। আসলে ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পর্ব আজকাল রূপান্তরিত হয়েছে কলাবৃত্ত পর্বে। উপরে ষণ্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির যে তিন রূপ দেখানো হল, নিম্নে তার কলাবৃত্ত প্রতিরূপের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল যথাক্রমে।

১। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৬+৬। ৬+২ মাত্রা

ক. এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়। আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত। কাঙালের ধন চুরি।

—চিত্রা, দুই বিঘা জমি

খ. পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র। হিমানীর গ্লানি মাখা,

পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ,। শিহরে নগ্ন শাখা।

—চিত্রা, সিন্ধুপারে

আধুনিক কালের কবিরা এ-রকম কলাবৃত্ত দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পর্বে কখনও মিল রাখেন, কখনও মিল বর্জন করেন। সেকালের কবিদের মতো মিল দেওয়া অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন না।

২। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৬+৬। ৬+৩ মাত্রা।

ক. বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে। ফুকারিয়া ডাকো, জননী,
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নামিছে। আঁধারে ঘেরিছে ধরণী।···
তোমার বনের ফুলের গন্ধ। আসিছে সন্ধ্যা-সমীরে,
শেষ গান গাহে তোমার কোকিল। সুদূর কুঞ্জ-তিমিরে।

—কল্পনা, মাতার আহ্বান

খ. লোকটি কে ইনি, যেন চিনি-চিনি,। বাঙালি মুখের ছন্দ—
ধরনে-ধারণে অতি অকারণে। ইংরাজিতরো গন্ধ।
ধুতিপরা দেহ দেখা দিলে কেহ। অতিশয় লাগে লজ্জা,
বাংলা আলাপে রাষে সন্তাপে। জ্বলে ওঠে হাড়-মজ্জা।

—কল্পনা, উন্নতি-লক্ষণ

প্রথম দৃষ্টান্তে পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পর্বে মিল নেই, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আছে।

৩। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৬+৬। ৬+৫ ও ৬ মাত্রা

ক. যেগাথা গাহিলা সে কখনো আর। হয় নি রচিত নারীর তরে,
সে শুধু শুনেছে নির্মলা ঊষা। নির্জন গিরি-শিখর ’পরে।
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা। নীল নির্বাক সিন্ধুতলে—
শুনে গলে যায় আর্দ্র হৃদয়। শিশিরশীতল অশ্রুজলে।

—কাহিনী, পতিতা

খ. যদিও মা তোর দিব্য আলোকে। ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা। ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য,। মানুষ আমরা, নাহি তো মেষ,
দে-বি আমার, সাধনা আমার,। স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, গান, ‘বঙ্গ আমার, জননি আমার’

গ. শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট। সাগর-ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার। পঞ্চসিন্ধু যমুনা-গঙ্গা।
কখনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত। তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখনো শ্যামল শস্যে। ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, গান, 'যে দিন সুনীল জলধি হইতে'

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'দেবি' শব্দের 'দে' দলটি দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চার্য ছন্দের প্রয়োজনে। গীতি-রচনায় মুক্তদলের এ-রকম দীর্ঘতাসাধন বৈধ বলেই স্বীকৃত।

৪। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৬+৬। ৬+৬+২ মাত্রা

তখন তরুণ, নয়ন করুণ;
কত দিনরাত চলে গেছে তার পর।
আঁধারে আলোকে বিষাদে পুলকে
কালের চক্র হয়েছে অগ্রসর।
কত সুখদুখ কত বিস্ময়,
কত আকাঙ্ক্ষা কত না অন্তরায়,
কত কণ্টক বিঁধিয়াছে মনে,
কত কঙ্কর ফুটিয়াছে পায়-পায়।

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জাগরণী, অনাহত

এখানে পদবিভাগ দেখানো হল দুই ছত্রে সাজিয়ে। পরবর্তী দৃষ্টান্ত-দুটিতেও এই নীতি অনুসৃত হল।

৫। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৬+৬+২। ৬+৬+২ মাত্রা

ক. বিদেশকে আজ ডাকো রৌদ্রের ভোজে
মুঠো মুঠো দাও কোষাগার-ভরা সোনা,
প্রান্তর বন ঝলমল করে রোদে
কি মধুর আহা রৌদ্রে প্রহর গোনা।

—সুকান্ত, ঘুম নেই. রৌদ্রের গান

এরকম দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির ছন্দে অনেক সময় দুই পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পদেও মিল রাখা হয়। যেমন—

খ. হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথি, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখি।

—গীতালি-১০৭, 'মুদিত আলোর'

গ. প্রথম যুগের উদয়-দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের ঊষা নেমে এল যবে
প্রকাশ-পিয়াসী ধরিত্রী বনে বনে

শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে।

—নবজাতক, উদ্বোধন

৬। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৬+৬+৩। ৬+৬+২ মাত্রা

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।

—উৎসর্গ-১৭, 'ধূপ আপনারে'

৭। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৬+৬+৪। ৬+৬+৩

ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুর-মন্দিরে?
ও যে দুটি তারা দূর পশ্চিম-গগনে।
ও কি শিঞ্জিত ধ্বনিছে কনক-মঞ্জীরে?
ঝিল্লির রব বাজে বনপথে সঘনে।

—কঙ্কানা, অসময়

চার। সপ্তমাত্রক পর্বের দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি

১। দলবৃত্ত দ্বিপদী—৭+৭। ২ মাত্রা এবং ৭+৭। ৭+২ মাত্রা

একদা ব্যাধের তাড়ায় ভয়েতে হরিণ হারায়। পথ,
শেষে এক দ্রাক্ষাবনে লুকালো সংগোপনে,
বুঝি বা কাট্‌ল এ বি : -পদ।
ছিল সে মাথা গুঁজে, ব্যাধেরা পায় না খুঁজে । তায়,
বলে, মুখ দেখেছি কার, পালাল প্রথম শিকার,
ভেবে আর ফল কি হবে,। হায়।

—কৃষ্ণদয়াল বসু, রুনুঝুনু, অকৃতজ্ঞ

এই দৃষ্টান্তের প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিকে সহজেই সাত-সাত-দুই দলমাত্রার অপূর্ণ একপদী বলে মনে করা যায়। তবে পরবর্তী দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির সান্নিধ্য ও মিলের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় ('হারায়' ও 'খুঁজে' শব্দের পরবর্তী) যতিটিকে অর্ধযতির মর্যাদা দিয়ে এই পঙ্‌ক্তি দুটিকে দ্বিপদী বলে গণ্য করাও অনুচিত হবে না।

২। দলবৃত্ত দ্বিপদী—৭+৭। ৭+৫ মাত্রা

চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে,
এত বল নাইরে তোমার, রবে না সেই টান।

শাসনে যত ঘের', আছে বল দুর্বলেরও,
হও না যতই বড়, আছেন ভগবান্।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারি হলেই ডুব্‌বে তরীখান।

—গীতবিতান, স্বদেশ, 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি'

৩। দলবৃত্ত দ্বিপদী—৭+৭। ৭+৭ মাত্রা

ক. বিষাদের অশ্রুজলে নীরবের মর্মতলে
গোপনে উঠুক ফ'লে হৃদয়ের নূতন বাণী।···
সারাদিন সংগোপনে সুধারস ঢালবে মনে
পরানের পদ্মবনে বিরহের বীণাপাণি।

—গীতবিতান, প্রেম, 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়'

খ. ফুলেরা তোমায় সাধে, সুবাসের শোলোক বাঁধে,
নিরালায় উশীর কাঁদে, থেক না বধির হয়ে।
এস গো অরূপ হতে মুরতির এই মরতে,
দেখা দাও আলোর রথে, ডাকে প্রাণ অধীর হয়ে।···
তোমারি মূক আরতির কাঁপে দীপ প্রজাপতির,
দ্যুলোকের মৌন দু-তীর উঠেছে মদির হয়ে!

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, সাঁঝাই

এই দৃষ্টান্তকে সাত দলমাত্রার পূর্ণ দ্বিপদী বলেও নির্দেশ করা যায়। তাছাড়া, এই দুই দৃষ্টান্তেই প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রথম তিন পর্বের অন্তে মিল রাখা হয়েছে। এ-রকম মিল-রাখা অত্যাবশ্যক নয়। প্রথম দুই দৃষ্টান্তের সঙ্গে তুলনা করলেও তা বোঝা যাবে। শেষ দৃষ্টান্তের বধির-অধীর-মদির শব্দের মিলটুকুও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এ-রকম সপ্তমাত্রক পর্বের পঙ্‌ক্তি ও চতুর্মাত্রক পর্বের পঙ্‌ক্তিকে একত্র সমাবিষ্ট করার নিদর্শনও আছে। যেমন—

সুদূরের বীণার স্বরে। কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে। উদাস করে—
সে কোন্ উধাও হাওয়ার। পাগলামিতে ॥ পাখা ওদের। ওঠে মাতি।···
যে বাসা ছিল জানা, সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাই রে মানা—
ওরা দিনের শেষে। দেখেছে কোন্ ॥ মনোহরণ আঁধার রাতি।

—গীতবিতান, প্রকৃতি, 'মেঘের কোলে কোলে' (১৯২১)

এটির প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ৭+৭ ॥ ৭+৪ দলমাত্রার অপূর্ণ দ্বিপদী। আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ৪+৪ ॥ ৪+৪ দলমাত্রার পূর্ণ দ্বিপদী।

এ-রকম আর একটি দৃষ্টান্ত এই—

কিছু মোর নেই ক্ষমতা। এ যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয়নি মরণ। শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি। আপন ভক্তি ॥ চরণে তোর। দেব মেলে।
নেব গো মেগে পেতে যা আছে তোর ঘরেতে,
দে তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ, সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে ।

—গীতবিতান, স্বদেশ, ‘মা কি তুই পরের দ্বারে’ (১৯০৫)

১। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৭+৭। ৭+২ মাত্রা

ক. নূপুর ছিল ঘরে, গিয়েছ তাই পরে,
নিয়েছ হেথা হতে তাই,
অঙ্গে আর কিছু নাই।···
হেলায় বাঁধা সেই নূপুর-দুটি পায়ে
আছে কি গেছে পথে খুলে,
সে-কথা ভাবি তরু-মূলে।

—উৎসর্গ-৪২, ‘মন্দ্রে সে যে পুত’

প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি একপদী—৭+২ মাত্রা।

খ. ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর
প্রভাত-অম্বর মাঝে,
দিকে দিগন্তরে ভুবন-মন্দিরে
শান্তি-সংগীত বাজে।

—গীতবিতান, পূজা, ‘ধ্বনিল আহ্বান’

২। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৭+৭। ৭+৫ মাত্রা

উঠিলে নব শশী ছাদের ’পরে বসি
আর কি উপকথা বলিবি না গো।
হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা আঁখিজলে রজনী জাগো।
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে

প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

—মানসী, বধূ

৩। কলাবৃত্ত দ্বিপদী—৭+৭। ৭+৭ মাত্রা।

জগৎ ব্যথা-ভরে জাগিছে জোড়-করে
এ মহা-কোজাগরে কি দিবে বরদান,
এস হে এস শ্রেয়, এস হে মৈত্রেয়,
ক্রূরতা-মূঢ়তার কর হে অবসান।

হে রাজ-সন্ন্যাসী, বিমল তব হাসি
ঘুচক গ্লানি-তাপ কলুষ সমুদায়।
ক্রোধেরে অক্রোধে জিনিতে দাও বল,
চিত যে বিচিলিত, চরণে রাখ তায়।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, বুদ্ধপূর্ণিমা

১। মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী—৭+৭। ৭+২ মাত্রা

ক. জয়া সে রূপবতী হরিদ্রা-যুত ধুতী
পরিয়া বসিলে আসনে,
যতেক দ্বিজমুনি করিল বেদধ্বনি
কন্যার গন্ধাধিবাসনে।

—মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল (ধনপতি), জয়াবতীর বিবাহ

খ. কহেন দেবী সুখী কোথা লো চন্দ্রমুখী
এস লো পদ্মমুখী রামা।
আছিলা স্বর্গবাসী শাপে ভূতলে আসি
ভুলিয়া নাহি চিন আমা।
এই যে ভবানন্দ পাইয়া মহানন্দ
মনে না করে পূর্ব-কথা।
আসার ইতিহাস করিল পরকাশ।
এখন চল যাই তথা।

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল (৩য় খণ্ড), অন্নদাপূজা

প্রথম দৃষ্টান্তের দুই পঙ্‌ক্তিতেই দ্বিতীয় পদে সাত মাত্রার পরবর্তী লঘুযতি অব্যক্ত আছে। সেকালের কবিরা দ্বিতীয় পদের পর্ববিভাগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই এই সাত-দুই মাত্রার পদটিকে নয় মাত্রার অখণ্ড

বিভাগ বলে মনে করা হত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে এ-বিষয়ে অধিকতর সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্যই রামা-আমা, কথা-তথা। এই চারটি দ্বিমাত্রক শব্দের পূর্ববর্তী লঘুযতি সুব্যক্ত আছে। তবে এই দৃষ্টান্তের 'শাপে ভূ ○ তলে : আসি' পর্বের প্রথম উপযতিটি অব্যক্ত আছে। আজকাল এ-রকম উপযতি-লোপের দৃষ্টান্ত আগের তুলনায় অনেক কম পাওয়া যায়। এটা প্রখরতর যতি-চেতনারই লক্ষণ।

২। মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী—৭+৭। ৭+৫ মাত্রা

কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিনী রানী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে।

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল (১ম খণ্ড), অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান'

লক্ষণীয় এই দৃষ্টান্তের 'লয়ে শীতল জল' এবং 'ছয় রাগিনী-রানী', এই দুই পর্বের প্রথম উপযতি অব্যক্ত আছে।

আগেকার দিনে ৭-৭-৯ [আসলে ৭+৭। ৭+২] মাত্রার পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পর্বে মিল রাখা হত। আর, এ-রকম পঙ্‌ক্তিকে বলা হত ত্রিপদী। অনুরূপ ভাবে ৭-৭-৭-৫ মাত্রার পঙ্‌ক্তিতে প্রথম তিন পর্বে মিল রাখা হত। আর, এ-রকম পঙ্‌ক্তিকে বলা হত চৌপদী। আধুনিক কালে অর্ধযতির বিচারে এই দু-রকম পঙ্‌ক্তিই দ্বিপদী বলে স্বীকার্য। আজকাল পঙ্‌ক্তির পর্ব ও পদ-বিভাগ নিরূপিত হয় অর্ধযতির বিচারে, মিলের বিচারে নয়। মিল ছন্দের অলংকরণ মাত্র, পঙ্‌ক্তিরূপের নিয়ামক নয়। এইজন্যই আজকাল পর্ব ও পদ-প্রান্তের মিল প্রায়শঃ বর্জিত হয়ে থাকে।

আজকাল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সাত মাত্রার পর্ব রচনা চলে না। চলে শুধু দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতিতে।

ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি

যে ছন্দপঙ্‌ক্তি দুই অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে (অর্থাৎ তিন পদে) বিভক্ত, তাকে বলা হয় **ত্রিপদী**। ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির তিন পদ সাধারণতঃ সমায়তন হয় না।

এক। চতুর্মাত্রক পর্বের ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি

১। দলবৃত্ত ত্রিপদী—৪+৪। ৪+৪। ৪+২ মাত্রা

কে গো চিরজন্ম ভরে
নিয়েছে মোর হৃদয় হরে,
উঠছে মনে জেগে।
নিত্যকালের চেনাশোনা
করছে আজি আনাগোনা

নবীন-ঘন মেঘে।

—উৎসর্গ-৩৫, 'দেখো চেয়ে গিরির শিরে'

২। কলাবৃত্ত ত্রিপদী—৪+৪। ৪+৪। ৪+৪+২ মাত্রা

অঘ্রান হল সারা,
স্বচ্ছ নদীর ধারা
বহি চলে কলসংগীতে।
কম্পিত ডালে ডালে
মর্মর তালে তালে
শিরীষের পাতা ঝরে শীতে।

—চিত্রবিচিত্র, শীত

৩। মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী—৪+৪। ৪+৪। ৪+২ মাত্রা

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা,
সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা।
দিনের কল্লোল 'পর
টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।

—কল্পনা, অশেষ

তিন দৃষ্টান্তেই পঙ্‌ক্তিগুলি দুটি অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে বা পদে বিভক্ত। দলবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত পঙ্‌ক্তির তিন পদে আছে যথাক্রমে আট-আট-ছয় মাত্রা। কলাবৃত্ত রীততে এ-রকম পঙ্‌ক্তি সুলভ নয়। তাই এখানে আট-আট-দশ মাত্রার দৃষ্টান্তই দেওয়া হল। কিন্তু এই রীতিতে আট-আট-ছয় মাত্রার ত্রিপদী বন্ধও অনায়াসেই রচনা করা চলে। যেমন—

অঘ্রান হল সারা,
বহিছে নদীর ধারা
কলসংগীতে।

এর চেয়ে ছোট আয়তনের ত্রিপদী বন্ধও দুর্লভ নয়। যেমন,

৪। মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী—৮+৬+৬ মাত্রা।

একদা তুলসীদাস। জাহ্নবীর তীরে। নির্জন শ্মশানে
সন্ধ্যায় আপন মনে একা একা ফিরে মাতি নিজ গানে।

—কথা, স্বামীলাভ

দলবৃত্ত রীতিতেও এ-রকম ত্রিপদী বন্ধের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে, অথবা অনায়াসেই রচনা করা যেতে পারে।

ত্রিপদী বন্ধে আরও নানা আয়তনের পদবিভাগ দেখা যায়। মিশ্রবৃত্ত ও দলবৃত্তের তুলনায় কলাবৃত্ত ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির রূপবৈচিত্র্য খুবই কম। নিম্নে তিন রীতির ত্রিপদীরূপের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

৫। দলবৃত্ত ত্রিপদী—৪+৪ । ৪+৪ । ৪+৪+২ মাত্রা

আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে
বলাকাদল যাচ্ছে উড়ে
    জানি নে কোন্ দূর সমুদ্র-পারে।
সজল বায়ু উদাস ছুটে
কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
    পথবিহীন গহন অন্ধকারে।

—উৎসর্গ-৩৫, ‘দেখো চেয়ে গিরির শিরে’

৬। কলাবৃত্ত ত্রিপদী—৪+৪ । ৪+৪ । ৪+৪+২/৩ মাত্রা

ক. মহিষী বলেন তবে,
    ‘দন্ত যদি না রবে
        কী দেখে হাসিব তবে প্রভু।’
    বাদশা শুনিয়া কহে,
    ‘কিছুই যদি না রহে,
        হসনীয় আমি রব তবু।’

—খাপছাড়া-৫১, ‘বাদশার মুখখানা’

খ. যেখানে সে বুড়া বট
    নামায়ে দিয়াছে জট
        ঝিল্লি ডাকিছে দিনে দুপুরে,
    যেখানে বনের কাছে
    বনদেবতারা নাচে
        চাঁদনিতে রুনুঝুনু নূপুরে।

—শিশু, ঘুমচোর

৭। মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী—৪+৪ । ৪+৪ । ৪+৪+২ মাত্রা

বসেছেন পদ্মাসনে
প্রসন্ন প্রশান্ত মনে

নিরঞ্জন আনন্দ-মূরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে,
স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্য-জ্যোতি।

—কথা, মূল্যপ্রাপ্তি

ত্রিপদী বন্ধের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রূপের দৃষ্টান্ত এখানে সাজিয়ে দেওয়া গেল।—

১। দলবৃত্ত ত্রিপদী—১০+১০+১০ মাত্রা

ওগো তোমার আনো খেয়ার তরী,
তোমার সাথে যাব অকূল-'পরি,
যাব সকল বাঁধন-বাধা-খোলা।
ঝড়ের বেলা তোমার স্মিত হাসি
লাগবে আমার সর্বদেহে আসি,
তরাস সাথে হরষ দেবে দোলা।

—উৎসর্গ, —৩৩, 'দেখো চেয়ে গিরির শিরে'

২। দলবৃত্ত ত্রিপদী—১২+১২+১২ মাত্রা

ফুলের মালা দীপের আলোর ধূপের ধোঁয়ার
পিছন হতে পাই নে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার,
সুরের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি।···
কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়,
পাতব আসন আপন মনের একটি কোনায়
সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি।

—গীতিমাল্য-৮১, 'তোমার পূজার'

৩। মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী—১০+১০+১০ মাত্রা

যেদিন প্রথম কবিগান
বসন্তের জাগাল আহ্বান
ছন্দের উৎসব-সভাতলে,
সেদিন মালতী যূথী জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে।

—পূরবী, আকন্দ

৪। মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী—৮+১০+৬ মাত্রা

চাব না পশ্চাতে মোরা, । মানিব না বন্ধন-ক্রন্দন,
    হেরিব না দিক্।
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক-বিচার,
    উদ্দাম পথিক।

—কল্পনা, বর্ষশেষ

৫। মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী—৮+৬+১০ মাত্রা

জীবন আছিল লঘু। প্রথম রয়সে,
    চলেছিনু আপনার বলে,
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা। নবীন প্রভাতে
    আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।

—মানসী, জীবনমধ্যাহ্ন

৬। মিশ্রবৃত্ত ত্রিপদী—৮+১০+১০ মাত্রা

মোরে কর সভাকবি। ধ্যানমৌন তোমার সভায়,
    হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা।
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
    বিরচিব তাহাদের গীতা।

—কল্পনা, রাত্রি

সন্ধান করলে দলবৃত্ত রীতিতেও ত্রিপদী পঙ্ক্তির এই তিন রূপের নিদর্শন পাওয়া যাবে। অন্ততঃ এই তিন রূপের দলবৃত্ত ত্রিপদী অনায়াসেই রচনা করা যাবে।

পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব-রচিত ত্রিপদী পঙ্ক্তির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রূপের দৃষ্টান্ত এখানে যথাক্রমে সাজিয়ে দেওয়া গেল।—

দুই। পঞ্চমাত্রক পর্বের ত্রিপদী পঙ্ক্তি

১। কলাবৃত্ত ত্রিপদী—১০+১০+৭ মাত্রা

কোথায় কবে। আছিলে জাগি,
বিরহ তব। কাহার লাগি,
    কোন্ সে তব। প্রিয়া।
ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী,
জানি তাহারে তুলেছ রচি
    আপন মায়া দিয়া।

—বীথিকা, পাঠিকা

২। কলাবৃত্ত ত্রিপদী—১০+১০+১২ মাত্রা

রোদের বেলা। ছায়ার বেলা
করেছি সুখ। দুখের খেলা,
সে খেলাঘর। মিলাবে মায়া। সম।
অনেক তৃষা অনেক ক্ষুধা
তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা,
উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।

—বীথিকা, প্রণতি

পঞ্চমাত্রক পর্বের ত্রিপদী বন্ধ এক মাত্র কলাবৃত্ত রীতিতেই চলে। অন্য দুই রীতিতে এ-রকম ত্রিপদী বন্ধ রচিত হয় না।

তিন। ষন্মাত্রক পর্বের ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি

১। কলাবৃত্ত ত্রিপদী—১২+১২+৯ মাত্রা

ওগো কোথা মোর। আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি। পরশ-চকিত,
কোথা গো স্বপন।-বিহারী।···
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপন-বিহারী।

—উৎসর্গ-৩, 'মোর কিছু ধন'

এর প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পদে আছে দুটি করে ছয় মাত্রার পূর্ণপর্ব, আর তৃতীয় পদে একটি পূর্ণপর্ব (ছয় মাত্রা) ও একটি অপূর্ণ পর্ব (তিন মাত্রা)।

২। কলাবৃত্ত ত্রিপদী—১৪+১৪+৮ মাত্রা

ক্লান্তি আপন। রাখিয়া দিল সে। ধীরে
স্তব্ধ পাখির। নীড়ে।
বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা
জপিল সে বার-বার।···
ওই যে তাহার বিপুল রূপের ধন

অরূপ আঁধারে করিল সমর্পণ

চরম নমস্কার।

—গীতালি-৬১, ‘ওই যে সন্ধ্যা’

এর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি একপদী। প্রথম পঙ্‌ক্তির এক পদে আছে ছয়-ছয়-দুই মাত্রার তিন পর্ব, তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির এক পদে আছে ছয়-দুই মাত্রার দুই পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব অপূর্ণ। তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি অপূর্ণ ত্রিপদী। উভয় পঙ্‌ক্তিরই প্রথম দুই পদে আছে ছয়-ছয়-দুই মাত্রার তিন পর্ব, তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ। আর এই দুই পঙ্‌ক্তিরই তৃতীয় পদে আছে ছয়-দুই মাত্রার দুই পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব অপূর্ণ।

৩। কলাবৃত্ত ত্রিপদী—১৪+১৪+১৪ মাত্রা

চক্ষে তোমার। কিছু বা করুণা। ভাসে,

ওষ্ঠে তোমার কিছু কৌতুক হাসে,

মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু সুর।

আলো-আঁধারের বন্ধনে আমি বাঁধা,

আশানিরাশায় হৃদয়ে নিত্য ধাঁধা,

সঙ্গ যা পাই তারি মাঝে রহে দূর।

—বীথিকা, ঈষৎ দয়া

এর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে তিনটি অপূর্ণ পদ। আর প্রতি পদে আছে ছয়-ছয়-দুই মাত্রার তিন পর্ব, শেষ পর্ব অপূর্ণ।

৪। কলাবৃত্ত ত্রিপদী—১৫+১৫+১৫ মাত্রা

দিকে দিকে আজি। টুটিয়া সকল। বন্ধ

মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ:

জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।···

নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়-প্রান্তে

উদার উষার উদয়-অরুণ কান্তি,

অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।

—গীতাঞ্জলি-৬, ‘প্রেমে প্রাণে গানে’

এই দুই পঙ্‌ক্তিতেই আছে তিনটি করে অপূর্ণ পদ। আর প্রতি পদেই আছে ছয়-ছয়-তিন মাত্রার তিন পর্ব, তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ।

ছয়-ছয় মাত্রার দুই পর্ব অর্থাৎ বারো মাত্রার তিন পদ নিয়ে গড়া কলাবৃত্ত পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত সুলভ নয়।

দলবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ছয় মাত্রার পর্ব নিয়ে গড়া কোনো-রকম ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

চার। সপ্তমাত্রক পর্বের ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি

৩। দলবৃত্ত ত্রিপদী—১১+১১+১১ মাত্রা

আমার এই দেহখানি। তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের। প্রদীপ করো,
নিশিদিন আলোক-শিখা। জ্বলুক গানে।…
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো,
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-পানে।

—গীতালি-১৮, 'আগুনের পরশমণি'

এর প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে তিন পদ। প্রতি পদে দুই পর্ব—প্রথম পর্ব পূর্ণ (সাত দলমাত্রা), দ্বিতীয় পর্ব অপূর্ণ (চার দলমাত্রা)।

কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সপ্তমাত্রক পর্বের ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

চৌপদী পঙ্‌ক্তি

যে ছন্দ-পঙ্‌ক্তি তিন অর্ধযতির দ্বারা চার ভাগে (অর্থাৎ চার পদে) বিভক্ত, তাকে বলা হয় **চৌপদী**। চৌপদীর শেষ পদ সাধারণতঃ অপূর্ণ থাকে। অনেক সময় চৌপদীর প্রথম তিন পদে মিল রাখা হয়। আবার কখনও-কখনও তৃতীয় পদ হয় মিলহীন।—নিম্নে যথাক্রমে চার, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব-গঠিত চৌপদী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

এক। চতুর্মাত্রক পর্বের চৌপদী পঙ্‌ক্তি

১। দলবৃত্ত চৌপদী—৮+৮+৮+৬ মাত্রা

দুয়ার জুড়ে কাঙাল-বেশে
ছায়ার মতো চরণ-দেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব!

—ক্ষণিকা, বাণিজ্যে বসতে লক্ষী

এর প্রথম পঙ্‌ক্তি চৌপদী। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী।

২। কলাবৃত্ত চৌপদী—৮+৮+৮+৫ ও ৭ মাত্রা

ক. পথপাশে মল্লিকা। দাঁড়াল আসি,

বাতাসে সুগন্ধের। বাজাল বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে
ছড়ায়ে হাসি।

—মহুয়া, বরযাত্রা

খ. চিরযুবা শূর-বীর। বিজয়ীর কুঞ্জে
আমাদের মঞ্জীর। সদালসে গুঞ্জে।
ভাবে যারা তন্ময়
জানে না মরণভয়,
তার লাগি আনি হয়
রণধূম-পুঞ্জে।
ফুটে উঠি হাসি-সম। খড়্গের ঝলকে,
মোরা করি মনোরম। মৃত্যুরে পলকে।
উৎসবে দীপাবলী
সনে মোরা নিবি জ্বলি,
সুরাসম উচ্ছলি'
চঞ্চল পুলকে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, তুলির লিখন, বিদ্যুৎপর্ণা

দুই দৃষ্টান্তেই প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী। তৃতীয় পঙ্‌ক্তি চৌপদী। পার্থক্য শুধু শেষ অপূর্ণ পদের মাত্রাসংখ্যায়। পদ বা পঙ্‌ক্তির অন্তস্থিত মুক্তদল প্রয়োজনমতো দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হতে পারে। সে হিসাবে এই দুই দৃষ্টান্তের শেষ পদে আছে যথাক্রমে ছয় ও আট কলামাত্রা। বস্তুতঃ এই 'বিদ্যুৎপর্ণা' কবিতারই কোনো-কোনো অংশে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন—

ফাল্গুনে মরতের। বুকে রচি নন্দন,
বনে বনে হরিতের। ঢালি হরি-চন্দন।
আকাশ-প্রদীপে চাহি'
মোরা কত গান গাহি,
কবি -হৃদে অবগাহী'
লভি শ্লোক বন্ধন।

এর থেকেও বোঝা যায়, এই কবিতাটির পঙ্‌ক্তিপ্রান্তস্থিত সব মুক্তদলই আসলে দ্বিমাত্রক। নতুবা নন্দন, চন্দন প্রভৃতি শব্দের অন্তিম দ্বিমাত্রক রুদ্ধদলের সঙ্গে সমতা রক্ষা সম্ভব হত না।

৩। মিশ্রবৃত্ত চৌপদী—৮+৮+৮+৬ মাত্রা

আকাশে অসংখ্য তারা
চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা,
হৃদয় বিস্ময়ে সারা
    হেরি একদিঠি,
আর যে আসে না-আসে
মুক্ত এই মহাকাশে
প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে
    অসীমের চিঠি।

—মানসী, পত্রের প্রত্যাশা

এই দুই পঙ্‌ক্তিই চৌপদী।

দুই। পঞ্চমাত্রক পর্বের চৌপদী পঙ্‌ক্তি

১। কলাবৃত্ত চৌপদী—১০+১০+১০+৭ মাত্রা

জগৎ পারাবারের তীরে
    ছেলেরা করে খেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার ’পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
    নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল
    ছেলেরা করে খেলা।

—শিশু ‘ভূমিকা’। জগৎ পারাবারের

প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী (১০+৭ মাত্রা)। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি চৌপদী।

২। কলাবৃত্ত চৌপদী—১০+১০+১০+১০ মাত্রা

পরের ’পরে কেন এ রোষ,
নিজেরাই যদি শত্রু হোস্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—

আবার তোরা মানুষ হ।···

মিত্র হোক ভণ্ড যে,

তাহারে দূর করিয়া দে,

সবার বাড়া শত্রু সে—

আবার তোরা মানুষ হ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, মেবার পতন (৫ম অঙ্ক), গান ('কিসের শোক করিস ভাই')

প্রথম পঙ্ক্তির দ্বিতীয় পদে 'নিজেরাই' শব্দের ই-বর্ণটি রাখতে হয়েছে নেহাতই ভাবরক্ষার প্রয়োজনে। ছন্দের বিচারে এটি উপেক্ষণীয়। আপাততঃ মনে হতে পারে এটুকু রচিত হয়েছে দলবৃত্ত রীতিতে। কিন্তু 'নিজেরা যদি' এবং এ-রকম আরও কিছু পাঁচদলের পর্ব দেখে বোঝা যায় এটি কলাবৃত্ত রীতিতেই রচিত। তাছাড়া কলাবৃত্তের 'তাহারে', 'করিয়া প্রভৃতি অন্য লক্ষণও এটিতে আছে। দলবৃত্তের সব লক্ষণ নেই।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়—যে, দে, সে এবং হ, এই চারটি মুক্তদল আছে পদান্তে এবং উচ্চারিত হয় স্বতন্ত্র ভাবে। এই দুই কারণেই এগুলি আবৃত্তিকারের মুখে স্বতঃই দ্বিমাত্রকতা লাভ করে। আর এজন্যই এই চারটি মুক্তদল রোষ, হোস্, দোষ প্রভৃতি দ্বিমাত্রক রুদ্ধদলের সঙ্গে সমতা লাভ করতে পেরেছে।

পাঁচ মাত্রার পর্ব দিয়ে গড়া দলবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত চৌপদী পঙ্ক্তি রচনার চল নেই।

তিন। ষণ্মাত্রক পর্বের চৌপদী পঙ্ক্তি

১। কলাবৃত্ত চৌপদী—১০+১০+১০+৮ মাত্রা

কবে সে খোয়ালি | বাদশাহী,

সেই সে অতীতে আজো চাহি'

যাস্ মুসাফির গান গাহি,

ফেলিস্ অশ্রুজল।

—নজরুল, সন্ধ্যা, চল্ চল্ চল্

২। কলাবৃত্ত চৌপদী--১১+১১+১১+৮ মাত্রা

ঊষার দুয়ারে | হানি' আঘাত

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,

আমরা টুটাব তিমির-রাত,

বাধার বিন্ধ্যাচল।

—নজরুল, সন্ধা, চল্ চল্ চল্

৩। কলাবৃত্ত চেপ্দী—১২+১২+১২+৮ মাত্রা

তুরঙ্গসম। অন্ধ নিয়তি,

বন্ধন করি। তায়

রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন-বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
    প্রতিকূল ঘটনায়।

—মানসী, গুরু গোবিন্দ

প্রথম পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী (১২+৮ মাত্রা)। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি চৌপদী। প্রতি পূর্ণ পদে আছে ছয় মাত্রার দুই পর্ব। আর অপূর্ণ পদে আছে একটি ছয় মাত্রার পূর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব (দুই মাত্রা)।

৪। কলাবৃত্ত চৌপদী—১৪+১৪+১৪+৮ মাত্রা

প্রভাতসূর্য,। এসেছ রুদ্র। সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে,
    মৃত্যুর হোক লয়।
    তোমারি হউক জয়।

—গীতালি-১০১, 'ভেঙেছ দয়ার'

প্রথম পঙ্‌ক্তি চৌপদী। এর প্রথম তিন পদে আছে তিন পর্ব—দুটি ছয় মাত্রার পূর্ণপর্ব ও একটি দুই মাত্রার অপূর্ণ পর্ব। আর চতুর্থ পদে আছে দুই পর্ব—একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি অপূর্ণ একপদী, মাত্রাবিন্যাস প্রথম পঙ্‌ক্তির চতুর্থ পদের অনুরূপ।

৫। কলাবৃত্ত চৌপদী—১৫+১৫+১৫+৯ মাত্রা।

মুখর নূপুর। বাজিছে সুদূর। আকাশে,
অলক গন্ধ উড়িয়ে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
    কত মঞ্জুল রাগিণী।

—চিত্রা, চিত্রা

এই চৌপদী পঙ্‌ক্তিটি উপরের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রায় অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এই যে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রত্যেক পদের শেষ অপূর্ণ পর্বে আছে দুই কলামাত্রা, আর এই দৃষ্টান্তের অনুরূপ অপূর্ণ পর্বে আছে তিন কলামাত্রা।

১। মিশ্রবৃত্ত চৌপদী—১১+১১+১১+৯ মাত্রা

ভভম ভভম | ববম ভাল
ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল,
রুদ্রতালে তাল দেয় বেতাল,
    ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া।

সুরগণ কহে জয় মহেশ,
পলকে পুরিল কল দেশ,
ভারত যাচত ভকতিলেশ
সরস অবশ অঙ্গিয়া।

—ভারতচন্দ, অন্নদামঙ্গল, শিববিবাহ

২। মিশ্রবৃত্ত চৌপদী—১২+১২+১২+১১ মাত্রা

নিনাদিল শৃঙ্গ। করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস,
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্যাবর্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা।
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।"

—হেমচন্দ্র, কবিতাবলী, ভারত-সংগীত (১৮৭০)

৩। মিশ্রবৃত্ত চৌপদী—১২+১২+১২+৫ মাত্রা

বিলম্বে এসেছ। রুদ্ধ এবে দ্বার,
জনশূন্য পথ রাত্রি অন্ধকার,
গৃহহারা বায়ু করি হাহাকার
ফিরিয়া মরে।···
কাহারা জাগিছে নবীন উৎসবে
রুদ্ধ করি দ্বার মত্ত কলরবে,
কী তোমার যোগ আজি এই ভবে
তাদের সাথে।

—চিত্রা, দুঃসময় (১৮৯৪)

৪। মিশ্রবৃত্ত চৌপদী—১২+১২+১২+৩ মাত্রা

সাধু কহে, "শুন,। মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার;
সব ধর্ম মাঝে ত্যাগধর্ম সার

ভুবনে।”

কৈলাসশিখর হতে দূরাগত

ভৈরবের মহা-সংগীতের মতো

সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত

ভবনে।

—কথা, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা (১৮৯৭)

শেষ তিন দৃষ্টান্তই মিশ্রবৃত্ত রীতির চৌপদী বন্ধে রচিত। অর্থাৎ এই তিন দৃষ্টান্তেরই প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে চার পদ। প্রথম তিন পদে আছে দুটি করে ছয় কলামাত্রার পূর্ণপর্ব। এই তিন দৃষ্টান্তের পার্থক্য শুধু শেষ (চতুর্থ) পদে। প্রথম দৃষ্টান্তের শেষ পদে একটি পূর্ণপর্ব (ছয় কলামাত্রা) ও একটি অপূর্ণ পর্ব (পাঁচ কলামাত্রা); দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের শেষ পদে আছে শুধু একটি অপূর্ণ পর্ব (পাঁচ কলামাত্রা), তৃতীয় দৃষ্টান্তের শেষ পদেও আছে শুধু একটি তিন কলামাত্রার অপূর্ণ পর্ব। বিশেষ লক্ষণীয়—প্রথম দৃষ্টান্তের ‘বিংশতি’ শব্দে চার মাত্রা ধরা হয়েছে অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতি অনুসারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ক্রমে-ক্রমে ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পর্ব রচনা ত্যাগ করেন। ফলে ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত বাংলা সাহিত্যেই অচল হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে[১]—এ-রকম ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পর্ব “অগ্রাহ্য, অন্তত আধুনিক কালের কানে। অসমমাত্রার ছন্দে এ-রকম যুক্তধ্বনির বন্ধুরতা [ষণ্মাত্রক পর্বের রুদ্ধদলের সংকোচন] আবার একদিন ফিরে আসতেও পারে, কিন্তু আজ এটার চল নেই।”

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলীতে দলবৃত্ত রীতিতে রচিত ষণ্মাত্রক পর্বের ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির ন্যায় চৌপদী পঙ্‌ক্তির নিদর্শনও পাইনি।

চার। সপ্তমাত্রক পর্বের চৌপদী পঙ্‌ক্তি

১। দলবৃত্ত চৌপদী—৯+৯+৯+৬ শ্রুতমাত্রা

প্রভাতে পথিক ডেকে। যায়,

অবসর পাই নে আমি। হায়,

বাহিরের খেলায় ডাকে। যে,

যাব কী ক’রে।···

যে আমার নতুন খেলার। জন

তারি এই খেলার সিংহা।-সন,

ভাঙারে জোড়া দেবে। সে

কিসের মন্তরে।

—গৃহপ্রবেশ (নাটক), গান—‘খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি’

এর প্রতি পঙ্ক্তিতে আছে চার পদ। প্রথম তিন পদে আছে দুটি করে পর্ব—প্রথম পর্বে আছে সাত দলমাত্রা; দ্বিতীয় পর্বের এক দল স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত, তাই শ্রুত ধ্বনির হিসাবে দুই দলমাত্রা বলেই স্বীকার্য। প্রতি পঙ্ক্তির শেষ (চতুর্থ) অপূর্ণ পদে আছে পাঁচ দলমাত্রা।—সপ্ত দলমাত্রক পর্বের চৌপদী পঙ্ক্তি খুবই দুর্লভ।

২। কলাবৃত্ত চৌপদী—১৪+১৪+১৪+৯ মাত্রা।

বিদায়বেলা এল। মেঘের মতো ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে। দু হাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে। চক্ষু-দুটি ছেপে
ভরে যে এল জল ।-ধারা।
আজকে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথ-হারা।

—উৎসর্গ-৪, 'মন্ত্রে সে যে পূত'

এই চৌপদী পঙ্ক্তি-দুটিরই প্রথম তিন পদে আছে দুটি করে পর্ব। প্রতি পর্বে সাত কলামাত্রা। আর শেষ (চতুর্থ) অপূর্ণ পদে আছে একটি পূর্ণপর্ব (সাত কলামাত্রা) ও একটি অপূর্ণ পর্ব (দুই কলামাত্রা)।—অনুরূপ আর-একটি দৃষ্টান্ত এই।—

হেরো গো অন্তরে। অরূপ-সুন্দরে,
নিখিল সংসারে। পরম বন্ধুরে,
এস আনন্দিত। মিলন-অঙ্গনে
শোভন মঙ্গল। সাজে।
কলুষ কল্মষ বিরোধ-বিদ্বেষ
হউক নির্মল, হউক নিঃশেষ,
চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত
নিত্য কল্যাণ-কাজে।

—গীতবিতান (পূজা), 'ধ্বনিল আহ্বান'

ছন্দোরূপের বিচারে এই দুই দৃষ্টান্তের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কানে যে পার্থক্য বোধ হয়, তা হয় রচনার গুণে।

৩। কলাবৃত্ত চৌপদী—১৪+১৪+১৪+১৪ মাত্রা

আজি কারার সারাদেহে। মুক্তি-ক্রন্দন
ধ্বনিছে হাহা-স্বরে। ছিঁড়িতে বন্ধন,

নিখিল গেহ যেথা। বন্দী-কারাগৃহ
সেথা কেন রে কারা-ত্রাসে। মরিবে বীরদলে?
'জয় হে বন্ধন'। গাহিল তাই তারা। মুক্ত নভতলে।

—নজরুল বিষের বাঁশি, বন্দি-বন্দনা

এর প্রথম অংশে আছে একটি চৌপদী পঙ্‌ক্তি। এটির প্রতি পদে দুই পর্ব, প্রতি পর্বে সাত কলামাত্রা। তার পরে আছে একটি একপদী পঙ্‌ক্তি। এই একটি পদে আছে তিন পর্ব, প্রতি পর্বের সাত কলামাত্রা।

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে সপ্তমাত্রক পর্বের চৌপদী পঙ্‌ক্তির নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

কয়েকটি বিশেষ পঙ্‌ক্তিরূপ

মহাত্রিপদী ও মহাচৌপদী পঙ্‌ক্তি

চতুর্মাত্রক কলাবৃত্ত পর্বের সাধারণ ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির একটি বৃহত্তর রূপও দেখা যায়। তাকে বলা যায় **মহাত্রিপদী**। যেমন—

১। কলাবৃত্ত মহাত্রিপদী—৮+৮। ৮+৮। ৮+৮ মাত্রা

ঘাসে আছে ভিটামিন,। গোরু ভেড়া অশ্ব।
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে। আঁখি মেলে পশ্য।
অনুকূল বাবু বলে। ঘাস খাওয়া ধরা চাই
কিছুদিন জঠরেতে। অভ্যেস করা চাই,
বৃথাই খরচ করে। চাষ করা শস্য।...
দুদিন না যেতে যেতে মারা গেল লোকটা,
বিজ্ঞানে বিঁধে আছে এই মহা শোকটা,
বাঁচলে প্রমাণ শেষ হত যে অবশ্য।

—খাপছাড়া—১৮, 'ঘাসে আছে ভিটামিন'

প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি সাধারণ পূর্ণ দ্বিপদী (৪+৪। ৪+৪ মাত্রা)। বাকি দুই পঙ্‌ক্তিতেই আছে তিন পদ—এই তিন পদের প্রত্যেকটি সাধারণ দ্বিপদী বা ত্রিপদী বন্ধের দুই পদের সমান। এ-রকম দীর্ঘ পদকে বলা যায় **মহাপদ**। তাই এ-রকম ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির নাম হয়েছে 'মহাত্রিপদী'। অপূর্ণ কলাবৃত্ত পদের শেষ মুক্তদল প্রায়শঃ দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়। এজন্যই এখানে শ্ব, শ্য এবং টা, এই তিন মুক্তদলকে 'চাই' রুদ্ধদলটির মতোই দ্বিমাত্রক বলে গণনা করা হয়েছে।

মহাত্রিপদীকে তিনটি দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির স্তবক (stanza) বলে বর্ণনা করা সংগত নয়। স্তবকে-স্তবকে মিল থাকা আবশ্যক নয়। পঙ্‌ক্তিতে-পঙ্‌ক্তিতে মিল থাকাই স্বাভাবিক। অনুরূপ আর-একটি দৃষ্টান্ত—

'পাক প্রণালী'র মতে। করো তুমি রন্ধন,

জেনো ইহা প্রণয়ের। সব-সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন। না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত বলে দাবি। নাহি করে মুচিটা,
পাতে বসি পতি যেন। নাহি করে ক্রন্দন।

—প্রহাসিনী, পরিণয়মঙ্গল

২। কলাবৃত্ত মহাত্রিপদী—৮+৮। ৮+৮। ৮+৩ মাত্রা

ধীরু কহে শূন্যেতে। মজো রে,
নিরাকার সত্যেরে। ভজো রে।
এত বলি যত চায়। শূন্যেতে ওড়াটা,
কিছুতে কিছু-না পানে। পৌঁছে না ঘোড়াটা,
চাবুক লাগায় তারে। সজোরে।
ছুটে মরে সারারাত, ছুটে মরে সারাদিন,
হয়রান হয়ে তবু আমিহীন ঘোড়াহীন
আপনারে নাহি পড়ে নজরে।

—খাপছাড়া, সংযোজন—৪, 'ধীরু কহে শূনোতে'

প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি সাধারণ অপূর্ণ দ্বিপদী, বাকি দুই পঙ্‌ক্তি অপূর্ণ মহাত্রিপদী। পঙ্‌ক্তি শেষের 'মজো রে' প্রভৃতি চারটি পর্ব চতুর্মাত্রক বলেও গণ্য হতে পারে।

মহাত্রিপদীর মতো **মহাচৌপদী** পঙ্‌ক্তিও দেখা যায় মাঝে-মাঝে। যেমন—

১। কলাবৃত্ত মহাচৌপদী—৮+৬। ৮+৬। ৮+৬। ৮+২ মাত্রা

খেঁকশেয়ালের দল। শেয়াল দহর
হাঁচি শুনে হেসে মরে। অষ্ট প্রহর,
হাতিবাগানের হাতি। ছাড়িয়া শহর
ভাগলপুরের দিকে। ভাগে।
গিরিডির গিরগিটি। মস্ত বহর
পথ দেখাইয়া চলে। আগে।

—খাপছাড়া-১০৪, 'হাজারিবাগের ঝোপে'

প্রথম পঙ্‌ক্তি অপূর্ণ মহাচৌপদী। এটিতে আছে তিনটি অপূর্ণ মহাপদ (৮+৬ মাত্রার) ও একটি সাধারণ পদ (৮+২ মাত্রার)। আর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি আট-ছয়-দশ মাত্রার সাধারণ ত্রিপদী।

২। কলাবৃত্ত মহাচৌপদী—৮+৮। ৮+৮। ৮+৮। ৮+৩ মাত্রা

খর বায়ু বয় বেগে,। চারি দিক্ ছায় মেঘে,
　　ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল,। আমি তুলে বাঁধি পাল,
　　হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
শৃঙ্খলে বার বার। ঝন্‌ঝন্ ঝংকার,
নয় এতো তরণীর। ক্রন্দন শঙ্কার,
বন্ধন দুর্বার। সহ্য না হয় আর,
　　টলোমলো করে আজ তাই ও ॥
গনি গনি দিন ক্ষণ। চঞ্চল করি মন
　　বোলো না, ‘যাই কি নাহি যাই রে’।
সংশয় পারাবার। অন্তরে হবে পার,
　　উদ্বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল,
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ ওঠে উত্তাল,
হয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল,
　　জয় জয় জয়গান গাইয়ো ॥

—তাসের দেশ (নাটক), প্রবেশক

এর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি সাধারণ কলাবৃত্ত ত্রিপদী। প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দুটি দুই পর্বের পূর্ণ পদ (৪+৪ মাত্রা) ও একটি তিন পর্বের অপূর্ণ পদ (৪+৪+৩ মাত্রা)। তার পরে আছে তিনটি পূর্ণ মহাপদ (৮+৮ মাত্রা) ও একটি অপূর্ণ মহাপদ (৮+৩ মাত্রা) নিয়ে রচিত একটি মহাচৌপদী পঙ্‌ক্তি। তার পরবর্তী তিন পঙ্‌ক্তিও (দুটি সাধারণ ত্রিপদী ও একটি মহাচৌপদী) যথাক্রমে রচিত ও সজ্জিত। অনুরূপ আর-একটি দৃষ্টান্ত এই।—

৩। কলাবৃত্ত মহাচৌপদী—৮+৮। ৮+৮। ৮+৮। ৮+২ মাত্রা

ঐ　ভেসে আসে কুসুমিত। উপবন-সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল। জলদল-কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি। জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,
　　ভেসে আসে পাপিয়ার তান ॥
আজি এমন চাঁদের আলো, ।মরি যদি সেও ভালো,
　　সে মরণ স্বরগ-সমান।
আজি　তোমার চরণতলে। লুটায়ে পড়িতে চাই,

তোমার জীবনতলে। ডুবিয়া মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে। শয়ন লভিব বলে
আসিয়াছি তোমার নিধান ॥
আজি সব ভাষা সব বাক্। নীরব হইয়া যাক,
প্রাণে শুধু মিশে যাক প্রাণ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, গান, 'আজি এসেছি'

এই রচনাটির বৈশিষ্ট্য প্রণিধানযোগ্য। এটির প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির পূর্বেই আছে একটি করে অতিপর্ব। তাতেই বোঝা যায়, প্রথমে একটি মহাচৌপদী ও তার পরে একটি সাধারণ ত্রিপদী, এই পর্যায়ক্রমে এর পঙ্‌ক্তিগুলি সাজানো হয়েছে। এই হিসাবে উদ্ধৃত অংশে আছে মোট চার পঙ্‌ক্তি। অথচ মহাচৌপদী পঙ্‌ক্তিগুলিতে প্রথম তিন মহাপদের অন্তে মিল রাখা হয় নি। মিল আছে শুধু প্রথম দুই মহাপদে। আবার প্রথম দুই মহাপদে দুই যতিবিভাগের অন্তে মিল নেই। কিন্তু তৃতীয় মহাপদের দুই যতিবিভাগে মিল দিয়ে মহাচৌপদী পঙ্‌ক্তির শেষ দুই মহাপদকে একটি সাধারণ ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির রূপ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই দুই মহাপদ একাধারে মহাচৌপদীর শেষার্ধ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সাধারণ ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি। এর ফলে একটি মহাচৌপদীর পরে একটি মাত্র সাধারণ ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে তার জন্য রবীন্দ্র-রচিত মহাচৌপদী পঙ্‌ক্তির পরে দুটি সাধারণ ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি রচনা করতে হয়েছে।

অসম পর্বের পঙ্‌ক্তি

একটা প্রচলিত ধারণা এই যে, ছন্দ নির্ভর করে এক-এক প্রকার ধ্বনিগুচ্ছের অর্থাৎ ছন্দপর্বের পুনরাবৃত্তির উপরে। এ-রকম পুনরাবৃত্তিতে মনে যে তালের প্রত্যাশা জাগে সেই প্রত্যাশা-পূরণের দ্বারাই ছন্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এই ধারণা পুরো সত্য নয়। ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তিতে বিরক্তিকর একঘেয়েমিও দেখা যায়। তাই নানা উপায়ে ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তিজাত একঘেয়েমির বদলে বৈচিত্র্যসৃষ্টিও প্রয়োজন হয়। এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির একটা উপায় হল প্রয়োজনমতো উপযতি ও লঘুযতি-লোপ ঘটানো। যতিলোপর কথা পূর্বেই যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। তবু বিষয়টা আর-একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে।

পর্বের আয়তনভেদ প্রসঙ্গে আগে একস্থানে বলা হয়েছে যে, আট মাত্রার পর্ব স্বীকারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আট মাত্রার বিভাগ আসলে দুটি চতুর্মাত্রক পর্বের যুক্তরূপ। দুই চতুর্মাত্রক পর্বের মধ্যবর্তী লঘুযতি-লোপের ফলেই উৎপন্ন হয় এক-একটি যুক্তপর্বক (বা অবিভক্ত) 'পদ'। কোনো-কোনো রচনায় চার মাত্রার পরে লঘুযতি বা পর্বযতির বাহুল্য থাকে, আবার অন্যবিধ রচনায় পর্বযতি-লোপের বাহুল্য দেখা যায়। এই উভয়বিধ বাহুল্য ঘটে কবির ভাবগত প্রয়োজন বা ছন্দোগত অভিরুচির ফলে। তবে পর্বযতি-লোপহীন চতুর্মাত্রপর্বক ছন্দের রচনা বড় দেখা যায় না। তেমনি পর্বযতি-হীন শুধু যুক্তপূর্বক ছন্দের রচনা খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। অবশ্য চেষ্টা করলে এই উভয়বিধ ছন্দ রচনা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু সেটা সাধারণ রীতি নয়। সাধারণতঃ চতুর্মাত্রক পর্বক ছন্দের রচনায় এই দুই রূপেরই অল্পাধিক মিশ্রণ থাকে। তাতে ভাবপ্রকাশের সুবিধা যেমন বাড়ে, তেমনি ছন্দশ্রুতিগত বৈচিত্র্যও বাড়ে। অর্থাৎ একঘেয়েমি ঘটার আশঙ্কা

থাকে না। চতুর্মাত্রক ছন্দের পূর্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির প্রতি একটু মনোনিবেশ করলেই এ-কথার সার্থকতা বোঝা যাবে।

তবু এখানে আরও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আশুবোধের সুবিধার জন্য।—

যেখানে সে। বুড়া বট ॥ 'নামায়ে দিয়াছে জট'
'ঝিল্লি ডাকিছে দিনে'। দুপুরে,
'যেখানে বনের কাছে' ॥ বনদেব।-তারা নাচে
চাঁদিনিতে। রুনুঝুনু। নূপুরে,
যাব আমি। ভরা সাঁঝে ॥ সেই বেণু।-বন মাঝে
আলো যেথা। রোজ জ্বালে। জোনাকি—
'শুধাব মিনতি করে', ॥ আমাদের। ঘুমচোরে
তোমাদের। আছে জানা।-শোনা কি।

—শিশু, ঘুমচোর

বলা বাহুল্য, এটি সাধারণ (৮+৮+১১ মাত্রার) কলাবৃত্ত ত্রিপলী পঙক্তির দৃষ্টান্ত। এর চারটি পদে পর্বযতি লুপ্ত হয়েছে। সেসব পদে পর্বযতি-লোপের চিহ্নও দেওয়া হয়নি। অন্য সর্বত্রই এই পর্বযতি আছে, তার চিহ্নও আছে। অর্থাৎ এখানে চারটি পদ যুক্তপর্বক, বাকি সব পদই বিযুক্তপূর্বক। আবৃত্তিকালে ওই চারটি যুক্তপর্বক পদে যে ধ্বনিবৈচিত্র্য ঘটে, তা যে-কোনো পাঠকের কানেই ধরা পড়বে। এ-রকম আর-একটি দৃষ্টান্ত এই।—

তোমারে ডাকিনু যবে ॥ কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে ॥ গন্ধ ছিল।
জানি না কী লাগি ছিলে ॥ অন্যমনে,
তোমার দুয়ার কেন ॥ বন্ধ ছিল।
একদিন। শাখা ভরি ॥ এল ফল।-গুচ্ছ,
ভরা অঞ্জ।-জলি মোর ॥ করি গেলে। তুচ্ছ,
পূর্ণতা। পানে আঁখি ॥ অন্ধ ছিল।···

তোমার সন্ধ্যা ছিল ॥ প্রদীপহীনা,
আঁধারে দুয়ারে তব ॥ বাজানু বীণা।
তারার আলোক-সাথে ॥ মিলি মোর। চিত্ত
ঝংকৃত। তারে তারে ॥ করেছিল। নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিস ॥-পন্দ ছিল।

—বীথিকা, উদাসীন

এটির প্রথম চার পঙক্তি এবং দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি অপূর্ণ দ্বিপদী (৪+৪ ।৪+১ মাত্রা)। এই ছয় পঙক্তির সব পদই যুক্তপর্ব। কেননা এই ছয় পঙক্তি প্রত্যেক পদেই (পূর্ণ ও অপূর্ণ) একটি করে পর্বযতি লুপ্ত হয়েছে। উভয়ার্ধের শেয়ে আছে একটি করে মহাত্রিপদী পঙ্‌ক্তি (৮+৭ । ৮+৭ । ৮+৫ মাত্রা)। প্রথম মহাত্রিপদা পঙক্তির শেষ পর্বযতিটি লুপ্ত, বাকি পাঁচটি পর্বযতিই সুব্যক্ত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মহাত্রিপদী পঙক্তির তিনটি পর্বযতি সুব্যক্ত, বাকি তিনটি অব্যক্ত অথাৎ লুপ্ত। এই রচনাটি মূলতঃ রচিত হয়েছে চতুষ্কলপর্বক ছন্দে, অথচ এটিতে পর্বযতিলোপের বাহুল্য ঘটিয়ে যুক্তপর্বক চালের ভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাতে ছন্দের ধ্বনিশ্রুতিতে যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, সেটাই বিশেষভাবে লক্ষিতব্য।

ছন্দের ধ্বনিশ্রুতিগত একঘেয়েমিকে সংযত করে বৈচিত্র্যসৃষ্টির আর-এক উপায় হল সমায়তন ধ্বনিপর্বের পুনরাবর্তন না ঘটিয়ে অসম পর্বের একত্র সমাবেশ ঘটানো। এ-রকম অসমপর্বক পঙক্তির নিদর্শন পাওয়া যায় প্রধানতঃ কলাবৃত্ত রীতিতে। যেমন—

১। অসমপর্বক পঙক্তি (একপদী)—৭+৪+ ৩.৪ মাত্রা

ক. একদা এলোচুলে   কোন ভুলে   ভুলিয়া
আসিল সে আমার   ভাঙা দ্বার   খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ,   চারি দিক   সুবিজন,
চাহিল একবার   আঁখি তার   তুলিয়া।
দখিন বায়ুভরে   থরথরে   কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম   তারি সময়   দুলিয়া।

—মানসী ক্ষণিক মিলন (১৮৮৯)

খ. একদা তুমি, প্রিয়ে,   আমারি এ   তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে   সে কথা যে   গেছ ভুলে।
সেথা যে বহে নদী   নিরবধি   সে ভোলে নি,
তারি যে স্রোতে আঁকা   বাঁকা-বাঁকা   তব বেণী,
তোমারি পদরেখা   আছে লেখা   তারি কূলে—
আজি কি সবি ফাঁকি,   সে কথা কি   গেছ ভুলে?

—গীতবিতান।(প্রেম) ‘একদা তুমি প্রিয়ে’ (১৯১৭)

এ-দুটির রচনারূপ একই। পার্থক্য শুধু শেষ চার পঙ্‌ক্তির মিলের বিন্যাসক্রমে।

এবার অন্য প্রকার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

২। অসমপর্বক পঙক্তি (দ্বিপদী)—৫+৪ ॥ ৫+২ মাত্রা

জগৎ-স্রোতে। ভেসে চল ॥ যে যেথা আছ। ভাই,
চলেছে যেথা। রবিশশী ॥ চল রে সেথা। যাই।
কোথায় চলে কে জানে তা ॥ কোথায় যাবে শেষে।

জগৎ-স্রোত বয়ে গিয়ে ॥ কোন সাগরে মেশে।
অনাদি কাল চলে স্রোত ॥ অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব ॥ অসীমে যেতে যেতে।

—প্রভাতসাগরের স্রোত

৩। অসমপর্বক পঙ্‌ক্তি (দ্বিপদী)—৭।৫ ॥ ৭+২, ৩ মাত্রা

ক. বরজ করজোড়ে। কহিল, "প্রভু, ॥ মোদের সভা হল। ভঙ্গ
এখন আসিয়াছে। নূতন লোক, ॥ ধরায় নব নব। রঙ্গ।···
একাকী গায়কের নহে তো গান, ॥ মিলিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, ॥ আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, ॥ তবে সে কলতান উঠে—
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, ॥ তবে সে মর্মর ফুটে।

—সোনার তরী, গানভঙ্গ (১৮৯২)

খ. উঠিল চমকিয়া। সভার লোকে, ॥ নীরব হল গৃহ।-তল,
বর্ম-আবরিত। দ্বারীর চোখে ॥ অশ্রু করে ছল। ছল।
মৌন রহি রাজা ।ক্ষণেকতরে ॥ হাসিয়া কহে, "ওহে। বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী ।আমার 'পরে ॥ এমনি করিয়াছ। ফন্দি।
তোমার সে আশায় ।হানিব বাজ, ॥ জিনিব আজিকার। রণে—
রাজ্য ফিরি দিব, ।হে মহারাজ, ॥ হৃদয় দিব তারি। সনে।"

—কথা, মস্তকবিক্রয় (১৮৯৭)

এই দুটি রচনার রূপাদর্শ অভিন্ন। পার্থক্য শুধু এই যে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রতি দুই পঙ্‌ক্তির প্রথম পদের অন্তে একটি অতিরিক্ত মিল রাখা হয়েছে। তাতে রচনাটি প্রথমটির তুলনায় অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়েছে।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যৌতুক না কৌতুক' কাব্যে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে এই রচনারূপের নিদর্শন আগে। রবীন্দ্রনাথ সেই রচনারূপটিকেই প্রতিধ্বনিত করেছেন কলাবৃত্ত রীতিতে।[১]

এবার অন্যরকম দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা[২] থেকে।

৪। অসমপর্বক পঙ্‌ক্তি (একপদী)—৫+৬+৫ মাত্রা

না জানি আজি। গাহ চুপি চুপি। কি গান সখী,
এ কি এ আলো। নয়নে তোমার। আজি নিরখি।
বুঝি না কি যে আছে তব মনে সঙ্গোপনে,
প্রণয়ী জনে কেন অকরুণ বিদায়-খনে।

৫। অসমপর্বক পঙ্‌ক্তি (দ্বিপদী)—৬+৫ ॥ ৫+৫ মাত্রা

ক. রিম ঝিম্ ঝিম বরষা ঝরে ॥ বরযা ঝরে তরুর দেহে,
লতা দুলে দুলে পরশে তারে, ॥ পরশে তারে সজল স্নেহে।
ঘনতমসার সজল মায়া বিছালো ছায়া নেত্রে তব,
স্নিগ্ধ তোমার ওষ্ঠাধরে হাস্য ঝরে কি অভিনব।

—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিগত দিন, পরিচ্ছেদ-৮, পৃ. ৩৬–৩৭

খ. ভারতী আরতি-হেমপ্রদীপ ॥ যাঁর পূজায় নিত্য দিন,
মানসে যিনি আনন্দ-নীপ, ॥ বন্দি তাঁয় জাগ্‌রে দীন।
জাগিয়া মাগিয়া নাও আশিস্, ॥ গাও নবীন ছন্দে গান,
নব সুরে ওরে আজ বাঁধিস্ ॥ তোর তানেই বিশ্ব-প্রাণ।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, প্রণাম

এই দুই দৃষ্টান্তের পর্ববিন্যাস অভিন্ন, কিন্তু দলবিন্যাস অভিন্ন নয়। এইজন্যই এ দুই দৃষ্টান্তের শ্রুতিসৌন্দর্যে পার্থক্য ঘটেছে। এ বিষয়ে এখানে অধিকতর আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

অসমপর্বক পঙক্তিরূপের দৃষ্টান্ত আর বাড়িয়ে লাভ নেই। বিভিন্ন আয়তনের পর্ব নানাভাবে সাজিয়ে আরও অনেক পঙক্তিরূপ সৃষ্টি করা যেতে পারে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত বর্ণবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত) বগের অধিকাংশ ছন্দই (মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি) অসমপর্বক পঙ্‌ক্তির ছন্দ। তবে লক্ষণীয়, বাংলা ও সংস্কৃত অসমপর্বক পঙ্‌ক্তির সর্বত্র একই পর্বের অর্থাৎ মাত্রাগুচ্ছের পুনরাবর্তন থাকে না বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই প্রথম পঙ্‌ক্তিতে অনুসৃত পর্বের পর্যায়ক্রম পরবর্তী সব পঙক্তিতেই অনুবৃত্ত হয়। অর্থাৎ কোনো পঙ্‌ক্তিতে একই পর্বের পুনরাবর্তন না হলেও বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে একই পর্বক্রমের পুনরাবর্তন হয়। এই দ্বিতীয় প্রকার পুনরাবর্তনই সংস্কৃত বা বাংলা অসমপর্বক পঙ্‌ক্তি-রচিত ছন্দের প্রধান আশ্রয়।

বাংলা ছন্দের শ্লোকরূপ

প্রণালীবদ্ধ পদসমাবেশকে বলেছি ‘পঙ্‌ক্তি’। তেমনি প্রণালীবদ্ধ পঙক্তিসিমাবেশকে বলা যায় **শ্লোক** (verse group) পঙ্‌ক্তিসংখ্যা অনুসারে শোকরূপকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সমরীতিতে রচিত, সমায়তন, অনোন্যসাপেক্ষ ও সমিল দুই পঙ্‌ক্তির শ্লোককে বলা যায় **যুগ্মক** এবং অনুরূপভাবে গুচ্ছবদ্ধ তিন ও চার পঙ্‌ক্তির শ্লোককে বলতে পারি যথাক্রমে **ত্রিতক ও চতুষ্ক**। চারের অধিক পঙ্‌ক্তির সুপরিকল্পিত গুচ্ছকে অর্থাৎ শ্লোকরূপকে বলা যায় **স্তবক**। স্তবকের পঙ্‌ক্তিগুলি সমরীতিতে রচিত হওয়া চাই, কিন্তু সমায়তন হওয়া আবশ্যক নয়।

সব রকম শ্লোকেই পঙ্‌ক্তিপ্রান্তে নির্দিষ্ট প্রণালীতে সাজানো মিল থাকাও প্রয়োজন। এখানে বিভিন্ন শ্লোকরূপের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিলের পর্যায়ক্রমের কথাও উল্লেখ করা হল।—

১। দ্বিপঙ্‌ক্তিক শ্লোক বা যুগ্মক (couplet)

ক। দুঃখসহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়,

ভয়কে যারা মানে তারই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তাঁরাই জানে। —পুরবী, চিঠি

খ। এ জগতে হায়, সে-ই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি,
বার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

—চিত্রা, দুই বিঘা জমি

গ। তব সত্য তব গান রুদ্ধ হয়ে রাজে
রাত্রি দিন জীর্ণশাস্ত্রে শুষ্কপত্র-মাঝে।

—নৈবেদ্য-৭১, 'ওরে মৌনমূক'

প্রথম দৃষ্টান্তে তাছে দুটি যুগ্মক। এ-দুটির প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি চার-চার। চার-দুই দলমাত্রার তাপূর্ণ দ্বিপদী, অর্থাৎ দলবৃত্ত পয়ার। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আছে একটি যুগ্মক। এর প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি ছয়-ছয়। ছয়-দুই কলামাত্রার দ্বিপদী (অপূর্ণ)। তৃতীয় দৃষ্টান্তেও আছে একটি যুগ্মাক। এটির প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে মিশ্রবৃত্ত রীতির চার-চার। চার-দুই গঠিত দুই পদ। অর্থাৎ প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি মিশ্রবৃত্ত রাতির অপূর্ণ দ্বিপদী বা মিশ্রবৃত্ত পয়ার।

২। ত্রিপঙ্‌ক্তিক শ্লোক বা ত্রিতক (triplet)

ক। কেন এত ফুল তুলিলি, স্বজনি, ভরিয়া ডালা?
মেঘবৃত হলে পরে কি রজনী তারার মালা,
আর কি যতনে কুসুম-রতনে ব্রজের বালা।

—মধুসূদন, ব্রজঙ্গনা, কুসুম

খ। নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
অন্তবিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবনমরণ হরণ করি।

—মানসী, ধ্যান

গ। দিনরাত শুধু হাহাকার,
শ্বাসবায়ু অনল আমার
মৃত্যু হল, গেল না বিকার।···
আবার যা ছিল হল তাই,
শান্তি নাই, যন্ত্রণা সদাই,
পরিণাম হত যদি ছাই।

—সত্যেন্দ্রনাথ, রেণু ও বীণা, আলেয়া

মধূসুদনের 'কুসুম' কবিতাটি মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত। কিন্তু এই অংশটুকুতে শব্দের প্রাত্য রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট প্রয়োগ কোথাও নেই। তাই এই অংশের ধ্বনিপ্রকৃতি অনেকটা কলাবৃত্তের মতো মনে হয়। পক্ষান্তরে

রবীন্দ্রনাথের ‘ধ্যান’ কবিতাটি কলাবৃত্ত রীতিতেই রচিত। নিত্য, চিত্ত ও অন্ত শব্দে রুদ্ধদলের বিশ্লিষ্ট প্রয়োগই তার প্রমাণ। আরও লক্ষণীয়, এই দুই দৃষ্টান্তের রীতি ভিন্ন হলেও এদের পঙক্তিরূপ অভিন্ন। দুটিতেই প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি ছয়-ছয়-পাঁচ মাত্রার একপদী। সতেন্দ্রনাথের ‘আলেয়া’ কবিতার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি চার-চার-দুই মাত্রার একপদী, রীতি মিশ্রবৃত্ত। যুগ্মকের ন্যায় ত্রিতক বন্ধের মিলও পারস্পরিক। ত্রিপঙক্তিক শ্লোকের আর-এক রকম দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

জয় ভারত, জয় জয় মাতা,
ঋদ্ধির নিধান, সিদ্ধির দাতা,
অক্ষয় তোমার কীর্তির গাথা,—জয় জয়।
দর্দম তোমার শৌর্যের বরে
পর্বত দাঁড়ায় গর্বের ভরে
সূর্যের গমন রোধবার তরে,—জয় জয়।

—সত্যন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, ভারতের আরতি

এর প্রতি পঙ্‌ক্তি একপদী, প্রতি পদে দুই পর্ব, প্রতি পর্বে চার দলমাত্রা। এ-রকম দলবৃত্ত ত্রিতক শ্লোকের আরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

জয় কবি জয়, জগৎপ্রিয়
বরেণ্য হে বন্দনীয়,
অগম শ্রুতির শ্রোত্রিয়—জয়, জয়।···
শ্রদ্ধা-হোমের লও আরতি,
মানস-হবি এই আকৃতি,
কবি, সবিতা-দ্যুতি,—জয়, জয়।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, শ্রদ্ধাহোম

এই এই ছন্দোরূপকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন ‘**গৌড়ী গায়ত্রী**’। তাঁর দেওয়া এই নামের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য পরবর্তী ‘পরিভাষাকোষ’ অধ্যায়ে।

বাংলায় যুগ্মক বন্ধেরই প্রাধান্য। প্রাচীন কবিদের একমাত্র অবলম্বনই ছিল যুগ্মক বন্ধ। একপদী, ত্রিপদী বা চৌপদী, পঙ্‌ক্তিরূপ যা-ই হক, ধারাবাহিক ভাবে দুই পঙ্‌ক্তির অন্তে মিল রাখাই ছিল প্রচলিত রীতি। আধুনিক কালে বোধ করি মধুসূদনই প্রথম ত্রিতক শ্লোক রচনার প্রবর্তন করেন। ত্রিতক শ্লোকের নিদর্শন অপেক্ষাকৃত বিরল। অসমায়তন ত্রিতক শ্লোকরূপ খুব বিরল নয়।

৩। চতুষ্পঙ্‌ক্তিক শ্লোক বা চতুষ্ক (quatrain)

চতুষ্ক সাধারণতঃ রচিত হয় চারটি পয়ার পঙ্‌ক্তি নিয়ে। যেমন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে,
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।

—কড়ি ও কোমল, প্রাণ

মিল পর্যায়ক্রমিক। চতুষ্ক রচনায় এ-রকম মিলই সাধারণতঃ চলে। আর-একটি দৃষ্টান্ত—

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোটো-ছোটো ফুলে,
যে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়;
তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়।
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।

—কড়ি ও কোমল, ছোটো ফুল

এখানে মিল হয়েছে প্রথম-চতুর্থ ও দ্বিতীয়-তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে। এ-রকম মিল অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়।— এই দুটি চতুষ্কই মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত। দলবৃত্ত এবং কলাবৃত্ত রীতিতেও এ-রকম চতুষ্ক রচনা করা যায়। চতুষ্ক শ্লোকের দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়।

ইংরেজিতে চার এবং ততোধিক পঙ্‌ক্তির গুচ্ছকে বলা হয় stanza। বাংলায় চার পঙ্‌ক্তির গুচ্ছকে ‘চতুষ্ক’ নামে অভিহিত করে পাঁচ এবং ততোধিক পঙ্‌ক্তির গুচ্ছকে ‘স্তবক’ অভিধায় নির্দেশ করাই ভাল মনে করি।

৪। বহু পঙ্‌ক্তিক শ্লোক বা স্তবক (stanza)

চারের অধিক সংখ্যার পঙ্‌ক্তি নিয়ে রচিত স্তবকের রূপ অসংখ্য। ছোট-বড় নানা আয়তনের ও বিভিন্ন সংখ্যার পঙ্‌ক্তি বিভিন্নভাবে সাজিয়ে ও মিল দিয়ে কত রকমের স্তবক রচিত হয়েছে বা হতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। তাই সেগুলির নামকরণও নিরর্থক। এখানে নানা আয়তনের কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়াই যথেষ্ট।—

হাসিও মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মল উল্লাসে,
বনসরসীর তীরে
ভীরু কাঠবিড়ালীরে
সহসা চকিত করি ত্রাসে।
ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে-কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।

—পূরবী, শেয় বসন্ত

এখানে আছে মোট পাঁচ পঙ্‌ক্তি। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি দশ মাত্রার একপদী। তৃতীয় পঙ্‌ক্তি আট-আট-দশ মাত্রার ত্রিপদী। শেষ দুই পঙ্‌ক্তি আট-দশ মাত্রার দ্বিপদী অর্থাৎ মহাপয়ার। এর মিলগুলি পঙ্‌ক্তিক্রমিক। প্রথম মিলটি

ত্রিপঙ্‌ক্তিক, দ্বিতীয়টি দ্বিপঙ্‌ক্তিক। 'শেষ বসন্ত' কবিতাটির সবগুলি স্তবকই এই প্রণালীতে সজ্জিত। সমগ্র রচনাতে এক প্রণালীতে স্তবক গঠন করাই কবিস্বীকৃত সাধারণ রীতি।

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে—
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

—চিত্রা, উর্বশী

এই স্তবকটিতে মোট নয়টি পঙ্‌ক্তির সমাবেশ ঘটেছে। পঙ্‌ক্তিগুলি নানা আয়তনের—পাঁচটি আট-দশ মাত্রার দ্বিপদী বা মহাপয়ার, একটি আর্ট-ছয় মাত্রার দ্বিপদী বা ছোট পয়ার, একটি দশ মাত্রার একপদী আর দুটি ছয় মাত্রার একপদী। এর মিলগুলিও পঙ্‌ক্তিক্রমিক। তিনটি মিল দ্বিপঙ্‌ক্তিক, একটি ত্রিপঙ্‌ক্তিক। মূল রচনাটির ('উর্বশী') প্রত্যেকটি স্তবকই এই প্রণালীতে সাজানো।

উপরের দুটি, স্তবকই মিশ্রবৃত্ত রীতিতে রচিত। এবার কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত স্তবকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। —

ফাল্গুনী। পূর্ণিমা, ॥ ঝরিতেছে। জ্যোৎস্নার। ঝর্ণা,
'লক্ষ : তারকা :-আঁখি' ॥ মেলিয়াছে। নীলাকাশ। শূন্যে।
'নিম্নে ধরণী-বধূ' কি মধুর সুবর্ণ-বর্ণা,
'বিশ্ব শান্তিময়' 'জ্যোৎস্না-মিলন-প্রেম'-পূণ্যে।
কিশলয়-গুঞ্জনে ভরিয়াছে মধুবন-বীথিকা,
পত্রের মর্মরে রণিতেছে অশ্রুত গীতিকা।
সমীরণ-হিল্লোলে বিহ্বল কল্পনা ভাসিছে,
দক্ষিণা কানে কানে কি বার্তা কহিতেছে পুলকে;
'লক্ষ যোজন হতে' 'কে যেন কাহার লাগি' আসিছে,
তারি আগমনী গান বণিতেছে স্বর্গে ও ভুলোকে।

—জগদীশ ভট্টাচার্য, ক্ষণ-শাশ্বতী, মধুঋতু

কলাবৃত্ত বাতির এই পঙ্‌ক্তিরূপ দুর্লভ। তাই এর প্রথম দুই পঙক্তিতে যথারীতি যতিচিহ্ন দেওয়া গেল। আশা করি তার থেকেই এই স্তবকটির পঙক্তিরূপ পরিস্ফুট হবে। বলা বাহুল্য, সবগুলি পঙক্তিই দ্বিপদী। প্রথম পদে দুই পর্ব, দ্বিতীয় পদে তিন পর্ব। প্রতি পর্ব চার কলামাত্রা, শেষ পর্ব অপূর্ণ (তিন কলামাত্রা)। 'লক্ষ তারকা-আঁখি' প্রভৃতি ছয়টি পদে লঘুযতি (পর্বযতি) লুপ্ত হয়। এগুলি লঘুযতিহীন যুক্তপর্বক পদ বলে স্বীকার্য। কারণ আবৃত্তিকালে এই ছয় পদের মধ্যবর্তী লঘুযতি-স্থানে উচ্চারণবিরতি ঘটে না। এই যুক্তপর্বগুলি দুই উপযতির দ্বারা তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে বিভক্ত হয়। মোট কথা, এই দীর্ঘ দ্বিপদী পঙক্তিগুলি মিশ্রবৃত্ত মহাপয়ার পঙক্তির রূপভেদ বলেই স্বীকার্য। তাই এ-রকম পাঁচ পর্বের দীর্ঘ দ্বিপদীকে **মহাদ্বিপদী** নামেও আখ্যাত করা যায়।

এই স্তবকটিতে আছে দশ পঙক্তি। সবগুলি পঙক্তিই সমায়তন দীর্ঘ দ্বিপদী। পার্থক্য শুধু মিলে। এটির প্রথমে ও শেষে আছে একটি করে চতুষ্ক, আর মাঝে একটি যুগ্মক। চতুষ্ক-দুটির মিল পর্যায়-ক্রমিক, যুগ্মকটির মিল স্বভাবতঃই পঙক্তিক্রমিক।

এবার দলবৃত্ত রীতির ছন্দে রচিত স্তবকের আর-এক রকম একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

আমি যেদিন প্রথম বড়ো হব।
    মা সেদিন গঙ্গাস্নানের পরে
আসবে যখন খিড়কি দুয়ার দিয়ে
    ভাববে 'কেন গোল শুনি রে ঘরে'।
    তখন আমি চাবি খুলতে শিখে
    যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝিকে।
মা দেখে তাই বলবে তাড়াতাড়ি,
    'খোকা তোমার খেলা কেমনতরো'।
আমি বলব, 'মাইনে দিচ্ছি আমি,
    হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।
ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
যত চাই মা, এনে দেব আবার।

—শিশু, ছোটোবড়ো

এই স্তবকটিতে আছে আট পঙ্‌ক্তি। প্রতি দুই পঙ্‌ক্তিতে একটি করে যুগ্মক। মোট চারটি যুগ্মক—প্রথম ও তৃতীয় যুগ্মাক আয়তনে বড়, দ্বিতীয় ও চতুর্থ আয়তনে ছোট। বড় যুগ্মক-দুটির প্রতি পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী। প্রতি পদে চার-চার-দুই দলমাত্রার তিন পর্ব—তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ। ছোট যুগ্মক-দুটির প্রতি পঙ্‌ক্তি একপদী। প্রতি পদে চার-চার-দুই মাত্রার তিন পর্ব। সব মিল পঙ্‌ক্তিক্রমিক।

পূর্বেই বলেছি অধুনাপূর্ব কালে শুধু যুগ্মক রচনার রীতিই প্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্রের রচনায় স্তবক রচনার পূর্বাভাস দেখা যায়। স্তবক রচনার ব্যাপক প্রচলন হয়েছে আধুনিক কালে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে। তবু

এখনও যুগ্মকই কবিতা-রচনার প্রধান অবলম্বন। ত্রিতক রচনার দৃষ্টান্ত সব চেয়ে কম। চতুষ্কও খুব বেশি নয়। তার চেয়ে বড় স্তবকের সংখ্যা অনেক বেশি। স্তবকে পঙ্‌ক্তির সংখ্যা, আয়তন ও মিলের ক্রম কেমন হবে তা নির্ভর করে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন ও কবির অভিরুচির উপরে।

১.। রবীন্দ্রথের 'ছন্দ' গ্রন্থ (৩য় সং. ১৯৭৬), 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' (তৃতীয় পর্যায়), পৃ ১১৯।

১. রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থ (তৃতীয় সং, ১৯৭৬), 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রবন্ধ (তৃতীয় পর্যায়), পৃ ১১৯।

১. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থকারের 'বাংলা ছন্দের রূপকার রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ (১৯৮১), পৃ. ৩৪–৩৬।

২. সমগ্র রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এই গ্রন্থকারের 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে (১৯৭৪), পৃ. ২৭৫–৭৬। এই রচনাটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে উক্ত গ্রন্থের 'পাঠপরিচয়' বিভাগে, পৃ. ৪১৫–১৬। আর বিস্তৃত ইতিহাস আছে উপেন্দ্রনাথের 'বিগত দিন' গ্রন্থের সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদে, পৃ. ৩০–৪০।

চতুর্থ অধ্যায়

পয়ারের রূপবৈচিত্র্য

১। আয়তনভেদে পয়ারে দুই রূপ

পয়ার ও মহাপয়ার

'পয়ার একটি ছন্দোবন্ধের (ছন্দ-আকৃতির) নাম, ছন্দোরীতির (ছন্দ-প্রকৃতির) নাম নয়। যে ছন্দপঙ্‌ক্তি অর্ধযতির দ্বারা যথাক্রমে আট ও ছয় মাত্রার দুই ভাগে অর্থাৎ দুই পদে বিভক্ত, তারই নাম **পয়ার**। সেইজন্যই ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

আট-ছয় আট ছয়
পয়ারের ছাঁদ কয়।

—ছন্দ সরস্বতী ('ভারতী' ১৩২৫ বৈশাখ), প্রথম প্রকাশ

পয়ারের সংজ্ঞাসূত্র থেকেই বোঝা যায়, 'পয়ার' আসলে দ্বিপদী বন্ধের একটি বিশেষ রূপের রূঢ়ার্থক নাম। অর্থাৎ যে-কোনো রকম দ্বিপদী বন্ধকেই 'পয়ার' বলা যায় না। শুধু আট-ছয় মাত্রার দ্বিপদী বন্ধকেই 'পয়ার' নামে আখ্যাত করা হয়।

পরবর্তী কালে আট-দশ মাত্রার দ্বিপদী বন্ধও পয়ার নামে পরিচিত হয়েছে। এই বড় পয়ারকে বলা হয় **দীর্ঘ পয়ার** বা **মহাপয়ার**। দৃষ্টান্ত দিয়ে এই দু-রকম পয়ারের পরিচয় দিচ্ছি।—

১। মিশ্রবৃত্ত অপূর্ণ দ্বিপদী —৪+৪ ॥ ৪+২ মাত্রা

ক. জন্মেছি যে মর্ত্যলোকে ॥ ঘৃণা করি তারে
ছুটির না স্বর্গ ॥ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

—সোনার তরী, আত্মসমর্পণ

খ. সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে ॥ মেঘে মায়া ঢালে,
ভরিল সন্ধ্যার মেঘ ॥ সোনার খেয়ালে।

—স্ফুলিঙ্গ-২৪৩

এর প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি অর্ধযতির আট-ছয় মাত্রার দুই পদে বিভক্ত। এ-রকম দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিরই প্রথাসিদ্ধ নাম 'পয়ার'।

২। মিশ্রবৃত্ত পূর্ণ দ্বিপদী—৪+৪ ॥ ৪+৪ মাত্রা

ক. যেই দিন ও চরণে ॥ ডালি দিনু এ-জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন ॥ করিয়াছি বিসর্জন।

হাসিবার কাঁদিবার ॥ অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি, ॥ মা আমার, মা আমার।

—কামিনী রায়, আলো ও ছায়া, মা আমার

খ. বসি শাখে পাখি ডাকে ॥ সারা দিন একতান,
চারি দিক্ স্তব্ধ হেরি ॥ কী যেন করিত প্রাণ।
মৃদু তপ্ত সমীরণ ॥ গায়েতে লাগিত এসে
সেই সমীরণ-স্রোতে ॥ কত কী আসিত ভেসে।

—প্রভাতসংগীত, পুনর্মিলন

এর প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি অর্ধযতি দ্বারা আট-আট মাত্রার দুই পদে বিভক্ত। এ-রকম দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিকে 'পয়ার' বলা হয় না।

৩। মিশ্রবৃত্ত দীর্ঘ দ্বিপদী—৪+৪ ॥ ৪+৪+২ মাত্রা

ক. সেই দিন রাজা তথা ॥ পরিহরি ছত্র-সিংহাসনে।
রাজপাটে যথাবিধি ॥ বরিলেন প্রথম নন্দনে॥
অরিসিংহ নাম তাঁর, ॥ অরিপক্ষে সিংহের সমান।
তিন দিন পরে শূর ॥ সসৈন্যেতে রণভূমে যান॥

—রঙ্গলাল, পদ্মিনী উপাখ্যান, অরিসিংহের যুদ্ধ

খ. পূর্ণ করি মহাকাল ॥ পূর্ণ করি অনন্ত গগন
নিদ্রামগ্ন মহাকাল ॥ দেখিছেন মহান্ স্বপন।···
উঠিতেছে চন্দ্রসূর্য, ॥ উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ ॥ নক্ষত্রের জ্যোতি-পরিবার।

—প্রভাতসংগীত, মহাস্বপ্ন

এ-রকম আট-দশ মাত্রায় বিভক্ত দ্বিপদী আধুনিক কালে পরিচিত হয়েছে **মহাপয়ার** নামে।

৪। মিশ্রবৃত্ত দীর্ঘ দ্বিপদী—৪+৪+২ ॥ ৪+৪+২ মাত্রা

ক. জীবনের বসন্ত উষায়
দেখেছিনু ছবি একখানি,
ধরাতলে শান্তি মূর্তিমতী,
জ্যোতির্ময়ী দেবী বীণাপাণি।

—কামিনী রায়, আলো ও ছায়া, বেশী কিছু নয়

খ. আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার,

গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নেই তার।

—কড়ি ও কোমল, কাঙালিনী

এ-রকম দশ-দশ মাত্রায় বিভক্ত দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিকেও ‘পয়ার’ বলা চলে না। আরও নানা রকম দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি প্রচলিত আছে। কিন্তু আট-ছয় এবং আট-দশ মাত্রার দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি ছাড়া আর কোনো-রকম দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিকেই ‘পয়ার’ বলা যায় না। কারণ ‘পয়ার’ নামটা প্রথাজাত, বিচারবুদ্ধিজাত নয়। যা হক, এই পয়ার ও মহাপয়ারই বাংলা কবিতার দুই শ্রেষ্ঠ বাহন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত’। আধুনিক কালে এই পয়ার ও মহাপয়ারের রূপে ও প্রয়োগে নানা বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। তারও কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

২। রীতিভেদে পয়ারের তিন রূপ

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত

বাংলা ছন্দের তিন রীতি-ভেদে সাধারণ পয়ার ও মহাপয়ার, উভয়েরই তিন রূপ। যথাক্রমে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

১। দলবৃত্ত পয়ার (৮+৬ মাত্রা)

আজ বিকালে কোকিল ডাকে ॥ শুনে মনে লাগে,
বাংলাদেশে ছিলাম যেন ॥ তিন শো বছর আগে।

—খেয়া, কোকিল

২। কলাবৃত্ত পয়ার (৮+৬ মাত্রা)

পূর্ণিমা রাত্রের ॥ জ্যোৎস্নাধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা ॥ তন্দ্রা হারায়!

—চিত্রবিচিত্র, উৎসব

৩। মিশ্রবৃত্ত পয়ার (৮+৬ মাত্রা)

জীবন মন্থন-বিষ ॥ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল ॥ করে গেছ দান।

—চৈতালি, কাব্য

তিনটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে মোট চোদ্দ মাত্রা। আট মাত্রার পরে অর্ধযতি, আর বাকি ছয় মাত্রার পরে পূর্ণযতি। অন্য ভাবে বলা যায়, প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি আট ও ছয় মাত্রার দুই পদে বিভক্ত। অতএব তিনটিই পয়ার। কিন্তু শুনতে তিন রকম। অর্থাৎ, এই তিন রূপ হচ্ছে পয়ারের অন্তঃপ্রকৃতিজাত শ্রুতরূপ, বহিরাকৃতিগত গঠনরূপ নয়। অর্থাৎ এই তিন দৃষ্টান্ত শ্রুতরূপে বিভিন্ন (দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত), গঠন রূপে অভিন্ন (পয়ার)। ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি তথা শ্রুতরূপ নির্ভর করে তার ‘মাত্রানিরূপণ’-প্রণালীর উপরে, আর

বহিরাকৃতি বা গঠনরূপ নির্ভর করে তার 'মাত্রাবিন্যাস'-প্রণালীর উপরে। মাত্রা-নিরূপণ ও গণনা-প্রণালীর ভিন্নতার জন্যই উদ্ধৃত ত্রিবিধ পয়ার আকৃতিতে এক-রকম হলেও প্রকৃতিতে তিন রকম। তাই শুনতেও তিন রকম।

১। দলবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা)

ওখানে ঠাঁই নাই প্রভু আর, ॥ এই এসিয়ায় দাঁড়াও সরে এসে,
বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক ॥ -নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে।
ভাবসাধনার এই ভুবনে ॥ এস তোমার নূতন বাণী লয়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার ॥ ভক্তমালে নূতন মণি হয়ে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, বড় দিনে

২। কলাবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা)

কখনো বা ফাগুনের ॥ অস্থির এলোমেলো চাল
  জোগাইত নাচনের তাল।···
সমুখে অজানা পথ ॥ ইঙ্গিত মেনে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে ॥ যাত্রীর পাত্রটি পুরে
সদয় অতীত কিছু ॥ সঞ্চয় দান করে তারে
  পিপাসার গ্লানি মিটিবারে।

—নবজাতক, শেষবেলা

৩। মিশ্রবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা)

সত্য মূল্য না দিয়েই ॥ সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
  ভালো নয়, ভালো নয় ॥ নকল সে শৌখিন মজদুরি।

—জন্মদিনে-১০, 'বিপুলা এ পৃথিবীর'

অভ্র-ভেদী ঐশ্বর্যের ॥ চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা ॥ বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে

—জন্মদিনে-২২, 'সিংহাসন-তলচ্ছায়ে'

কলাবৃত্ত মহাপয়ারের দৃষ্টান্তটির দ্বিতীয় এবং শেষ পঙ্ক্তি খণ্ডিত। এই দুই পঙ্ক্তিরই আট মাত্রার প্রথম পদ বর্জিত এবং দশ মাত্রার দ্বিতীয় পদ রক্ষিত হয়েছে।

তিন রীতির সাধারণ পয়ার ও তিন রীতির মহাপয়ার, এই ছয় প্রকার পয়ারের কথা মনে না রাখলে পয়ার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব নয়।

৩। গতিভঙ্গি ভেদে পয়ারের তিন রূপ

অপ্রবহমান, প্রবহমান ও মুক্তক

শুধু আয়তনভেদে (দৈর্ঘ্যভেদ) ও রীতিভেদে নয়, পয়ারের গতিভঙ্গিভেদের কথাও বলা প্রয়োজন। পুরো পঙ্‌ক্তির গতিভঙ্গিভেদে পয়ার ও মহাপয়ার উভয়েরই তিন রূপ—অপ্রবহমান, প্রবহমান ও মুক্তক। এখানে একে-একে তিন রীতির পয়ার ও মহাপয়ারের এই ত্রিবিধ গতিভঙ্গিভেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

মিশ্রবৃত্ত পয়ারের অপ্রবহমান রূপ

ছন্দের গতিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ লঘুযতি, অর্ধযতি ও পূর্ণযতির বিন্যাসপ্রণালীর দ্বারা। যে পয়ার পঙ্‌ক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকে তাকেই বলা যায় **অপ্রবহমান পযার**। অপ্রবহমান মহাপয়ারেরও এই একমাত্র লক্ষণ। অপ্রবহমান পয়ার ও মহাপয়ার সকলেরই সুপরিচিত। উপরে পয়ার ও মহাপয়ারের যে ছয় রকম দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সবই অপ্রবহমান। নূতন দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক।

অপ্রবহমান পয়ার এবং মহাপয়ারের গতিভঙ্গিতেও বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্য ঘটে প্রধানতঃ উপযতি ও লঘুযতি-লোপের দ্বারা। উপরের দৃষ্টান্তগুলিতেই এই আভ্যন্তর গতিবৈচিত্র্যের নিদর্শন আছে।

অধুনাপূর্ব কালে আট মাত্রার পরে অর্ধযতি রাখাও আবশ্যক বলে গণ্য হত না। অর্থাৎ অর্ধযতি-লোপের নিদর্শনও খুব বিরল ছিল না। ফলে চোদ্দ মাত্রার পয়ার পঙ্‌ক্তি অনেক সময় ছয়-আট, চার-দশ, চার-ছয়-চার, চার-আট-দুই ইত্যাদি মাত্রা বিভাগে বিভক্ত হত। এমন কি, সাত-সাত মাত্রার বিভাগও খুব বিরল ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের আমলেও এ-রকম বিভাগ সুপ্রচলিত ছিল। যেমন—

চৌত্রিশ অক্ষরে। বণাইয়া কৈলা স্তব।
অনুকম্পা। স্বপনে হইল। অনুভব।···
সভাসদ্ তোমার। ভারতচন্দ্র রায়,
মহাকবি মহাভক্ত ॥ আমার কৃপায়।
তুমি তারে। 'রায় গুণাকর'। নাম দিও,
রচিতে আমার গীত ॥ তাহারে কহিও।

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, গ্রন্থসূচনা

পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি ॥ চন্দ্রেরে দেখিলে,
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে। পদ্মিনী আঁখি মিলে।···
দুই পক্ষ চন্দ্রের। অসিত সিত হয়,
কৃষ্ণ চন্দ্রে দুই পক্ষ ॥ সদা জ্যোৎস্নাময়।

—ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

ক্ষণমাত্র। বিবাহ-কলহ। নাহি ছাড়ি,
করিয়াছি কারাগার ॥ শ্বশুরের বাড়ি।

—ঈশ্বর গুপ্ত, সমাজিক ও ব্যঙ্গ-১

মনে যার। প্রণয়পীযূষ-তৃষ্ণা। আছে,

অভিমান ম্রিয়মান ॥ হয় তার কাছে।···
বসনে ঝাঁপিয়া। সুবদন-শতদল,
গোপনেতে সংবরণ ॥ করে অশ্রুজল।

—ঈশ্বর গুপত, মানস-মোহন, মান

পদ্মবন যৌবন। জীবন-সরোবরে,
বিরহ-শিশির তায় ॥ শোভাশূন্য করে

—ঈশ্বর গুপ্ত, মানস-মোহন, বিরহ

স্নান করি। উত্তরবাহিনী। গঙ্গাজলে
শিবপূজা করে আসি ॥ ফুল-বিল্বদলে।···
ভাগ্যবতী তুমি সতী, ॥ আমি ভাগ্যধর,
মহেশ্বরী কুমারী ।জামাতা মহেশ্বর।

—ঈশ্বর গুপ্ত, সারদামঙ্গল, মেনকার প্রতি গিরিরাজ

বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, একমাত্র সাত ছাড়া অন্যকোনো অসমসংখ্যক মাত্রার যতিবিভাগ দেখা যায় না সেকালের কবিদের রচনায়। আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, এ-রকম বিভিন্ন আয়তনের যতিবিভাগের ফলে সেকালের পয়ার-পঙ্‌ক্তিতে কিছু গতি-বৈচিত্র্য দেখা দিত।

কবি মধুসূদন তৎকালীন পয়ারের এই অসমান যতিবিভাগ ও তজ্জাত আভ্যন্তর গতিবৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন প্রবহমান (‘অমিত্রাক্ষর’) পয়ার রচনায়। তবে তিনি পয়ারপঙ্‌ক্তিতে সাত মাত্রার যতিবিভাগ ছাড়া আরও কিছু অসমসংখ্যক মাত্রার যতিবিভাগও মেনে নিয়েছিলেন ছন্দে গতিবৈচিত্র্য সাধনের প্রয়োজনে। কিন্তু হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিরা এ-রকম অসম সংখ্যার মাত্রাবিভাগ মেনে নেন নি। এমন কি, পূর্বাগত সাত মাত্রার বিভাগও পরিত্যক্ত হয়েছে। কেননা, অসমসংখ্যক মাত্রার যতিবিভাগ পয়ারপঙ্‌ক্তির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহকে ব্যাহত করে। তাই আজকাল পয়ারের যতিবিভাগে তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি অসমসংখ্যার মাত্রা দেখা যায় না। অধিকন্তু আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের রচিত অপ্রবহমান পয়ারে ও মহাপয়ারে আট মাত্রার পরবর্তী অর্ধযতি-লোপের নিদর্শনও খুব বিরল। অর্থাৎ পয়ার ও মহাপয়ারের দ্বিপদীত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক কালেই। ‘আট-ছয় আট-ছয় পয়ারের ছাঁদ কয়’, পয়ারের এই সংজ্ঞাসূত্র ঈশ্বর গুপ্ত-মধুসূদনের কালেও স্বীকৃত হয় নি।

মিশ্রবৃত্ত পয়ার ও মহাপয়ারের প্রবহমান রূপ

যে পয়ার বন্ধের প্রতিপঙ্‌ক্তির অন্তে পূর্ণযতি রাখা আবশ্যিক নয় তাকেই বলা হয় **প্রবহমান পয়ার**। অনুরূপ লক্ষণযুক্ত হলে মহাপয়ারও প্রবহমান হয়।

আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয়ার ও আট-দশ মাত্রাবিভাগের মহাপয়ার, এই দুই ক্ষেত্রেই আট মাত্রার পরে অর্ধযতি ও পঙ্‌ক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকে। আর দুই পঙ্‌ক্তির শেষে থাকে মিল। এই ধরাবাঁধা নিয়মের দ্বারা

ক্ষেত্রবিশেষে কবির স্বাধীনতা যে কিছু-পরিমাণে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর প্রত্যেকটি বক্তব্যকে দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয়তাও কম বাধা নয়। কোনো বক্তব্যকে দুই পঙ্‌ক্তির চেয়ে দীর্ঘ করার স্বাধীনতা যেমন থাকে না, তার চেয়ে ছোট করার স্বাধীনতাও তেমনি থাকে না। এই দুটি বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যে মধুসূদন সাধারণ পয়ারের অর্ধযতি ও পূর্ণযতি-স্থাপনকে অস্বীকার করে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে পঙ্‌ক্তির যে-কোনো স্থানে অর্ধযতি ও পূর্ণযতি স্থাপনের স্বাধীনতা অবলম্বন করলেন। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি কাব্যের ভাবকে ছন্দ-যতির অনুসারী না করে ছন্দকেই ভাব-যতির অনুসারী করলেন। কবির ভাবধারা যেখানে-যেখানে অল্পাধিক থামে, ছন্দের ধারাও সেখানে অল্পাধিক থামবে—অর্থাৎ ছোট বা বড় যতি পড়বে! এই হল মধুসূদন-প্রবর্তিত নূতন বিধান। অধিকন্তু তিনি মিলের বাধাটিও তুলে দিলেন। যতি ও মিলের বন্ধনমুক্ত এই নূতন পয়ারই পরিচিত হয়েছে **অমিত্রাক্ষর** নামে। আধুনিক পরিভাষায় তাকে বলা যায় **অমিল প্রবহমান পয়ার**। কেননা, অমিত্রাক্ষরতাই, অর্থাৎ মিলহীনতাই এই নূতন পয়ারের আসল লক্ষণ নয়। আসল লক্ষণ তার প্রবহমান গতি। প্রবহমান পয়ার সমিল হতেও বাধা নেই। যথাস্থানে তার পরিচয় দেওয়া যাবে।

প্রবহমান পয়ারকে রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় বলা যায় **পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘক** পয়ার। কেননা পঙ্‌ক্তিশেষের পূর্ণযতিকে না মেনে চলাই এই নূতন পয়ারবন্ধের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি এই পয়ারের প্রবহমান গতিভঙ্গিকে বলেছেন **লাইন-ডিঙোনো চাল** বা **পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘন**।

মধুসূদন-প্রবর্তিত এই মুক্তযতি ও মুক্তগতি অমিল পয়ার স্বভাবতঃই রচিত হয়েছিল মিশ্রবৃত্ত রীতিতে। কেননা সেকালে মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দই ছিল সাধু সাহিত্যের একমাত্র বাহন। দলবৃত্ত রীতির ছন্দ ছিল লোকসাহিত্যের বাহন। সাধু সাহিত্যের আসরে তার প্রবেশাধিকার তখনও স্বীকৃত হয় নি। আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নূতন কলাবৃত্ত রীতির আবির্ভাব তখনও অনেক দূরবর্তী।

১। অমিল প্রবহমান পয়ার (মধুসূদন)

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণী,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে, অজেয় জগতে,
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি, যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে গহন কাননে

ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আমি দয়া কর সতি।

—মধুসূদন, মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথম সর্গ

লক্ষণীয়— (১) এই পনেরো পঙ্‌ক্তিতে পূর্ণবাক্য আছে তিনটি। কোনো বাক্যই দুই পঙ্‌ক্তিতে সমাপ্ত হয় নি। একেকটি বাক্য ছড়িয়ে আছে অনেক পঙ্‌ক্তিতে। পঙক্তির মধ্যেও নানাস্থানে বাক্যের সমাপ্তি হতে পারে। ফলে পূর্ণযতিও সেখানেই স্থাপিত হতে পারে। এখানে প্রথম বাক্যটি সমাপ্ত হয়েছে ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির প্রথম চার মাত্রার পরে। (২) এই পনেরো পঙ্‌ক্তির মধ্যে পূর্ণযতি আছে মাত্র দুটি পঙ্‌ক্তির অন্তে। অন্য পঙ্‌ক্তিগুলির অন্তে আছে অর্ধযতি বা লঘুযতি। কোনো-কোনো স্থলে পঙ্‌ক্তিশেষে উপযতিও থাকে। পঙ্‌ক্তিপ্রান্তে লঘু বা উপযতিও নেই এমন হয় না। (৩) এই দৃষ্টান্তের বেশ কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতেই আট-মাত্রার পরে অর্ধযতি আছে, সর্বত্র নেই। (৪) লঘুযতি অনেক স্থলেই লুপ্ত হয়েছে। আর অলুপ্ত লঘুযতির অবস্থানেরও কোনো নির্দিষ্টতা নেই। আসলে বাক্যার্থের প্রতি লক্ষ রেখে আবৃত্তি করে গেলে এসব যতি স্বতঃই ঠিকঠিক জায়গায় পড়ে। কেননা, প্রবহমান পয়ারে ছন্দকে চলতে হয় ভাবের গতিভঙ্গি অনুসারেই, সাধারণ পয়ারের নিয়মে ভাবকে ছন্দের গতিভঙ্গি অনুসারে চলতে হয় না। এই হল সর্বপ্রকার প্রবহমান ছন্দোবন্ধের মূল রহস্য।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মিলের মাধুর্যটুকু বর্জন না করেও এই মুক্তগতি পয়ারকে এক নূতন রূপ দিলেন। এই নূতন পয়ারকে বলা যায় **সমিল প্রবহমান পয়ার**। 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' (১৮৯০) ও 'অহল্যার প্রতি' (১৮৯০) এবং 'সোনার তরী' কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' (১৮৯২) এবং 'বসুন্ধরা (১৮৯৩) কবিতায় এই সমিল মুক্তগতি পয়ার আদর্শ রূপ ধারণ করেছে। এই রচনাগুলি সুপরিচিত। তবু পাঠকের আশুবোধের সহায়তাকল্পে একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হল।

২। সমিল প্রবহমান পয়ার (রবীন্দ্রনাথ)

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।
সেদিন সে উজ্জয়িনী-প্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবনবেগ, গুরুগুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন

সেই দিন ঝরে পড়ে ছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।

—মানস, মেঘদূত (১৮৯০)

মধুসূদনের রচনার তুলনায় এর গতিভঙ্গি অনেক মসৃণ। গীতিকবিতার পক্ষে এই মসৃণতার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এর প্রবহমানতা সুস্পষ্ট। এতগুলি পঙ্‌ক্তিতে পূর্ণযতি আছে মাত্র পাঁচটি'—তিনটি পঙ্‌ক্তির অন্তে, দুটি মধ্যে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কোথাও অসমসংখ্যক মাত্রার পরে যতি নেই। এটাও এর অবন্ধুরতার একটা বড় কারণ। এই প্রসঙ্গটা আর-একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।—

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,
নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপসবিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে?

—মানসী, অহল্যার প্রতি (১৮৯০)

আজ কোনো কাজ নয়—সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধ-গ্রন্থগীত—এস তুমি প্রিয়ে,
অজন্মা-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে বোসো।···
শরৎ-প্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা।

—সোনার তরী, মানসসুন্দরী (১৮৯২)

অহল্যা, কবিতা ও শেফালি, এই তিনটি ত্রিমাত্রক শব্দের পরে যতি রেখে আবৃত্তি করলে ছন্দের গতিতে একটু বন্ধুরতা দেখা দেয়। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের শুরুতেই 'অকালে' শব্দের পরে যতি রাখা কবি হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পায় নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দের' অর্থ প্রবন্ধে বলেছেন ('ছন্দ' তৃতীয় সং, পৃ-৬৩) —"তার [রীববাহুর] অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল—'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে'।" অর্থাৎ 'অকালে' শব্দের পরে যতি রাখাতে ছন্দ এখানে ভেঙে পড়েছে। রবীন্দনাথের এই উক্তি (১৯১৮) 'মানসী' ও 'সোনার তরী' কাব্য রচনার বহুকাল পরবর্তী। মনে হয় এক কালে তিনি পরীক্ষা করে দেখছিলেন প্রবহমান পয়ারে তিন মাত্রার পরে যতি চালানো যায় কি না। কিন্তু তাঁর কানের অনুমোদন না পাওয়াতে এই প্রয়াস পরে পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়।

আট-দশ মাত্রার অপ্রবহমান মহাপয়ার (স্বভাবতঃই সমিল) প্রথম দেখা যায় রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে (১৯৫৮)। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) কাব্যেও এই সমিল অপ্রবহমান মহাপয়ারের যথেষ্ট সাবলীল প্রয়োগ দেখা যায়। অধিকন্তু এই কাব্যে অমিল প্রবহমান মহাপয়ারের নিদর্শনও আছে। বোধ করি

দ্বিজেন্দ্রনাথই মহাপয়ারের অমিল প্রবহমান রূপের প্রথম প্রবর্তক। তাঁর রচিত এই নূতন মহাপয়ারের গতিভঙ্গিটুকু লক্ষণীয়।—

৩। অমিল প্রবহমান মহাপয়ার (দ্বিজেন্দ্রনাথ)

গম্ভীর পাতাল। যথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখাসঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহস্ত এড়াইতে—প্রাণযথা কালের কবল।
কোথা জল কোথা স্থল কোথা তল কোথা দিগ্‌বিদিক্‌।
রসাতল-গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল।
দেখে যদি মর্ত্য কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়া, সে কি আর
আসে ফিরে্য? আপাদমস্তক ঘুরি, টলিয়া চরণ,
কন্টকিয়া কেশজাল, বিস্ফারিয়া নয়নযুগল,
তমোগর্ভে তলাইয়া শেষপৃষ্ঠে লভে শেষ গতি।
দল-বল একত্র করিছে হেথা রসাতল-পতি।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বপ্নপ্রয়াণ, পঞ্চম গ্রন্থ (রসাতল প্রয়াণ)

অর্ধযতি ও পূর্ণযতির অবস্থানগত কোনো নির্দিষ্টতা নেই। কবির ভাবপ্রবাহ (এক-একটি বাক্য) বয়ে চলেছে একাধিক পঙ্‌ক্তিতে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত এই অমিল প্রবহমান মহাপয়ারই দীর্ঘকাল পারে সমিল রূপ লাভ করে রবীন্দ্রনাথের রচনায়। 'সোনার তরী' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' (১৮৯৩) এবং 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' (১৮৯৪) প্রভৃতি কবিতার যোগে সমিল প্রবহমান মহাপয়ার সকলের কাছেই সুপরিচিত হয়েছে। মহাপয়ারের এই নূতন রূপের নমুনা হিসাবে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা গেল।—

৪। সমিল প্রবহমান মহাপয়ার (রবীন্দ্রনাথ)

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার

সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

—সোনার তরী, সমুদ্রের প্রতি (১৮৯৩)

যতিবিভাগের কোনো নির্দিষ্টতা নেই। অথচ ছন্দের প্রবহমান গতি সুমসৃণ। রবীন্দ্ররচিত সবরকম প্রবহমান পয়ারেরই এই বিশিষ্টতা।

রবীন্দ্ররচিত অমিল প্রবহমান মহাপয়ারের আদর্শ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তার 'প্রান্তিক' কাব্যের (১৯৩৮) কয়েকটি রচনায়। এই কাব্য থেকে একটা নমুনা তুলে দিলাম।—

৫। অমিল প্রবহমান মহাপয়ার (রবীন্দ্রনাথ)

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছি
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে; দূর যুগান্তর
হতে মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্যমুহূর্তেরে
তব শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

—প্রান্তিক ১৩, 'একদা পরমমূল্য'

প্রবহমান পয়ারে (ছোট বা বড়) মিলের অভাব কানকে পীড়া দেয় না। কারণ (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়)—'এর ভঙ্গি পদ্যের মতো, কিন্তু ব্যবহার গদ্যের তালে'।[১]

মিশ্রবৃত্ত পয়ারের মুক্তক রূপ

'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ' কাব্যে মধুসূদন যতি ও মিলের বন্ধন ছিন্ন করে পয়ারকে মুক্তি দিলেন বটে, কিন্তু তিনি পয়ারপঙ্ক্তির চোদ্দ মাত্রার সীমাবন্ধনটুকু মেনেই নিলেন। তেমনি প্রবহমান মহাপয়ারের আঠারো মাত্রার সীমাবন্ধনটুকুও দীর্ঘকাল অব্যাহত রইল। কিন্তু পঙ্ক্তিসীমার বন্ধনও তো বন্ধনই, ক্ষেত্রবিশেষে কবিদের অভিপ্রায়সাধনের অন্তরায়। তাই কালক্রমে পয়ারের এই পঙ্ক্তিসীমার বন্ধনটুকু কবিদের হাতে ছিন্ন হল। তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় মধুসূদনেরই 'গদা ও সদা', 'সিংহ ও মশক' প্রভৃতি কোনো-কোনো খণ্ডকবিতায়। আর পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণের নাট্যরচনায় এবং রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায়। যতি ও পঙ্ক্তিসীমার বন্ধনহীন এই যে মুক্ততর পয়ার, তাকেই বলি **মুক্তক পয়ার**। এই মুক্তক পয়ারকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন **গণ্ডিভাঙা** বা **বেড়াভাঙা** পয়ার। কারণ চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার প্রবহমান পয়ারে পঙ্ক্তিসীমার বেড়া দাঁড়িয়ে থাকে, অথচ ছন্দের পদক্ষেপ ক্রমাগতই চলে ওই সীমার বেড়া বা গণ্ডি ডিঙিয়ে।

তার পরে এক সময়ে যখন অনাবশ্যকবোধে এই বেড়াগুলিই ভেঙে দেওয়া হল তখনই দেখা দিল যথার্থ মুক্তক বা বেড়াভাঙা পয়ার। এই মুক্তক পয়ারেরও দুই রূপ—সমিল ও অমিল। এবার এই মুক্তক পয়ারের বিভিন্ন রূপের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

১। সমিল মুক্তক ছোট পয়ার (মধুসূদন)

ক। গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীমা স্রোতস্বতী,
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলাহল
উভে আক্রমিল।
সদা অতি কাতরে কহিল,—
"শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি
বিষ্ণু রথিপতি
জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লভিলা,
মার চোরে করি রণলীলা!"

—মধুসূদন, নীতিগর্ভ কাব্য, ও সদা

১। সমিল মুক্তক ছোট পয়ার (রবীন্দ্রনাথ)

খ। অজস্র দিনের আলো,
জানি, একদিন
দু'চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি মহারাজ।
শোধ করে দিতে হবে জানি,
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে
ফেল ছায়াখানি।...
অল্প কিছু আলো থাক,
অল্প কিছু ছায়া,
আর কিছু মায়া।
ছায়াপথে লুপ্ত আলোকের পিছু
হয়তো কুড়ায়ে পাবে কিছু—

কণামাত্র লেশ
তোমার ঋণের অবশেষ।

—রোগশয্যায় ৪, 'অজস্র দিনের আলো' (১৯৪০)

এই রচনাটির একটি পঙ্‌ক্তি ('শেষ চিহ্ন···ধূলায়') মিলহীন। এই পঙ্‌ক্তিটি আছে এই রচনার অনুদ্ধৃত অংশে।

২। অমিল মুক্তক ছোট পয়ার (রবীন্দ্রনাথ)

ক। ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
সম্পদে বিপদে,
জীবনে মরণে
শত ঋতু-আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও কেড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখ তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার কর তুমি পান,
ভালবাস, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

—মানসী, নিষ্ফল কামনা (১৮৮৭)

মধুসূদনের 'নীতিগর্ভ কাব্যে' যে-কয়টি মুক্তক পয়ার আছে তার কোনোটিতেই পঙ্‌ক্তিদৈর্ঘ্য চোদ্দ মাত্রার সীমা ছাড়িয়ে যায়নি (দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে)। কেননা, মধুসূদনের কোনো রচনাতেই আঠারো মাত্রার পয়ারপঙ্‌ক্তি স্বীকৃতি পায় নি। দ্বিতীয়তঃ, অমিল প্রবহমান পয়ারের প্রবর্তক মধুসূদনের রচনায় অমিল মুক্তক পয়ারের কোনো নিদর্শন নেই। মনে হয় শিশুদের জন্য অভিপ্রেত নীতিগর্ভ কবিতায় অমিল ছন্দ চালানো তিনি সমীচীন মনে করেন নি। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে ওই একটিমাত্র মুক্তক পয়ারের নিদর্শন আছে। এবং

সেটি অমিল। যিনি সমিল প্রবহমান পয়ারের প্রবর্তক, তাঁর হাতেই দেখা দিল অমিল মুক্তক রচনা। মনে হয় সেকালে নাট্যসাহিত্যে যে ছোট আয়তনের অমিল মুক্তক পয়ার প্রচলিত ছিল তাকেই তিনি আবৃত্তিযোগ্য কবিতার উপযোগী রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনে রচিত আরো কোনো-কোনো কবিতায় অমিল ছোট পয়ারের মুক্তক রূপ দেখা যায়। যেমন—

২। অমিল মুক্তক ছোট পয়ার (রবীন্দ্রনাথ)

খ। বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এধরণী মাটির বুদবুদ,
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি।
সে না হলে বিরাটের নিখিলমন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনো জন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে।
রইত নীরব।

—পরিশেষ, প্রাণ (১৯৩১)

গ। জীবনবহনভাগ্য নিত্য আশীর্বাদে
ললাট করুক স্পর্শ
অনাদি জ্যোতির দান-রূপে—
নব নব জাগরণে প্রভাতে প্রভাতে
মর্ত্য এ আয়ুর সীমানায়।
ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্ত্যলোকের দ্বারে
নিদ্রায়-জড়িত রাত্রির সম।
হে সবিতা, তোমার কল্যাণত রূপ
করো অপাবৃত,

সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আনি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

—জন্মদিনে ২৩, 'জীবনবহনভাগ্য' (১৯৪০)

'আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস' ইত্যাদি রচনাটিও (রোগশয্যায়-২৬) অমিল মুক্তক ছোট পয়ারের ভাল দৃষ্টান্ত। তবে এই রচনাটি অতি স্বাভাবিক ভাবেই সমাপ্ত হয়েছে আঠারো মাত্রার একটি দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি দিয়ে।

৩। সমিল মুক্তক মহাপয়ার (দ্বিজেন্দ্রলাল)

ক। ১

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজ্জলিতে; স্বর্গীয়,
সুন্দর।
কভু ভাবি মনে
তুমি নও শীত
ধরণীর;
কোন্ সূর্যালোক হতে এসেছিলে নেমে
এক বিন্দু কিরণ শিশির;
শুধু গাথা-গীত,
আলোক ও প্রেমে;
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

৪

আরো;—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীব সুন্দর মুখখানি;
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে।
তখন কি জানি,
কিরূপ সে যেন উদাসীন, চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে।
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।

তখন নক্ষত্র সম ছিলে দূরস্থায়ী।
তখন সৌন্দর্যে এসেছিলে, প্রেমে আস নাই।

৫

কিন্তু আজি যৌবন সোদ্যম;
প্রভাতশিশির—
সম স্নিগ্ধ; বীণাধ্বনিসম
স্বর্গীয়; বিশ্বাসসম স্থির;
গাঢ় নীল আকাশের মত;—
সে, দৃঢ়নির্ভর প্রেমে মোরই পানে নত।
আহা,
যদি কোনো মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে;
যদি অপ্সরার সম্মিলিত গীতধ্বনি
হত সত্য; নৈশ নীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত; অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী হইত ঝংকার;
হইত আশ্চর্য তাহা;
কিন্তু হইত না অর্ধমধুর সংগীত তার
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্দ্র (১৯০২), উদবোধন

ছন্দের বিশিষ্টতা বিবেচনায় এই দীর্ঘ কবিতাটির পুরো তিনটি স্তবকই উদ্ধৃত হল। অনুরূপ ছন্দের আর-একটি কবিতা আছে 'মন্দ্র' কাব্যে। নাম 'আশীর্বাদ'। এটির স্তবক-সংখ্যা দুই। প্রতি স্তবকে দশটি করে অসমান পঙ্‌ক্তি, আর প্রতি স্তবকের দশ পঙ্‌ক্তিতে একই মিল। মিলের ব্যবস্থা ছাড়া 'আশীর্বাদ' ও 'উদ্বোধন' কবিতার ছন্দ-গঠনপ্রণালী অভিন্ন। এই দুই কবিতার ছন্দ প্রচলিত যতিবিধানকে উপেক্ষা করে যথেচ্ছ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, কোথাও ছক-বাঁধা পথে আবর্তিত হয় নি। এই যে বাধাবন্ধনহীন মুক্তগতির ছন্দ, আধুনিক পরিভাষায় তারই নাম 'মুক্তক'। এই যথেচ্ছ গতির ছন্দ রচনায় যে স্পর্ধা ও দুঃসাহস প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মতে, তা "কোনো ক্ষমতাহীন কবিকে শোভা পাইত না।" রবীন্দ্রনাথ আরও মন্তব্য করেছেন যে—"তিনি যেন

সাংঘাতিক সংকটের পাশ দিয়া গেছেন—কোথাও যে কিছু বিপদ্ ঘটে নাই তাহা বলিতে পারি না।” অর্থাৎ এই যথেচ্ছ ছন্দ-রচনায় কোনো-কোনো স্থলে কিছু ত্রুটিও আছে। যেমন—প্রথম স্তবকে মনোহর-সুন্দর, প্রিয়-স্বর্গীয়, মনে-স্বপনে, শীত-গীত, ধরণীর-শিশির, নেমে-প্রেমে এবং পঞ্চম স্তবকে আহা-তাহা, সোদ্যম-সম, শিশির-স্থির, সুর-মধুর, হেম-প্রেম ইত্যাদি দূরান্বিত ও কষ্টসাধ্য মিল কানে ধরা পড়ে না, চোখে দেখে আবিষ্কার করতে হয়। তাতে খানিকটা কৃত্রিম কলাকৌশল প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু মিলের আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়। অধিকন্তু তাতে ছন্দের ও ভাবের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়। প্রথম স্তবে ‘স্বর্গীয়, সুন্দর’ একসঙ্গে থাকলই ছন্দের মাত্রা ও কাব্যের ভাবগত সমতা রক্ষিত হত। কিন্তু ‘প্রিয়-স্বর্গীয়’ মিলের খাতিরে তা হয় নি। ফলে এক পঙ্ক্তিতে মাত্রাসংখ্যা হয়েছে নয়, অন্য পঙ্ক্তিতে তিন। দুটোই ছন্দের পক্ষে মারাত্মক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এখানেই ‘বিপদ্’ ঘটেছে। যদি লেখা হত ‘সুন্দর, স্বর্গীয়’ তাহলে বিপদ্ ঘটত না, ছন্দ ও ভাবের সমতা বজায় থাকত। কিন্তু ‘মনোহর-সুন্দর’ মিল থাকত না। বলা বাহুল্য, মিলের চেয়ে ভাব ও ছন্দের গুরুত্ব বেশি। পঞ্চম স্তবকে ‘শিশিরসম’ এবং ‘হেম সন্ধ্যাকাশ’ এক সঙ্গে থাকলেই ভাবগত অন্বয় রক্ষিত হত। এই দুই স্থানেও মিলের খাতিরেই ভাবকে ব্যাহত করা হয়েছে। তা ছাড়া স্বর্গীয়’ ও ‘হইত’, এই দুই স্থানেও তিন মাত্রার পরে যতি থাকাতে এই ছন্দের স্বাভাবিক গতিভঙ্গিতে পঙ্গুতা দেখা দিয়েছে।

এই দুটি ত্রুটির (মিলের কৃত্রিমতা ও তিন মাত্রার পরে যতি) কথা বাদ দিলে এই ছন্দের অভিনব ও বলিষ্ঠ গতিভঙ্গিতে বিস্মিত হতে হয়। এর কোনো-কোনো পঙ্ক্তি ভাবের বেগে অনায়াসেই চোদ্দ মাত্রার সীমা ছাড়িয়ে ষোলো, আঠারো, কুড়ি বা বাইশ মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে। এই দীর্ঘ পঙ্ক্তিগুলি কোথাও এলিয়ে পড়ে না, তার গ্রন্থিগুলিতে শিথিলতা নেই। সর্বত্রই আঁট বাঁধুনি। দীর্ঘ পঙ্ক্তিগুলি প্রচলিত প্রথা মেনে আট-ছয় বা আট-দশ মাত্রায় পা ফেলে চলে না। ভাবের গতিভঙ্গি অনুসারে যথেচ্ছ পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। কিন্তু বিজোড় মাত্রায় না, তাই তালভঙ্গ হয় না। সে সময়কার (১৯০২) পক্ষে বাংলা ছন্দে এ-রকম গতিভঙ্গি সঞ্চার করা সত্যই বিস্ময়কর। অসাধারণ ছন্দ-প্রতিভার পরিচায়ক। আরও বিস্ময়ের বিষয়, এই কবিতাটির রচনাকাল। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কবির ‘আর্যগাথা’ কাব্য দ্বিতীয় ভাগে (১৮৯৩)। এই কাব্যের ‘উৎসর্গ’ পত্রেই ছিল এই কবিতাটি। এই উৎসর্গ কবিতাটিই পরে ঈষৎ মার্জিত রূপে সংকলিত হয় ‘মন্দ্র’ কাব্যে (১৯০২)। তখন এটির নাম হয় ‘উদ্বোধন’। কিন্তু তার ছন্দোরূপ অপরিবর্তিত থাকে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটির রচনাকাল সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। যা হক, মনে রাখতে হবে তখন (১৮৯৩) রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবহমান মহাপয়ার সবে দেখা দিয়েছে, আর মুক্তক মহাপয়ার ছিল বহু দূরবর্তী। অথচ এই সময় দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে পয়ারের মুক্তকরূপ দেখা দিল সংশয়াতীত রূপে, আর তার পঙ্ক্তিদৈর্ঘ্য অনায়াসেই চোদ্দ মাত্রার সীমা অতিক্রম করে গেল। সে সীমা আঠারো মাত্রায় না থেমে বাইশ মাত্রা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র অসংযম বা শৈথিল্য প্রকাশ পায়নি। তাই এই ‘উদ্বোধন’ কবিতাটিকেই মুক্তক মহাপয়ারের অগ্রদূত বলে মেনে নেওয়া সমীচীন মনে করি। এই কারণেই এটির ছন্দোগত দোষগুণের বিষয় এত সবিস্তারে আলোচনা করা গেল।

এর প্রায় দুই দশক পরে মুক্তক মহাপয়ারের সুগঠিত স্বচ্ছন্দ রূপ দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ কাব্যের রচনায় (১৯১৪)। দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩ মে) মুক্তক মহাপয়ারের এই পরিচ্ছন্ন রূপ দেখে যেতে পারেন নি।

৩। সমিল মুক্তক মহাপয়র (রবীন্দ্রনাথ)

খ। তোমার চিকন

চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত

তবে

একদিন কবে

চঞ্চল পবনে লীলায়িত

মর্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের

হত স্বপনের।

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে?

তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে,

তাই ভুল।

অন্য মনে চলি যবে পথে, ভুলি নে কি ফুল?

ভুলি নে কি তারা?

তবুও তাহারা।

প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,

ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।

ভুলে-থাকা নয় সে তো ভোলা;

বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।

—বলাকা-৬ 'তুমি কি কেবল ছবি' (১৯১৪)

৪। অমিল মুক্তক মহাপয়ার (রবীন্দ্রনাথ)

ক। হে জরতী, দেখেছি তোমাকে

সত্তার অন্তিম তটে,

যেখানে কালের কোলাহল

প্রতিক্ষণ ডুবিছে অতলে।

নিস্তরঙ্গ সেই সিন্ধুনীরে

তীর্থস্নান করি

রাত্রির নিকষকৃষ্ণ শিলাবেদিমূলে

এলোচুলে করিছ প্রণাম

পরিপূর্ণ সমাপ্তিরে।
চঞ্চলের অন্তরালে অচঞ্চল যে শান্ত মহিমা
চিরন্তন,
চরম প্রসাদ তার। নামিল তোমার নম্রশিরে
মানস সরোবরের অগাধ সলিলে
অস্তগত তপনের সর্বশেষ আলোর মতন।

—পরিশেষ, জরতী (১৯৩২)

খ। অভিভূত ধরণীর দীপ-নেভা তোরণদুয়ারে
আসে রাত্রি,
আধা অন্ধ, আধা বোবা,
বিরাট্ অস্পষ্ট মূর্তি,
যুগারম্ভ-সৃষ্টিশালে অসমাপ্তি পুঞ্জীভূত যেন
নিদ্রার মায়ায়।...
বিশ্বনাট্যে প্রথম অঙ্কের
অনিশ্চিত প্রকাশের যবনিকা
ছিন্ন করে এসেছিল দিন,
নির্ধারিত করেছিল বিশ্বের চেতনা
আপনার নিঃসংশয় পরিচয়।...
আমি কর্তা, আমি মুক্ত দিবসের আলোকে দীক্ষিত,
কঠিন মাটির 'পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় করে চলে।

—নবজাতক, রাত্রি (১৯৩৯ জুলাই ২৬)

লক্ষণীয় মুক্তক পয়ারেও প্রবহমানতা থাকে। কেননা, প্রবহমান পয়ারকে পঙ্‌ক্তিসীমার বন্ধন থেকে মুক্ত করার ফলেই মুক্তক পয়ারের উদ্ভব হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, মুক্তক পয়ার আসলে প্রবহমান পয়ারের রূপান্তর মাত্র।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের মুক্তক মহাপয়ার বন্ধেও মাঝে-মাঝে ২০ বা ২২ মাত্রার পঙ্‌ক্তি দেখা যায়। যেমন—

১।   তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি   ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

—বলাকা-৭, 'এ কথা জানিতে তুমি'

২। পাপ যদি নাহি মরে যায়
      আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
   অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে   আপনার অসহ্য সজ্জায়,
      তবে ঘরছাড়া সবে
      অন্তরের কি আশ্বাস-রবে
   মরিতে ছুটিছে শতশত প্রভাত-আলোর পানে শতশত নক্ষত্রের মতো?

—বলাকা-৩৭, 'দূর হত কি শুনিস'

৩। যে আনন্দ-বেদনায়। এ জীবন বারেবারে। করেছে উদাস
      হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

—বনাকা-৪১, 'যে কথা বলিতে চাই'

৪। যারে নাহি চিনি,
      যার ভাষা বুঝিতে পারিনি,
   অর্ধরাতে দেখা দিবে। বারে বারে তারি মুখ। নিদাহীন চোখে
            রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।

—বলাকা-৪২, 'তোমারে কি বারবার'

২০ (১০+১০) এবং ২২ (৮+৮+৬) মাত্রার দ্বিপদী ও ত্রিপদী পঙ্‌ক্তিকে মহাপয়ার বলা যায় না। সুতরাং এ-রকম পঙ্‌ক্তিকে মুক্তক মহাপয়ারের স্বীকৃত সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম বলেই মনে করা সমীচীন।

মোট কথা। সব রকম পয়ারেরই মূল অবলম্বন দুই মাত্রার অর্ধপর্ব, চার মাত্রার পূর্ণপর্ব, ছয় মাত্রার সার্ধপর্ব এবং আট মাত্রার যুক্তপর্ব। এই চার রকম মাত্রাবিভাগকে নির্দিষ্ট প্রণালীতে উপযতি, লঘুযতি, অর্ধযতি ও পূর্ণযতি দিয়ে চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার সীমার মধ্যে সাজালেই হয় পয়ার বা মহাপয়ার। আর, যতি-স্থাপনের নির্দিষ্ট প্রণালী না মেনে এই মাত্রাবিভাগগুলিকে স্বাধীন ভাবে অর্থাৎ গদ্যের মতো শুধু ভাবযতি অনুসারে চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়ে গেলেই হয় প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ার। সবশেষে, নির্দিষ্ট পঙ্‌ক্তিসীমার বাধাটুকুও সরিয়ে ফেলে কবিভাবনাকে স্বাধীনভাবে স্তরে স্তরে সাজিয়ে গেলেই হয় মুক্তক পয়ার। তবু কিন্তু একটা সীমা মেনে চলতে হয়। দেখতে হয় কোনো ভাবতরঙ্গই যেন চোদ্দ বা আঠারো মাত্রার সীমা ছাড়িয়ে না যায়। এটুকুও না থাকলে মুক্তক পয়ারকে তো আর পয়ারই বলা যাবে না। নদী যদি তীরের বন্ধন থেকেও মুক্তি পায় তবে সে আর নদীই থাকে না। তাই মুক্তককেও একটা সীমা মেনে চলতে হয়। সীমাহীন মুক্তক ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন **লাগাম-ছেঁড়া ছন্দ**। এই 'লাগাম-ছেঁড়া' ছন্দের প্রসঙ্গ আবার তোলা যাবে যথাস্থানে। মুক্তক পয়ারের স্বাভাবিক পরিণতি কি, এবার তারই একটু পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

বাংলা ছন্দের গদ্যরূপ

প্রবহমান ও মুক্তক পয়ার ছন্দের যে বন্ধনমুক্তির পরিচয় পাওয়া গেল, তা হল শুধু যতি, মিল ও পঙ্‌ক্তিসীমার বন্ধন থেকে মুক্তি, নির্দিষ্টসংখ্যক মাত্রা-বিন্যাসের নীতি থেকে মুক্তি নয়। মাত্রাবিন্যাসের যে নীতিতে ছন্দোবদ্ধ পদ্যের পদ গঠিত হয়, পয়ারের মুক্তক রূপেও সে নীতির বন্ধনকে মেনে নেওয়া হয়। সে বন্ধনটুকুও না মানলে, অর্থাৎ মাত্রাবিন্যাসের নীতি লঙ্ঘন করলে পদ্য আর পদ্যই থাকে না, সে হয়ে ওঠে গদ্য। কিন্তু কবিরা অনুভব করলেন যে, মাত্রাবিন্যাসের নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ফলে পদ্যে যে ধ্বনিগত তরঙ্গায়িত ভঙ্গি বা ধ্বনিস্পন্দ (rhythm) জেগে ওঠে, সেই স্পন্দ বা তরঙ্গভঙ্গিটুকুকে রক্ষা করে যদি নির্দিষ্টসংখ্যক মাত্রা-বিন্যাসের বন্ধনকে এড়ানো যায়, তাহলে একরকম স্পন্দমান গদ্য (rhythmic prose) রীতির উদ্ভব হয়, যাকে ক্ষেত্রবিশেষে অনায়াসেই কাব্যভাবের বাহন রূপে স্বীকার করে নেওয়া যায়। এইরূপেই আবির্ভূত হল গদ্যকবিতা। সংক্ষেপে বলা যায়, গদ্যকবিতায় ছন্দ থাকে না, কিন্তু ছন্দের ভঙ্গিটুকু থাকে। গদ্যকবিতার এই যে ধ্বনিভঙ্গি বা স্পন্দনলীলা, তাকেই বলা হয়েছে ‘গদ্যছন্দ’। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। আমি বললেম, “সুরসিকে, খুশি হবে না,
এ গদ্যকাব্য।”
কপালে ভ্রূকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে
বললে, “আচ্ছা, তাই সই।”
সঙ্গে একটু স্তুতিবাক্য দিলে মিলিয়ে;
বললে, “তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।”
বলে গলা ধরলে জড়িয়ে।
আমি বললেম, “কবিত্বের রঙ লাগিয়ে নিচ্ছ
কবিকণ্ঠ থেকে তোমার বাহুতে?
সে বললে, “অকবির মতো হল তোমার কথাটা;
কবিত্বের স্পর্শ লাগিয়ে দিলেম তোমারি কণ্ঠে,
হয়তো জাগিয়ে দিলেম গান।”
শুনলুম নীরবে, খুশি হলুম নিরুত্তরে ।

—আকাশপ্রদীপ, ময়ূরের দৃষ্টি

পদ্যের রঙ-লাগা গদ্যই হচ্ছে গদ্যকবিতার বাহন। গদ্যেও পদ্যের রঙ্‌ লাগে যে কণ্ঠস্বরের প্রভাবে, সে কণ্ঠস্বর বস্তুতঃ ভাবেরই দ্যোতক। এই ভাবাবেগের স্পর্শেই গদ্যকবিতার ভাষা স্পন্দিত হয়ে ওঠে পদ্যের মতো। এজন্যই কবিতার ভাবস্পন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘ভাবের ছন্দ’। গদ্যকবিতার ভাষায় পদ্যের ন্যায় সুনির্দিষ্ট ধ্বনিস্পন্দ লক্ষিত হয় না, কিন্তু কবিতার ভাবস্পন্দটুকু রক্ষিত হয়। গদ্যকবিতার ভাষায় পদ্যের ন্যায় পদবিভাগও থাকে, কিন্তু সেসব পদবিভাগ কবিতার ভাববিভাগেরই অনুরূপ, পদ্যের মতো ধ্বনিমাত্রা-

নিরূপিত নয়। গদ্যকবিতার ভাবানুযায়ী পদক্ষেপ ও স্পন্দিত গতিভঙ্গি, এই দুই-ই অনুভূত হবে নিম্নোদ্ধৃত কাব্যাংশটুকু থেকে।—

২। আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।···
আজ আপন মনে ভাবি,
"কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা?"
শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর,
আজ দেখছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।
কেননা আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে।

—পত্রপুট-১৫, "ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত"

শুধু পদ্যভাষা নয়, সাধারণ গদ্যভাষা থেকেও এই গদ্যকবিতার ভাষাপ্রকৃতি পৃথক্। গদ্যকবিতার ভাষাগত দায়িত্ব কবিচিত্তের ভাবস্পন্দ ও তার গতিভঙ্গিকে প্রকাশ করা। আর সাধারণ গদ্যভাষার দায়িত্ব নানাপ্রকার তথ্য, বিবরণ ও মননধারার বাহকত্ব করা। ফলে সে ভাষার প্রকৃতি হয় নিরলংকার ও নিস্তরঙ্গ, আর তার গতি হয় সরল, বৈচিত্র্যহীন।

দলবৃত্ত পয়ারের প্রবহমানরূপ

মিশ্রবৃত্ত পয়ারের নানারকম গতিভঙ্গি সাহিত্যে সুপ্রচলিত। দলবৃত্ত পয়ারের এত রকম গতিভঙ্গি দেখা যায় না, যদিও মিশ্রবৃত্ত রীতি-সুলভ সব রূপবৈচিত্র্যই দলবৃত্ত রীতিতে চালানো সম্ভব। দলবৃত্ত রীতির এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সজাগ ছিল। বাংলা সাহিত্যে দলবৃত্ত পয়ারের যে কয় প্রকার গতিবৈচিত্র্য দেখা যায় একে-একে তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল।—

১। অমিল প্রবহমান (অমিত্রাক্ষর) পয়ার

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষপদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষঃকুলের নিধি।

—ছন্দ (৩য় সং), ছন্দের প্রকৃতি (১৯৩৪), পৃ ১৭০-৭১

বলা বাহুল্য, এটুকু হচ্ছে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম পাঁচ পঙ্‌ক্তির রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় অমিত্রাক্ষর সাধু পয়ারের প্রাকৃত রূপ, আধুনিক পরিভাষায় অমিল প্রবহমান মিশ্রবৃত্ত পয়ারের দলবৃত্ত রূপ। মেঘনাদবধ কাব্যের সাধু অমিত্রাক্ষর পয়ার শতাধিক বর্ষব্যাপী পরিচয়ের ফলে আমাদের বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে। তাই মেঘনাদবধের সাধু ভাষা ও ছন্দকে প্রাকৃত বেশ পরালে আমাদের চিরাগত ও বদ্ধমূল সংস্কার আহত হয়। ফলে আমাদের মনও স্বভাবতঃই ওই প্রাকৃত রূপের প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে। কাব্যের সিদ্ধরসে হস্তক্ষেপের এই বিপদ্। এই আশঙ্কা বা বিপদের কথা মনে ছিল বলেই 'যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল' ইত্যাদি অংশটুকু রচনা করবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে ভূমিকা করে বলতে হয়েছিল—

> "এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস।…এই প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না।"

—ছন্দ (৩য় সং, ১৯৭৬), পৃ ১৭০

আর, এই কয়েক পঙ্‌ক্তি রচনা করেও তাঁকে আবার বলতে হয়েছিল—"এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে এ কথা মানব না।"

অথচ এ-কথাও সত্য যে, অনেক পাঠকের কান রবীন্দ্রনাথের কানের সঙ্গে সায় দিতে পারে নি। বলা বাহুল্য, এটা দীর্ঘকালের অভ্যাসজাত সংস্কারেরই ফল। চিরন্তন অভ্যাস ও সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারা প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব, সকলের পক্ষে নয়। প্রচলিত পয়ারের চিরন্তন সংস্কারকে অতিক্রম করতে গিয়ে একদা মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভাকেও কম বাধা পেতে হয় নি। তাছাড়া, ওই প্রবাহমান প্রাকৃত পয়ার-পঙক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিভঙ্গিতে কি রূপ ধারণ করত, অন্যের পক্ষে তাও জানবার উপায় ছিল না। তাই অনেকের পক্ষেই সংস্কারের বাধা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে যদি স্বাধীনভাবে প্রবহমান প্রাকৃত পয়ারবন্ধে দু-একটি কবিতা রচনা করতেন তা হলে অনেকের পক্ষে সংস্কারের বাধা কাটিয়ে ওঠা সহজ হত, বাংলা ছন্দভাণ্ডারেরও একটি নূতন কক্ষ উদঘাটিত হত।

দলবৃত্ত পয়াবের সমিল প্রবহমান রূপও দেখা যায় নি রবীন্দ্রসাহিত্যে। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি রচনায় তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। যেমন—

২। সমিল প্রবহমান পয়ার (দ্বিজেন্দ্রলাল)

হেমন্তে, নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত দুপুর বেলা,
বকুলতলায় ঘাসের উপর, একান্ত একেলা,
ধূলা নিয়ে আপন মনে খেলা করে খানিক
ঘুমিয়ে গেছে বাছা আমার, ঘুমিয়ে গেছে মাণিক।···
একি খেয়াল বাছা রে তোর? গাছের তলে, ভুঁয়ে,
কেবল দুটো ঘাস-বিছানো ধূলার উপর শুয়ে?
মৌরুসি তোর মায়ের কোলে, বাপের বুকে, হেন
ছেড়ে এসে, বাছারে তুই হেথায় শুয়ে কেন?

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আলেখ্য, ঘুমন্ত শিশু (প্রথম চিত্র)

এতে প্রবহমানতার আভাসমাত্র আছে। তার বেশি কিছু নয়। মনে হয় কবি একে প্রবহমান রূপ দেবার চেষ্টা বা ইচ্ছাও করেন নি।

৩। সমিন প্রবহমান মহাপয়ার (রবীন্দ্রনাথ)

ক যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
তাদের প্রাণের ঝরনা-স্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার ধারা
চলছে বয়ে চতুর্দিকে। নয় তো কেবল কালের যোগে আয়ু,
নয় সে কেবল দিন-রজনীর সাতনলি হার, নয় সে নিশাস বায়ু।
নানান প্রাণের প্রীতির মিলন নিবিড় হয়ে স্বজনবন্ধুজনে
পরমায়ুর পাত্রখানি জীবনসুধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে।
একের বাঁচন সবার বাচার বন্যাবেগে আপন সীমা হারায়
বহু দূরে; নিমেষগুলির ফলের গুচ্ছ ভরে রসের ধারায়।
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে,—
গর্ভবাঁধন কাটিয়ে শিশু তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের গ্রন্থি দিয়ে।

—পলাতকা, শেষ গান (১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ ৪)

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে দলবৃত্ত রীতিতে রচিত সমিল প্রবহমান মহাপয়ারের এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই আছ। এই রচনাটিকে কবি একাধিক বার পরিমার্জনা করেছেন। মনে হয় তবু তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই আর প্রবহমান দলবৃত্ত মহাপয়ার (সমিল বা অমিল) রচনায় প্রয়াসী হন নি।

এ প্রসঙ্গে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল-রচিত সমিল প্রবহমান দলবৃত্ত মহাপয়ারের দু-একটি বিশিষ্টতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। প্রথমেই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

৩। সমিল প্রবহমান মহাপয়ার (দ্বিজেন্দ্রলাল)

খ. সূর্য অস্ত গেল। দিবার শুভ্র আলোক, অন্ধকার লেগে
ভেঙে গেছে।—চূর্ণ হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে যেন একটা ঝড়ে,
শুয়ে আছে বর্ণগুলি চারিধারে—আকাশে ও মেঘে।
যেন একটা বর্ণসৈন্য ঘুমিয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে;
যেমন একটা মহানদী বহে গিয়ে পূর্ণ খরবেগে
শেষে শাখায় উপশাখায় ছড়িয়ে পড়ে মন্দীভূত তেজে।
যেমন একটা মহাগীতি মহাতালে মহানন্দে জেগে,
ছড়িয়ে পড়ে বিকম্পিত শত ভগ্ন মূর্ছনাতে বেজে।
সূর্য অস্ত গেল। বিশ্ব ঘিরে এল কৃষ্ণ সুপ্তি নেমে,
মিশিয়ে গেল মহানদী সিন্ধুজলে, গীতি গেল থেমে।

—ত্রিবেণী (১৯১২), দশপদী, গোধূলি

এর মাত্রাবিন্যাস পদ্যের মতো, কিন্তু চলার ভঙ্গি গদ্যের মতো। এর ছন্দ চার মাত্রার পর্ববিন্যাস মেনে লঘুযতিতে পা ফেলে চলে না, ভাবগত যতি মেনে চলে। তাই তার পর্বযতিগুলি হয় বিলুপ্ত, না-হয় উপেক্ষিত। তাই তার চলার ভঙ্গিতে চটুলতা নেই, আছে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা। এই দৃঢ় পদক্ষেপই দ্বিজেন্দ্রলালের দলবৃত্ত রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর প্রবহমানতা (অর্থাৎ পঙ্‌ক্তিপ্রান্তের পূর্ণযতি লঙ্ঘন-প্রবণতা) দুর্বল। পর্বযতিগুলি যত অনায়াসে উপেক্ষিত হয়েছে, পঙ্‌ক্তিতিগুলি তা হয় নি। তার প্রধান কারণ মিলের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বআরোপ। দ্বিজেন্দ্র-স্বীকৃত দলবৃত্ত রীতির ছন্দ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এখানে নয়।

রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল, কারও রচনাতেই দলবৃত্ত মহাপয়ারের অমিল প্রবহমান রূপ দেখা যায় না।

দলবৃত্ত পয়ারের মুক্তক রূপ

মিশ্রবৃত্তের ন্যায় দলবৃত্ত রীতিতেও ছোট পয়ারের সমিল বা অমিল মুক্তক রূপ খুব বিরল। তবে একেবারে অপ্রাপ্য নয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১। সমিল মুক্তক ছোট পয়ার

ক. ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুস।
কত যে যুগ-যুগান্তরের
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধুলোমাটির মানুষ।

স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখ-সুখে।
আমার জন্মমৃত্যু তরঙ্গে
নিত্যনবীন রঙের ছটায় খেলায় সে যে রঙ্গে।

—বলাকা-২৪, 'স্বর্গ কোথায়' (১৯১৪)

খ। দামামা ঐ বাজে,
দিনবদলের পালা এল ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়,
নইলে কেন এত অপব্যয়—
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়,
অন্যায়েরে টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত
ভবিষ্যতের দূত।
কৃপণতার পাথর-ঠেলা বিষম বন্যাধারা
লোপ করে দেয় নিঃস্ব মাটির নিষ্ফলা চেহারা।···
হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের তরে আনবে নূতন খেতে
শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে—
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে, কী রইবে।
পালিস-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি,
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।

—জন্মদিনে-১৬, 'দামামা' ঐ বাজে' (১৯৪০)

লক্ষণীয় দুটি ব্যতিক্রম— (১) 'নূতন অধ্যায়' অংশের প্রথমে আছে একটি আদি লঘু ত্রিদল পর্ব ('নূতন অধ্')। (২) এই রচনার 'বাইরে তবু' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিটিতে আছে আঠার দলমাত্রা। অর্থাৎ এই পঙ্‌ক্তিটিতে মাত্রাধিক্য ঘটেছে। এই পঙ্‌ক্তিটি আছে কবিতাটির অনুদ্ধৃত অংশে।

২। অমিল মুক্তক ছোট পয়ার

সৃষ্টিপীড়া ধাক্কা লাগায়

শিল্পকারের তুলির পিছনে।
রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে
রূপের বেদনা
সাথিহারা তপ্ত রাঙা রঙে।
কখনো বা ঢিল লেপে যায় তুলির টানে;
পাশের গলির চিক-ঢাকা ঐ ঝাপসা আকাশতলে
হঠাৎ যখন রণিয়ে ওঠে
সংকেতঝংকার,
'আঙুলের' ডগার 'পরে নাচিয়ে তোলে মাতালটাকে
'গোধূলির' সিঁদুর ছায়ায় ঝরে পড়ে
পাগলা আবেগের
হাউই-ফাটা আগুন-ঝুরি।
'বাধাপায়', বাধা কাটায় চিত্রকরের তুলি।···
রূপের বোঝাই ডিঙি নিয়ে চলল রূপকার
রাতের উজান স্রোত পেরিয়ে
হঠাৎ-মেলা ঘাটে।
ডাইনে বাঁয়ে সুর-বেসুরের দাঁড়ের ঝাপট চলে,
তাল দিয়ে যায় ভাসান-খেলা শিল্পসাধনার।

—জন্মদিনে-২৪, 'পোড়ো বাড়ি', (১৯৩৯)

লক্ষণীয়—(১) 'পিছনে' এবং 'বেদনা' শব্দের নে এবং না, এই দুটি পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মুক্তদল বিচ্ছিন্নরূপে উচ্চারিত হয়। তাই এই দুই মুক্তদলের প্রত্যেকটি দুই দলমাত্রার মূল্য পায়। আর, (২) আঙুলের, গোধূলির এবং বাধা পায়, এই তিনটি অন্তগুরু ত্রিদল পর্ব দলবৃত্ত রীতির ছন্দে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই স্বীকার্য।

দলবৃত্ত রীতিতে রচিত মহাপয়ারের সমিল ও অমিল মুক্তক রূপের কিছুমাত্র অভাব নেই। যেমন—

৩। সমিল মুক্তক মহাপয়ার।

ক. আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মানিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে
গেঁথে নিলেম তারে
এই যে আমার বিনিসূতার গোপন গলার হারে।
চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে

এই যে, সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নত শিরে
নির্মাল্য তোমার
আকাশ হয়ে পার;
ঐ যে মরি মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের ’পরে ভাসিয়ে দিল তোমার ছায়াতরী;
ঐ যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি
রাতের আঙিনায়
ঘুমে অলস কায়;
ঐ যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
ছড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধুলি নিল সে বিদায়;
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে;
তোমার ঐ অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনো কালে,
আর হবে না কভু।
এমনি করে প্রভু।
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি।
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।

—বলাকা-৩২ ‘আজ এই দিনের শেষে’ (১৯১৭)

মিশ্রবৃত্ত মহাপয়ারের ন্যায় দলবৃত্ত মহাপয়ারের মুক্তক রূপও প্রথম দেখা দেয় ‘বলাকা’ কাব্যেই (১৯১৪-১৯১৬)। তবে দলবৃত্ত মুক্তক মহাপয়ারের স্বাধিক প্রয়োগ দেখা যায় পরবর্তী ‘পলাতকা’ কাব্যে (১৯১৮), আর এই কাব্যের সঙ্গেই দলবৃত্ত মুক্তকের স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে সব চেয়ে বেশি। এইজন্যেই চলতি কথায় মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্তক মহাপয়ারের নাম হয়েছে ‘বলাকার ছন্দ’, আর দলবৃত্ত রীতির মুক্তকমহাপয়ারের নাম হয়েছে ‘পলাতকার ছন্দ’। আরও পরবর্তী কালে দলবৃত্ত মহাপয়ারের এই মুক্তক রূপ রবীন্দ্রনাথের হাতে অধিকতর শক্তি লাভ করে। যেমন—

৩। সমিল মুক্তক মহাপয়ার

খ. বিরাট্ অবুঝ এই সে আদিম মন,
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপ্নারে তার অধীর অন্বেষণ।
ঘর হতে ধায় আগুন-পানে, আগুন হতে পথে,

পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিঘ্নবিষম অরণ্যে পর্বতে।···

অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপনগড়া

তাই নিয়ে সে লড়াই করে,   তাই নিয়ে তার কেবল ওঠাপড়া।

হঠাৎ উঠে ঝেঁকে

যায় সে ছুটে কী রাঙা রঙ দেখে

অদৃশ্য কোনও দূর দিগন্ত-পানে;

আবছায়া কোন্ সন্ধ্যা-আলোয় শিশুর মতো তাকায় অনুমানে,

তাহার ব্যাকুলতা

স্বপ্নে সত্য মিশিয়ে রচে বিচিত্র রূপকথা

—পরিশেষ, অবুঝ মন (১৯২৭)

বলা বাহুল্য, এটা দলবৃত্ত মহাপয়ারের সমিল মুক্তক রূপ। এবার এর অমিল রূপের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

৪। অমিল মুক্তক মহাপয়ার

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,

জাগো আমার মন,

গান জাগিয়ে চলল সমুখ-পথে,

যেখানে ঐ কাশের চামর দোলে

নব সূর্যোদয়ের দিকে।

নৈরাশ্যের নখর হতে

রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,

আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও,

লালসাকে দলে পায়ের তলায়।

মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার

পরাজয়ের গ্লানিভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত।

ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী,

তাদের মাভৈঃ-বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে

নির্মল এই শরৎ-রৌদ্রালোকে

আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

—পুনশ্চ, পয়লা আশ্বিন (১৯৩২)

লৌকিক অথাৎ দলবৃত্ত রীতির ছন্দ কতখানি শক্তিশালী হতে পারে তার অন্যতম নিদর্শন এই রচনাটি।

দলবৃত্ত পয়ারের অমিল মুক্তক রূপ ও গদ্যকবিতা

দলবৃত্ত মহাপয়ারের এই যে অমিল মুক্তক রূপ, একেই বলা যেতে পারে গদ্যের নিকটতম পদ্য রূপ। একমাত্র মাত্রাবিন্যাসের বাঁধনটুকুই একে পদ্যের পর্যায়ভুক্ত করে রেখেছে, পদ্যরূপের আর কোনো বাঁধনই এর নেই। মাত্রাবিন্যাসের এই বাঁধনটুকুও খুলে নিলে এটি পরিণত হবে গদ্যকবিতায়। গদ্যকবিতার অন্যান্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে পূর্ববর্তী 'বাংলা ছন্দের গদ্যরূপ' বিভাগে। মোট কথা, গদ্য কবিতায় ছন্দোবদ্ধ পদ্যভাষার কোনো বিশিষ্ট লক্ষণই থাকে না। থাকে শুধু তার স্পন্দলীলা ও গতিভঙ্গিটুকু। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দুই বিভাগে গদ্য ও পদ্য ভাষা তথা কবিতার পার্থক্য বিষয়ে যে আলোচনা আছে, এ প্রসঙ্গে সেটুকুও স্মরণীয়।

মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রধান অবলম্বন সাধু ভাষার শব্দ (প্রধানতঃ ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম)। তবে তার সঙ্গে চলতি ভাষার শব্দ প্রয়োগেও কিছুমাত্র বাধা নেই। যেমন—

পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।

—চৈতালি, বঙ্গমাতা

পক্ষান্তরে দলবৃত্ত রীতির একমাত্র অবলম্বন চলতি ভাষার শব্দ। তবে কখনও যে দুটি-একটি সাধু শব্দ দেখা যায় না তা নয়। যেমন—

ভেসে থাকতে পার যদি সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়,
না পারো তো বিনা বাক্যে টুপ 'করিয়া' ডুবে যেয়ো।···
'যাহার' লাগি চক্ষু বুজে বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর,
'তাহারে' বাদ দিয়েও দেখি বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।

—ক্ষণিকা, বোঝাপড়া

এ-রকম ব্যতিক্রম অত্যন্ত বিরল, তাই সাধারণ নিয়মের অন্তরায় বলে গণ্য হতে পারে না। আবার আধুনিক গদ্য কবিতারও একমাত্র অবলম্বন চলতি ভাষা। তাতে উক্তপ্রকার ব্যতিক্রম থাকাও সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, মিশ্রবৃত্ত মুক্তকের চেয়ে দলবৃত্ত মুক্তকের সঙ্গেই এই গদ্যকবিতার সম্পর্ক নিকটতর।

কলাবৃত্ত পয়ারের মুক্তক রূপ

কলাবৃত্ত পয়ারের অপ্রবহমান রূপের ধারাবাহিক প্রয়োগ খুবই কমই দেখা যায়। এ-রকম প্রয়োগের অল্প কয়েকটিমাত্র নিদর্শন আছে রবীন্দ্ররচনায়। সেগুলিও শিশুপাঠ্য। আর তার প্রবহমান ও মুক্তক রূপ একেবারেই অপ্রাপ্য, তার বিশেষ কোনো সার্থকতাও নেই। কলাবৃত্ত মহাপয়ারের অপ্রবহমান রূপের ধারাবাহিক প্রয়োগও

খুবই দুষ্প্রাপ্য। এই মহাপয়ারের প্রবহমমান রূপ বোধ করি এখনও প্রচলিত হয় নি। কিন্তু তার মুক্তক রূপের সুন্দর নিদর্শন আছে রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' কাব্যে (১৯৪০)। তারই একটা অংশ এখানে উদ্ধৃত হল।—

১। সমিল মুক্তক মহাপয়ার

ক.

জীবনের বস আজ মজ্জায় বহে,
বাহিরে প্রকাশ তার নহে।
অন্তরবিধাতার সৃষ্টিনিদেশে
যে অতীত পরিচিত সে নূতন বেশে
সাজ-বদলের কাজে ভিতরে লুকালো—
বাহিরে নিবিল দীপ, অন্তরে দেখা যায় আলো।
গোধূলির ধূসরতা ক্রমে সন্ধ্যার
প্রাঙ্গণে ঘনায় আঁধার।
মাঝে-মাঝে জেগে ওঠে তারা,
আজ চিনে নিতে হবে তাদের ইশারা।
সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে যাত্রীর পাত্রটি পুরে
সদয় অতীত কিছু সঞ্চয় দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটাবারে।
যত বেড়ে ওঠে রাতি
সত্য যা সেদিনের উজ্জ্বল হয় তার ভাতি।
এই কথা ধ্রুব জেনে নিভৃতে লুকায়ে
সারা জীবনের ঋণ একে-একে দিতেছি চুকায়ে।

—নবজাতক, শেষ বেলা (১৯৪০ জানু ১১)

এই রচনাটির শুধু ভাবগত গভীরতা নয়, এর ছন্দোগত গতিবেগ, শক্তিশালিতা এবং গাম্ভীর্যও লক্ষণীয়। এই রচনাটি কলাবৃত্ত মহাপয়ারের নূতন শক্তি ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করছে বলেই মনে করি।—কলাবৃত্ত মহাপয়ারের সাধারণ অপ্রবহমান রূপের নিদর্শন দুর্লভ। তাই পূর্বে সাধারণ কলাবৃত্ত মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই রচনাটি থেকেই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। যা হক, কলাবৃত্ত মহাপয়ারের সমিল মুক্তক রূপের আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ওই 'নবজাতক' কাব্য থেকেই। আশা করি তাতে এই নূতন ছন্দোরূপের গতিবৈশিষ্ট্য উপলব্ধির সহায়তা হবে।—

১। সমিল মুক্তক মহাপয়ার

খ. এ প্রাণ রাতের রেল-গাড়ি,
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম
রজনী নিঝুম।
কালি-লেপা কিছু নয় মনে হয় যারে
নিদ্রার পারে
রয়েছে সে।
পরিচয়-হারা দেশে।...
চালায় যে, নাম নাহি কয়;
কেউ বলে, যন্ত্র সে, আর কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে, সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অজানা বারবার পার হয়ে যায়
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়,
তারি যেন বহে নিশ্বাস,
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা রহে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে,
নিমেষ বিরাম নেই আকাশের তলে।
ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে
কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে।

—নবজাতক, রাতের পড়ি (১৯৪০ মার্চ, ২৮)

অন্যান্য কলাবৃত্ত দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির মুক্তক রূপ

আমরা জানি পয়ার মাত্রই দ্বিপদী, কিন্তু দ্বিপদীমাত্রই পয়ার নয়। পয়ারের প্রতি পূর্ণপর্বে থাকে চার মাত্রা। যে দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির পূর্ণ পর্বে চারের চেয়ে বেশি মাত্রা থাকে, তাকে পয়ার বলা যায় না। কলাবৃত্ত রীতির পূর্ণপর্বে পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রাও থাকে। ও-রকম পর্ব নিয়ে গড়া দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিকে পয়ার বলা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ পর্বে এ-রকম কলাবৃত্ত দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিকেও মুক্তক রূপ দিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত দিলেই অ-পয়ার দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিকে মুক্তক রূপ দেবার সার্থকতা বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন পঞ্চকল, ষট্‌কল ও সপ্তকল-পর্বক ছন্দে মিশ্রবৃত্ত রীতির চতুষ্কলপর্বক ছন্দের ন্যায় প্রবহমানতা সঞ্চার করা সম্ভব নয়।[১] তাই রবীন্দ্রসাহিত্যে ওই ত্রিবিধ পর্বের ছন্দে প্রবহমান দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু পঞ্চকল ও ষট্‌কল পর্বের ছন্দে মুক্তক পঙ্‌ক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।[২] একে-একে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। পঞ্চকলপর্বক দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির মুক্তক রূপ (সমিল)—

ক. কখনো যারা দেয় নি হাতে হাত,
মর্মমাঝে করে নি আঁখিপাত,
প্রবল প্রেরণায়
দিল না আপনায়।
তাহারা কহে কথা,
ছড়ায় পথে বাধা ও বিফলতা,
করে না ক্ষমা কভু,
তুমি তাদের ক্ষমা করিয়ো তবু।

হায় গো রূপকার,
ভরিয়া দিও জীবন-উপহার;
চুকিয়ে দিও তোমার দেয়,
রিক্ত হাতে চলিয়া যেয়ো,
কোরো না দাবি ফলের অধিকার।
জানিয়ো মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথি আছেন হিয়ামাঝে;
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।

—বীথিকা, রূপকার (১৯৩৪ এপ্রিল ১০)

খ পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো,
গানের বেলা আজ ফুরাল।
কী নিয়ে তবে কাটিবে তব সন্ধ্যা?—

রাত্রি নহে বন্ধ্যা,
অন্ধকারে না-দেখা ফুল ফুটায়ে তোলে সে যে—
দিনের অতি নিঠুর খর তেজে
যে-ফুল ফুটিল না,
যাহার মধুকণা
বনভূমির প্রত্যাশাতে গোপনে ছিল বলে
গিয়েছে কবে আকাশ-পথে চলে
তোমার উপবনের মৌমাছি
কৃপণ বনবীথিকা-তলে বৃথা করুণা যাচি।

—বীথিকা, রাতের দান (১৯৩৪ জুলাই)

২। ষটক লপর্বক দ্বিপদী পঙক্তির মুক্তক রূপ (সমিল ও অমিল)

ক

যাক এ জীবন,
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধুলি হয়ে ললাটে ধুলি ’পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক।
যাক এ জীবন পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক।
টুকরো যা থাকে ভাঙা পেয়ালার,
ফুটো সেতারের সুরহারা তার,
শিখা-নিবে-যাওয়া বাতি,
স্বপ্নশেষের ক্লান্তি-বোঝই রাতি—
নিয়ে যাক যত দিনে-দিনে-জমা-করা
প্রবঞ্চনায় ভরা।
নিস্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।
কুড়ায়ে ঝাটায়ে মুছে নিয়ে যাক্, নিয়ে যাক শেষ করি
ভাঁটার স্রোতের শেষ-খেয়া-দেওয়া তরী।

—সেঁজুতি, যাবার মুখে (১৯৩৭ মার্চ)

খ জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না।

ও আজি মেনেছে হার।

ক্রূর বিধাতার কাছে।

সব চাওয়া ও যে দিতে চায় নিঃশেষে।

অতলে জলাঞ্জলি।

দুঃসহ এ দুরাশার

গুরুভার যাক দূরে

কৃপণ প্রাণের ইতর বঞ্চনা।

আসুক নিবিড় নিদ্রা,

তামসী মসির তুলিকায়

অতীত দিনের বিদ্রূপবাণী

রেখায় রেখায় মুছে-মুছে দিক

স্মৃতির পত্র হতে,

থেমে যাক ওর বেদনার গুঞ্জন

সুপ্ত পাখির স্তব্ধ নীড়ের মতো।

—সানাই, ব্যথিতা (১৯৪০ জানু. ১৩)

ছয় কলামাত্রার পর্ববিভাগ অনুসারে সহজভাবে আবৃত্তি করে গেলেই এই দুই রচনার প্রবহমান মুক্তক গতি অনুভব করা যাবে। প্রথম দৃষ্টান্তের প্রথম পঙ্ক্তি এবং শেষ দিকে 'নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়', এই দুই পঙ্ক্তি মিলহীন, নিঃসঙ্গ। অন্য সর্বত্র আছে ধারাবাহিক মিল। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পুরোপুরি মিলহীন।

কবি সুকান্তের সুখ্যাত 'রানার' কবিতাটিও এই ছয় কলামাত্রার মুক্তক পদ্ধতিতেই রচিত। এই রচনার কয়েকটি পঙ্ক্তি এই।—

২। ষট্‌কলপর্বক দ্বিপদী পঙ্ক্তির সমিল মুক্তক রূপ (সুকান্ত)—

রানার ছুটেছে, তাই ঝুমঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে,
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে, রানার।
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
রানার, রানার, জানা-অজানার বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই-জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে।···
কত গ্রাম, কত পথ যায় সরে সরে,

শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে।
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্‌, জোনাকিরা দেয় আলো,
মাভৈঃ রানার, এখনো রাতের কালো।…
রানার, রানার, এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?

—সুকান্ত, ছাড়পত্র, রানার

পঞ্চকল ও ষট্‌কল-পর্বক দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির রবীন্দ্র-প্রবর্তিত মুক্তক রূপ প্রকাশের অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল কবি নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা (১৯২২)। এটিরও অবলম্বন ষট্‌কল পর্বের একপ্রকার মুক্তক দ্বিপদী। কিন্তু তার মুক্তক রূপে এমন কিছু অভিনবতা আছে যা রবীন্দ্রসৃষ্ট মুক্তক রূপে লক্ষিত হয় না। দৃষ্টান্ত দিলেই এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে।—

২। ষট্‌কলপর্বক দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির সমিল মুক্তক রূপ (নজরুল)

বল বীর—
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি’
চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি’
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর[১]।
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।

—নজরুল, অগ্নিবীণা, বিদ্রোহী

প্রথমেই লক্ষণীয় অতিপর্বের বাহুল্য। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কলাবৃত্ত মুক্তক রচনায় অতিপর্ব প্রয়োগের অভাবও তেমনি লক্ষণীয়। এই রচনাটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তার পঙ্‌ক্তি দৈর্ঘ্যের বৈচিত্র্য। এক দিকে যেমন আছে শুধু দুই মাত্রার ক্ষুদ্রতম পঙ্‌ক্তিখণ্ড, অপর দিকে তেমনি আছে ছাব্বিশ-আটাশ মাত্রার দীর্ঘতম দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি। ২৬, ২৭, ও ২৮ মাত্রার তিনটি দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি এখানে যথাক্রমে তুলে দেওয়া গেল এই ‘বিদ্রোহী’ কবিতা থেকে।—

১। উঠিয়াছি চির।-বিস্ময় আমি ॥ বিশ্ব-বিধাত্‌।-ত্রীর

মম ললাটে রুদ্র। ভগবান্ জ্বলে ॥ রাজ-রাজটীকা। দীপ্ত জয়শ্।-শ্রীর।

২।	আমি বিদ্রোহী ভৃগু,। ভগবান্-বুকে ॥ এঁকে দিই পদ।-চিহ্ন,

আমি স্রষ্টা-সূদন,। শোক-তাপ-হানা ॥ খেয়ালী বিধির। বক্ষ করিব। ভিন্ন।

৩। আমি বঞ্চিত ব্যথা। পথবাসী চির॥-গৃহহারা যত। পথিকের, আমি অবমানিতের মরম-বেদনা,॥ বিষ-জ্বালা, প্রিয়।-লাঞ্ছিত বুকে। গতি ফের।

তিন দৃষ্টান্তের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে আছে যথাক্রমে কুড়ি, একুশ ও বাইশ মাত্রা। সাহিত্যে এ-রকম দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি সুপ্রচলিত। এর চেয়ে দীর্ঘ ষট্‌কল পর্বের দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি একান্ত বিরল। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর রচনা থেকে ছাব্বিশ (৬+৬ ॥ ৬+৬+২) মাত্রার দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির একটি দৃষ্টান্ত পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে ষট্‌পর্বিক দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির প্রসঙ্গে।

উদ্ধৃত তিন দৃষ্টান্ত থেকে আরও বোঝা যায় যে, এই রচনাটিতে পঙ্‌ক্তিপ্রান্তের অপূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা সমান নয়, আর তার পর্যায়ক্রমের স্থিরতাও নেই। সাধারণতঃ একই রচনায় পঙ্‌ক্তি শেষের অপূর্ণ পর্বে এতখানি অসমতা এবং তার পর্যায়ক্রমে এত অনিশ্চয়তা দেখা যায় না। কিন্তু অপূর্ণ পর্বের এই অসমতা ও অনিশ্চয়তা এই রচনাটির মুক্তক প্রকৃতির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হয়েছে, তার শ্রুতি ও গতিবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার সহায়ক হয়েছে।

এই কবিতার প্রসঙ্গে প্রথমেই যে স্তবকটি উদ্ধৃত তার মধ্যভাগে (বল মহাবিশ্বের...বিধাত্রীর) আছে রবীন্দ্রচনা-সুলভ সুস্পষ্ট প্রবহমানতা। এই রচনাটির অন্যান্য অংশে এতখানি প্রবহমানতা নেই। অল্পস্বল্প প্রবহমানতা দেখা যায় নানা স্থানে। যেমন—

আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল মর্ত্য।

এর প্রথম অংশেও যথেষ্ট প্রবহমানতা আছে। কিন্তু এই প্রবহমানতাই এ-রচনাটির আসল লক্ষণ নয়। তার বিশিষ্টতা প্রকাশিত হয় তার দৃঢ় ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। ছোট-ছোট অথচ দৃঢ় পদস্পন্দেই এর ভাবগত তথা ছন্দোগত সার্থকতা ও বিশিষ্টতা, একটানা ধ্বনিপ্রবাহে নয়। যেমন—

আমি	অন্যায়, 'আমি' উল্‌কা, 'আমি' শনি,
আমি	ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী।
আমি	ছিন্ন মস্তা চণ্ডী, 'আমি' রণদা সর্ব-নাশী,
আমি	জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।

এই চার পঙ্‌ক্তিতেই এর পদক্ষেপভঙ্গির বিশিষ্টতা সুপ্রকট। ঘনঘন কমাচিহ্নের প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায়, এই পঙ্‌ক্তিগুলি অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহ রূপে পঠনীয় নয়। এর প্রত্যেক পর্ব বা পদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থেমে-থেমে

পড়তে হবে। এই থেমে-থেমে পড়ারও বিশেষ কায়দা আছে। এবার ছন্দোবিশ্লেষণ করলে দেখা যাক এই পঙ্‌ক্তিগুলি আবৃত্তি করার বিশেষ কায়দা কি।

প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে আছে ৬-৬-২ মাত্রার এক পদ। আর পরের দুই পঙ্‌ক্তিতে আছে ৬-৬। ৬-২ মাত্রার দুই পদ। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির একপদী রূপ আর চতুর্থ পঙ্‌ক্তির দ্বিপদী রূপ সুব্যক্ত। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তির পদবিভাগ সুব্যক্ত নয়। তা ছাড়া, তাতে কিছু জটিলতাও আছে। যথোচিত চিহ্ন দিয়ে পর্ব ও পদ-বিভাগ করে দেখা যাক।—

আমি অন্যায়, 'আমি'। উল্‌কা, 'আমি'। শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা,। বিষধর কাল।-ফণী।
আমি ছিন্নমস্তা। চণ্ডী, 'আমি' ॥ রণদা সর্ব।-নাশী,
আমি জাহান্নমের। আগুনে বসিয়া ॥ হাসি পুষ্পের। হাসি।

প্রথম পঙ্‌ক্তির 'অন্যায়' ও 'উল্‌কা' শব্দের পরবর্তী কমাচিহ্ন ভাবযতি-সূচক, ছন্দের পর্বযতি-সূচক নয়। অথচ আবৃত্তিকালে গদ্যপাঠের মতো এই দুই শব্দের পরেই পর্বযতি স্থাপন করতে হয়। পদ্যপাঠের ভঙ্গিতে কমাচিহ্নকে উপেক্ষা করে পরবর্তী 'আমি' শব্দের পরে থামতে হয় না। অর্থাৎ এই স্থানে ভাবযতিকেই পর্বযতি বলে মেনে নিতে হয়। ফলে পরবর্তী 'আমি' শব্দ-দুটি মৃদুস্বরে উচ্চারিত হয় এক-একটি অতিপর্ব রূপে। এ-রকম অতিপর্বকে বলা যায় **আভ্যন্তর অতিপর্ব**। তাই বলতে হয়, প্রথম পঙ্‌ক্তির তিন পর্বের সমুখেই আছে তিন অপ্রস্বরিত অতিপর্ব—প্রথমটি পঙ্‌ক্তি-পুরোবর্তী, পরের দুটি আভ্যন্তর। এই উভয়বিধ অতিপর্বের পরবর্তী পর্বের আদিস্থিত প্রস্বর প্রবলতর রূপে অনুভূত হয়। অন্যায়, উল্‌কা ও শনি শব্দের আদিস্থিত প্রস্বরের স্পষ্টতর গুরুত্ব সহজেই কানে ধরা পড়ে।

আভ্যন্তর অতিপর্ব যুগপৎ দুই কাজ করে।—(১) সাধারণ অতিপর্বের ন্যায় পরবর্তী পর্বপ্রস্বরকে প্রকটতর করে। (২) পুরোবর্তী পর্বের শেষ (দ্বিতীয় বা তৃতীয়) উপপর্ব রূপে তাকে পূর্ণতা দান করে, অথাৎ তার নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যা পূরণ করে। যেমন, প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম আভ্যন্তর অতিপর্ব ('আমি') একদিকে পরবর্তী 'উল্‌কা' শব্দের প্রস্বরকে প্রকটতর করছে এবং অপরদিকে পুরোবর্তী পর্বের তৃতীয় উপপর্ব ('অন্যায়' শব্দে আছে দুই উপপর্ব) রূপে গণ্য হয়েছে আর তারই ফলে এই পর্বের নির্দিষ্ট ছয় কলামাত্রা রক্ষা সম্ভব হয়েছে। আর-একটি পঙ্‌ক্তি এই—

আমি সহসা আমারে। চিনেছি, 'আমার' ॥ খুলিয়া গিয়াছে। সব বাঁধ!

এখানে 'আমার' শব্দটি যুগপৎ পরবর্তী পর্বের 'অতিপর্ব' এবং পুরোবর্তী পর্বে দ্বিতীয় 'উপপর্ব' (তিন মাত্রা) রূপে গণ্য হয়েছে।

এই রচনাটির আর-এক বৈশিষ্ট **মাত্রার ফাঁক** রাখা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'মিলের ফাঁক' প্রসঙ্গে মাত্রার ফাঁকের কথাও বলা হয়েছে সংক্ষেপে। সব রকম কবিতাতেই মাত্রার ফাঁক রাখার নিদর্শন সাধারণতঃ খুব কম পাওয়া যায়। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতার বিশিষ্ট মুক্তক গতিভঙ্গির অন্যতম প্রধান লণ বা অবলম্বনই হল মাত্রার ফাঁক। যেমন উল্লিখিত দৃষ্টান্তের—

আমি অন্যায়, অমি। উলকা, আমি। শনি।...

আমি ছিন্নমস্তা। 'চণ্ডী', আমি। রণদা সর্ব।-নাশী।

এই দুই পঙ্‌ক্তির 'উলকা' ও 'চণ্ডী' শব্দে এক মাত্রা করে ফাঁক রাখা হয়েছে। এই দুই শব্দের পরে সুস্পষ্ট যতি রেখে পড়তে হয়। তাই ছন্দের বেগে ওই দুটি ফাঁক আমাদের উচ্চারণে স্বতঃই পূর্ণ হয়ে যায়। ওই দুই শব্দের পরে যদি যতি না রাখ হত, তাহলে কিন্তু ওভাবে ফাঁক পূরণ সম্ভব হত না। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ ও-রকম ফাঁকের মাত্রাকে বলেছেন **যতির মাত্রা**। এভাবে মাত্রার ফাঁক-পূরণের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল এই রচনাটি থেকেই।

১। আমি সৃষ্টি-, আমি। ধ্বংস-, আমি॥ লোকালয়, আমি। শ্বশান।

২। আমি আকুল নিদাঘ।-তিয়াষা-, আমি ॥ রৌদ্র-রুদ্র। রবি।

৩। আমি উত্থান, আমি। পতন-, আমি ॥ অচেতন-চিতে। চেতন।

সৃষ্টি, ধ্বংস, তিয়াষা ও পতন, এই চার শব্দের পরে এক মাত্রার ফাঁক আছে।

মোট কথা। 'বিদ্রোহী' কবিতার বিশিষ্ট মুক্তক প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ চারটি—ছোট-ছোট বিচ্ছিন্ন ও দৃঢ় পদক্ষেপ (প্রবহমানতা নয়), আভ্যন্তর অতিপর্ব, পর্বের মধ্যে মাত্রার ফাঁক রাখা এবং পাঁচ পর্বের (২৬, ২৭, ২৮ মাত্রার) সুদীর্ঘ দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি প্রয়োগ।

সাত কলামাত্রার পর্বগঠিত মুক্তক পঙ্‌ক্তি দুর্লভ। এ-রকম মুক্তক রচনার নমুনা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের একটি গীতি-রচনা থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে দিলাম।—

৩। সপ্তকলপর্বক দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির মুক্তক রূপ (অমিল)

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু,
ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত,
হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর।...
সঘনবর্ষণ-শব্দমুখরিত
বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতী-বল্লরী কাঁপায় পল্লব করুণ কল্লোলে—
কানন শঙ্কিত ঝিল্লি-ঝংকৃত।

—গীতবিতান (প্রকৃতি), হৃদয়ে মন্দ্রিল

গানের সুরে-তালে এমন অনেক কিছুই চালানো যায়, যা পাঠযোগ্য কবিতায় চলে না। কবিতার ছন্দে সপ্তমাত্রক পর্বের মুক্তক পঙ্‌ক্তি চালাতে হলে সংস্কৃত শব্দের গুরুভার ও ঝংকার কমিয়ে তার ভাষাকে আরও হালকা করতে হবে। আর বোধ হয় কিছু কিছু মিল দিয়ে সে ভাষা ও ছন্দকে যথাসম্ভব সুখশ্রাব্য করতে হবে।

প্রবহমান ও মুক্তক পঙক্তির কয়েকটি বিশিষ্ট রূপ

ছন্দপঙ্‌ক্তির প্রবহমান নানারকম পরীক্ষা বা প্রয়োগ দেখা যায় বিভিন্ন কবির রচনায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। আশা করি পাঠকরা এগুলির নজিরে বা তুলনায় অনুরূপ অন্যান্য রচনার স্বাতন্ত্র ও গুণাগুণ নিরূপণ করতে পারবেন।

প্রবহমান পঙ্‌ক্তির বিশিষ্ট রূপ (মিশ্রবৃত্ত)

১। দশ মাত্রার প্রবহমান একপদী পঙ্‌ক্তি (দ্বিজেন্দ্রলাল)

তদুপরি—মরণের পাছে
কি জগৎ লুক্কায়িত আছে।
এই কৃষ্ণ জলধির পারে
কোন দেশ আছে? অন্ধকারে
আচ্ছন্ন, যে-দেশ হতে কেহ
ফিরে নাই আর নিজ গেহ।
কিম্বা, এইখানে শেষ সব ;—
এত আশা ; প্রণয় বিভব ;
এত বুদ্ধি ; এ উগ্র প্রতাপ,
যাহা অনায়াসে পরিমাপ
করে পৃথিবীর ভার, প্রতি
গ্রহের নির্ণয় করে গতি,
তপনের আয়ু-নিরূপণ
নক্ষত্রের রশ্মিবিশ্লেষণ ;
এই শক্তি,—হায় নাহি জানে
হয়ত বা সমাপ্ত এখানে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্দ্র, সুখমৃত্যু-৬

এ-রকম দৃষ্টান্ত অতি বিরল। চোদ্দ ও আঠার মাত্রার প্রবহমান পঙ্‌ক্তি সুপরিচিত। এবার আর-এক রকম দুর্লভ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

২। আট-আট মাত্রার প্রবহমান দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি (রবীন্দ্রনাথ)

ক. আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে।
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল, ফুরাল আমার কাল ;
আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।...

এত আলো, এত সুখ, এত গান, এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে। আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি, সযতন নীরবতা,
শুধু চেয়ে থাকা আঁখি, শুধু মনে মনে কথা।
আর কি দিই নি কিছু? প্রলুব্ধ প্রভাত যবে
চাহিল তোমার পানে, শত পাখি শত রবে
ডাকিল তোমার নাম, তখন পড়িল ঝরে
আমার নয়ন হতে তোমার নয়ন-পরে
একটি শিশির কণা। চলে গেনু পরপার।
সেই বিদায়ের বিন্দু, বিষাদের উপহার
প্রখর প্রমোদ হতে রাখিবে শীতল করে
তোমার তরুন মুখ ; রজনীর অশ্রু-'পরে
পড়ি প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম,
বিকচ সৌন্দর্য তব করিবে সুন্দরতম।

—মানসী, শেষ উপহার (১৮৯০)।

এই রচনাটিতে প্রবহমানতা আছে। কিন্তু এর গতিভঙ্গিতে বৈচিত্র্য নেই। কেননা, এর সব পদক্ষেপই আট মাত্রায়। পক্ষান্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল-রচিত অনুরূপ ছন্দের পদক্ষেপে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈচিত্র দেখা যায়।—

২। আট-আট মাত্রার প্রবহমান দ্বিপদী পঙ্ক্তি (দ্বিজেন্দ্রলাল)

খ. পড়ে গেছে যবনিকা ;
সাঙ্গ অভিনয়, সাঙ্গ ক্ষুদ্র মধুর নাটিকা ;
সমাপ্ত সাবিত্রীসীতাকৃষ্ণা-উপাখ্যানভাগ ;—
উদার গভীর প্রেম, নিঃস্বার্থতা, আত্মত্যাগ
পরহিত ব্রতে, সাম্য, সহিষ্ণুতা, নিত্য জয়
ধর্ম্মের;—সমাপ্ত আজি উপকথা অভিনয়।...
পাঠক গিয়াছ ভুলি মধুর চরিতাবলি
সেই সব পৌরাণিক? দিয়াছ কি জলাঞ্জলি
ভক্তি, বিশ্বাসে ও স্নেহে?...তবে কিবা কাজ
গাহিয়া সে গান যাহা শুনিবে না। যদি আজ

ওই সব অতীতের, অসত্যের, কল্পনার,
থাকুক অতীত-গর্ভে, তাহা গাহিব না আর।...
        দিব সত্য যত চাহো; ঊনবিংশ শতাব্দীর
শেষ ভাগে সভ্যতার তীব্রালোকে, জানি স্থির
অন্য গান লাগিবে না ভালো।—তবে থাক্ সব,
সে করুণ, সে গম্ভীর, সে সুন্দর গীতরব,
সে গভীর প্রশ্ন ;—সেই জীবনের দুঃখসুখ
লুকায়ে নিভৃতে শুদ্ধ এ হৃদয়ে জাগরূক।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্দ্র (১৯০২), স্বপ্নভঙ্গ

এই দুই রচনার ছন্দ একই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এদের চলার ভঙ্গিতে প্রচুর পার্থক্য। প্রথমটিতে পদ্যধর্মিতা বেশি, দ্বিতীয়টিতে গদ্যধর্মিতা। অর্থাৎ প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির চলার ভঙ্গি আমাদের বাগ্‌ভঙ্গির অনুবর্তী অনেক বেশি। ছন্দের প্রকৃতিগত পার্থক্য শুধু বিবৃতি দিয়ে বোঝানো যায় না। তাই দুই রচনা থেকেই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হল।

যে কারণেই হক, ষোল মাত্রার প্রবহমান পঙ্‌ক্তি রচনার রীতি সুপ্রচলিত হয় নি। তবে এ-কথা ঠিক যে, ছোট ও বড় পয়ার-পঙ্‌ক্তির তুলনায় ষোল মাত্রার দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিতে গতিভঙ্গির বৈচিত্র্য আনা অধিকতর যত্নসাধ্য। আট-ছয় মাত্রার ছোট পয়ার ও আট-দশ মাত্রার বড় পয়ারের অসমান পদক্ষেপে যে স্বাভাবিক বৈচিত্র থাকে আট-আট মাত্রার দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির দুই সমান পদক্ষেপে তা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ আঠার মাত্রার চেয়ে দীর্ঘতর পঙ্‌ক্তিকে সমায়তন প্রবহমান রূপ দেওয়া অনাবশ্যক মনে করতেন। তাই তিনি আট-আট-ছয় মাত্রার ত্রিপদী পঙ্‌ক্তিকে সমায়তন প্রবহমানরূপ দিতে চেষ্টিত হননি। আঠারর চেয়ে বেশি মাত্রার পঙ্‌ক্তিকে তিনি নানা অসমান ভাগে বিভক্ত করে প্রবহমান মুক্তক রূপ দেওয়াই সমীচীন মনে করতেন। সেইজন্যই তিনি তাঁর রচিত মুক্তক পঙ্‌ক্তিকে আঠার মাত্রার সীমা ছাড়িয়ে যেতে দেন নি। দু-একটা ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই, নিয়ম নয়।

রবীন্দ্রস্বীকৃত এই দুটি নীতি কিন্তু সবাই মেনে নেন নি। তার নিদর্শন আছে বিভিন্ন কবির রচনায়। যেমন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল আট-আট-ছয় মাত্রার ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির যতিবিধানকে যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন করে বাইশ মাত্রার পঙ্‌ক্তিকে দিয়েছেন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিভঙ্গি।—

৩। আট-আট-ছয় মাত্রার প্রবহমান ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি (দ্বিজেন্দ্রলাল)

ক. হে কবি, গাহিয়াছিলে শতবর্ষ পূর্বে তুমি, মিষ্ট তারস্বরে,
ইংলণ্ডের উপকূলে; শতবর্ষ পরে আজি, দূর দেশান্তরে,
ভারতের শ্যামল সন্তান, সেই গীত শুনি, মুগ্ধ, কুতূহলী,
তোমার চরণতলে দিতেছে বিস্মিত মুগ্ধ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি।

উঠ নি জ্যোৎস্নার মত তুমি। উঠেছিলে তীব্র বিদ্যুতের ছটা
প্রাবৃট্ আকাশে। চতুর্দিকে তব, ঘোর কুৎসা-কৃষ্ণ ঘনঘটা
তোমারে ঘেরিয়াছিল ; তুমি চালাইয়াছিলে তব রশ্মিরথ
তাহার উপর দিয়া, করিয়া চকিত স্তব্ধ বিস্মিত জগৎ।
তুমি গাহ নাই গীত, বসন্তের পিক সম ললিত উচ্ছ্বাসে,
কুঞ্জবনে; গেয়েছিলে তুমি কবি, পাপিয়ার মত নীলাকাশে,
প্রবল মধুর স্বনে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্দ্র, বাইরনের উদ্দেশে

‘মন্দ্র’ কাব্যের ‘সুখমৃত্যু’ কবিতার চতুর্থ বিভাগটি এ এই ছন্দে রচিত। পরবর্তী কবি জীবনানন্দ দাশের রচনায় বাইশ মাত্রার প্রবহমান পঙ্ক্তির প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

৩। আট-আট-ছয় মাত্রার প্রবহমান ত্রিপদী পঙ্ক্তি (জীবনানন্দ)

খ. এখানে আকাশ নীল,—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা,-রং তার আশ্বিনের আলোর মতন ;
আকন্দ ফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ
রৌদ্রের দুপুর ভরে ;—বার বার রোদ তার সুচিক্কণ চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায় ;—দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে বুলায়ে ফিরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,
ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ ;
মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধূল।
কবেকার কোকিলের, জান কি তা? যখন মুকুন্দরাম, হায়,
লিখিতেছিলেন বসে দু’ পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়,—থেমে থেমে যায় ;
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙড়ের জল
‘সন্ধ্যার’ অন্ধকারে, ধান-ক্ষেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল।

—জীবনানন্দ, রূপসী বাংলা, ‘এখানে আকাশ নীল’

তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দে পদক্ষেপের দৃঢ়তা ও বৈচিত্র্য বেশি, রচনার ভঙ্গীতে বাগ্‌ভঙ্গীর অনুবর্তিতা বেশি। আর জীবনানন্দের ছন্দে পদক্ষেপের চেয়ে ভাবের স্রোতে বয়ে চলার প্রবণতা বেশি। সংক্ষেপে বলা যায়,

একজনের রচনায় সুদৃঢ় গদ্যধর্মিতার প্রাধান্য, আর-এক জনের রচনার ঝোঁক সুকোমল পদ্যধর্মিতার দিকে।— লক্ষণীয়, এই রচনাটির উপান্ত্য পঙ্‌ক্তিতে 'সন্ধ্যার' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে চার কলামাত্রার হিসাবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের আর-একটি রচনার ছন্দোবৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটিতে তিনি বারো-নয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিকে প্রবহমান রূপ দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে ছয়, ছয় ও নয় মাত্রার পরে যতি স্থাপনের পূর্বাগত বিধান লঙ্ঘন করে চলতে হয়েছে অনেক স্থানেই। কেননা, পূর্বাগত যতিবিধান লঙ্ঘন না করে এ-রকম ছন্দপঙ্‌ক্তিকে প্রবহমান রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত—

৪। বারো-নয় মাত্রার প্রবহমান দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি (দ্বিজেন্দ্রলাল)

কে তুমি সহস্র যোজন জুড়িয়া, ব্রহ্মদেশ হতে তাতার।
অক্ষয় হীরক-মুকুটের মতো ভারতলক্ষ্মীর মাথার,
জ্বলিছ প্রদীপ্ত, পাইয়া উষার কনকচরণ-পরশ
তুষার মণ্ডিতচূড়ায়? হিমাদ্রি? ব্যাপি কত লক্ষ বরষ
আছ এইরূপ নিশ্চল, নিস্তব্ধ, ভেদিয়া নির্মল গগন
উত্তুঙ্গ শিখরে, গিরিবর? আছ, কোন্ মহাধ্যানে মগন,
মহর্ষি? বিরাজে পদতলে দূরে কত রাজ্য শ্যাম, নবীন,
শিশুসম ; শুদ্ধ তুমিই একাকী, বসে আছ কৃশ, প্রবীণ,
পাষাণপঞ্জর যেন ; দেখি দেহে আছে কয়খানি যা হাড় ;
কার্যময় এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে প্রকাণ্ড অকেজো পাহাড়।
দেখ, নিজ কার্য করে সকলেই—ইতর, মহৎ,—সবে ;
শুদ্ধ কি একাকী বসিয়া রহিবে নিষ্কর্মা, তুমিই ভবে?

—দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্দ্র, হিমালয় দর্শনে

এই রচনাটির প্রতি স্তবকের শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে আছে বারো+আট, মোট কুড়ি মাত্র। অন্য সব পঙক্তিতে আছে বারো+নয়, মোট একুশ মাত্রা।—আসল লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এটিতে ছন্দের প্রথাগত যতিবিধান মানা হয় নি, মানা হয়েছে বাক্যার্থগত যতিবিধান। অথচ প্রতি পঙ্‌ক্তির মাত্রাসংখ্যার সমতা রক্ষা করা হয়েছে। ফলে অনেক পঙক্তির অন্তেই বাক্যার্থগত পূর্ণযতি নেই। ছয় মাত্রার পর্ব গঠিত (মিশ্রবৃত্ত বা কলাবৃত্ত) দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিকে আর কেউ এ-রকম প্রবহমান রূপ দিয়েছেন বলে মনে হয় না। অথচ এই নূতন ছন্দোরূপ রচনার প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়েছে তাও বলা যায় না। এই হল এ রচনাটির ছন্দোগত অ-সাধারণত্ব। বিগত আট দশক কাল যাবৎ ছয় মাত্রার মিশ্রবৃত্ত পর্ব রচনার প্রথা অচল হয়ে আছে। তবু এই দীর্ঘ কালের ব্যবধানেও দ্বিজেন্দ্র-রচিত এই ছন্দোরূপের উজ্জ্বলতা মলিন হয় নি।

অতিমুক্তক ছন্দোবন্ধ (মিশ্রবৃত্ত)

‘বলাকা’ কাব্যের ‘**বেড়াভাঙা**’ (মুক্তক) মহাপয়ার রচনা শুরু করার (১৯১৪) বহু বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ রচনার প্রচলিত প্রথা না মেনে নিজের অভিরুচি অনুসারে ছোট-বড় নানা আয়তনের ছন্দপঙ্‌ক্তি রচনা শুরু করেন। তখন পঙক্তিদৈর্ঘ্যের কোনো সীমা মেনে চলাও অনাবশ্যক মনে করেন। নিজের অভিরুচি অনুসারে রচিত এ-রকা সীমাহীন স্বচ্ছন্দগতি ছন্দকে তিনি তখন (১৮৮২) অভিহিত করেছেন ‘**হৃদয়ের ছন্দ**’ নামে। পরিণত বয়সে (১৯৩০) এ-রকম স্বাধীন ছন্দকে তিনি বলেছেন ‘**লাগাম-ছেঁড়া**’ ছন্দ। এই লাগাম-ছেঁড়া ছন্দের প্রচুর নিদর্শন আছে তাঁর ‘সন্ধ্যাসংগীত’ (১৮৮২), ‘প্রভাতসংগীত’ (১৮৮৩) এবং ‘ছবি ও গান’ (১৮৮৪) কাব্যে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। অতিমুক্তক ছন্দোবন্ধ (রবীন্দ্রনাথ)

জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধারসাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা, ৮-৬-১০=২৪ মাত্রা
একেবারে উন্মাদের পারা।
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক্ হইয়া—
এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্তে সে গেল মিশাইয়া।... ৮-৮-১০=২৬ মাত্রা
জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে, ৮-৮-১০=২৬ মাত্রা
যত হাসে ততই সে দহে।
তেমনি, তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল— ৮-৬-৬= ২০ মাত্রা
দহিত, দহিত তারে, দহিত কেবল।
জ্যোতির্ময় তারাপূর্ণ বিজন তেয়াগি
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।...
১৬-১৪=৩০ মাত্রা
সে কি কভু ভেবেছিল মনে—
(এত গর্ব আছিল কি তার) ১০-১০=২০ মাত্রা
আপনারে নিবাইয়া তোমাদের করিবে আঁধার।
৮-১০=১৮ মাত্রা
গেল, গেল, ডুবে **গেল**, তারা এক ডুবে **গেল**,

আঁধারসাগরে—

গভীর নিশীথে

অতল আকাশে। ১৬-১৮=৩৪ মাত্রা

হৃদয়, হৃদয় **মোর**, সাধ কিরে যায় **তোর**

ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে। ১৬-১৪=৩০ মাত্রা

—সন্ধ্যাসংগীত, তারকার আত্মহত্যা (১৮৮১)

দেখা যাচ্ছে—(১) কোনো ছত্রেই অর্ধযতিবিভক্ত দুটির বেশি পদ রাখা হয় নি। (২) দীর্ঘতম দ্বিপদী ছন্দপঙ্‌ক্তিতে আছে আট-দশ মাত্রার দুই পদ। (৩) এর চেয়ে দীর্ঘ ছন্দপঙ্‌ক্তিকে ভেঙে একাধিক ছত্রে সাজানো হয়েছে। (৪) কোনো ছন্দপঙ্‌ক্তিতেই তিনের বেশি পদ রাখা হয় নি। এই ছন্দকে মুক্তক পয়ার বলা যায় না, বলা যায় মুক্তক 'ত্রিপদী'। (৫) যেসব ছন্দোবিভাগ (একপদী, দ্বিপদী বা ত্রিপদী) এই রচনাটিতে স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তি বলে স্বীকৃত হয়েছে সেগুলির অন্তে মিল রাখা হয়েছে। যেসব পঙ্‌ক্তিকে ভেঙে দুই ছত্রে সাজানো হয়েছে সেগুলির মিল আছে দ্বিতীয় ছত্রের অন্তে। (৬) কোনো ছন্দপঙ্‌ক্তিতে তিনের বেশি পদ হয়ে গেলে তার প্রথম দুই পদে মিল দিয়ে পঙ্‌ক্তির অতিদীর্ঘতাকে নিরস্ত করা হয়েছে। যেমন—

তাই আজ ছুটে**ছে সে**। নিতান্ত মনের **ক্লেশে**

আঁধারের তারাহীন। বিজনের লাগি।

—'ছেসে' ও 'ক্লেশে' মিলটুকু না থাকলে এই দুই ছত্র নিয়ে গঠিত হত একটি চৌপদী পঙ্‌ক্তি। কিন্তু সেটা কবির অভিপ্রেত ছিল না। তাই মিল দিয়ে প্রথম দুই পদকে দুটি স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী 'গেল, গেল ডুবে গেল' এবং 'হৃদয়, হৃদয় মোর' ইত্যাদি দুটি স্থলেও তাই করা হয়েছে।

এর থেকে বোঝা যায়, এ ছন্দকে একেবারে লাগামছেঁড়া অথাৎ অসংযত বলা সংগত নয়। বরং পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সংযম ও সুবিবেচনার পরিচয়ই পাওয়া যায়। তবে 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রভৃতি তিন কাব্যের ছন্দে কবি প্রচলিত ছন্দোবন্ধের নিয়মকানুন না মেনে বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের যথেচ্ছ মিশ্রণ এবং ছোট-বড় ও অতিবড় পঙ্‌ক্তির যথেচ্ছ সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন বলেই তিনি এ-রকম ছন্দোবন্ধকে বলেছেন 'লাগামছেঁড়া'। আধুনিক পরিভাষায় এ-রকম ছন্দোবন্ধকে বলা যায় **অতিমুক্তক**।

'সন্ধ্যাসংগীত' প্রভৃতি কাব্যের লাগামছেঁড়া ছন্দের সঙ্গে 'বলাকা'র মুক্তক পয়ারের প্রধান পার্থক্য দুটি। এক, বলাকা-র মুক্তক রচনায় নানা ছন্দোবন্ধের মিশ্রণ ঘটানো হয় নি। দুই, বলাকা-র মুক্তক রচনায় কোনো ছত্রেই ত্রিপদী পঙ্‌ক্তিকে আমল দেওয়া হয় নি। ছত্রের দৈর্ঘ্য দুই পদের সীমা ছাড়িয়ে যায় নি। কার্যতঃ দ্বিপদী মহাপয়ার পঙ্‌ক্তির আঠারো মাত্রাকেই ছত্রদৈর্ঘ্যের সীমা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এইজন্যই কবি নিজে 'বলাকা'-র ছন্দকে বলেছেন 'বেড়াভাঙা পয়ার'। ছত্রদৈর্ঘ্যের এই সীমা মেনে নেবার ফলে শ্রুতিগ্রাহ্য মিলের পারম্পর্য রক্ষা সহজ হয়েছে, আর ছন্দের পদক্ষেপে দেখা দিয়েছে দৃঢ়তা তাছাড়া বাক্যরচনায় এসেছে গাঢ়বদ্ধতা। আগেকার লাগামছেঁড়া ছন্দে এসব গুণের অভাব ছিল। কারণ মুক্তক রচনায় অতিদীর্ঘ পঙ্‌ক্তি

স্বতঃই এলিয়ে পড়ে এবং তার গতিতে দেখা দেয় অলস মন্থরতা। তাছাড়া, পঙ্‌ক্তির অতিদীর্ঘতার ফলে মিলের শ্রুতিগ্রাহ্যতাই হারিয়ে যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের ‘মন্দ্র’ (১৯০২) কাব্যের ‘আশীর্বাদ’, ‘উদ্‌বোধন’ এবং ‘রাধার প্রতি কৃষ্ণ’, এই তিনটি কবিতাতেও অতিমুক্তক পদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই তিন কবিতাতেই ছত্রের দৈর্ঘ্য আঠার মাত্রার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এগুলির মধ্যে ‘উদ্‌বোধন’ কবিতার ছন্দোবৈশিষ্ট্যের কথা আগেই বলা হয়েছে ‘সমিল মুক্তক মহাপয়ার’ প্রসঙ্গে—দীর্ঘ উদ্‌ধৃতি সহ। বাকি দুটি কবিতা থেকে দুটি অংশ এখানে তুলে দিলাম।—

২। অতিমুক্তক ছন্দোবন্ধ (দ্বিজেন্দ্রলাল)

ক. আজি, শান্তিজলে
পবিত্রে! দাঁড়াও, নারীজীবনের এই সন্ধিস্থলে ;
আমি আশীর্বাদ করি শান্তি ও কুশলে
থাক পরিণীতে! পতি-সখী ও সচিব হও—আর সুমঙ্গলে,
ধন্য হও নিজ পুণ্যবলে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্দ্র, আশীর্বাদ

লক্ষণীয়, ‘উদ্‌বোধন’ কবিতাটির মতো এটিতেও কোনো ছত্রই বাইশ মাত্রার সীমা ছাড়িয়ে যায় নি। কিন্তু,

খ. ভুলিব? এ জীবনের সৌন্দর্যগরিমা?
নব বসন্ত উদ্‌গমে স্নিগ্ধ মলয় বায়ুর সেই প্রথম উচ্ছ্বাস?
না সখি, না, পারিব না, যদিও কাঁদিতে হয় স্মরিয়া,—কাঁদিব ;
সেও ভালো—তথাপি সে ক্রন্দনও বিলাস।
আহা, সেই জীবনের প্রথম গভীর সুখদুঃখ, সেই প্রথম আবেগ ;
বিরহ, মিলন নব ;—প্রথম জীবনে।
নবীন প্রাণের গাঢ় গভীর উদ্দাম ভালবাসা,—
ঘনকুঞ্জবনচ্ছায়ে, নিস্তব্ধ নির্জনে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, মন্দ্র, রাধার প্রতি কৃষ্ণ,

এই রচনাটিতে কোনো কোনো ছত্রে চব্বিশ বা ছাব্বিশ মাত্রাও আছে। তবে একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় কোনো ছত্রেই তিনের বেশী পদ স্থান পায় নি। আর পদগুলির আয়তনভেদে ছত্রের মোট মাত্রাসংখ্যায় ভিন্নতা ঘটে। দ্বিজেন্দ্রলালের ত্রিপদী ছত্র রচনায় আট-আট-ছয়, আট-আট-আট, আট-আট-দশ, আট-দশ-ছয় ইত্যাদি নানারকম মাত্রাসমাবেশ দেখা যায়। এইজন্যই তাঁর রচনায় শ্রুতিবৈচিত্র্য বজায় থাকে, কোথাও একঘেয়েমি দেখা যায় না। তাছাড়া, তাঁর রচনা ঘনঘন কমা-সেমিকোলন যোগে নানা অসমান ভাগে বিভক্ত থাকে। ফলে তাঁর কবিতা আবৃত্তিতে লিরিকভঙ্গির বদলে গদ্যসুলভ পদক্ষেপভঙ্গি দেখা যায়। তাঁর মাত্রাসমাবেশপ্রণালীও

গদ্যসুলভ পাঠভঙ্গির সহায়তা করে। এইজন্যই তাঁর রচনায় দুই-তিন-তিন মাত্রার পদ একটুও অস্বাভাবিক বোধ হয় না। আর, আট-দশ মাত্রার দ্বিপদী পঙ্‌ক্তিও তাঁর হাতে অতি সহজেই পরিণত হয় ছয়-ছয়-ছয় মাত্রার ত্রিপদীতে। তাতেও বাংলা কবিতাপাঠের একটানা সুর প্রতিহত হয়। এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। —'রাধার প্রতি কৃষ্ণ' কবিতাটির সর্বত্রই মিল আছে শুধু দ্বিতীয়-চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে, প্রথম-তৃতীয়ে মিল নেই।

মোট কথা। দ্বিজেন্দ্রলালের মুক্তক প্রণালীর ছন্দকে বেড়াভাঙা বা মুক্তক পয়ার বলা যায় না। এছন্দকে বলা যায় **মুক্তক ত্রিপদী**। এই মুক্তক ত্রিপদী বন্ধও কার্যতঃ অতিমুক্তক বলেই গণ্য হতে পারে।

কবি নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) রচনায় মুক্তক পঙ্‌ক্তি আরও প্রসার লাভ করে। যেমন—

৩। অতিমুক্তক ছন্দোবন্ধ (নজরুল)

ক. হেরিলাম সেবারতা মহীয়সী মহালক্ষ্মী প্রকৃতির রূপ,
সহসা সে ভুলিয়াছে সেবা, আগমন-ভয়ে মোর
প্রস্তরশিখর সম নিশ্চল নিশ্চুপ।
অনুমানি যেন কোন্ সর্বনাশা অমঙ্গল-ভয়
জাগি আছে শিশুর শিয়র-পাশে ধ্যানমগ্না মাতা, শ্বাস নাহি বয়।
মনে হল ঐ বুঝি মাতা মোর, মৌনা ঐ জননীর শুভ্র শান্ত কোলে
—প্রহ্লাদকুলের আমি কাল দৈত্যশিশু,
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম 'মা আমার' বলে।

—নজরুল, বিষের বাঁশী (১৯২৪). ঝড়

খ. মনে হয়—ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি, মা বসুধা, দ্বিধা হও!
ঘৃণাহত মাটিমাখা ছেলেরে তোমার
এ নির্লজ্জ মুখ-দেখা আলো হতে অন্ধকারে টেনে লও।'...
বুঝিয়াছি, শেষ বার ঘিরে আসে সাথী মোর মৃত্যু-ঘন আঁধি,
রিক্ত প্রাণ তিক্ত সুখে হুঙ্কারিয়া উঠে তাই
কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি?
জ্বলে ওঠ্ এইবার মহাকাল-ভৈরবের নেত্রজ্বালা-সম ধক ধক
হাহাকার-করতালি বাজা ; জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা অনন্ত পাবক।

—নজরুল, দোলন চাঁপা(১৯২৩), পূজারিণী

দেখা গেল নজরুলের মুক্তক রচনায় পঙ্‌ক্তিদৈর্ঘ্যের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। তাঁর রচিত কোনো-কোনো পঙ্‌ক্তি অনায়াসেই তিন পদের সীমা ছাড়িয়ে যায়। অধিকন্তু একই পঙক্তির পদগুলিও সমায়তন নয়। নানা মাপের পদ নিয়ে এক-একটি পঙ্‌ক্তি গঠিত হয়েছে। ফলে কোথাও একটানা সুরের একঘেয়েমি ঘটতে পারে নি।

মোট কথা, এজাতীয় ছন্দকে মুক্তক পয়ার বা মহাপয়ার তো বলা যায়ই না, মুক্তক ত্রিপদীও বলা যায় না। শুধু **অতিমুক্তক** বলেই নিরস্ত হতে হয়।

এ-রকম অতিমুক্তক ছন্দোবন্ধের জন্য সবচেয়ে বেশি খ্যাত হয়েছেন কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

৪। অতিমুক্তক ছন্দোবন্ধ (জীবনানন্দ)

ক. পৃথিবীর প্রেত চোখ বুঝি
সহসা উঠিল ভাসি তারকাদর্পণে মোর অপহৃত আননের প্রতিবিম্ব খুঁজি।...
মশলাদরাজ এই মাটিটার ঝাঁঝ যে রে—
কেন তবে দু-দণ্ডের অশ্রু অমানিশা
দূর আকাশের তরে বুকে তোর তুলে যায় নেশাখোর মক্ষিকার তৃষা।

—জীবনানন্দ, ঝরাপালক (১৯২৮). সেদিন এ ধরণীর

খ. চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি ধান-ভানা
রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।...
ফলন্ত ধানের গন্ধে, রঙে তার, স্বাদে তার ভরে যাবে আমাদের সকলের দেহ ;
রাগ কেহ করিবে না, আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।...
ফসল—ধানের ফলে যাহাদের মন
ভরে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা করে গেছে
পৃথিবীর সব সিংহাসন।...
অনেক রাতের আগে এসে তারা চলে গেছে, তাদের দিনের আলো
হয়েছে আঁধার,
সেই সব গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়—
আজ এই অন্ধকারে আসিবে কি আর?
তাদের ফলন্ত দেহ শুষে লয়ে জান্মিয়াছে আজ এই খেতের ফসল,
অনেক দিনের গন্ধে ভরা ওই ইঁদুরেরা জানে তাহা,—জানে তাহা

নরম রাতের হাতে ঝরা শিশিরের জল।...
ফুরোনো খেতের গন্ধে এইখানে ভরেছে ভাঁড়ার ;
পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই, কোনো কৃষকের মতো
দরকার নেই দূরে মাঠে গিয়ে আর।...
আমার চোখের পাশে আনিয়ো না সৈন্যদের মশালের আগুনের রং ;
দামামা থামায়ে ফেল—পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক
রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ্‌।...
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমবার সাধ
ভালবেসে।

—জীবনানন্দ, ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), অবসরের গান

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অনেকগুলি পঙ্‌ক্তিতে আছে বিভিন্ন আয়তনের তিন পদ আর কতকগুলিতে আছে চার পদ। পদের মাত্রাসংখ্যা ছয়, আট বা দশ। কোনো-কোনো পদে বারো মাত্রাও থাকে। ফলে ত্রিপদী বা চৌপদী পঙ্‌ক্তির মাত্রাসংখ্যাও বিভিন্ন রকম হয়। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি থেকেই জীবনানন্দের বিভিন্ন মাপের পদসমাবেশজাত বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। এই উদ্দেশ্যেই কিছু বেশিসংখ্যক পঙ্‌ক্তি সংকলন করা গেল। তাছাড়া, একটু তুলনা করলেই বোঝা যাবে, দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে নজরুলের অতিমুক্তক ছন্দোবন্ধের সঙ্গেই জীবনানন্দের অতিমুক্তক রচনার সাদৃশ্য বেশি।

নজরুল ও জীবনানন্দের দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিগুলিতে যথাস্থানে যতি রেখে (অর্থাৎ অভীষ্ট রূপে পদবিভাগ করে) আবৃত্তি করা অনায়াসসাধ্য হয় না। একাধিক বার পড়ে নিতে হয়। দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির পদবিভাগ অনুসারে বিভিন্ন ছত্রে সাজিয়ে দিলেই এই গোলযোগ থাকে না। অর্থাৎ আবৃত্তিকালে আমরা কার্যতঃ যা করে থাকি, লেখাতেও যদি তাই করা যায় তাহলেই চক্ষুকর্ণের বিরোধ মিটে যায়। ছন্দোবন্ধ যে স্বরূপতঃই একটা শ্রৌত বস্তু তা মনে রাখা আবশ্যক। (অতি দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিগুলিকে অনেক সময় দুই ছত্রে সাজানো হয় বটে। কিন্তু তা করা হয় মুদ্রণ-সৌকর্যের প্রয়োজনে, ছন্দোবোধ-সৌকর্যের প্রয়োজনে নয়।) প্রত্যেক পদকে স্বতন্ত্র ছত্রে না সাজিয়ে এক ছত্রে অনধিক দুটি পদ থাকলে ছন্দোবোধের তথা আবৃত্তির বাধা হয় না। কারণ কবিতা পাঠকমাত্রই এক ছত্রে লেখা দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি পাঠে অভ্যস্ত। তবু যে অতিদীর্ঘ পঙ্‌ক্তিগুলিকেও এক ছত্রে লেখার প্রবণতা দেখা যায় তার মূলকারণ পঙ্‌ক্তিপ্রান্তের মিলগুলিকে পরস্পরের সান্নিধ্যে দৃশ্যমান করার চিরাভ্যস্ত প্রথা। দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিকে ভেঙে একাধিক ছত্রে সাজালে মিলগুলি দৃশ্যতঃ পরস্পরের সন্নিহিত থাকবে না বটে, কিন্তু তাদের শ্রুতিগত সান্নিধ্য বা ব্যবধান অপরিবর্তিতই থাকবে।

প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ারে যে, সব পঙ্‌ক্তিকেই এক মাপের রাখা হয়, তা চোখের অভ্যাসরক্ষার প্রথাজাত। কানের বিচারে কিন্তু প্রবহমান পয়ারের সব পঙ্‌ক্তি সমান মাপের থাকে না। অর্থাৎ, প্রবহমান

পয়ার কানের বিচারে আর পয়ারই থাকে না, সে হয়ে যায় মুক্তক ছন্দোবন্ধ। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তির আসল শ্রুতরূপ এই—

সম্মুখ সমরে পরি বীরচূড়ামণি বীরবাহু
চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে,
কহ হে দেবি অমৃতভাষিণী,—
কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।

বলা বাহুল্য মধুসূদনের অমিল প্রবহমান পয়ার এখানে মুক্তক মহাপয়ারের রূপ ধারণ করেছে। নজরুল বা জীবনানন্দের আদর্শে এর শেষ দুই ছাত্রকে এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে, বিশেষতঃ যদি 'অমৃতভাষিণি' ও 'রাঘবারি' শব্দের স্থলে দুটি সমিল শব্দ বসানো যায়। পক্ষান্তরে এই দুই কবির অতিদীর্ঘ পঙ্‌ক্তিগুলিকে ভেঙে দুই-তিন ছত্রে সাজিয়ে এবং নূতন মিলের ব্যবস্থা করে সমিল মুক্তক মহাপয়ারের রূপ দেওয়া যেতে পারে। তাতে ছন্দের গতিস্পন্দে কোনো পার্থক্য ঘটবে না। শুধু মিলগুলি নূতন সুরে কানে বাজবে।

মোটকথা। অমিল প্রবহমান পয়ারে ও মহাপয়ারে আছে পঙ্‌ক্তিমাপের সমতারক্ষার প্রথাপালন, আর অতিমুক্তক ছন্দোবন্ধে আছে ধারাবাহিক মিলরক্ষার প্রথাপালন। বলা বাহুল্য, সমিল প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ারে পঙ্‌ক্তিমাপের সমতা ও মিলের ধারাবাহিকতা রক্ষা, এই দু-রকম প্রথাপালনেরই দায়িত্ব আছে। এই দু-রকম দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলে প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার ও অতিমুক্তক, এই দু-রকম ছন্দোবন্ধই পরিণত হবে অমিল মুক্তক মহাপয়ারে। এই মহাপয়ারের পায়ে মিলের নূপুরও পরানো যেতে পারে। পরানো হক বা না-হক মুক্তক মহাপয়ারের পদস্পন্দ সমভাবেই অনুভূত হবে।

মনে রেখো হে নিদয়ে   মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান
হবে, হবে, হবে জয়,   হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী   সফল করিব রাণী,
হে মহিমাময়ী।

---

১. দ্রষ্টব্য 'ছন্দ গ্রন্থ' (তৃতীয় সং, ১৯৭৬), 'গদ্যকাব্যের ছন্দ প্রকৃতি' (প্রথম পর্যায়), পৃ ২৩০।

১। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থ (তৃতীয় সং ১৯৭৬), 'গদ্য ছন্দ' প্রবন্ধ (১৯৩২), চতুর্থ বিভাগ, পৃ ২১৬-১৮।

২। স্মরণীয়— "মাত্রাবৃত্ত [কলাবৃত্ত] ছন্দে ও মুক্তক করা যায় কিনা আমি তাই ভাবছি।" ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের উক্তি। দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'ছন্দ-বিচার' প্রবন্ধ (১৯৩২), পৃ ২৭১।

১। পাঠান্তর আছে বিধাতৃর।

পরিভাষাকোষ ও মতান্তর-বিচার

Glossary and Comparative Study of Metrical Thoughts

ছন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যা বলি সেটা আমার অশিক্ষিত বলা। সুতরাং তাতে দোষ স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু ছন্দের রস-সম্বন্ধে আমি যদি কিছু আলোচনা করি, সংকোচ করব না। কেননা ছন্দসৃষ্টিতে অশিক্ষিত পটুত্বের মূল্য উপেক্ষা করবার নয়।

১৩৪১ (ইং ১৯৩৪) জ্যৈষ্ঠ

—**রবীন্দ্রনাথ**

পঞ্চম অধ্যায়

পরিভাষা-কোষ

সূচনা

পরিভাষা-প্রয়োগে ও ছন্দের বিশ্লেষণে ছান্দসিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। ফলে বাংলা ছন্দশাস্ত্র এখনও সর্বস্বীকৃত ও সুনির্দিষ্ট প্রণালীর উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। বস্তুতঃ পরিভাষাপ্রয়োগে মতপার্থক্যের জন্য ছান্দসিকদের মতামত স্বরূপতঃ বোধগম্য হবার সুযোগ পায় না। ফলে সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত এবং ছন্দশাস্ত্র বিষয়েই বীতস্পৃহ হয়। আশ্চর্যের বিষয় সুপ্রাচীন ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রেরও এই দশা। বিখ্যাত ছন্দশাস্ত্রী জর্জ সেনস্‌বারি (G. Saintsbury) ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

The great difficulty attending the study of English prosody, and the cause of the fact that *no book hitherto published can be said to possess actual authority on the subject,* arises from the other fact that *no general agreement exists* or ever has existed, *on the root-principles of the matter, or,* it may be added, *on its terminology*: whence it results that here is no subject on which it is so difficult to write without being constantly misunderstood. (বক্রলিপি লেখকের)

—*Manual of English prosody (1930), p.6 & f.n.1*

বাংলা ছন্দশাস্ত্রের অবস্থা এখন আর এতখানি নৈরাশ্যজনক নয়। বাংলা ছন্দের আলোচনা যদি সুপরিচালিত হয় তবে বাংলা ছন্দশাস্ত্র অদূর ভবিষ্যতেই সর্বস্বীকৃত পরিভাষা ও বিশ্লেষণের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, এমন আশা করা অন্যায় নয়। এখনও এ বিষয়ে যে কিছু মতপার্থক্য দেখা যায়, তার প্রধান কারণ বাংলা ছন্দের রীতিনিরূপণ-প্রণালীর ভিন্নতা এবং তদনুসারে রীতিপরিচায়ক পারিভাষিক নামের ভিন্নতা। দ্বিতীয় কারণ অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিভাষার অর্থগত অনির্দিষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা। এই দ্বিবিধ ত্রুটির নিরসনই বর্তমান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলা ছন্দ নিয়ে যাঁরা অল্পাধিক আলোচনা করেছেন (প্রবন্ধে বা গ্রন্থে), তাঁদের প্রায় সকলেই স্বোদ্‌ভাবিত পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যাঁদের ছন্দচিন্তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের প্রযুক্ত মুখ্য পরিভাষার পরিচয় দিয়েছি 'আধুনিক বাংলা ছন্দসাহিত্য' গ্রন্থে (১৯৮০)। সেসব পরিভাষার অধিকাংশই অপ্রচলিত হয়ে গেছে। যেসব পরিভাষা পাঠকসমাজে সুপরিচিত, এই অধ্যায়ে শুধু সেগুলিরই পরিচয় দেওয়া যাবে। এই অধ্যায়ে সংকলিত পরিভাষাগুলি নিম্নলিখিত চার শ্রেণীর অন্তর্গত।

রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ-আলোচনা করেছেন কবির দৃষ্টিতে, ছন্দশাস্ত্রীর দৃষ্টিতে নয়। তাই তাঁদের আলোচনায় নির্দিষ্টার্থক পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। তবে তাঁরা এমন কতকগুলি শব্দ যোগে ছন্দ-আলোচনার কাজ চালিয়েছেন, যেগুলি যথার্থ পরিভাষার স্থলবর্তী বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু মুশকিল

এই যে, রবীন্দ্রনাথ একই শব্দ প্রবন্ধভদে ভিন্নার্থে ব্যবহার করেছেন আবার একই অর্থে একাধিক শব্দও প্রয়োগ করেছেন। এটা হল নানা উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্রভাবে ছন্দ-আলোচনার ফল। তিনি স্বভাবতঃই সুপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ ছন্দশাস্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হন নি। এটা তাঁর কাছে প্রত্যাশাও করা যায় না। সত্যেন্দ্রনাথও ছন্দশাস্ত্র রচনা করতে বসেন নি। তিনি 'ছন্দ-সরস্বতী' নামে প্রায়-গল্পাকারে লিখিত একটিমাত্র রচনায় (১৯১৮) বাংলা ছন্দের শুধু রীতিগুলির পরিচয় দিয়েছেন ; ছন্দোরূপের আলোচনা করেন নি। এই প্রবন্ধে (পরবর্তী কালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) প্রযুক্ত কোনো-কোনো শব্দ যথার্থ পরিভাষা বা পরিভাষাতুল্য বলে স্বীকৃত হতে পারে। এই দুই কবির ছন্দচিন্তার গুরুত্ব কম নয়। কেননা, আধুনিক কালে বোধ করি এমন কোনো ছান্দসিক নেই যিনি তাঁদের কাছ থেকে অল্পাধিক প্রেরণা লাভ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা ছন্দের এই দুই মহাশিল্পীর ছন্দ-রচনার স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষেও তাঁদের ছন্দচিন্তার সম্যক্‌জ্ঞান অপরিহার্য। এই জন্যই এই দু-জনের ব্যবহৃত পরিভাষা বা পরিভাষাতুল্য শব্দের সংজ্ঞার্থ নিরূপণের প্রয়াস করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী' কাব্যের ভূমিকায় ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন, পরিমাণে স্বল্প হলেও তার গুরুত্ব কম নয়। তাই যথাস্থানে তাঁর মতামত এবং পরিভাষার পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে।

ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থখানি সুদীর্ঘ কাল যাবৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্বাচিত হয়ে আসছে। তাই এই গ্রন্থে স্বীকৃত পরিভাষাগুলি ছাত্র ও শিক্ষকমহলে সুপরিচিত। এই কারণেই উক্ত গ্রন্থে স্বীকৃত পরিভাষাগুলির গুণাগুণ বিচার করাও কর্তব্য বোধ করেছি। বাংলা ছন্দের তিন রীতির অমূল্যধনের দেওয়া তিন নামের (তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও শ্বাসাঘাতপ্রধান) কিছু আলোচনা করেছি 'বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা' গ্রন্থে[১] (১৯৭৭)। এই অধ্যায়ে ওই তিন নামের আরও পরিচয় দেওয়া গেল অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে।

বর্তমান লেখকের দেওয়া (১৯২২-২৩) বাংলা ছন্দোরীতির তিন নাম (অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত) একদা সাধারণ পাঠকমহলে সুপ্রচলিত ছিল। এখনও প্রবীণ পাঠক ও কবিদের মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু এই নামগুলি যথাযথভাবে তিন ছন্দোরীতির প্রকৃতি-পরিচায়ক নয়, ফলে যথাযথভাবে ছন্দ-বিশ্লেষণের সহায়কও নয়। বস্তুতঃ এগুলি জিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে ছিল বিভ্রান্তিকর। তাই এই তিন নাম দীর্ঘকাল পূর্বেই (১৯৪৯) পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু এখনও এগুলি একেবারে অচল হয়ে যায় নি। তাই এগুলিকেও এই অধ্যায়ের পরিভাষা-তালিকায় স্থান দেওয়া গেল।

এই পরিত্যক্ত নামগুলির বদলে যে নূতন তিন নাম (মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত) বর্তমানে সুপ্রচলিত হয়েছে, তার সূত্রপাত হয় ১৯৪৯ সালেই। কিন্তু সেগুলির বহুল প্রচার শুরু হয় 'ছন্দ-পরিক্রমা' বই প্রকাশের সময় (১৯৬৫) থেকে। এই তিন নাম ছাড়া আরও যেসব পারিভাষিক শব্দ বর্তমানে চলছে এবং এই গ্রন্থে স্বীকৃত হয়েছে, সেগুলিকেও এই কোষাধ্যায়ে গ্রহণ করা হল।

এই চার শ্রেণীর পারিভাষিক শব্দের শুধু বিশেষার্থ বা নির্দিষ্টার্থ দিয়েই নিরস্ত হই নি। এসব শব্দের আনুষঙ্গিক অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ও যথাযথ রূপে বিবৃত হল। আশা করি তাতে পারিভাষিক নামগুলির সম্যক্ তাৎপর্য উপলব্ধির সহায়তা হবে।

পরিভাষা শব্দের মানে বিশেষ অর্থ-জ্ঞাপক শব্দ, প্রাকরণিক শব্দ (technical term)। সংজ্ঞা শব্দের মানেও তাই। অর্থাৎ, পরিভাষা ও সংজ্ঞা অভিন্নার্থক শব্দ। অতএব এই দুই শব্দ পরস্পরের প্রতিশব্দ (synonym) হিসাবেই ব্যবহার্য। তাই পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যাসূত্রকে সংক্ষেপে বলা যায় **সংজ্ঞাসূত্র (definition)**, মানে সংজ্ঞার্থসূচক সূত্র। কেউ-কেউ মনে করেন 'সংজ্ঞা' মানেই পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যাসূত্র। এ-রকম সিদ্ধান্ত সমীচীন নয় বলেই মনে করি।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, শাস্ত্রভেদে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন, সংস্কৃত ব্যাকরণে ও সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে একই 'পদ' শব্দ দুই ভিন্ন অর্থ বহন করে। তেমনি সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দশাস্ত্রে ওই 'পদ' শব্দই প্রযুক্ত হয় দুই ভিন্ন অর্থে।

২

সংজ্ঞার্থ-নিরূপণ

বাংলা ছন্দ-আলোচনায় সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় তার পরিভাষা। এই বিতর্কিত বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছি চারটি গ্রন্থে—'ছন্দ-পরিক্রমা' (১৯৬৫), 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' (১৯৭৪), 'বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা' (১৯৭৭ এপ্রিল) এবং 'ছন্দ-পরিক্রমা' (দ্বিতীয়, ১৯৭৭ সেপ্টেম্বর)। এখানে কোনো প্রকার বিতর্কের পুনরুক্তি না করে পারিভাষিক শব্দগুলির যথাসম্ভব সরল পরিচয় দিতে চেষ্টিত হয়েছি। কোনো-কোনো বিষয়ে অল্পাধিক মতভেদ দেখা যায়। এই মতভেদ দ্বিবিধ—(১) একই বিষয়ের একাধিক পারিভাষিক নাম এবং (২) একই পারিভাষিক নামের বিভিন্ন অর্থ স্বীকার। এই কোষাধ্যায়ে এই দ্বিবিধ মতভেদের সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়া গেল এবং বিভিন্ন মতের সমীচীনতা সম্বন্ধেও অনতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। আশা করি তাতে পাঠকের পক্ষে স্বমত-গঠনে সহায়তা হবে এবং বাংলা ছন্দচিন্তার তুলনাত্মক গবেষণারও (comparative study) একটা আদর্শ পাওয়া যাবে।

অধুনাপ্রবর্তিত ও সুপরিচিত পরিভাষাগুলির মধ্যে কোন্‌টি কার প্রবর্তিত তাও যথাস্থানে নির্দেশ করা গেল। আর, এই লেখকের রচিত ও স্বীকৃত পারিভাষিক নামগুলি নির্দিষ্ট হল (*) এই তারকা চিহ্নের দ্বারা এবং একদা এই লেখকপ্রযুক্ত ও পরে পরিত্যক্ত পারিভাষিক নামগুলি নির্দিষ্ট হল এই (†) ছুরিকা চিহ্নের দ্বারা।

অক্ষর—এই অনিশ্চিতার্থক শব্দটি বাংলা ছন্দের আলোচনায় অনেক অনর্থ সৃষ্টি করেছে। তাই এ শব্দটির একটু বিশদ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। অমূল্যধনের মতে 'অক্ষর' শব্দই ইংরেজি **syllable**-এর যথার্থ প্রতিশব্দ। তিনি বলেন ('বাংলা ছন্দের মূলসূত্র', ১৯৮৩ সং, পৃ ২৪৬)—"**syllable**র প্রত্যয় ভারতীয় ব্যাকরণ ও ছন্দঃশাস্ত্রে বরাবরই ছিল। **syllable**কে 'অক্ষর' শব্দ দিয়াই নির্দেশ করা হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। যে কোনও অভিধান হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।"

অমূল্যধনের এই উক্তির সত্যতা বিচার করে দেখা যাক। ভারতীয় ব্যাকরণে সিলেব্‌ল্‌-বোধক 'অক্ষর' শব্দের (বা অন্য কোনো শব্দের) প্রয়োগ কোথায় আছে তা আমার জানা নেই। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানে আছে, "অক্ষর—বর্ণ, letter/syllable।" এর থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে,—(১) অক্ষর

শব্দের এক মানে বর্ণ এবং বর্ণের ইংরেজি letter; (২) অক্ষর শব্দের আর-এক মানে সিলেব্‌ল্ এবং সিলেব্‌ল্ শব্দের ভারতীয় (সংস্কৃত বা বাংলা) প্রতিশব্দ নেই। মনিঅর উইলিঅম্‌সের অভিধানেও আছে, "অক্ষর—a syllable, a letter"। বস্তুতঃ প্রাচীন ও আধুনিক সব অভিধানেই অক্ষর শব্দের এই দুই অর্থ পাওয়া যায়।

বিখ্যাত বাচস্পত্য অভিধানে আছে অক্ষর শব্দের অর্থ "অকারাদি বর্ণে", আবার বর্ণ শব্দের অর্থ "অকারাদ্যক্ষরে"। সুতরাং অক্ষর ও বর্ণ পরস্পরের প্রতিশব্দ তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, এই অভিধানেই 'অক্ষর' শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"অক্ষরং বর্ণনির্মাণং বর্ণমপ্যক্ষরং বিদুঃ।"

অর্থাৎ অক্ষর শব্দের এক অর্থ 'বর্ণনির্মাণ' এবং আর-এক অর্থ 'বর্ণ'। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে—(১) সিলেব্‌ল্ শব্দে অদ্ব্যর্থক কোনো নাম নেই, তাই 'বর্ণনির্মাণ' বলে তার পরিচয় দিতে হয়েছে ; (২) 'অক্ষর' ও 'বর্ণ' অভিন্নার্থক শব্দ।

বর্ণ শব্দটিও অক্ষর শব্দের মতোই দ্ব্যর্থক। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ আছে, "বর্ণ—অক্ষর, শব্দাংশ (syllable)"! এখানে অক্ষর মানে letter। আর, সিলেব্‌ল্-এর কোনো প্রতিশব্দ নেই, তাই 'শব্দাংশ' বলে এবং তার সঙ্গে ইংরেজিতে 'syllable' লিখে তার পরিচয় দিতে হয়েছে। পূর্বোক্ত 'বর্ণনির্মাণ' এবং এই 'শব্দাংশ', এই দুই শব্দই ইংরেজি সিলেব্‌ল্-এর পরোক্ষ পরিচয়-সূচক বর্ণনা মাত্র। শুধু 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নয়, সব অভিধানেই 'অক্ষর' শব্দের ন্যায় 'বর্ণ' শব্দেরও letter এবং 'বর্ণনির্মাণ' বা 'শব্দাংশ', এই দুই অর্থ স্বীকৃত।

এবার দেখা যাক ছন্দশাস্ত্রে 'অক্ষর' শব্দের মানে কি? 'ছন্দোমঞ্জরী'র একটি শ্লোক এই।—

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোপি বা॥

—ছন্দোমঞ্জরী ১/১১

'শ্রুতবোধ'-নামক বহুপ্রচলিত ছন্দ-গ্রন্থে আছে—

সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গসংমিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়**মক্ষরং** গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন ॥

—শ্রুতবোধ ২

এই দুই শ্লোকেরই বক্তব্য বিষয় অভিন্ন—অনুস্বার ও বিসর্গ-যুক্ত, দীর্ঘস্বরান্ত এবং সংযুক্তপূর্ব বর্ণ (বা অক্ষর) গুরু বলে গণ্য হয়, আর পাদান্ত বর্ণ (বা অক্ষর) গুরু বলে গণ্য হয় বিকল্পে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রথম শ্লোকের 'বর্ণ' ও দ্বিতীয় শ্লোকের 'অক্ষর', এই দুই শব্দের অর্থ অভিন্ন। বস্তুতঃ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে অক্ষর ও বর্ণ শব্দের অর্থে কোনো পার্থক্যই স্বীকৃত হয় না। 'ছন্দোমঞ্জরী'র সপ্তম শ্লোকে আছে 'অক্ষর', আর একাদশে 'বর্ণ'। 'শ্রুতবোধ'-এর বিংশ শ্লোকে আছে 'অক্ষর', একবিংশে 'বর্ণ'। প্রাকৃতপৈঙ্গল, হিন্দি 'ছন্দপ্রভাকর' প্রভৃতি সব ছন্দ-গ্রন্থেই অক্ষর ও বর্ণ শব্দ অভিন্নার্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। অমূল্যধনও স্বীকার করেছেন ('মূলসূত্র' গ্রন্থ, পৃ ২৪৭)—প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থে "syllable অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কখনও 'বর্ণ',

কখনও ‘অক্ষর।” তাহলেই প্রশ্ন ওঠে, ভারতীয় ভাষায় letter ও syllable শব্দের পার্থক্য বোঝানো যাবে কি করে? ‘মূলসূত্র’ গ্রন্থে এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না।

এ কথা অবশ্য মানতে হবে যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে বর্ণ ও অক্ষর, এই দুই শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বোক্ত ‘বর্ণনির্মাণ’ বা ‘শব্দাংশ’ অর্থে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, এই ‘বর্ণনির্মাণ’ বা ‘শব্দাংশ’ ও আসলে যথার্থ সিলেব্‌ল্-বোধক নয়। ‘সুপ্তি’ শব্দটার অক্ষর-বিভাগ আর সিলেব্‌ল্-বিভাগ হবে এ-রকম—

সু+প্তি=অযুক্তাক্ষর+যুক্তাক্ষর

সুপ্+তি=closed syllable+open syllable

এর থেকেই বোঝা যায়, ‘অক্ষর’ সিলেব্‌ল্-এর প্রতিশব্দ হতে পারে না। কেননা, সিলেব্‌ল-এর অযুক্ত-যুক্ত রূপভেদ হয় না, আর ‘অক্ষর’-এর open-closed রূপভেদ নেই। তাই ‘তি’ সিলেব্‌ল্-কে অযুক্ত অক্ষর বলা গেলেও ‘সুপ্’ সিলেব্‌ল্-কে অযুক্ত বা যুক্ত অক্ষর কিছুই বলা যায় না। মোট কথা, অক্ষর বা বর্ণকে ‘শব্দাংশ’ বা ‘বর্ণনির্মাণ’ বলা গেলেও সিলেব্‌ল্ বলা যায় না কিছুতেই। অর্থাৎ অক্ষর (বা বর্ণ) শব্দকে কিছুতেই সিলেব্‌ল্-এর প্রতিশব্দ বলে স্বীকার করা যায় না।

বাংলা প্রয়োগে ‘অক্ষর’ শব্দের অর্থগত অনিশ্চয়তা আরও গুরুতর। ‘অক্ষরপরিচয়’ (বর্ণপরিচয়), ‘নিরক্ষর’ (বর্ণজ্ঞানহীন, illiterate), ‘আক্ষরিক’ (বর্ণগত, litteral) প্রভৃতি স্থলে ‘অক্ষর’ মানে লেটার, সিলেব্‌ল্ নয়। ‘যুক্তাক্ষর’ মানেও যুক্ত-লেটার, যুক্ত-সিলেব্‌ল্ তো হতেই পারে না। বাংলায় ‘অক্ষর’ শব্দের অর্থগত অনির্দিষ্টতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় হস্‌মধ্য ও হসন্ত শব্দের বেলায়। হালকা, রেশমী, অলস, মিনিট প্রভৃতি শব্দে তিন অক্ষর গণনা করাই প্রচলিত বাংলা রীতি। অথচ এসবে আছে দুটি সিলেব্‌ল্—একটি মুক্ত (open) ও একটি রুদ্ধ (closed)। তেমনি ‘পুণ্যবান্’ শব্দে আছে তিন সিলেব্‌ল্ (পুণ্, ণ্য, বান্)—দুটি রুদ্ধ ও একটি মুক্ত। অথচ প্রচলিত বাংলা রীতি অনুসারে ‘পুণ্যবান্’ শব্দে আছে চার অক্ষর (পু, ণ্য, বা, ন্)—দুটি অযুক্ত, একটি যুক্ত আর একটি হস্‌বর্ণ। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সব কবিরাই এ-রকম ‘অক্ষর’ গণনায়ই অভ্যস্ত ছিলেন। এই অবস্থায় স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলা ‘অক্ষর’ শব্দকে সিলেব্‌ল্-এর প্রতিশব্দ বলে মানা যায় না। তবু যদি অক্ষর-কে সিলেব্‌ল্ অর্থে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে পণ্ডিত অপণ্ডিত উভয় মহলেই ভ্রান্তি ঘটা অনিবার্য হবে।

দেখা গেল, সংস্কৃত বা বাংলা কোনো অর্থেই ‘অক্ষর’ শব্দ সিলেব্‌ল্-বোধক নয়। বস্তুতঃ ভারতীয় ভাষায় মুক্তরুদ্ধ-নির্বিশেষে সিলেব্‌ল্-বোধক কোনো শব্দ নেই। অর্থাৎ এমন কোনো শব্দ নেই যার দ্বারা একই সঙ্গে উভয়বিধ সিলেব্‌ল্ বোঝানো যায়। বাংলা ছন্দের আলোচনায় এমন একটি শব্দ মেনে নেওয়া বা বানিয়ে নেওয়া অত্যাবশ্যক। আমি ছন্দের আলোচনায় সংস্কৃত খণ্ডার্থক **দল** শব্দটিকে সিলেব্‌ল্-এর প্রতিশব্দ বলে মেনে নিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ‘অক্ষর’ শব্দকে সিলেব্‌ল্-বোধক বলে মনে করতেন না। তাই তাঁরা সিলেব্‌ল্ অর্থে ব্যবহার করতেন ‘মাত্রা’ শব্দ। কিন্তু ছন্দশাস্ত্রে ‘মাত্রা’ শব্দের প্রয়োগসিদ্ধ অন্য অর্থ আছে। তাই ছন্দ-আলোচনায় ‘মাত্রা’ শব্দকে দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করা চলে না। সিলেব্‌ল্ অর্থে ‘দল’ শব্দ প্রয়োগে এ-রকম দ্ব্যর্থতার আশঙ্কা থাকে না।

অক্ষরবৃত্ত + —ভারতচন্দ্রাদি কবিরা দীর্ঘকাল বাংলা অক্ষর-সংখ্যার হিসাবেই পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ রচনা করতেন। হালহেড প্রমুখ ছান্দসিকরাও অক্ষর-সংখ্যার হিসাবেই এসব ছন্দের পরিচয় দিতেন। এই প্রচলিত রীতির প্রতি লক্ষ রেখেই এক সময়ে (১৯২২) আমি 'অক্ষরবৃত্ত' নাম ব্যবহার করেছিলাম। এ-রকম অক্ষরগণনার ত্রুটি কোথায় (অর্থাৎ প্রচলিত বাংলা রীতিতে অক্ষর-গণনা যে উচ্চারণসম্মত নয়) তাও তখন লক্ষ করেছিলাম। এই রীতির ছন্দে যে ধ্বনির দু-রকম উচ্চারণের সমবায় ঘটে তারও আভাস দেওয়া হয়েছিল তখনই। যেমন 'অমরবৃন্দ' শব্দের 'ম' বর্ণের উচ্চারণ দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রক, অথচ 'বৃ' বর্ণের উচ্চারণ একমাত্রক, তেমনি 'সম্মুখ' শব্দের 'স' একমাত্রক অথচ 'মু' দ্বিমাত্রক, এ-রকম বিশ্লেষণও করা হয়েছিল তখনই।[১] কিছু কাল পরে (১৯৩১।১৩৩৮ ভাদ্র) আরও স্পষ্ট করে বলেছিলাম—

"শুধু অক্ষরগণনার উপরে ভিত্তি করে কোনো ছন্দ রচিত হতে পারে না। কারণ ছন্দের মূলতত্ত্ব অক্ষর নয়, ধ্বনি।...অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলে একটি ধ্বনিতত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্বটি এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দ শেষাংশে মাত্রাবৃত্তধর্মী ও অন্যাংশে স্বরবৃত্তধর্মী। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত আসলে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের **মিশ্রণজাত** একটি **যৌগিক** ছন্দ।" —ছন্দ-জিজ্ঞাসা, 'বাংলা ছন্দের বিবর্তন' প্রবন্ধ, পৃ ১১১-১২।

এই সময়েই 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' নামে এক প্রবন্ধেও (১৯৩১।১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে লেখা) অনুরূপ কথাই বলেছিলাম ('ছন্দ-জিজ্ঞাসা', পৃ ১৪৩)—

"অক্ষরবৃত্ত আসলে একটি **মিশ্রপ্রকৃতির** ছন্দ।...অক্ষরসংখ্যা এ ছন্দের মূলগত তত্ত্ব নয়। ধ্বনিবিচারহীন অক্ষরসংখ্যা কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত্ত্ব হতে পারে না।...এ ছন্দের স্বরূপ এই যে, এর প্রতেক শব্দের শেষ অংশের (সিলেব্‌ল্‌-এর) প্রকৃতি মাত্রিক (quantitative) এবং বাকি অংশের প্রকৃতি স্বরসংখ্যক (syllabic)। একস্বর শব্দের ধ্বনিটিকে প্রান্তিক বলেই ধরতে হয়।"

১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ (১৯৩১ মে) মাসে লেখা "বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ" নামের একটি প্রবন্ধ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কয়েক মাস পরে (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ)। তাতে বহু তথ্য ও যুক্তি-যোগে দেখাতে চেষ্টা করি যে,—তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত আসলে অক্ষর-সংখ্যাত নয়, বরং অক্ষর-সংখ্যার সমতা রক্ষার চেষ্টাতেই এই শ্রেণীর ছন্দে যথেষ্ট ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। আসলে দৃশ্যতঃ অক্ষরসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হলেও এই রীতির ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।—এর ফলে বাংলা সাহিত্যে ছন্দ নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এখানে সে ইতিহাস বলা অনাবশ্যক। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই বিতর্কের প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে (১৩৩৮ মাঘ) মন্তব্য করেন—

"আমাদের স্বরবর্ণগুলো জীবধর্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন-প্রসারণ চলে।...এইজন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলা ছন্দে চলে না।"—'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), ছন্দের হসন্ত-হলন্ত (২), পৃ ১০২।

রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়ে আমি 'অক্ষরবৃত্ত' নাম পরিত্যাগ করে পূর্বব্যবহৃত **যৌগিক** (composite) নামটাই চালাতে থাকি। কিন্তু তাতেও আমার দ্বিধা থেকে যায়। কারণ 'যৌগিক' নামটা স্পষ্টার্থজ্ঞাপক নয়।

তাতে ব্যাখ্যার অপেক্ষা থেকে যায়। তাই আরও স্পষ্টার্থক নামের প্রয়োজন বোধ করি। অবশেষে **মিশ্র-কলাবৃত্ত** (সংক্ষেপে **মিশ্রবৃত্ত**) নাম মেনে নেবার ফলে এই সমস্যার নিরসন হয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিলেই মিশ্রবৃত্ত নামের সার্থকতা বোঝা যাবে।—

মাঝে মাঝে দীর্ঘ-শ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—হিং টিং ছট্।...
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিং টিং ছট্।

—সোনার তরী, হিং টিং ছট্

এই কবিতার অন্যান্য পঙ্ক্তির তুলনায় বোঝা যায়, এই তিন পঙ্‌ক্তিতেও ১৪টি করে কলামাত্রা। কিন্তু অক্ষর-সংখ্যার হিসাবে এই তিন পঙ্‌ক্তিতে ১৪ মাত্রা পাওয়া যাবে না। খণ্ড ৎ এবং অনুস্বারকে অক্ষর বলে মানা হবে কিনা এই সমস্যায় পড়তে হবে। বাধ্য হয়ে এই পঙ্‌ক্তিগুলির উচ্চারণপ্রকৃতির প্রতি মন দিতে হবে। একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে, এই তিন পঙ্‌ক্তিতে শব্দের অন্ত্য রুদ্ধদল উচ্চারিত হয় বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ দ্বিমাত্রক রূপে, শব্দের অপ্রান্ত রুদ্ধদল উচ্চারিত হয় সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ একমাত্রক রূপে, আর মুক্তদলের উচ্চারণ সর্বত্রই একমাত্রক। 'উৎকট' শব্দের উৎ একমাত্রক, কট্ দ্বিমাত্রক, মোট তিন মাত্রা। আর 'হঠাৎ' শব্দের হ একমাত্রক, ঠাৎ দ্বিমাত্রক, মোট তিন মাত্রা। তেমনি 'সংক্ষেপে' শব্দের সং এক মাত্রা, ক্ষেপে দুই মাত্রা, মোট তিন মাত্রা। কিন্তু হিং টিং, ছট্ এই তিনটিই দ্বিমাত্রক, মোট ছয় মাত্রা। অনুরূপ হিসাবে 'দীর্ঘ-শ্বাস' শব্দের দীর্ একমাত্রা, শ্বাস দুই মাত্রা আর ঘ এক মাত্রা, মোট চার মাত্রা। এ-ভাবে প্রত্যেক মুক্ত দলে ও শব্দের অপ্রান্ত্য সংশ্লিষ্ট রুদ্ধদলে এক মাত্রা এবং শব্দান্ত্য বিশ্লিষ্ট রুদ্ধদলে দুই মাত্রা ধরে হিসাব করে গেলে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতেই ১৪ মাত্রা পাওয়া যায়, অথচ অক্ষর-সংখ্যার হিসাবে পাওয়া যায় না। এইজন্যই এ-ছন্দকে 'অক্ষরবৃত্ত' না বলে '**মিশ্রবৃত্ত**' বলাই সংগত। এ-জাতীয় ছন্দে ধ্বনি-বিন্যাসপ্রণালীটাই যে মিশ্রপ্রকৃতির।

অণুযতি বা **দলযতি** *—মুক্তরুদ্ধ-নির্বিশেষে প্রত্যেক দলের অন্তে অবস্থিত ক্ষীণতম যতির নাম 'অণুযতি' বা 'দলযতি'। নির্দেশক চিহ্ন এক বিন্দু (.)। যেমন—র.বীন্.দ্র.নাথ্।

অতিপর্ব * (anacrusis)—কোনো ছন্দপঙ্‌ক্তির পূর্বে স্থাপিত প্রস্বরহীন। অথচ অর্থবহ দ্বিমাত্রক শব্দ। যেমন—

ওগো,   এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন, নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব   আজীবন কাল পাষাণকঠিন সরণে।
যদি   মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ, সুখ আছে সেই মরণে।

—মানসী, ভৈরবী গান

ওগো, যাব, যদি—এই তিনটি অর্থবহ দ্বিমাত্রক শব্দকে বলা হয় 'অতিপর্ব'। অতিপর্ব বাক্যের অর্থবোধের সহায়ক। অথচ এগুলির আদিতে কোনো প্রস্বর থাকে না। থাকে মূল ছন্দপঙ্‌ক্তির আদিতে। তাতে ধ্বনিপ্রবাহের ঢেউ ওঠে নীচের থেকে উপরের দিকে। ছন্দের এই **ঊর্ধ্বগ তরঙ্গলীলা** সৃষ্টিই অতিপর্ব প্রয়োগের আসল উদ্দেশ্য।

অতিপর্ব সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয় দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে। উপরের দৃষ্টান্তটি কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। দলবৃত্ত রীতির ছন্দে অতিপর্ব প্রয়োগের একটা দৃষ্টান্ত এই।—

আমি হব না ভাই নববঙ্গে নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননি-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হতে ব্রজের গোপবালক,
তবে চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।

—ক্ষণিকা, জন্মান্তর

মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে অতিপর্ব খুব কমই দেখা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে।

—সোনার তরী, হৃদয়যমুনা

যদি কোনো পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় উপযতির স্থলে ভাবগত বিরতি ঘটে তবে ওই পর্বের দ্বিতীয় বা তৃতীয় উপপর্বটি পরবর্তী অংশের অতিপর্ব রূপে কাজ করে। যেমন—

ভালোবেসে সখী,। নিভৃতে যতনে
আমার নামটি। লিখিয়ো—**তোমার** ॥ মনের মন্দি।-রে!
আমার পরানে। যে গান বাজিছে
তাহার তালটি। শিখিয়ো—**তোমার**॥ চরণমঞ্জরী।-রে।

—কল্পনা, যাচনা

হৃদয় আমার। নাচে রে আজিকে॥
ময়ুরের মতো। নাচেরে, **হৃদয়**। নাচে রে।. . .
আকুল পরাণে। আকাশে চাহিয়া ॥ উল্লাসে কারে। যাচে রে।
ওগো, নদীকূলে। তীরতৃণতলে॥
কে বসে অমল। বসনে, **শ্যামল**। বসনে?...
নব মালতীর। কচি দলগুলি॥ কাটে আনমনে। দশনে।

—ক্ষণিকা, নববর্ষা

ওগো প্রিয়তম, যদি। নাহি পারো ভালো। বাসিতে
তবু ভালোবাসা করো। মার্জনা, করো। মার্জনা।

—কল্পনা, মার্জনা

কালো? **তা সে** | যতই কালো। হোক,

দেখেছি তার। কালো হরিণ।-চোখ।

—ক্ষণিকা, কৃষ্ণকলি

মালা বটে। শুকিয়ে মরে, ॥ যে জন মালা পরে
সেও তো নয়। অমর, **তবে** ॥ দুঃখ কিসের। তরে?

—ক্ষণিকা, শেষ

আমি প্রভঞ্জনের। উচ্ছ্বাস, **আমি** ॥ বারিধির মহা।-কল্লোল...
আমি চপল মেয়ের। ভালোবাসা, **তার** ॥ কাঁকন চুড়ির। কন্‌কন্‌,
আমি চির-শিশু, চির।-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু। পল্লীবালার ॥ আঁচল কাঁচলি। নিচোর।

—নজরুল, অগ্নিবীণা, বিদ্রোহী

এ-রকম পর্বমধ্যস্থ অতিপর্বকে বলা যায় **আভ্যন্তর অতিপর্ব**। প্রথম দৃষ্টান্তে লিখিয়ো-শিখিয়ো মিল রেখে আবৃত্তি করলে এই শব্দের পরে স্বতঃই একটু বিরতি ঘটে। এজন্যই এই শব্দ-দুটির পরে একটু ফাঁক রাখা হয়েছে। ফলে এদের পরবর্তী দুটি ‘তোমার’ শব্দ অতিপর্ব-প্রকৃতি লাভ করে। বস্তুতঃ এসব পঙ্‌ক্তিকে দু-ভাগে বিভক্ত করে লিখলেই আভ্যন্তর অতিপর্বের স্বরূপ উপলব্ধি সহজ হয়। যেমন—

১। আমার নামটি লিখিয়ো
তোমার মনের মন্দিরে।

২। সেও তো নয় অমর,
তবে দুঃখ কিসের তরে?

এখানে বলা উচিত যে, ত্রিমাত্রক উপপর্ব খুব কমই দেখা যায়। বস্তুতঃ দুই মাত্রাতেই অতিপর্বপ্রকৃতি ফোটে ভাল। তিন মাত্রায় তার কিছু গুণহানি হয়।

পক্ষান্তরে পদের পূর্বে স্থাপিত কোনো-কোনো অতিপর্ব আপাততঃ সাধারণ অতিপর্ব বলে প্রতীয়মান হয়, অথচ সেগুলি আসলে আভ্যন্তর অতিপর্ব। যেমন—

যদি দেখি ঘনঘোর। মেঘোদয়, **দূর**। ঈশানের কোণে। আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী। জ্বালাময়, **তার**। উদ্যত ফণা। বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি। মিছা ভয়, **আমি**। করিব নীরবে। তরণ
সেই মহাবরষার। রাঙাজল, **ওগো**। মরণ, হে মোর। মরণ।

—উৎসর্গ-৫, ‘অত চুপিচুপি’

প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দ্বিতীয় পর্বে চার মাত্রার পরে একটা করে সুস্পষ্ট ভাবগত যতি আছে, প্রথম তিন পঙ্‌ক্তিতে সে যতি মিলগতও বটে। তাই এ যতির পরবর্তী উপপর্বগুলি পরবর্তী পদের অতিপর্ব রূপেও কাজ করছে। বস্তুতঃ মূল রচনায় প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিকে দুই ভাগ করে ‘দূর’ প্রভৃতি চারটি শব্দকে পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয়ার্ধের অতিপর্ব রূপেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু আবৃত্তিকালে এই অতিপর্বগুলি প্রতি পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্বের তৃতীয় উপপর্ব

রূপেও কাজ করে। এই দ্বিমুখী প্রকৃতিই অভ্যন্তর অতিপর্বের বিশিষ্টতা। চতুর্থ পঙ্‌ক্তির 'রাঙাজল' দোসরহীন, **নিঃসঙ্গ**।

ছন্দের পরিভাষায় পঙ্‌ক্তির পূর্ব ও মধ্য-স্থিত অতিপর্বকে যথাক্রমে বলা যায় **আদ্য** ও **আভ্যন্তর অতিপর্ব**। অনুরূপভাবে পর্বের মধ্যস্থিত মিলকে বলা যায় **আভ্যন্তর মিল**। যেমন, প্রথম দৃষ্টান্তের লিখিয়ো-শিখিয়ো এবং শেষ দৃষ্টান্তের দয়-ময়-ভয়।

অমিতাক্ষর ছন্দ (অমূল্যধন)—মধুসূদন-প্রবর্তিত যে নূতন পয়ারবন্ধ 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নামে সুপরিচিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে 'মূলসূত্র' গ্রন্থে (পৃ ৭১) বলা হয়েছে—"এই নূতন ধরনের ছন্দকে **অমিতাক্ষর** ও সাধারণ ছন্দকে মিতাক্ষর বলা যাইতে পারে।" এ সম্বন্ধে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, 'অক্ষর' শব্দকে যে অর্থেই গ্রহণ করা যায়, এই নূতন ছন্দকে কিছুতেই 'অমিত' বলা যায় না। প্রথমতঃ, অমিত্রাক্ষর পয়ারের প্রতি পঙ্‌ক্তির মোট ধ্বনিপরিমাণ সুপরিমিত—চোদ্দ (বা আঠার) মাত্রা। দ্বিতীয়তঃ, এই নূতন পয়ারেও লঘুযতি ও অর্ধযতির ধ্বনিবিভাগগুলিও সুপরিমিত থাকে—এক-এক বিভাগে চার মাত্রার পূর্ণপর্ব, ছয় মাত্রার সার্ধপর্ব, আট মাত্রার যুক্তপর্ব থাকে এবং অবস্থাবিশেষে দুই মাত্রার অর্ধপর্বও থাকতে পারে। মধুসূদন অবশ্য কখনও কখনও তিন, সাত প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যক মাত্রার বিভাগও ব্যবহার করতেন। কিন্তু যাতে দুই সন্নিহিত বিভাগের মোট মাত্রা জোড় সংখ্যক হয় সেদিকে তাঁর লক্ষ রাখতে হত। সুতরাং এই ছন্দকে 'অমিত' বলা সমীচীন নয় বলেই মনে করি।

যাহক, উক্ত মাত্রাবিভাগগুলির বিন্যাসপারম্পর্য বিষয়ে কবির ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা, তাঁকে শুধু লক্ষ রাখতে হত যাতে পঙ্‌ক্তির মোট মাত্রাসংখ্যা চোদ্দ ছাড়িয়ে না যায়। মাত্রাবিভাগ বিন্যাসের পূর্ণ স্বাধীনতা মানে লঘুযতি, অর্ধযতি এবং পূর্ণযতি স্থাপনেরও পূর্ণ স্বাধীনতা। ফলে অনেক সময় পূর্ণযতি পঙ্‌ক্তির অন্তে স্থাপিত না হয়ে পঙ্‌ক্তির মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আর এইসব যতিই হয় কবির ভাবানুসারী। সাধারণ পয়ার রচনায় কবির ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় ছন্দের যতিবিধান অনুসারে, আর এই নূতন পয়ারে ছন্দের লঘু, অর্ধ ও পূর্ণ-যতি স্থাপিত হয় কবির ভাবপ্রবাহের ক্ষীণ, মাঝারি ও পূর্ণ বিরতির অনুসারে। অর্থাৎ এই নূতন পয়ারে ছন্দের ছোট-বড় যতিবিভাগগুলি গঠিত হয় পদ্যের নিয়মে, কিন্তু সেগুলি বিন্যস্ত ও পঠিত হয় গদ্যের নিয়মে।

কিন্তু 'মূলসূত্রে' (পৃ ৭০) বলা হয়েছে—"মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ—এই ছন্দে অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগ পরস্পর মিলিয়া যায় না, অর্থাৎ যতি ছেদের অনুগামী হয় না।" আমাদের বিশ্বাস অন্য রকম—অমিত্রাক্ষর পয়ারে অর্থবিভাগই ছন্দোবিভাগ বলে স্বীকৃত হয়, আর 'ছেদ'ই (মানে ভাবযতিই) ছন্দোযতি বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ এই পয়ারে স্বতন্ত্র 'ছন্দোবিভাগ' ও স্বতন্ত্র 'যতি বিভাগ', এই দুয়ের কোনো অস্তিত্বই থাকে না। অমিত্রাক্ষর পয়ার প্রসঙ্গে 'অর্থবিভাগ' ও 'ছন্দোবিভাগ'-এর তথা 'যতি' ও 'ছেদ'-এর বিরোধ কল্পনা করে শুধু জটিলতা বাড়াবার দরকার কি? স্বয়ং মধুসূদনও এ-রকম চিন্তা পোষণ করতেন বলে মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, কবি হেমচন্দ্র 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ভূমিকায় এ ছন্দের যে বিশ্লেষণ করেছেন তার যথার্থ্য আজও অমলিন আছে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের দুটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে এক স্থানে ('ছন্দ', তৃতীয় সং, পৃ ২১৫-১৬) তিনি বলেছেন—

"পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পঙ্‌ক্তিসীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক-একটি পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ। সেই পঙ্‌ক্তিশেষে একটি করে বড়ো যতি।...পদ্যছন্দ যেখানে আপন ধ্বনিসংগতিকে অপেক্ষাকৃত বড়ো রকমের সমাপ্তি দেয়, অর্থনির্বিচারে সেইখানে পঙ্‌ক্তি শেষ করে। পদ্য সর্ব প্রথম এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে, পঙ্‌ক্তির বাইরে পদচারণা শুরু করলে।"—আর একস্থানে ('ছন্দ', পৃ ২৩০) আছে—

"মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাবে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গি পদ্যের মতো, কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।" —'ছন্দের পদক্ষেপ' মানে ছন্দের সুপরিমিত ধ্বনিবিভাগ (পর্ব ও পদ)। এগুলির 'ভঙ্গি' অর্থাৎ গঠন-প্রণালী পদ্যের মতো বটে, কিন্তু এগুলির 'ব্যবহার' অর্থাৎ বিন্যাস ও পঠন-প্রণালী গদ্যের মতো। এর চেয়ে সরল ও সুন্দর ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে?'

অমিত্রাক্ষর পয়ারের রবীন্দ্রকৃত এই ব্যাখ্যার সমর্থনে তাঁরই দেওয়া একটি দৃষ্টান্ত ('ছন্দ', তৃতীয় সং, পৃ ৬৩-৬৪) এই—

সম্মুখ সমরে পড়ি ॥ বীরচূড়ামণি। বীরবাহু
চলি যবে। গেলা যমপুরে ॥ অকালে,
কহ হে দেবি। অমৃতভাষিণী,—
কোন্ বীরবরে বরি ॥ সেনাপতিপদে॥
পাঠাইলা। রণে পুনঃ ॥ রক্ষঃকুলনিধি। রাঘবারি।

ছত্রবিভাগ রবীন্দ্রনাথের। যতচিহ্নগুলি বর্তমান লেখকের, প্রথম তিন ছত্রের অন্তে একটি করে অর্ধযতির চিহ্ন ঊহ্য আছে। প্রথম ছত্রে আট-দশ মাত্রার দুই পদ, দ্বিতীয় ছত্রে দশ-তিন মাত্রার দুই পদ (অপূর্ণ), তৃতীয় ছত্রে এগারো (পাঁচ-ছয়) মাত্রার একপদ (অপূর্ণ), আর চতুর্থ ছত্রে আট-ছয়-আট-দশ মাত্রার চার পদ। এই চার ছত্রে ভাষাগত একটি বাক্যের সমাপ্তি, আর নয়টি পদ নিয়ে গঠিত একটি ছন্দপঙ্‌ক্তির সমাপ্তি। এখানেই পূর্ণযতি, আর অন্য সর্বত্রই আছে লঘুযতি (পর্বযতি) কিংবা (পদযতি)।

দেখা যাচ্ছে অমিত্রাক্ষর পয়ার বন্ধের পরিচয়প্রসঙ্গে যতি ও ছেদ কিংবা ছন্দোবিভাগ ও অর্থবিভাগের পার্থক্য দেখাবার কোনো প্রয়োজনই নেই।

অমিত্রাক্ষর—মধুসূদন-প্রবর্তিত মিলহীন ও মুক্তগতি পয়ারবন্ধের প্রচলিত নাম 'অমিত্রাক্ষর'। তার আধুনিক পারিভাষিক নাম 'অমিল প্রবহমান পয়ার'। 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' মানে আসলে 'অমিত্রাক্ষর পয়ারবন্ধ'। অমিত্রাক্ষর নামটা বাচ্যার্থে স্বীকৃতিযোগ্য নয়। তবে রূঢ়ার্থে ব্যবহারযোগ্য বলেই মনে করি। ইংরেজি blank verse নামটাও রূঢ়ার্থেই মেনে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থবহ নাম হিসাবে 'অমিল-প্রবহমান পয়ার' কথাটা ব্যবহার করে থাকি। যে পয়ারবন্ধে পঙ্‌ক্তিপ্রান্ত্য পূর্ণযতি স্থাপন আবশ্যিক বলে মানা হয় না, অর্থাৎ যে

পয়ারবন্ধে ভাব ও ধ্বনির প্রবাহ পূর্ণযতির বাধা না মেনে এক পঙ্‌ক্তি থেকে আর-এক বা ততোধিক পঙ্‌ক্তিতে এগিয়ে চলে তাকেই বলি ">**প্রবহমান** (emjambed) পয়ার। এ প্রবহমান পয়ারে পঙ্‌ক্তিপ্রান্ত্য মিল থাকলে তাকে বলি 'সমিল প্রবহমান পয়ার', আর পঙ্‌ক্তিপ্রান্তের মিল না থাকলে বলি 'অমিল প্রবহমান পয়ার'। মনে রাখা দরকার অমিত্রাক্ষরতাই স্বনামখ্যাত অমিত্রাক্ষর পয়ারের আসল লক্ষণ নয়, তার আসল লক্ষণ প্রবহমানতা *(enjambement)* ।

'মিত্রাক্ষর' শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় বোধ করি শ্যামাচরণ শর্মা সরকার-এর 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' গ্রন্থে (১৮৫২)। তিনি বলেন—"বাঙ্গলায়...প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের বা পদের শেষবর্ণ পরস্পর একজাতীয় বা একরূপে মিলে এবং তদ্‌রূপ মিলবিশিষ্ট 'শেষবর্ণ'-কে মিত্রাক্ষর বলা যায়। **মিত্রাক্ষরহীন** পদ্য অদ্যাপি বাঙ্গলায় রচিত হয় নাই।" এই উক্তির কয়েক বৎসর পরেই 'মিত্রাক্ষরহীন' অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর পয়ার প্রথম দেখা গেল মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে (১৮৫৯ জুলাই)!

অর্ধযতি বা **পদযতি** *—ছন্দপঙ্‌ক্তির প্রধান বিভাগের অর্থাৎ পদের পরবর্তী ধ্বনিবিরতির পারিভাষিক নাম 'অর্ধযতি'। সংক্ষেপে বলা যায়, ছন্দের পদবিভাগ-সূচক ধ্বনিবিরতির নাম 'অর্ধযতি'। এইজন্য অর্ধযতিকে 'পদযতি' বলেও নির্দেশ করা যায়। নির্দেশক চিহ্ন দুই দণ্ড (॥)। যেমন—

সবাই বড়ো। হইলে তবে ॥ স্বদেশ বড়ো। হবে,
যে কাজে মোরা। লাগাব হাত ॥ সিদ্ধ হবে। তবে।

—মানসী, দেশের উন্নতি

মূলসূত্র গ্রন্থে (পৃ ৩) পূর্ণযতির চেয়ে ক্ষীণতর অন্য সবরকম যতিকেই বলা হয়েছে **অর্ধযতি**। এই গ্রন্থের মতে এই অর্ধযতিকেই 'উপযতি', 'হ্রস্বযতি' বা শুধু 'যতি' বলা যায়। 'অর্ধযতি' সংজ্ঞার এই ব্যাখ্যাই বাংলা ছন্দ যথাযথ বিশ্লেষণের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

অর্ধযমক *—দুটি ভিন্নার্থক শব্দের বা শব্দগুচ্ছের উচ্চারণগত পূর্ণ (বা প্রায়পূর্ণ) ধ্বনিসাম্যক বলা হয় **যমক**। পক্ষান্তরে, যদি দুটি শব্দ, শব্দাংশ বা শব্দগুচ্ছের ধ্বনিসাম্য থাকা সত্ত্বেও অর্থগত সাম্য না থাকে অথবা এক দিকে অর্থ ও অপর দিকে নিরর্থকতা থাকে তবে তাকে বলা যায় **অর্ধযমক**। যমক ও অর্ধযমকের দ্বারাও মিলের কাজ চালানো যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে যমক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত খুবই কম। অর্ধযমকের প্রয়োগই বেশি। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

জব্দিবে কে **শব্দীকে**,
শব্দ যে যায় **সব দিকে**
যতই আসুক দুঃসময়,
শব্দ যে যায় বিশ্বময়।...
স্তব্ধ করো শব্দীকে,
শব্দ যাবে সব দিকে।

—অন্নদাশঙ্কর, শব্দী

জব্দিবে-শব্দীকে, দুঃসময়-বিশ্বময় এ-দুটি অপূর্ণ মিল। স্তব্ধ-শব্দ আদ্যমিল। 'শব্দীকে -সব দিকে' পূর্ণ যমক।

দেখো না কি, হায়। বেলা চলে যায়, ॥ সারা হয়ে এল। দিন।
বাজে **পূরবীর**। ছন্দে **রবির** ॥ শেষ রাগিণীর। বীণ।

—পূরবী, লীলাসঙ্গিনী

প্রিয়নামটি। শিখিয়ে দিত ॥ সাধের শারি। -**কারে**,
নাচিয়ে দিত। ময়ূরটিরে ॥ কঙ্কণ-ঝং। -**কারে**।

—ক্ষণিকা, সেকাল

হায়-যায়, দিন-বীণ এ-দুটি পূর্ণ মিল। 'রবীর-রবির' এবং 'কারে-কারে' অর্ধযমক। দ্রষ্টব্য পরবর্তী '**উপযমক**' সংজ্ঞা।

আদ্য মিল—মিল থাকে সাধারণতঃ পঙ্ক্তির অন্তে। পদান্ত্য মিল অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। পর্বান্ত্য আরও বিরল। আবার পদ ও পর্বের আদিতে মিল স্থাপনের নিদর্শনও পাওয়া যায় কারও কারও রচনায়। দৃষ্টান্ত—

১। পদাদ্য মিল

নিশির না যায় রিষ্টি ॥ **শিশির** সতত বৃষ্টি,
ঋষির তাহাতে ভাঙে ধ্যান।

—ঈশ্বর গুপ্ত (ঋতুবর্ণন), শীত

চট করে মনে পড়ে ॥ **মট**কার কাছে
মালপোয়া আধখানা ॥ **কাল** থেকে আছে।

—সুকুমার রায়, আবোল তাবোল, হুলোর গান

২। পর্বাদ্য মিল

দুই পার্শ্বে। পরিজন, ॥ মধ্যে বুড়ো। বোসে
চিটে গুড়। **ছিটে** দিয়ে, ॥ **পিটে** খান। কোসে

—ঈশ্বর গুপ্ত, পৌষ পার্বণ

আমরা **ভুষি** পেলেই। **খুসি** হব, ॥ ঘুসি খেলে। বাঁচব না।

—ঈশ্বর গুপ্ত, নীলকর-১

এরা **বেদ** কোরানের। **ভেদ** মানে না, ॥ **খেদ** করে আর। কে বোঝাবে?

—ঈশ্বর গুপ্ত, দুর্ভিক্ষ

মক্ষিরানী। **পক্ষি**রাজ—
দস্যি ছেলে। **লক্ষ্মী আজ**।
আদিম কালের। **চাঁদিম** হিম,

তোড়ায় বাঁধা। **ঘোড়ার ডিম**।

—সুকুমার রায়, 'আবোল তাবোল', আবোল তাবোল

পদাদ্য ও পর্বাদ্য মিলের ধারাবাহিক প্রয়োগ দেখা যায় না। একমাত্র সুকুমার রায়ের 'হুলোর গান' রচনাটিতেই পদাদ্য মিলের ধারাবাহিক প্রয়োগ দেখেছি। 'তোড়ায়-ঘোড়ার' মিলে একটু ত্রুটি আছে।

আদ্যা রীতি (সত্যেন্দ্রনাথ)—পূর্বাগত অক্ষরগোনা ছন্দোরীতিকে কবি সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া নাম 'আদ্যা'। অর্থাৎ যে ছন্দোরীতিকে এখন বলি 'মিশ্রবৃত্ত', তাকেই তিনি বলেছেন 'আদ্যা'। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য পরবর্তী '**রীতি**' শব্দ।

উপপর্ব *, উপযতি *—সবরকম পর্বই আমাদের মুখে সাধারণতঃ দুই বা তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। পর্বের এ-রকম স্বাভাবিক উচ্চারণবিভাগের নাম 'উপপর্ব। প্রত্যেক উপপর্বের পরে স্বতঃই যে উচ্চারণবিরতি ঘটে তার নাম 'উপযতি'। উপযতির নির্দেশক চিহ্ন দ্বিবিন্দু দণ্ড (:)। যেমন—

নমো : নমো : নম। সুন্ : দরী : মম ॥ জননী : বঙ্গ।-ভূমি।
গঙ্ : গার : তীর। স্নিগ্ধ : সমীর ॥ জীবন : জুড়ালে। তুমি।

—চিত্রা, দুই বিঘা জমি

প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে আছে চারটি করে পর্ব—প্রথম তিনটি পূর্ণ, চতুর্থটি অপূর্ণ। এগুলির মধ্যে তিনটি পূর্ণপর্বে আছে দুটি করে উপপর্ব, বাকি তিনটি পূর্ণপর্বে আছে তিনটি করে। অপূর্ণ পর্ব-দুটিতে উপপর্ব আছে একটি করে।

সমুদ্র, বসন্ত, বিনষ্ট প্রভৃতি যেসব ত্রিদল শব্দের মধ্যে একটি রুদ্ধদল থাকে সেগুলিকে সংক্ষেপে বলা যায় মধ্যগুরু ত্রিদল শব্দ। কলাবৃত্ত রীতিতে এ-রকম মধ্যগুরু ত্রিদল শব্দে চার মাত্রা থাকে বটে। অবস্থাবিশেষ এ-রকম মধ্যগুরু চতুষ্কল শব্দ অখণ্ড রূপেই উচ্চারিত হয়, দুই উপপর্বে বিভক্ত হয় না। যেমন—

'প্রসন্ন' : মুখ। নাহি : কোনো : দুখ ॥ অতি : অকা : তর। চিত্ত।
ছাড়া :-লে না : ছাড়ে,। কী ক :-রিব : তারে ॥ মোর : পুরা :-তন। ভৃত্য।

—চিত্রা, পুরাতন ভৃত্য

'বিদীর্ণ' :-হিয়া। ফিরিয়া : ফিরিয়া ॥ চারি : দিকে : চেয়ে। দেখি—
প্রাচী :-রের : কাছে। এখ :-নো যে : আছে ॥ সেই : আম :-গাছ,! একি!

—চিত্রা, দুই বিঘা জমি

প্রসন্ন ও বিদীর্ণ, এই দুটি মধ্যগুরু চতুষ্কল শব্দ দুই দ্বিকল উপপর্বে বিভক্ত হয় নি।

এ-রকম মধ্যগুরু চতুষ্কল শব্দ যদি পর্বের শেষ ভাগে স্থাপিত হয় তবে তার প্রথম মুক্তদলটি পূর্ববর্তী উপপর্বভুক্ত হয়। যেমন—

রেল : গাড়ি : ধায়,। হেরি : লাম : হায় ॥ নামিয়া : বর্ধ। মানে
কৃষ্ণ : কান্ত। অতি 'প্র : শান্ত' ॥ তামাক : সাজিয়া। আনে।

—চিত্রা, পুরাতন ভৃত্য

এ জ : গতে : হায়,। সেই : বেশি : চায় ॥ আছে : যার : ভুরি। ভুরি,
রাজার : হস্ত। করে 'স : মস্ত' ॥ কাঙা : লের ধন। চুরি।

—চিত্রা, দুই বিঘা জমি

লক্ষণীয় এখানে 'প্রশান্ত' ও 'সমস্ত', এই দুটি মধ্যগুরু চতুষ্কল শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পর্বের আদিতে থাকলে এ দুই শব্দ অবিভাজ্য হত।

উপযমক *—যদি কোনো দুই শব্দের, শব্দাংশের বা শব্দগুচ্ছের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটি বাদে বাকি সব স্বর ও ব্যঞ্জন-ধ্বনির শ্রুতরূপ যথাক্রমে অভিন্ন বা প্রায়-অভিন্ন হয়, তবে ওই দুই শব্দের সমবায়কে বলা যায় 'উপযমক'। যেমন—মমতা-সমতা, অবলা-তবলা, রূপকার-উপকার, আহ্নিকে-খান নি কে। উপযমকের প্রচলিত নাম '**মিল**'। 'মিল' শব্দটা রূঢ়ার্থক, অর্থবহ পরিভাষা নয়। 'মিল'-এর পারিভাষিক নাম '**উপমক**'। উপযমক শব্দটা অর্থবহ। যেমন প্রায়-দ্বীপকে বলা হয় 'উপদ্বীপ', তেমনি প্রায়-যমককে বলা যায় 'উপযমক'। প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটির ভিন্নতার দ্বারাই যমক-উপমকের পার্থক্য সূচিত হয়।

একপদী—যে ছন্দপঙ্ক্তিতে কোনো অর্ধযতি থাকে না তাকে বলা হয় 'একপদী'। একপদী পঙ্ক্তি সাধারণতঃ একটি বা দুটি লঘুযতির দ্বারা যথাক্রমে দুই বা তিন পর্বে বিভক্ত হয়ে থাকে। লঘু যতিহীন ক্ষুদ্রায়তন পঙ্ক্তি খুবই কমই দেখা যায়। পূর্বোক্ত '**অর্ধযমক**' প্রসঙ্গে উদ্ধৃত প্রথম দৃষ্টান্তটি এবং '**আদ্যমিল**' প্রসঙ্গে উদ্ধৃত শেষ দৃষ্টান্তটি একপদী। এ-দুটির প্রতি পঙ্ক্তিতে আছে একটি করে লঘুযতির দ্বারা বিভক্ত দুই পর্ব। অর্ধযতি নেই কোনো পঙ্ক্তিতেই। দ্রষ্টব্য পরবর্তী '**পদ**' সংজ্ঞা।

কলা *—একটি হ্রস্ব স্বর বা হ্রস্বস্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সমপরিমাণ ধ্বনিকে ছন্দ-পরিভাষায় বলা হয় 'কলা' (mora)। ভাষান্তরে বলা যায়, একটি অপ্রসারিত (মুক্ত বা রুদ্ধ) দলের সমপরিমাণ ধ্বনির পারিভাষিক নাম 'কলা'। যেমন—

বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

—মধুসূদন, মেঘনাদবধ, নবম সর্গ

এর প্রত্যেক পঙ্ক্তিতেই আছে চোদ্দ দল—এগুলির তিনটি দল (সর্, সপ্, লঙ্) রুদ্ধ, বাকি সব দল মুক্ত। রুদ্ধমুক্ত-নির্বিশেষে এই সবগুলি দলই উচ্চারিত হয় হ্রস্ব রূপে। সুতরাং বলা যায়, এর প্রতি পঙ্ক্তিতেই আছে চোদ্দ কলা

কোনো দল (মুক্ত বা রুদ্ধ) যদি দীর্ঘ অর্থাৎ প্রসারিত রূপে উচ্চারিত হয় তবে তার ধ্বনিপরিমাণ হয় দুই কলার সমান। যেমন—

সুন্দর বটে। তব অঙ্গদ। খানি
তারায় তারায়।-খচিত,
খড়্গ তোমার,। হে দেব বজ্র।-পাণি,
চরম শোভায়। রচিত।

—গীতিমাল্য—৩০, 'সুন্দর বটে'

এই দৃষ্টান্তের মুক্ত ও রুদ্ধ দলগুলি উচ্চারিত হয় যথাক্রমে হ্রস্ব (একমাত্রক) ও দীর্ঘ (দ্বিমাত্রক) রূপে। এই হিসাবে এর প্রত্যেক পূর্ণ পর্বে পাওয়া যাবে ছয় কলা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দের মাত্রা' (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রবন্ধে 'কলা' শব্দ কখনও ব্যবহার করেছেন 'পর্ব' অর্থে, কখনও করেছেন 'উপপর্ব' অর্থে।

কলাবৃত্ত রীতি *—যে রীতিতে বাংলা ছন্দের ধ্বনি পরিমিত হয় কলাসংখ্যার হিসাবে তাকে বলা হয় 'কলাবৃত্ত'। ভাষান্তরে বলা যায়, যে ছন্দোরীতিতে কলাই ছন্দের মাত্রা বলে গণ্য হয় (অর্থাৎ এক কলাকেই এক মাত্রা বলে গণ্য করা হয়) তার নাম 'কলাবৃত্ত'। কলাসংখ্যাত, কলামাত্রক ও কলাবৃত্ত, এই তিন নাম অভিন্নার্থক। উপরের 'সুন্দর বটে' ইত্যাদি দৃষ্টান্তটি কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত।

কলার সংখ্যা অনুসারে কোনো দল, শব্দ, পর্ব প্রভৃতিকে এককল, দ্বিকল, ত্রিকল, চতুষ্কল ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন, উল্লিখিত শেষ দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণপর্বে আছে ছয় কলা। তাই এই ছন্দকে বলা যায় ষট্‌কল পর্বের ছন্দ।

কলামাত্রা *—কলাসংখ্যাত ছন্দের মাত্রাকেই বলা যায় 'কলামাত্রা'। অর্থাৎ যে প্রকার মাত্রার সংখ্যা অনুসারে কলাবৃত্ত রীতিতে রচিত ছন্দের ধ্বনি পরিমিত হয় তাকেই বলা যায় 'কলামাত্রা'। যেমন—

আছে আছে প্রেম। ধুলায় ধুলায় ॥ আনন্দ আছে। নিখিলে,
মিথ্যায় ঘেরে। ছোট কণাটিরে ॥ তুচ্ছ করিয়া। দেখিলে।

—উৎসর্গ-১৪, 'সব ঠাই মোর ঘর আছে'

এর প্রতি পূর্ণপর্বে আছে ছয় কলামাত্রা, আর সমগ্র পঙ্‌ক্তিতে আছে একুশ কলামাত্রা।

খণ্ডবর্ণ *—স্বতন্ত্রভাবে অনুচ্চার্য ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণকে বলা যায় 'খণ্ডবর্ণ' (sound particle, phoneme) যেমন—'মহৎ' ও 'বণিক্' শব্দের অন্তে আছে যথাক্রমে একটি 'খণ্ড ত্' ও একটি 'খণ্ড ক্'। বস্তুতঃ অ-স্বরান্ত সব ব্যঞ্জনবর্ণই মূলতঃ খণ্ডবর্ণ। অনুস্বার এবং বিসর্গও খণ্ডবর্ণ বলে স্বীকার্য। বাংলা মেঘ, আকাশ প্রভৃতি শব্দের শেষ বর্ণ এবং পাগলা, হালকা প্রভৃতি শব্দে মধ্যবর্ণও খণ্ডবর্ণ রূপেই উচ্চারিত হয়।

স্বরবর্ণ স্বরূপতঃ স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণযোগ্য। কিন্তু বাংলায় ই উ এ ও, এই চারটি স্বরবর্ণ অবস্থা বিশেষে পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না। যেমন—ছাই্, ঢেউ্, খা্এ (খায়), দাও্। এ-রকম অপূর্ণোচ্চারিত স্বরবর্ণকে বলা যায় **খণ্ডস্বর** (vowel particle)। ঐ, ঔ (উচ্চারণরূপে অই্, অ্উ) এ-দুটি বর্ণ আসলে একটি করে পূর্ণস্বর ও একটি করে খণ্ডস্বরের যুক্তরূপ। খণ্ডস্বরও খণ্ডবর্ণের প্রকারভেদ মাত্র। স্বরব্যঞ্জন-নির্বিশেষে খণ্ডবর্ণের নির্দেশক চিহ্ন (্) এই নিম্নগ তির্যক্ রেখা।

খণ্ডস্বরকে 'অর্ধস্বর' বা 'semi-vowel' বলা অনুচিত। যে বর্ণধ্বনি একাধারে আধা-স্বর ও আধা-ব্যঞ্জন, তাকে ইংরেজিতে বলা হয় semi-vowel ('অর্ধস্বর'), আর ভারতীয় ভাষায় বলা হয় 'অন্তঃস্থ' (intermediate) বর্ণ। এর দৃষ্টান্ত—ইংরেজি y, w এবং ভারতীয় য্ র্ ল্ ব্ (v বা w)। খণ্ডস্বরের ধারণাটাই নূতন। সংস্কৃত ভাষাচিন্তায় ছিল না, ইংরেজি চিন্তায়ও নেই।

গুরু-লঘু—সংস্কৃত ও প্রাকৃত পরিভাষায় একমাত্রক দলকে হ্রস্ব এবং দ্বিমাত্রক দলকে দীর্ঘ বলা হয়। ‘একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে’—শ্রুতবোধ। আবার এই দু-রকম দলকে যথাক্রমে লঘু ও গুরু বলেও বর্ণনা করা হয়। আভিধানিক অর্থে হ্রস্ব-দীর্ঘ শব্দের দ্বারা সূচিত হয় দলের উচ্চারণগত প্রসার বা ব্যাপ্তি, আর লঘু-গুরু শব্দের দ্বারা সূচিত হয় বস্তুর ভার বা ওজনগত তারতম্য। কিন্তু প্রাচীন ছন্দপরিভাষায় হ্রস্ব ও লঘু এবং দীর্ঘ ও গুরু অভিন্নার্থক বলে স্বীকৃত হয় রূপকার্থে। বাংলায় লঘু ও গুরু শব্দের দ্বারা প্রয়োজনমতো পর্বের বা শব্দের ধ্বনিগত ঘনতার তারতম্য বোঝানো যেতে পারে। যেমন—বন্দনা, হেমন্ত, ও কালিদাস শব্দকে যথাক্রমে আদিগুরু, মধ্যগুরু ও অন্ত্যগুরু বলে বর্ণনা করা যায়। তেমনি অহংকার আদি লঘু, আক্রমণ মধ্যলঘু, সন্দিগ্ধ অন্ত্যলঘু, সর্বাঙ্গীণ ত্রিগুরু, কবিতা ত্রিলঘু ইত্যাদি।

গৌড়ী গায়ত্রী (সত্যেন্দ্রনাথ)—একটি বৈদিক ছন্দের নাম ‘গায়ত্রী’। এই ছন্দে থাকে তিন ‘পদ’ (অর্থাৎ পঙ্‌ক্তি)। প্রতি পদে আট দল। যেমন—

তৎ সবিতু র্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহী
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

এই বৈদিক মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দে রচিত। এটির প্রত্যেক পদে আট দল। প্রথম পদের ‘বরেণ্যং’ শব্দটি উচ্চারিত হয় ‘বরেণ্ ইতম্’ রূপে। নতুবা এই পদে আটদল পাওয়া যাবে না। এই ছন্দে আট দলের লঘুগুরু ভেদে বিন্যাসক্রম সম্পর্কে কোনো বিধিনিষেধ নেই। তবু দেখা যায় এই মন্ত্রটিতে প্রতি পদের শেষ চার দল লঘুগুরু-লঘুগুরু ক্রমে সাজানো আছে। প্রথম চার দল কোনো নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানো নয়। এই ছন্দের সত্যেন্দ্র-রচিত বাংলা প্রতিরূপের একটি দৃষ্টান্ত এই।—

সূর্য মহান্ তাহার অধিক
সত্য মহান্, মহান্ বিবেক,
আদিম এ সাম, প্রধান এ ঋক্।

—ছন্দ-সরস্বতী, চতুর্থ প্রকাশ

বৈদিক গায়ত্রী ছন্দে পঙ্‌ক্তি প্রান্তে মিল থাকে না। তার বাংলা প্রতিরূপে কিন্তু মিল রাখা হয়েছে বাঙালির শ্রুতিরুচির দাবিতে। যা হক, বৈদিক গায়ত্রী ছন্দের প্রতিরূপ রচনা না করে স্বাধীনভাবে রচিত অনুরূপ ছন্দকে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন ‘গৌড়ী গায়ত্রী’, অর্থাৎ বাংলা গায়ত্রী। যেমন—

প্রাণের কাঙাল্ মানের নহ,
মান ঠেলে পায় কুলির সহ
অসম্মানের ভাগ লহ। জয়, জয়।
তোমায় দেখে প্রাণ উথলে।
হাসি-উজল চোখের জলে
অফুট বোলে দেশ বলে—‘জয়, জয়’।

—বেলাশেষের গান, শ্রদ্ধাহোম

এ ছন্দ বৈদিক গায়ত্রী ছন্দের অনুরূপ বটে, কিন্তু প্রতিরূপ নয়। লক্ষণীয়, এর তৃতীয় পদে এক দলমাত্রা কম আছে। শেষের 'জয়, জয়' ধুয়াটুকু ছন্দের অঙ্গ বলে গণ্য নয়।

ঘাতপ্রস্বর *—শব্দের বা পর্বের প্রথম দলের উপরে স্থাপিত উচ্চারণগত ঝোঁক (stress accent)। যেমন—

আমি শুনে হাসি। আঁখিজলে ভাসি, ॥ এই ছিল মোর। ঘটে,
তুমি মহারাজ। সাধু হলে আজ, ॥ আমি আজ চোর। বটে।

—চিত্রা, দুই বিঘা জমি

একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে, এর প্রত্যেক (পূর্ণ বা অপূর্ণ) পর্বের প্রথম দলের উপরে একটি সুস্পষ্ট ঝোঁক (ঘাতপ্রস্বর) পড়ে। পর্বের প্রথমে যদি রুদ্ধদল থাকে তবে ওই ঝোঁকটি স্পষ্টতর (অর্থাৎ প্রবলতর) হয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দূরে দেবালয়তলে। উষার রাগিণী ॥ বাঁশিতে উঠিছে। বাজি
এই নির্মলবায়। শান্ত উষার ॥ জাহ্নবীতীরে। আজি।

—চিত্রা, রাত্রে ও প্রভাতে

প্রথম পঙ্‌ক্তির তুলনায় দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম তিনটি পর্বাদ্য প্রস্বর যে প্রবলতর তা সকলের কানেই ধরা পড়বে।

চরণ (অমূল্যধন)—ছন্দোগত পূর্ণযতির বিভাগকে অমূল্যধন বলেছেন 'চরণ'। চরণ, পদ ও পাদ শব্দ অভিন্নার্থক। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রেও ছন্দোবন্ধের বৃহত্তম বিভাগকে (অর্থাৎ পূর্ণযতির বিভাগকে) পদ, পাদ বা চরণ নামে অভিহিত করা হয়। এই তিন নামের মধ্যে 'চরণ' নামের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু বাংলায় 'পদ' মানে ছন্দোবদ্ধ রচনার অর্ধযতি-বিভাগ, পূর্ণযতি-বিভাগ নয়। ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি নামেই বাংলায় 'পদ' নামের পারিভাষিক অর্থ বোঝা যায়। এই অর্থে 'চরণ' শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম হলেও দুর্লভ নয়। লালমোহন বিদ্যানিধি (১৮৪৫-১৯১৬) প্রণীত 'কাব্যনির্ণয়' (২য় সং, ১৮৬৪) গ্রন্থের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।—

১। "এক-একটি কবিতায় যত **পদ** অর্থাৎ **চরণ** (প্রধান বিভাগ) থাকে, তাহা ধরিয়া বঙ্গভাষার ছন্দ গণনা করা হয়। যথা—ত্রিপদী, চৌপদী, বিষমপদী ইত্যাদি। এই নিয়মানুসারে **পয়ারকে দ্বিপদী** বলা যাইতে পারে।"

২। "এই [ত্রিপদী] ছন্দের প্রথমার্ধে তিন **চরণ** ও দ্বিতীয়ার্ধে তিন **চরণ** থাকে।"

৩। কাব্যনির্ণয়ের মতে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে (যেমন 'চতুর্দশপদী' কবিতায়)—"পদ শব্দের প্রকৃত অর্থ বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে যাহাকে পদ বলিয়া আসা যাইতেছে তাহা থাকিতেছে না।...এক-এক **পঙ্‌ক্তির** নাম এক-এক পদ দাঁড়াইয়াছে। **এই ভ্রমটি সংশোধন করা অতীব কর্তব্য**।"

এসব উক্তির তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য। আশ্চর্যের বিষয় ছন্দের 'পঙ্‌ক্তি'-কে 'চরণ' বা 'পদ' বলার ভ্রমটি এখনও সংশোধিত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ছন্দোগুরু মধুসূদন বাচস্পতির একটি উক্তিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর ‘ছন্দোমালা’ (১৮৬৮) গ্রন্থের ‘মুখবন্ধে’ (পৃ ১) বলা হয়েছে ‘পদ’ মানে ‘কবিতার চরণ’। আর অন্যত্র (পৃ ৬) বলা হয়েছে—

“পদ শব্দে পাদ, কভু পদ্যাংশ বুঝায়।
ত্রিপদী প্রভৃতি নাম তাই বলা যায়।”

দেখা যাচ্ছে ‘পদ’ মানে চরণ বা পাদ। অর্থাৎ পদ, পাদ ও চরণ সমার্থক শব্দ। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে এই তিন শব্দের দ্বারাই বোঝায় ছন্দোবন্ধের পূর্ণযতি-বিভাগ। কিন্তু বাংলা ছন্দচিন্তায় এই তিন শব্দের অর্থান্তর ঘটেছে। বাংলা ছন্দ-পরিভাষায় ‘পদ’ মানে ছন্দপঙ্‌ক্তির অর্ধযতি-বিভাগ। যদি তা না মানা হয় তবে বাংলা ছন্দশাস্ত্র থেকে ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি সিদ্ধার্থক নামকেই বাদ দিতে হয়। তা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। ফলে ছন্দের পূর্ণযতি-বিভাগকে পদ বা চরণ বলা অনুচিত।

চিত্রা রীতি (সত্যেন্দ্রনাথ)—লোক সাহিত্যে প্রচলিত এবং চলতি ভাষায় রচিত ছন্দোরীতিকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন ‘চিত্রা’। অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষায় যে ছন্দোরীতিকে বলা হয় ‘দলবৃত্ত’, তাকেই তিনি আখ্যাত করেছেন ‘চিত্রা’ নামে।—দ্রষ্টব্য পরবর্তী ‘**রীতি**’ শব্দ।

চৌপদী—যে ছন্দপঙ্‌ক্তি তিনটি অর্ধযতির দ্বারা চার ভাগে বিভক্ত তাকে বলা হয় ‘চৌপদী’। দ্রষ্টব্য পরবর্তী ‘**পদ**’ সংজ্ঞা।

ছত্র—লিখিত বা মুদ্রিত লিপির সারিকে বলি ‘ছত্র’। এই শব্দটি অপারিভাষিক অর্থাৎ প্রচলিত সাধারণ অর্থেই ব্যবহার্য। যেমন, এক-একটি ছন্দপঙ্‌ক্তিকে ভেঙ্গে প্রয়োজনমতো দুই বা ততোধিক ‘ছত্রে’ সাজানো যায়। —দ্রষ্টব্য পরবর্তী ‘পঙ্‌ক্তি’ সংজ্ঞা।

ছন্দ—প্রসঙ্গভেদে ‘ছন্দ’ কথার অর্থ বিভিন্নপ্রকার। এর একটি সাধারণ অর্থ হচ্ছে গড়ন বা ভঙ্গি। যেমন —মুখের ছন্দ, চলার ছন্দ। স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের ‘লোকটি কে ইনি, যেন চিনি চিনি, বাঙালি মুখের ছন্দ’ (কল্পনা, উন্নতিলক্ষণ) এবং ভারতচন্দ্রের ‘পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে’ (অন্নদামঙ্গল, রতিবিলাপ)। বাংলা ছন্দশাস্ত্রে ছন্দ শব্দটি প্রসঙ্গভেদে অন্ততঃ তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।—

১। পদ্যরচনার প্রণালী। যেমন—সংস্কৃত, প্রাকৃত বা বাংলা ছন্দ। ছন্দ-রচনার কোনো বিশেষ ‘রীতি’কেও অনেক সময় ‘ছন্দ’ বলা হয়। যেমন, দলবৃত্ত ‘রীতি’ না বলে বলি দলবৃত্ত ‘ছন্দ’। এ-রকম প্রয়োগ দোষাবহ নয়। কেননা, ‘দলবৃত্ত ছন্দ’ বললেই বোঝায় ‘দলবৃত্ত রীতির ছন্দ’।

২। কোনো ঘটনা বা ক্রিয়ার নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পুনরাবৃত্তি। যেমন—হৃৎপিণ্ডের ছন্দ ; ঘড়ির দোলকের ছন্দ ; “সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিদ্রা ও জাগরণের...নামা-উঠার ছন্দ নিয়তই চলিতেছে”। অথবা—

“দেখিতে পাইবে ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল।” —সোনর তরী, পুরস্কার

ওঠা-নামা প্রভৃতি এ-রকম সুনির্দিষ্ট পুনরাবৃত্ত ক্রিয়াকে ইংরেজিতে বলা হয় rhythm এই রিদ্‌ম্‌ই ছন্দের প্রাণ। গুরুলঘু বা প্রস্তরিত-অপ্রস্বরিত ভেদে ধ্বনির পুনরাবর্তন না ঘটলে কোনো ছন্দই অনুভূত হয় না। সত্যেন্দ্রনাথ রিদ্‌ম্‌ কথাটার বাংলা করেছিলেন 'ছন্দস্পন্দ'। ছন্দের আলোচনায় শুধু **স্পন্দ** বলাই যথেষ্ট মনে করি। তাতে শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করার সুবিধা হয়। যেমন—তূণকীয় স্পন্দ (trochaic rhythm). Rhythmic prose-কে বাংলা বলা যায় 'স্পন্দমান গদ্য'।

অনেক সময় ছন্দ শব্দ এই স্পন্দ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—চতুর্মাত্রক 'ছন্দ' মানে চার মাত্রার পুনরাবর্তনজাত রিদ্‌ম্‌ বা 'স্পন্দ'-ক্রমের পর্বধারা। অথবা ইংরেজি আয়াম্‌বিক ছন্দ মানে একটি গুরু ও একটি লঘু এই 'স্পন্দ'-ক্রমের দ্বিদলপর্ব-ধারা।

৩। পদ্যরচনার বহিরাকৃতি বা রূপ। যেমন—পয়ার, ত্রিপদী, অমিত্রাক্ষর, মুক্তক। পদ্যরচনার বহিরাকৃতি বা রূপের বিশেষ নাম 'ছন্দোবন্ধ' বা শুধু 'বন্ধ'। কোনো বিশেষ ছন্দোবন্ধকেও আমরা বলি ছন্দ। যেমন—পয়ার 'বন্ধ', ত্রিপদী 'বন্ধ' না বলে আমরা অনেক সময় বলি পয়ার 'ছন্দ', ত্রিপদী 'ছন্দ'।

বস্তুতঃ ব্যাপকর্থে ছন্দ বলতে পদারচর রীতি, বন্ধ ও স্পন্দ এই তিনের সমষ্টিকেই বোঝায়। এটাই তার আসল অর্থ। তাই ছন্দশাস্ত্র এই তিনের পরিচয় দিতে হয়। কিন্তু শিথিল প্রয়োগে ছন্দ বলতে ওই তিনের যে-কোনো একটি বোঝায়। তাই ব্যাপকার্থক ছন্দ শব্দটিকে অনির্দিষ্টার্থে প্রয়োগ না করে তার স্থলে বিশেষার্থবোধক রীতি, বন্ধ বা স্পদ শব্দ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে অনেক ভ্রান্তি এড়ানো যায়। যেমন—দলবৃত্ত ছন্দ, ত্রিপদী ছন্দ না বলে দলবৃত্ত রীতি, ত্রিপদী বন্ধ বললে ভুল বোঝার আশঙ্কা থাকে না।

ছন্দসন্ধি * (metrical liaison*)—ছন্দের মাত্রাসমতা রক্ষার প্রয়োজনে অনেক সময় দুটি সন্নিহিত বর্ণ (স্বর বা ব্যঞ্জন) আমাদের উচ্চারণে পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ ধারণ করে। দুটি বর্ণধ্বনির এরূপ সংযোগকে বলা যায় 'ছন্দসন্ধি'। দৃষ্টান্ত—

১। 'হিংসায় উন্‌'।-মত্ত পৃথ্বি, ॥ নিত্য নিঠুর। দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল। পন্থ তার, ॥ লোভ-জটিল। বন্ধ।

—পরিশেষ (সংযোজন), বুদ্ধজন্মোৎসব

এই দৃষ্টান্তে দীর্ঘস্বর ও রুদ্ধদল সংস্কৃত নিয়মে দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চার্য। সব অকারান্ত শব্দ অকারান্ত রূপেই উচ্চার্য। ছন্দসন্ধিতে হিংসায়+উন্‌=হিংসায়ুন্‌। এ (য়্‌)+উ=য়ু (yu)।

২। এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপস নিশ্বাস-বায়ে
মুমূর্ষুরে 'দাও উড়ায়ে',
রৎসরের আবর্জনা
দূর হয়ে যাক।

—নটরাজ (ঋতুরঙ্গশালা), বৈশাখ-আবাহন

ছন্দসন্ধিতে—দাও+উড়ায়ে=দায়ুড়ায়ে। ও+উ=য়ু (wu)। বাংলায় অন্তঃস্থ ব (wa)-এর স্বতন্ত্র লিপিরূপ নেই। তাই wu -কে এখানে য়ু-রূপেই দেখানো হল।

৩। বড়ো হলে। নেব তার

পদখানি দেবতার,

দাদা নাম। বলতেই

আঁখি হবে। সিক্ত।

ভাইটি অ : মূল্য-

নাই তার। তুল্য,-

সংসারে। বোনটি-

'নেহাত অতি'।-রিক্ত।

—প্রহাসিনী, ভাই-দ্বিতীয়া

প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী। তৃতীয় পঙ্‌ক্তি চৌপদী। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম তিন পদের অন্তে এক কলামাত্রার ফাঁক আছে। ফলে এই তিন পদের অন্তিম দলটি উচ্চারিত হয় দ্বিমাত্রক রূপে! ছন্দসন্ধি—নেহাত+অতি=নেহাততি। ত্‌+অ=ত।

৪। সেই কথা মোর। ছিল নাক মনে, ॥ থাকে না 'বোধ হয়'। কারো।

ভুলেছিনু, আমি। মানুষ যে শুধু, ॥ ভেবেছিনু, বড়ো। আরো।

—মোহিতলাল, স্বপন-পসারী, নাদির শাহের শেষ

ছন্দসন্ধিতে—বোধ+হয়=বোধহয়। ধ্‌+হ = ধ।

৫। লেখাপড়া শেখা। হল না আমার ॥ অর্ধ 'লাজ আর'। অর্ধ ভয়ে,

তাই তো রয়েছি। সভ্য সমাজে ॥ মস্ত একটি! 'গর্দভ হয়ে'।

—লেখক

ছন্দসন্ধিতে— লাজ+আর=লাজার (জ্‌+আ = জা) এবং গর্দভ+হয়= গর্দভয়ে (ভ্‌+হ =ভ)। সাধারণ উচ্চারণে 'গর্ধভয়ে'।

'ছন্দসন্ধি' (metrical liaison)' কথাটা প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল বর্তমান লেখকের 'ছন্দসংকট' প্রবন্ধে (১৯৩২।১৩৩৯ ভাদ্র)। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—এই লেখকের—(১) 'ছন্দজিজ্ঞাসা' গ্রন্থ (১৯৭৪), পৃ ৩১১; (২) 'ছন্দপরিক্রমা' (দ্বিতীয়, ১৯৭৭), পঞ্চম অধ্যায়, পৃ ৭০-৮১ এবং (৩) 'আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য' (১৯৮০), পৃ ৮৬, ১০২-০৩। অমূল্যধনের 'মূলসূত্র' গ্রন্থেও (সপ্তম সং ১৯৮৩, পৃ ৪৭) '**ছন্দঃসন্ধি**' সংজ্ঞার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা আছে।

ছেদ (অমূল্যধন)—যতির নামান্তর 'ছেদ'। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে যতি ও ছেদ অভিন্নার্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই বলা হয়েছে।

যতির্জিহ্বেষ্ট-বিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।

সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া॥

—ছন্দোমঞ্জুরী, ১।১৯

অর্থাৎ, জিহ্বার অভীষ্ট বিশ্রামস্থানকে (মানে জিহ্বা স্বতঃই যেখানে থামে সেই স্থানকে) কবিরা বলেন 'যতি'। যতিকে নিজের ইচ্ছামতো বিচ্ছেদ বিরাম প্রভৃতি আখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অমূল্যধন ধ্বনিপ্রবাহের ছন্দোগত বিরামকে বলেন 'যতি', আর বাক্যার্থগত বিরামকে বলেন, 'বিচ্ছেদযতি' বা শুধু **ছেদ** (breathpause)। তার একটু পরেই আবার বলেছেন (মূলসূত্র[১], পৃ ২৫) "ছেদ বা বিচ্ছেদ-যতিকে 'ভাব-যতি' (sense-pause)-ও বালা যাইতে পারে।" এ প্রসঙ্গে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে—(১) 'বিচ্ছেদ-যতি' শব্দটা 'কালা-বধির' বা 'পঙ্গু-খোঁড়া' শব্দের মতোই অব্যবহার্য এবং (২) 'ভাবযতি' বললেই যখন কাজ চলে তখন 'যতি' ও 'ছেদ' এই দুই সমার্থক শব্দের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার প্রয়োজন কি?—এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য পরবর্তী '**যতি**' সংজ্ঞা।

তানপ্রধান ছন্দ (অমূল্যধন)—'বাংলা কাব্যে যেটি সনাতন ও সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত রীতি' (মূলসূত্র, পৃ ১৯), তাকেই অমূল্যধন বলেছেন 'তানপ্রধান ছন্দ'। অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'আদ্যা', আর আমরা বলি 'মিশ্রবৃত্ত', অমূল্যধনের পরিভাষায় তারই নাম 'তানপ্রধান'।—এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য পরবর্তী 'রীতি' শব্দ।

তাল—ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গির প্রচলিত নাম 'তাল'। ছন্দশাস্ত্রের পরিভাষায় এই তালকেই বলা হয় '**স্পন্দ**' (rhythm)—দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী 'ছন্দ' সংজ্ঞা।

ত্রিপদী—যে ছন্দপঙ্‌ক্তি দুটি অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে অর্থাৎ পদে বিভক্ত তাকে বলা হয় 'ত্রিপদী'। দীর্ঘকালের প্রচলিত প্রথা অনুসারে ছয়-ছয়-আট মাত্রার ছন্দোবন্ধ পরিচিত হয়েছে **লঘু ত্রিপদী** নামে, আর আট-আট-দশ মাত্রার ছন্দোবন্ধ পরিচিত হয়েছে **দীর্ঘ ত্রিপদী** নামে। যেমন—

নমো নমো নম। সুন্দরী মম ॥ জননী বঙ্গ।-ভূমি,
গঙ্গার তীর। স্নিগ্ধ সমীর ॥ জীবন জুড়ালে। তুমি।

—চিত্র, দুই বিঘা জমি

এই ছন্দোবন্ধই পরিচিত ছিল 'লঘু ত্রিপদী' নামে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এটা আসলে দ্বিপদী, ত্রিপদী নয়। এর প্রতি পঙ্‌ক্তি একটি অর্ধযতির দ্বারা দুই পদে বিভক্ত। তাই একে দ্বিপদী বলাই উচিত। প্রতি পদ একটি লঘুযতির দ্বারা দুই পর্বে বিভক্ত। প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে ছয় কলামাত্রা। প্রথম দুই 'পর্বে' মিল, দুই 'পদে' নয়। এই ছন্দোবন্ধ যে আসলে দ্বিপদী, তা অন্যভাবেও দেখানো যায়।—

তুরঙ্গ সম। অন্ধ নিয়তি
বন্ধন করি। তায়,
রশ্মি পাকড়ি। আপনার করে
বিঘ্নবিপদ্। লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে। ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘট।-নায়।

—মানসী, গুরুগোবিন্দ

এর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটা (রশ্মি...ঘটনায়) যে চৌপদী তাতে সন্দেহ নেই। এর প্রথম তিন পদের অন্তে অর্ধযতির চিহ্ন (।।) উহ্য রাখা হয়েছে। প্রতি পূর্ণপদে ছয় কলামাত্রার দুই পর্ব। এই চৌপদী পঙ্‌ক্তির সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে, প্রথম পঙ্‌ক্তিটা (তুরঙ্গ...তায়) দ্বিপদী, ত্রিপদী নয়। অতএব 'লঘু ত্রিপদী' নামটা বর্জনীয়। ছয়-ছয়-আট মাত্রার দ্বিপদী বন্ধ রচনা আজকাল শুধু কলাবৃত্ত রীতিতেই চলে, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে এ-রকম দ্বিপদী বন্ধ রচনা এখন অচল হয়ে গেছে।

'মূলসূত্র' গ্রন্থে লঘুযতি ও অর্ধযতির পার্থক্যবোধের কোনো নিদর্শন নেই। তাই স্বভাবতঃই ওই গ্রন্থে (পৃ ৭৬) ছয়-ছয়-আট মাত্রার ছন্দোবন্ধ 'লঘু ত্রিপদী' বলেই বর্ণিত হয়েছে এভাবে—"লঘু ত্রিপদীর দুই মিত্রাক্ষর চরণ এবং প্রতি চরণে তিনটি পর্ব থাকিত।" এই বাক্যের পদ, চরণ ও পর্ব এই তিন শব্দের বাচ্যার্থগত অসংগতি লক্ষণীয়।

সাবেক 'লঘু ত্রিপদী' বন্ধের নামান্তর ঘটায় সাবেক 'দীর্ঘ ত্রিপদী'-কে 'দীর্ঘ' না বলে শুধু 'ত্রিপদী' বলাই যথেষ্ট। এই ত্রিপদীর মূল অবলম্বন চার মাত্রার পর্ব। আজকাল ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি শুধু আট-আট-দশ মাত্রার তিন পদ নিয়েই গড়া হয় না। আট, ছয় ও দশ মাত্রার তিন পদ নানাভাবে সাজিয়ে আজকাল অনেক রকম ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি গড়া হয়ে থাকে। যথাস্থানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।—দ্রষ্টব্য পরবর্তী '**পদ**' সংজ্ঞা।

দল *—'দল' (syllable) শব্দের সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করা যায় নানাভাবে। যেমন—

১। বাগ্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ডের নাম 'দল'।

২। একপ্রযত্নোচ্চারিত বাগ্‌ধ্বনির নাম 'দল'।

৩। একটিমাত্র স্বরবর্ণময় বা স্বরবর্ণাশ্রিত ধ্বনিখণ্ডের নাম 'দল'।

৪। বাক্যগত ধ্বনির ক্ষুদ্রতম উচ্চারণ-বিভাগের নাম 'দল'।

৫। শব্দের, বাক্‌পর্বের বা ছন্দপর্বের ক্ষীণতম যতি অর্থাৎ অণুযতি-সূচিত ধ্বনিবিভাগের নাম 'দল'।

এ-রকম যে-কোনো সূত্রের দ্বারাই 'দল' শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝানো যায়। 'দল' শব্দের মৌলিক অর্থ খণ্ড, অংশ, বিভাগ। পরোক্ষার্থে দল মানে গাছের পাতা (বিল্বদল, দূর্বাদল), ফুলের পাপড়ি (পঞ্চদল পুষ্প,শতদল কমল), ফলের বা বীজের স্বতোবিভক্ত অংশ (পণসদন মানে কাঠালের কোয়া, দ্বিদল বীজ মানে যে-বীজে থাকে দুই ভাগ অর্থাৎ cotyledon)। 'দল' শব্দের এ-রকম বিভিন্নার্থ-বোধক প্রয়োগের অনুসরণেই ছন্দের পরিভাষায় শব্দের বা বাক্‌পর্বের স্বতোবিভাজ্য ধ্বনিখণ্ডকে (অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌কে) 'ধ্বনিদল' বা শুধু 'দল' বলা অযৌক্তিক নয়।

কিন্তু অমূল্যধনের মতে (মূলসূত্র, পৃ ২৪৮)—"syllable-র প্রতিশব্দ হিসাবে 'দল' গ্রহণ করা যাইতে পারে না।" তাঁর একমাত্র যুক্তি (মূলসূত্র, পৃ ২৪৭) এই যে—"ভারতীয় ছন্দঃশাস্ত্রে 'দল' শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।...syllable অর্থে কখনও 'দল' শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।" যেমন প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থের মতে—"দল=চরণ (বা পদ)= অধালী= hemistich।" বস্তুতঃ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের 'দল' শব্দটি কখনও পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়েছে তার আভিধানিক অর্থে। সব অভিধানেই দেখা যায়, 'দল' শব্দের সাধারণ অর্থ খণ্ড, অংশ, বিভাগ। প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রে 'দল' মানে ছন্দোবন্ধের

অংশ বা বিভাগ। যেমন, ‘ছন্দোমঞ্জরী’ গ্রন্থে (৩।১) ‘উপচিত্র’ ছন্দের লক্ষণসূত্রে আছে ‘বিষমে দলে’। টীকাকারের ব্যাখ্যায় আছে—“বিষমে দলে অযুগ্মে খণ্ডে, প্রথমে তৃতীয়ে চ পাদয়োরিত্যর্থঃ।” তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় ‘দল’ মানে খণ্ড এবং এখানে ‘খণ্ড’ বলতে বোঝাচ্ছে শ্লোকের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ‘পাদ’ (চরণ)। এই গ্রন্থেই অন্যত্র (৬।৭, ৬।১০) ‘আর্যা’ বর্গের ‘মুখচপলা’ ও ‘উপগীতি’ ছন্দের লক্ষণসূত্রে আছে—‘আদ্যং দলং প্রথমং **খণ্ডম্**’ এবং ‘দলদ্বয়ে পূর্বার্ধাপরার্ধারূপে **ভাগ**দ্বয়ে’। অমূল্যধনও বলেছেন—“বৈদিক গায়ত্রী ছন্দে থাকে তিনটি অষ্টাক্ষর দল।” এখানেও ‘দল’ মানে ছন্দোবন্ধের অংশ বা ভাগ। লক্ষণীয় ‘দল’ মানে চতুষ্পাদ ‘উপচিত্র’ ছন্দের এক চতুর্থাংশ, ত্রিপাদ ‘গায়ত্রী’ ছন্দের এক তৃতীয়াংশ এবং দ্বিপাদ ‘আর্যা’ ছন্দের অর্ধাংশ। সর্বত্রই দল বলতে বোঝায় ছন্দোবন্ধের পুরো এক পদ, অর্ধপদ (অর্ধালী, hemistich অর্থাৎ half line of verse) বোঝায় না। প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রমতেও দল মানে দ্বিপাদ ছন্দের অর্ধাংশ এবং চতুষ্পাদ ছন্দের চতুর্থাংশ অর্থাৎ পুরো পদ বা চরণ, তার অর্ধেক নয়।

দেখা গেল ‘দল’ শব্দের আসল অর্থ খণ্ড, অংশ, বিভাগ। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে ‘দল’ ও ‘পদ’ মানে ছন্দের পূর্ণযতিসূচিত ‘বিভাগ’। কিন্তু বাংলায় ‘পদ’ মানে ছন্দের অর্ধযতিসূচিত বিভাগ। অনুরূপভাবে বাংলায় ছন্দের অণুযতি-বিভাগকে অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিখণ্ডকে যদি ‘দল’ নামে অভিহিত করা যায় তাহলে অন্ততঃ যুক্তিশাস্ত্রের নীতি লঙ্ঘিত হয় না। মনে রাখতে হবে বাংলা ছন্দশাস্ত্র সব বিষয়েই সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের অনুবর্তী নয়, হতে পারেও না। তার একটি স্বতন্ত্র সত্তা ও বৈশিষ্ট্য আছে।[১]

একপ্রযত্নোচ্চারিত (অর্থাৎ বাগ্‌যন্ত্রের একটিমাত্র প্রয়াসে উচ্চারিত) শব্দ বা শব্দাংশের নাম দল। শব্দের উচ্চারণজাত দল-বিভাগ স্বভাবতঃই কানেরও সম্মতি পায়। যেমন বিন্দু, মুক্তি ও গৌরী শব্দে আছে দুটি করে দল—বিন্‌দু, মুক্‌ তি ও গউ্‌ রী। এই ছয় দলের মধ্যে বিন্‌, মুক্‌ ও গউ্‌ এই তিনটি দলের অন্তে আছে একটি করে খণ্ডবর্ণ (ন্‌, ক্‌, উ্‌)। এ-রকম খণ্ডবর্ণান্ত দলকে বলা যায় **রুদ্ধদল** (closed syllable)। আর দু, তি এবং রী, এই তিনটি দলের অন্তে কোনো খণ্ডবর্ণ নেই। এ-রকম যেসব দলের অন্তে কোনো খণ্ডবর্ণ থাকে না তাকে বলা যায় **মুক্তদল** (open syllable)।—দ্রষ্টব্য পরবর্তী **বর্ণ** শব্দ।

দলবৃত্ত *—যে রীতিতে বাংলা ছন্দের ধ্বনি পরিমিত হয় দলসংখ্যার হিসাবে তাকে বলা হয় ‘দলবৃত্ত’। অন্য ভাবে বলা যায়, যে ছন্দোরীতিতে দলই ছন্দের মাত্রা বলে গণ্য হয় (অর্থাৎ এক দলকে এক মাত্রা বলে গণ্য করা হয়) তার নাম ‘দলবৃত্ত’ (syllabic)। দলসংখ্যাত, দলমাত্রক, দলবৃত্ত এই তিন নাম অভিন্নার্থক। দৃষ্টান্ত—

থাকব না ভাই, । থাকবে না কেউ, ॥ থাকবে না ভাই, । কিছু।
সেই আনন্দে। যাও রে চলে ॥ কালের পিছু। পিছু।

—ক্ষণিকা, শেষ

দলের সংখ্যা অনুসারে কোনো শব্দ, ছন্দপর্ব প্রভৃতিকে একদল, দ্বিদল, ত্রিদল, চতুর্দল ইত্যাদি বিশেষণযোগে বর্ণনা করা যায়। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের প্রতি পূর্ণপর্বে আছে চার দল। তাই বলা যায়, এটি চতুর্দল পর্বের ছন্দে রচিত।

দলমাত্রা *—দলসংখ্যাত ছন্দের মাত্রাকেই বলা যায় ‘দলমাত্রা’। অথবা, যে প্রকার মাত্রার সংখ্যা গণনা করে দলবৃত্ত রীতিতে রচিত ছন্দের ধ্বনি পরিমিত হয় তাকেই বলা যায় ‘দলমাত্রা’। যেমন—

মৃত্যু যেদিন। বলবে, 'জাগো, ॥ প্রভাত হল। তোমার রাতি',
নিবিয়ে যাব। আমার ঘরের ॥ চন্দ্রসূর্য। দুটো বাতি ॥

—কল্পনা, হতভাগ্যের গান

এর প্রতি পর্বে আছে চার দলমাত্রা, আর পঙ্ক্তিতে আছে ষোল দলমাত্রা।

দলযতি *—প্রত্যেক দলের পরেই আমাদের উচ্চারণে অতি সামান্য একটু বিরতি ঘটে। যেমন— মা-ন-সী, র-বীন্-দ্র-নাথ্। এরকম দলসূচক উচ্চারণবিরতিকে বলা যায় 'দলযতি'। নামান্তরে 'অণুযতি'।

দ্বিপদী—যে ছন্দপঙ্ক্তি একটিমাত্র অর্ধযতির দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত তাকে বলা যায় 'দ্বিপদী'।—দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী 'ত্রিপদী' এবং পরবর্তী '**পদ**' সংজ্ঞা।

ধ্বনিপ্রধান ছন্দ (অমূল্যধন)—আধুনিক কালে **কবি**রা যে পদ্ধতিতে এক শ্রেণীর কবিতায় 'যৌগিক অক্ষর' মাত্রকেই [মানে রুদ্ধদল-মাত্রকেই] দীর্ঘ এবং অপর সব 'অক্ষর'-কে [মানে মুক্তদল-কে] হ্রস্ব ধরে মাত্রাযোজনা করেন, অমূল্যধনের পরিভাষায় তারই নাম 'ধ্বনিপ্রধান ছন্দ'। অর্থাৎ, সত্যেন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'হৃদ্যা' আর আমরা বলি 'কলাবৃত্ত', অমূল্যধন তাকেই বলেছেন 'ধ্বনিপ্রধান'।—দ্রষ্টব্য পরবর্তী '**রীতি**' সংজ্ঞা।

নিঃসঙ্গ পঙ্ক্তি *—দ্রষ্টব্য পরবর্তী '**মিলের ফাঁক**' সংজ্ঞা।

পঙ্ক্তি (লালমোহন)—পদ্যরচনায় পূর্ণযতির দ্বারা নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগকে বলি 'পঙ্ক্তি' (verse)। অর্থাৎ ছন্দের পূর্ণযতিবিভাগের পারিভাষিক নাম 'পঙ্ক্তি'। অমূল্যধন 'পংক্তি' শব্দ ব্যবহার করেন ছত্র (অর্থাৎ লিখিত বা মুদ্রিত সারি) অর্থে। আর পূর্ণযতি-সূচিত ছন্দোবিভাগকে তিনি বলেন 'চরণ'। আবার কেউ-কেউ বলেন 'পদ'। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী' কবিতা নাম থেকেই বোঝা যায়, পদ্যরচনার বৃহত্তম বিভাগকেই তিনি বলতেন 'পদ'। চরণ ও পদ সমার্থক শব্দ। একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে, বৃহত্তম ছন্দেবিভাগকে চরণ বা পদ বলা অযৌক্তিক। যেমন—

নগ্নমূর্তি মরণের
নিষ্কলঙ্ক চরণের
    সম্মুখে প্রণমো।

—চিত্রা, মৃত্যুর পরে

তিন ছত্রে সাজানো এই ছন্দেবিভাগটি 'ত্রিপদী' নামে সুপরিচিত। এর প্রথম দুই ছত্রের পরে আছে অর্ধযতি, আর তৃতীয় ছত্রের পরে আছে পূর্ণযতি। পূর্ণযতিসূচিত এই সমগ্র ছন্দোবিভাগটিকে যদি বলা হয় চরণ (বা পদ), তবে একথাও বলতে হবে যে—এই ত্রিপদী রচনার এক চরণে (বা পদে) আছে তিন পদ। তাতে যে পুনরুক্তি দোষ (tautology) ঘটে তা সুস্পষ্ট। তাছাড়া সমগ্র বস্তু ও তার অংশকে একই শব্দ বা দুই প্রতিশব্দ দিয়ে নির্দেশ করা যায় না। কিন্তু পূর্ণযতির বিভাগকে 'পঙ্ক্তি' আর তার বিভাগকে পদ (বা চরণ) বললে এ-রকম অসংগতি ঘটে না। কারণ পঙ্ক্তি ও চরণ (বা পদ) একার্থক নয়।

‘পঙ্‌ক্তি’ নামটাও অর্বাচীন নয়। বহুকাল পূর্বেই লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর ‘কাব্যনির্ণয়’ গ্রন্থে (১৮৬৪) ছন্দের বৃহত্তম ভাগকে অভিহিত করেছিলেন **পঙ্‌ক্তি** নামে। শুধু তাই নয়, দ্বিপদী ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দপঙ্‌ক্তিকে পদ বা চরণ বলার অযৌক্তিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাছাড়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (‘মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (‘অলেখ্য’ কাব্যের ভূমিকা), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (‘ছন্দসরস্বতী’ প্রবন্ধ) প্রমুখ অনেকেই ছন্দের পূর্ণযতি-বিভাগ অর্থে ‘পঙ্‌ক্তি’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পূর্বাগত অভ্যাসের বশে ছন্দের পূর্ণরূপকে বলতেন ‘**পদ**’। যেমন—

১। ‘স্বনামখ্যাত ‘পয়ার’ ছন্দের একটা পাকা পরিয় আছে। এই জন্যে তার **পদে** কোথায় আধা যতি, কোথায় পুরো যতি তা নিয়ে বচসার আশঙ্কা নেই।’—ছন্দ (তৃতীয় সং ১৯৭৬), ছন্দের মাত্রা (দ্বিতীয়), পৃ ১৪০।

২। ‘আধুনিক বাংলা ছন্দে সবচেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা। তার প্রথম যতি **পদের** মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে **পদের** শেষে।’ —ছন্দ (তৃতীয় সং), ছন্দের হসন্ত-হলন্ত (দ্বিতীয়), পৃ ১০৮।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনায় ‘পঙ্‌ক্তি’ কথাটাই বেশি ব্যবহার করেছেন। এখানে তিনটি উক্তি উদ্ধৃত হল।—

১। ‘এর [‘মহাপয়ার’-এর] প্রত্যেক **পঙ্‌ক্তির** প্রথম ভাগে আট মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে দশ মাত্রা।’ —ছন্দ (তৃতীয় সং), ছন্দের প্রকৃতি (১৯৩৪), পৃ ১৬০।

২। পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পঙ্‌ক্তি-সীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দিষ্ট সংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক-একটি **পঙ্‌ক্তি** সম্পূর্ণ। সেই পঙ্‌ক্তিশেষে একটি করে বড়ো যতি।’—ছন্দ (তৃতীয় সং), গদ্যছন্দ (১৯৩৪), পৃ ২১৫।

এজন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রবহমান ছন্দকে বলেছেন **পঙ্‌ক্তি লঙ্ঘক** ছন্দ।—‘ছন্দ’ (তৃতীয় সং), পৃ ২১৮

৩। ‘[বাংলা ছন্দ-রূপের] বৈচিত্র্যঘটে যতিবিভাগের বৈচিত্র্যে এবং নানা ওজনের **পঙ্‌ক্তি**-বিন্যাসে। এইরকম বিভিন্ন বিভাগের যতি ও পঙ্‌ক্তি নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলি বেড়ে চলেছে।’ —ছন্দ (তৃতীয় সং), বাংলা প্রাকৃত ছন্দ (তৃতীয়, ১৯৩৮), পৃ ১৮৭।

পঙ্‌ক্তি কথার বিশেষ সার্থকতাও আছে। পঙ্‌ক্তি কথার আসল অর্থ সারি। যেমন ‘দন্তপঙ্‌ক্তি’। স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের—‘মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি। ‘ছন্দের পূর্ণযতি-বিভাগে সাজানো থাকে কয়েকটি পদ বা পর্ব, তাই তাকে পদ বা পর্বের সারি বা পঙ্‌ক্তি বলা অসংগত নয়।

পূর্বেই বলেছি ছন্দোবদ্ধ এক পঙ্‌ক্তিকে ভেঙে একাধিক ছত্রে লেখা যায়। তাই ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি প্রায়শঃ দুই বা তিন ছত্রে লিখিত হয়। তেমনি চৌপদী পঙ্‌ক্তি লিখিত হয় তিন বা চার ছত্রে। ফলে অসতর্ক দৃষ্টিতে মাঝে-মাঝে এক-একটি ছত্রই এক পঙ্‌ক্তি বলে ভ্রম হবার আশঙ্কা থাকে।

পঙ্‌ক্তিযতি *—পদ্যরচনার বৃহত্তম বিভাগ অর্থাৎ পঙ্‌ক্তির অন্তে যে বড় যতি তাকে বলা যায় ‘পঙ্‌ক্তিতি’। নামান্তরে ‘**পূর্ণযতি**’।

পদ—অর্ধযতির দ্বারা খণ্ডিত পঙ্‌ক্তি-বিভাগের পারিভাষিক নাম 'পদ' (clause)। ছন্দোময় রচনামাত্রেরই 'পদ' নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। কেননা, পদবদ্ধ রচনারই নাম 'পদ্য'। পদ না থাকলে পদ্যই হতে পারে না। এইজন্যই দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি নামের এত প্রচলন। এস্থলে পূর্বোক্ত 'চরণ' শব্দের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত লালমোহন বিদ্যানিধির মন্তব্যটুকু ('কাব্যনির্ণয়', দ্বিতীয় সং, ১৮৬৪) স্মরণীয়। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

যার খুশি রুদ্ধচক্ষে ॥ করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিম্বা ফাঁকি ॥ লভ সেই জ্ঞান।

—চৈতালি, তত্ত্বজ্ঞানহীন

এর প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই আট মাত্রার পরে আছে অর্ধযতি, আর বাকি ছয় মাত্রার পরে পূর্ণযতি। অর্ধযতির প্রতি লক্ষ রেখে পঙ্‌ক্তির এই বিভাগকে বলা উচিত 'পদ'। অর্থাৎ এর প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী। (দ্রষ্টব্য 'চরণ' প্রসঙ্গে উদ্ধৃত লালমোহন বিদ্যানিধির অভিমত।) কিন্তু অমূল্যধনের মতে এই দুই বিভাগের নাম 'পর্ব'। বস্তুতঃ তাঁর ছন্দচিন্তায় 'পদ' সংজ্ঞা কোনো গুরুত্ব পায় নি। এমন কি, এক স্থানে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন (মূলসূত্র, পৃ ১১৮ পাদটীকা)—"পদ কথাটির নানা অর্থ হয়, সুতরাং এই কথাটি ব্যবহার না করাই ভাল।" অথচ তাঁর গ্রন্থে 'ত্রিপদী শ্লোক' (পৃ ১৯), পূর্ণপদী, অপূর্ণপদী, অতিপূর্ণপদী চরণ' (পৃ ৬৮, ৭৮-৮০), এ-রকম উক্তি দেখা যায়। এসব স্থলে 'পদ' কথার অর্থ কি বোঝা যায় না। আমাদের মনে হয় 'পদ' সংজ্ঞা (term) বর্জন করে অথবা পদ ও পর্বের পার্থক্য স্বীকার না করে বাংলা ছন্দের যথাযথ পরিচয় দেওয়াই সম্ভব নয়।—দ্রষ্টব্য পরবর্তী '**পর্ব**' ও '**যতি**' সংজ্ঞা।

পদযতি *—পঙ্‌ক্তির পদবিভাগসূচক যতি। নামান্তরে '**অর্ধযতি**'।

পয়ার—যে দ্বিপদী ছন্দোবন্ধের দুই পদে যথাক্রমে আট ও ছয় মাত্রা থাকে, তারই দীর্ঘকালের প্রয়োগসিদ্ধ নাম 'পয়ার'। পয়ার একটি নির্দিষ্টাকৃতি ছন্দোবন্ধের নাম, কোনো ছন্দোরীতির নাম নয়। দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত, এই তিন রীতিতেই পয়ারবন্ধ রচিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে তিনটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। দলবৃত্ত পয়ার—

বিরল তব ভবনখানি ॥ পুষ্পকানন-মাঝে,
হে কল্যাণী, নিত্য আছ ॥ আপন গৃহ-কাজে।

—ক্ষণিকা, কল্যাণী

২। কলাবৃত্ত পয়ার—

পূর্ণিমা চন্দ্রের ॥ জ্যোৎস্না-ধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা ॥ তন্দ্রা হারায়।

—চিত্রবিচিত্র, উৎসব

৩। মিশ্রবৃত্ত পয়ার—

শীর্ণ শান্ত সাধু তব ॥ পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া ॥ লক্ষ্মীছাড়া করে।

—চৈতালি, বঙ্গমাতা

এর থেকেই বোঝা যায়, পয়ারের তিন রীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শিল্পানুভূতি কতখানি সক্রিয় ছিল। কিন্তু তাঁর ছন্দচিন্তায় পয়ারের এই তিন রীতি সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে নি। তবু পয়ারবন্ধের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে অভ্রান্ত ছিল তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে 'ছন্দ' (৩য় সং, ১৯৭৬) গ্রন্থের নানা স্থানে। এখানে দুটি উক্তি (পৃ ১০৯, ১১০) তুলে দিচ্ছি তাঁর 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রবন্ধ থেকে।—

১। তার [ছোট পয়ারের] প্রথম অংশে আট, দ্বিতীয় অংশে ছয়।"

২। "পয়ারের প্রকৃত রূপ চোদ্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষরে ও দ্বিতীয় অংশের ছয় অক্ষরের পরবর্তী দুই যতিতে।"

'দুই যতি'-র প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়। 'অক্ষর' শব্দ প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায়, পয়ার বলতে এসব স্থানে তিনি অক্ষরগোনা (অর্থাৎ মিশ্রবৃত্ত) ছন্দোবন্ধের কথাই বলছেন, অক্ষরগোনা ছন্দোরীতির কথা নয়! এ-রকম প্রয়োগই দেখা যায় 'ছন্দ গ্রন্থের প্রায় সর্বত্র। কিন্তু উক্ত ছন্দের 'হসন্ত-হলন্ত' (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রবন্ধেই তিনি সুচিরাগত অক্ষরগোনা ছন্দোরীতির কোনো স্বীকৃত পারিভাষিক নামের অভাবে বলেছেন (পৃ ১০৫, ১০৭) 'পয়ারজাতীয়' বা শুধু 'পয়ার'। যেমন—

১। "সাধুভাষার ছন্দে বাঁধারীতি যে-জাতীয় ছন্দে চলে এবং শোভা পায় সে হচ্ছে 'পয়ারজাতীয়' ছন্দ।"

২। "এই প্রবন্ধে আমি ত্রিপদী প্রভৃতি 'পয়ারজাতীয়' সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই 'পয়ার' নাম দিচ্ছি।"

'এই প্রবন্ধে' কথাটি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রয়োজনে (যোগ্য পরিভাষার অভাবে) 'পয়ার' শব্দটিকে এই প্রবন্ধে প্রয়োগ করেছেন ছন্দের একটি বিশেষ 'জাত' বা 'রীতি' অর্থে। কবি বুদ্ধদেব বসু তা লক্ষ করেছেন। তাই তিনি বলেছেন—

"পয়ার শব্দটির ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথে এক-এক রকম। অধিকাংশ সময় তিনি চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী পয়ার বলতে ত্রিপদীর মতো একটা ছন্দোবন্ধ বুঝেছেন, যাকে বলে ভর্স-ফর্ম।" —সাহিত্যচর্চা, বাংলা ছন্দ (৩য় বিভাগ)

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পয়ার যে একটি ছন্দোবন্ধ বা ভর্স-ফর্মের নাম, 'এই চিরাচরিত ধারণা'-কেই রবীন্দ্রনাথ 'অধিকাংশ সময়' স্বীকার করে নিয়েছেন। এটা বুদ্ধদেবের দৃষ্টি এড়ায় নি। তবু তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন—

১। "পাঠককে হয়তো বলে দেয়া দরকার যে, পয়ার বলতে আমি একটা ছন্দ বুঝি, আর ত্রিপদী বলতে পয়ারের একটা ছন্দোবন্ধ।...পয়ার আসলে একটা ছন্দ, ছন্দের একটা জাত।"

২। "ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি যে, পয়ার বলতে একটা ছন্দোবন্ধ আর বোঝায় না, বোঝায় ছন্দের একটা জাত।"

—সাহিত্যচর্চা, বাংলা ছন্দ[১] (৩য় ও ৪র্থ বিভাগ)

ছন্দের রীতিকেই বুদ্ধদেব বলেছেন 'ছন্দের জাত'। প্রথম উক্তির 'আমি' আর দ্বিতীয় উক্তির 'আর' শব্দ লক্ষণীয়। শত শত বৎসর যাবৎ বাংলার কবিসমাজ একটা বিশেষ ছন্দোবন্ধকেই 'পয়ার' নামে চালিয়ে

আসছেন (এটাই হল 'চিরাচরিত ধারণা' কথার লক্ষ্য) এবং রবীন্দ্রনাথও 'অধিকাংশ সময়' তাই মেনে নিয়েছেন। তবু একা বুদ্ধদেবের মনে তাঁর 'ছেলেবেলা থেকেই' এমন বিপরীত ধারণার সৃষ্টি হল কেমন করে তা বোঝা গেল না। 'পয়ার' নামটা কোনো ছন্দোবন্ধ (verse-form)-বোধক নয়, এটি আসলে ছন্দের জাত, মানে ছন্দোরীতি (verse-style) -বোধক, বুদ্ধদেব তাঁর এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোনো যুক্তিও নি। তবে 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের দুটি উক্তির সঙ্গে বুদ্ধদেবের শেষ দুই উক্তির সাদৃশ্য থেকে মনে হয়, এই দুটি রবীন্দ্রোক্তিই তাঁর এই সিদ্ধান্তের একমাত্র অবলম্বন।

এ প্রসঙ্গে স্বতঃই একটা প্রশ্ন মনে জাগে—ত্রিপদীকে যদি 'পয়ারের ছন্দোবন্ধ' বলা হয় তবে আট-ছয় মাত্রার সুচিরাগত ছন্দোবন্ধটাকে কি নাম দেওয়া যাবে? বুদ্ধদেবের মনে যদি এই মৌলিক প্রশ্নটা জাগত তাহলে বোধ করি তিনি তাঁর এই অভিনব মত প্রকাশে সাহসী হতেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের ওই দুটি সাময়িক উক্তি এবং বুদ্ধদেবের এই সুদৃঢ় অভিমত, এই দুই এর প্রভাবে এই নূতন ধারণাটি অচিরেই পাঠকসমাজে, বিশেষতঃ কবিমহলে ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়ে গেল। কেউ ভেবেও দেখলেন না এই নূতন ধারণাটি কোনো দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত কিনা।

অবশেষে যখন 'ছন্দ-পরিক্রমা' গ্রন্থে (১৯৬৫) দেখানো হল যে, আট-ছয় মাত্রার ছন্দোবন্ধ (অর্থাৎ চিরাগত পয়ার) তিন রীতিতেই রচিত হতে পারে এবং হয়ে থাকে, তখন এই বহুব্যাপ্ত ভ্রান্তিটা ঘুচে যেতেও দেরি হল না। আজকাল বোধ করি কেউ আর মনে করেন না যে, ছন্দের কোনো 'জাত'-এর, মানে কোনো বিশেষ 'রীতি'র নাম 'পয়ার'।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অমূল্যধনের বহুপ্রচারিত ও বহুপঠিত 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' গ্রন্থে (৭ম সং, ১৯৮৩,পৃ ৯৯-১০৬) এই পরিত্যক্ত ধারণাটি শুধু যে টিকে রয়েছে তাই নয়, সবিস্তারে আলোচিতও হয়েছে। এবিষয়ে তাঁর প্রথম দুটি উক্তি এই। —"বাংলা কাব্যে যেটি সনাতন ও সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত রীতি, তাহার নাম দিতেছি পয়ারের রীতি। এই রীতিতে যে সমস্ত কবিতা রচিত তাহাদিগকে 'পয়ারজাতীয়' বলা যাইতে পারে।" পয়ার যে তিন রীতিতেই রচিত হয়ে থাকে, এ বিষয়ে তিনি যদি সচেতন থাকতেন তাহলে এমন উক্তি করতে পারতেন না।

১। মরিতে চাহি না আমি ॥ সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি ॥ বাঁচিবারে চাই।

—মানসী, প্রাণ

২। এ কেবল দিনে রাত্রে   জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।

—কথা, প্রতিনিধি

অমূল্যধনের পরিভাষায় বলতে হয় প্রথম দৃষ্টান্তটি হচ্ছে 'পয়ারের রীতি'-তে রচিত পয়ার অথবা 'পয়ারজাতীয়' পয়ার, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'পয়ারের রীতি'-তে রচিত ত্রিপদী অথবা 'পয়ারজাতীয় ত্রিপদী'। এ-রকম পরিভাষা-প্রয়োগের অসার্থকতা স্বতঃপ্রতীয়মান। অধিকতর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আরও দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। নন্দিত কণ্ঠের ॥ হাস্যের রোল
অম্বর তলে দিল ॥ উল্লাসদোল।

—চিত্রবিচিত্র, উৎসব

২। বাহুর দন্ত রাহুর মতো ॥ একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে সে ॥ এক গরাসে গেলে।

—পূরবী, চিঠি

অমূল্যধনের সূত্র অনুসারেই মানতে হবে আট+ছয় মাত্রার দুই যতিবিভাগ ('পর্ব') নিয়ে গঠিত এই চারটি পঙ্‌ক্তিও ('চরণ') সর্বস্বীকৃত পয়ারবন্ধেই রচিত (মূলসূত্র, পৃ ১৮ ও ৭৬)। কিন্তু এই দুই দৃষ্টান্তের একটিও অমূলধন-কথিত 'পয়ারের রীতি'তে বা 'পয়ারজাতীয়' ছন্দে রচিত নয়। অর্থাৎ 'মরিতে চাহি না আমি' ইত্যাদি পয়ারের দৃষ্টান্তটি 'পয়ারের রীতিতে'ই রচিত, কিন্তু অন্য দুটি দৃষ্টান্ত তা নয়। এর থেকেও বোঝা যায় 'পয়ারজাতীয়' বা 'পয়ারের রীতি', এ-রকম স্ববিরোধী পরিভাষা ব্যবহার কতখানি অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর।

পর্ব (সত্যেন্দ্রনাথ)—লঘুযতির দ্বারা খণ্ডিত পদ-বিভাগের পারিভাষিক নাম 'পর্ব (foot)। দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে লঘুযতি সাধারণতঃ সুব্যক্ত থাকে। তাই এই দুই রীতির ছন্দের পদের পর্ববিভাগ সহজেই কানে ধরা পড়ে। কলাবৃত্ত রীতির একটি দৃষ্টান্ত—

মুদিত আলোর। কমল-কলিকা।-টিরে
রেখেছে সন্ধ্যা। আঁধার-পর্ণ।-পুটে।
উতরিবে যবে। নব প্রভাতের। তীরে
তরুণ কমল। আপনি উঠিবে। ফুটে।
উদয়াচলের। সে তীর্থ-পথে। আমি
চলেছি একেলা। সন্ধ্যার অনু। গামী,
দিনান্ত মোর। দিগন্তে পড়ে। লুটে।

—গীতালি-১০৭, 'মুদ্রিত আলোর'

এই স্তবকটিতে আছে মোট তিন পঙ্‌ক্তি। তিন পঙ্‌ক্তির অন্তে মিল (পুটে-ফুটে-লুটে)। অর্থাৎ এই গুচ্ছটি আসলে একটি **ত্রিতক** (triplet)। এর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি দ্বিপদী, তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ত্রিপদী। প্রত্যেক পদ এক-এক ছত্রে সাজানো। তাই অর্ধযতির চিহ্ন (॥) উহ্য রাখা হয়েছে। প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পদের অন্তে মিল (টিরে-তীরে) এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম দুই পদের অন্তে মিল (আমি-গামী)। প্রতি পদ সুব্যক্ত দুই লঘু যতির দ্বারা তিন পর্বে বিভক্ত। প্রথম দুই পর্ব পূর্ণ, তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ। লঘুযতি নির্দিষ্ট হল একদণ্ড (।) চিহ্নের দ্বারা। এর প্রত্যেক পূর্ণপর্বে আছে ছয় কলামাত্রা।

দলবৃত্ত রীতির ছন্দেও পদের পর্ববিভাগ-সূচক লঘুযতি সাধারণতঃ সুব্যক্ত থাকে। কিন্তু মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে লঘুযতি অনেক সময়ই সুব্যক্ত থাকে না। তাতে মনে হতে পারে এ-রীতির ছন্দে পর্ববিভাগ হয় না, পদবিভাগই তার প্রধান অবলম্বন, অথবা এই রীতিতে পূর্ণপর্ব গঠিত হয় আট মাত্রায়। এই দুই মতের মধ্যে

প্রথমটির সমর্থক কবি মোহিতলাল, আর দ্বিতীয় মতের প্রবক্তা অমূল্যধন। তাঁদের কারও মতই স্বীকৃতিযোগ্য বলে মনে করি না। এই দ্বিবিধ অভিমতেরই মূলে আছে লঘুযতির বিলোপ বা অব্যক্ততা সম্বন্ধে অসচেতনতা। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

এ দুর্ভাগ্য। দেশ হতে ॥ হে মঙ্গল।-ময়,
দূর করে। দাও তুমি ॥ সর্বতুচ্ছ। ভয়।...
মস্তক তু: -লিতে দাও ॥ অনন্ত আ : -কাশে
উদার আ : -লোক মাঝে ॥ উন্মুক্ত বা : -তাসে।

—নৈবেদ্য-৪৮, 'এ দুর্ভাগ্য'

এর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে লঘুযতি (।) সুব্যক্ত, তাই প্রতি পদের পর্ববিভাগও সুস্পষ্ট। কিন্তু পরের দুই পঙ্‌ক্তিতে চারটি লঘুযতিই লুপ্ত (:) হয়েছে, ফলে পদের পর্ববিভাগও লোপ পেয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির পদগুলি বিযুক্তপর্বক, আর পরের দুই পঙ্‌ক্তির পদগুলি যুক্তপর্বক।

এভাবে প্রয়োজনমতো যুক্তপর্বক পদের ব্যবহারে ছন্দের গৌরব বাড়ে। ঘনঘন লঘুযতিলোপের ফলেই যুক্তপর্বক পদের বাহুল্য দেখা যায়। তাই মনে হয় মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে পর্ববিভাগ নেই, পদবিভাগই তার ভিত্তি। এইজন্যই মোহিতলাল এ রীতির ছন্দকে বলেছেন, 'পদভূমক'। কিন্তু আসলে মিশ্রবৃত্ত রীতিও পর্বহীন নয়। এ বিষয়ে মোহিতলাল ও অমূল্যধনের মতে কোনে মৌলিক পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে মোহিতলাল যাকে বলেছেন 'পদ', অমূল্যধনের পারিভাষায় তারই নাম 'পর্ব'।

এখানে একটা স্মরণীয় বিষয় বলে রাখা দরকার। মোহিতলাল দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির ছন্দকে বলেছেন 'পূর্বভূমক', আর মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দকে বলেছেন 'পদভূমক'। আসলে মিশ্রবৃত্ত যেমন পর্বহীন নয়, দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির ছন্দও তেমনি পদহীন নয়। মোহিতলাল লঘুযতিলোপ এবং মিশ্রবৃত্ত রীতিতে এই যতিলোপের প্রাধান্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তাই তিনি বাংলা ছন্দের তিন রীতিকে পদভূমক, ও পর্বভূমক, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু তিনি পর্ব ও পদের পার্থক্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। পক্ষান্তরে অমূল্যধন যতিলোপ এবং মিশ্রবৃত্ত রীতিতে যতিলোপ-প্রবণতা বিষয়ে অনবহিত তো ছিলেনই, পর্ব ও পদের পার্থক্যবোধও তাঁর ছিল না। তাই তিনি 'পদ' শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নি। এই পদ' বর্জনের ফলে তাঁর ছন্দচিন্তার কাঠামোটাই কাত হয়ে আছে।

আসলে বাংলা ছন্দের তিন রীতিতেই পর্ব ও পদ বিভাগ স্বীকার্য। ছন্দের প্রকৃতি বা রীতি নিরূপিত হয় প্রতি পর্বে মাত্রাবিন্যাস-প্রণালীর দ্বারা, আর ছন্দের আকৃতি বা বন্ধ (অর্থাৎ রূপ) নির্দিষ্ট হয় প্রতি পদে পর্ববিন্যাস-প্রণালীর দ্বারা। তাই বলতে হয় পর্বই বাংলা ছন্দোবন্ধের প্রধান অবলম্বন! সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে 'পর্ব' শব্দের ব্যবহার নেই। তার স্থলে আছে 'গণ' শব্দ। যেমন—চতুষ্কল গণ, পঞ্চকল গণ ইত্যাদি। 'কাব্যনির্ণয়ে' আছে যড়ক্ষরী গণ, সপ্তাক্ষরী গণ। যেসব সংস্কৃত ছন্দে গণবিভাগ স্বীকৃত, সেগুলিকে অনেক সময় বলা হয় **'গণচ্ছন্দ'** বা **'গণবৃত্ত'**। সে হিসাবে বলা যায় বাংলায় তিন রীতির সব ছন্দই আসলে গণবৃত্ত।

বাংলা ভাষায় বাক্যের স্বাভাবিক উচ্চারণবিভাগ অর্থে **'পর্ব'** শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় বোধ করি রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ছন্দ' (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রবন্ধে। 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত (শ্রাবণ ১৩২১ । ইং ১৯১৪) এই

প্রবন্ধটির এক স্থানে আছে—('ছন্দ', ৩য় সং, পৃ ৩২)—"যদি জোর দিতে চাই তবে বাক্যের পর্বে পর্বেই ঝোঁক দিয়া থাকি।" হয় তো এই উক্তির অনুসরণেই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দসরস্বতী' প্রবন্ধে ('ভারতী', বৈশাখ ১৩২৫। ইং ১৯১৮) বাংলা ছন্দের 'হৃদ্যা' (কলাবৃত্ত) ও 'চিত্রা' (দলবৃত্ত) পদ্ধতি-প্রসঙ্গে প্রথম ব্যবহার করলেন **'পংক্তিপর্ব'** শব্দটি। এখন প্রায় সকলেই লঘুযতি-সূচিত পঙ্ক্তিবিভাগ (আসলে পদবিভাগ) অর্থে 'পর্ব' শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন। এই বিশেষ অর্থে পর্ব শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরও অনুমোদন ছিল। তার নিদর্শন আছে তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে। মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দেও যে পর্ববিভাগ স্বীকার্য, এবিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে এবিষয়েও অবহিত ছিলেন তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে ওই 'ছন্দ' গ্রন্থেই।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ প্রবন্ধে 'পদ' শব্দের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় না। যে কয়েক বার দেখা যায় তাও স্পষ্টার্থক নয় অথবা শৈথিল্যসূচক। তাছাড়া এক স্থানে (দ্বিতীয় প্রকাশ) আছে—"পয়ার ত্রিপদীর কাজ ফুরিয়েছে।" তাতে বোঝা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের মতে শুধু আদ্যা (মিশ্রবৃত্ত) রীতিতেই পয়ার-ত্রিপদী রচনা চলে। অন্য দুই রীতিতেও যে পয়ার-ত্রিপদী রচিত হয়ে থাকে, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। আসলে সত্যেন্দ্রনাথের সমস্ত মনোযোগই নিবদ্ধ ছিল বাংলা ছন্দের রীতিবৈচিত্র্যের দিকে। তার রূপবৈচিত্র্যের দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ তিনি পান নি। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনায় ছন্দের রীতি ও রূপের কোনোটাই উপেক্ষিত হয় নি। তাই ছন্দবিচারে পঙ্ক্তির পদ ও পর্ব-বিভাগ সমান গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর দুটি উক্তি তুলে দিচ্ছি।—

"পয়ারটা চতুষ্পদ ছন্দ।...ইহার এক-একটি **পদ** এক-একটি ঝোঁকের শাসনে চলে।

মহাভারতের কথা। অমৃতসমান
কাশীরাম দাস কহে। শুনে পুণ্যবান্।

...তবেই দেখা যাইতেছে, আট মাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট মাত্রাকে দুখানা করিয়া চার মাত্রায় ভাগ করা চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুত লম্বানিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্যাদা। —'ছন্দ', বাংলা ছন্দ (দ্বিতীয় পর্যায়), পৃ ৩২-৩৩।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে পয়ারে প্রতি পঙ্ক্তিতে থাকে দুই 'পদ'। এই পদকেই অমূল্যধন বলেছেন 'পর্ব'। এই আট মাত্রার পদকে লঘুযতি দিয়ে চার মাত্রায় ভাগ করা চলে। এই চার মাত্রার ভাগেরই পারিভাষিক নাম 'পর্ব'। আর লঘুযতি যদি অব্যক্ত (অর্থাৎ লুপ্ত) থাকে তাহলেই দেখা দেয় যুক্তপর্বক অখণ্ড পদ। রবীন্দ্রনাথ যে এই লঘুযতিলোপ সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন তার বহু নিদর্শন আছে 'ছন্দ' গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথের আর-একটি উক্তি এই।—

"মেঘ ডাকে গম্ভীর গরজনে,
ছায়া নামে তমালের বনে বনে,
ঝিল্লি ঝনকে নীপ-বীথিকায়।
সরোবর উচ্ছল কূলে কূলে,

তটে তারি বেণুশাখা দুলে দুলে
মেতে ওঠে বর্ষণ...গীতিকায়।

শ্রোতারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আবৃত্তিকালে পদান্তের পূর্বে কোনো যতিই দিই নি, অর্থাৎ বারো মাত্র একটি ঘনিষ্ঠ গুচ্ছের মতোই হয়েছে। এই পদগুলিকে [মানে গুচ্ছগুলিকে] বারো মাত্রার **পদ** বলবার কোনো বাধা আছে বলে আমি কল্পনা করতে পারিনে। উল্লিখিত শ্লোকের ছন্দে বারো মাত্রার প্রত্যেক পদে তিন **কলা**, প্রত্যেক কলায় চার মাত্রা।" —'ছন্দ', ছন্দের মাত্রা (দ্বিতীয় পর্যায়), পৃ ১৪৫।

এই গ্রন্থের পরিভাষায় বলা যায়, উপরের দৃষ্টান্তটিতে আছে দুই পঙ্‌ক্তি, প্রতি পঙ্‌ক্তিতে তিন পদ, প্রতি পদে তিন পর্ব, প্রতি পর্বে চার কলামাত্রা। এখানে 'পদ' শব্দ পারিভাষিক অর্থে অতি সুপ্রযুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে 'কলা' শব্দ ব্যবহার করেছেন 'পর্ব' অর্থে। পদান্তে আছে অর্ধযতি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আধা যতি'! পদান্তের পূর্বে কোনো যতি নেই, কথাটা ঠিক নয়। যদি না থাকে তবে পদের কলাবিভাগ (পর্ববিভাগ) করা হল কিভাবে? আসলে প্রথম দুই পর্বের অন্তে আছে একটি করে মৃদু যতি, অধুনা স্বীকৃত পরিভাষায় 'লঘুযতি'। এই লঘুযতির স্বীকৃতি আছে কবির শ্রুতিতে ও অনুভূতিতে, তাঁর চিন্তায় ও জ্ঞানে ধরা পড়ে নি। আরও লক্ষণীয়—

ঝিল্লি ঝ : -নকে নীপ।-বীথিকায়

এই পদের প্রথম লঘুযতিটি লুপ্ত হয়েছে। এই লঘূযতি-লোপেরও পরোক্ষ স্বীকৃতি আছে কবির অনুভূতিতে। কিন্তু অমূল্যধনের ছন্দসূত্রে ছন্দের পদবিভাগ, লঘুযতি ও যতিলোপর পরোক্ষ স্বীকৃতিও নেই। বস্তুতঃ ওই মূলসূত্র অনুসারে এই দৃষ্টিান্তটির যথাযথ বিশ্লেষণই সম্ভব নয়। অথচ এই 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন প্রধানতঃ অমূল্যধনের উদ্দেশ্যেই। কিন্তু তাঁর ছন্দচিন্তায় তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না।

পর্বযতি *—ছন্দোবদ্ধ পদের পর্ববিভাগসূচক যতি। নামান্তরে '**লঘুযতি**'।

পর্বাঙ্গ (অমূল্যধন)—পর্বের উপবিভাগ অর্থে 'পর্বাঙ্গ' শব্দের বিশেষ গুরুত্বের কথা আছে 'মূলসূত্র' গ্রন্থের নানা স্থানে। এখানে শুধু দুটি উক্তি উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট। এক স্থানে (পৃ ১০) আছে-"পর্ব যদি ছন্দের অণু (molecule) হয়, তবে পর্বাঙ্গ হইতেছে ছন্দের পরমাণু (atom)।" অন্যত্র (পৃ ১১) আছে—"ছন্দের বিচারে পবাঙ্গ একেবারে অচ্ছেদ্যো'য়ম্।" —এ-রকম উক্তির তাৎপর্য আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। দুই, তিন বা চার মাত্রার পবাঙ্গ কি একাধিক সিলেব্‌ল্ (আমাদের পরিভাষায় 'দল') নিয়ে গঠিত হয় না? যদি 'পরমাণু' কথাটা ব্যবহার করতেই হয়, তবে এই 'দল'-কেই ছন্দের পরমাণু বলে গণ্য করা উচিত বলে মনে করি। আর চার মাত্রার পর্বাঙ্গ মানা যায় না, এ কথা পরবর্তী '**যতি**' প্রসঙ্গে বলা যাবে। যদি চার মাত্রার পর্বাঙ্গ মানতেই হয় তবে তাকে একটি ক্ষীণ যতির দ্বারা দুটি উপবিভাগে (যেমন, 'এক : দিন') বিভাজ্য বলেও স্বীকার করতে হবে কানের সাক্ষ্যে। তাহলে অন্ততঃ চার মাত্রার পর্বাঙ্গকে অচ্ছেদ্য পরমাণু বলা যাবে না। মোট কথা, মূলসূত্রের ব্যাখ্যায় পর্ব ও পর্বাঙ্গ শব্দের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ পাওয়া যায় না। এ-রকম অনিশ্চয়তার্থক পরিভাষাযোগে ছন্দের যথাযথ পরিচয় দেওয়া ও ছন্দশাস্ত্র রচনা সম্ভব নয়। —দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী '**পর্ব**' ও পরবর্তী '**যতি**' প্রসঙ্গ।

পূর্ণযতি *—পদ্যরচনার বৃহত্তম বিভাগ অর্থাৎ পঙ্‌ক্তি-নির্দেশক যতির নাম 'পূর্ণযতি'। তাই পূর্ণযতিকে '**পঙ্‌ক্তিযতি**' নামেও আখ্যাত করা যায়।

প্রবহমানতা *—পয়ারবন্ধের প্রধান লক্ষণ তথা দুর্বলতা এই যে, তার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে প্রথম পদের অন্তে অর্ধযতি ও দ্বিতীয় পদের অন্তে পূর্ণযতি স্থাপন করতে হয় আর দুটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে এক-একটি ভাব সমাপ্ত করতে হয়। তাতে শুধু যে একটা একঘেয়েমি দেখা দেয় তা নয়। অর্ধযতি ও পূর্ণযতির নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে কবির ভাবে ও ছন্দে অবাধ গতিসঞ্চারের স্বাধীনতাও থাকে না। কবি মধুসূদন এসব বাধা লঙ্ঘন করে যে মুক্তযতি ও মুক্তগতি তথা মিলহীন পয়ারবন্ধ প্রবর্তন করেন তাকে বলা হয় 'অমিত্রাক্ষর'। কিন্তু অমিত্রাক্ষরতাই অর্থাৎ মিলহীনতাই এই নূতন পয়ারবন্ধের আসল লক্ষণ নয়, তার প্রকৃতি-পরিচায়কও নয়। তার আসল প্রকৃতি হল অবাধ সঞ্চরণশীলতা। এই সঞ্চরণশীলতারই পারিভাষিক নাম **প্রবহমানতা** *(enjambement)*। তাই ছন্দের পরিভাষায় অমিত্রাক্ষর পয়ারকে বলা যায় 'অমিল প্রবহমান পয়ার'। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'লাইনডিঙনো' বা '**পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘক**' ছন্দ।

প্রস্বর *—বাংলা পদ্যরচনার ভাষা আমাদের উচ্চারণে স্বতঃই কতকগুলি সুপরিচিত ধ্বনিগুচ্ছে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক ধ্বনিগুচ্ছের আদিতে থাকে একটি ঝোঁক আর অন্তে থাকে উচ্চারণ-বিরতি। ছন্দের পরিভাষায় এই ঝোঁককে বলি 'প্রস্বর' (accent), আর বিরতিকে বলি 'যতি' (pause)। 'ঝোঁক' শব্দটা পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবার যোগ্য নয়। অমূল্যধনের 'মূলসূত্র' গ্রন্থে **স্বরাঘাত ও শ্বাসাঘাত** প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু তাতেও ইংরেজি accent কথার আসল তাৎপর্য প্রকাশ পায় বলে বোধ হয় না।

অভিধানে 'accent' শব্দের অর্থ এই—"Prominence given to syllable by stress or (in some languages) by pitch." *(Concise Oxford Dictionary,* 1981)। অন্যত্র (W*ebster's Dictionary)* আছে —"A superior force of the voice, or of articulative effort, upon some particular syllable." এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি ছান্দসিক সেন্সবারি (George Saintsbury) স্বীকৃতি সহকারে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর *Mamual of English prosody* গ্রন্থে (১৯৩০, পৃ ২৬৫)। এই দুই ব্যাখ্যা পরস্পরের সমার্থক ও পরিপূরক। এর থেকে বোঝা যায়, কোনো একটি দলকে প্রাধান্য (prominence) দেবার অভিপ্রায়ে কণ্ঠস্বরের (voice) যে উৎকর্ষ বা প্রকর্ষ (superiority) ঘটে তারই নাম accent, এবং সে প্রকর্ষ stress-জনিত হতে পারে, pitch-জনিতও হতে পারে। সুতরাং কণ্ঠস্বরের এই উৎকর্ষ বা প্রকর্ষকে অর্থাৎ অ্যাক্‌সেন্টকে বলা যায় স্বরোৎকর্ষ বা স্বরপ্রকর্ষ। মোহিতলাল অ্যাক্‌সেন্টের বাংলা করেছেন 'স্বরোৎঘাত'। শব্দটি মন্দ নয়, অ্যাক্‌সেন্টের ভাব তাতে বেশ বোঝা যায়। 'স্বরোৎকর্ষ' শব্দটাও অনুরূপ স্বচ্ছার্থক। কিন্তু এই দুটি শব্দই ভারী, পরিভাষা রূপে চালানো কঠিন। তাই আমি প্রকৃষ্ট স্বর অর্থে '**প্রস্বর**' শব্দটাই মেনে নিয়েছি। তাতে স্বরকর্ষের ভাবটাও স্পষ্ট হয়। বস্তুতঃ দীর্ঘকালের ব্যবহারে এই শব্দটা ইতিমধ্যেই ব্যাপক স্বীকৃতিও পেয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় 'স্বর' শব্দটাই অ্যাক্‌সেন্ট অর্থে ব্যবহৃত হত। বৈদিক ভাষার উদাত্তাদি ত্রিবিধ অ্যাক্‌সেন্টকে বলা হত 'স্বর', আর বৈদিক ভাষার উচ্চারণে কোথায় কোন্ অ্যাক্‌সেন্ট পড়বে তা নিরূপণের জন্য যেসব নিয়ম প্রণীত হয়েছিল সেগুলি পরিচিত হয়েছে 'স্বরসূত্র' নামে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে এ-রকম স্বরসূত্রের নিদর্শন আছে। আধুনিক কালে অ্যাক্‌সেন্ট অর্থে 'স্বর' শব্দ চালানো যায় না। কারণ বাংলায়

স্বর শব্দের একাধিক অর্থ, যেমন—ব্যাকরণের স্বরবর্ণ, গানের স্বর (মানে সুর)। তাই 'স্বর' শব্দের পূর্বে একটা 'প্র' যোগ করে দিলে প্রাচীন ঐতিহ্যও রক্ষিত হয়, দ্ব্যর্থহীন ভাবে অ্যাক্সেন্ট অর্থে ব্যবহারের বাধাও থাকে না।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে (১৮৮৫) অ্যাক্সেন্টের বাংলা করেছিলেন 'প্রস্বন'। দিলীপকুমার রায় তাঁর 'ছান্দসিকী' গ্রন্থে এই শব্দটাই গ্রহণ করেছেন। শব্দটা মন্দ নয়। কিন্তু তার চেয়ে 'প্রস্বর' শব্দের ভাবদ্যোতনাই বেশি বলে মনে করি। কারণ, 'স্বন' শব্দ ধ্বনিবোধক বটে, কিন্তু কণ্ঠধ্বনিবোধক নয়। তাছাড়া, 'প্রস্বন' শব্দের ঐতিহ্যগুণও নেই।

যা হক, পূর্বোক্ত স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত শব্দের তুলনায় 'প্রস্বর' শব্দ প্রয়োগের আর-এক সুবিধা এই যে, এটিকে প্রয়োজনমতো নানাভাবে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন—প্রস্বরণ (accentuation), প্রস্বরিত (accented), প্রস্বরিক (accentual)। 'শ্বাসাঘাত' শব্দকে এভাবে রূপান্তরিত করা যায় না।

পূর্বে দেখেছি অ্যাক্সেন্ট দ্বিবিধ। এ দু-রকম অ্যাক্সেন্টকে বলা যায় যথাক্রমে **গীতপ্রস্বর** (musical বা pitch accent) এবং **ঘাতপ্রস্বর** (stress accent)। শব্দের বা শব্দগুচ্ছের কোনো বিশেষ দলের উচ্চারণে কণ্ঠস্বরের গীতসুলভ তীব্রতা-বৃদ্ধিকে বলা যায় 'গীতপ্রস্বর'। আর, কোনো বিশেষ দলের উচ্চারণে কণ্ঠস্বরের শক্তিপাতজনিত চাপ-বৃদ্ধিকে বলা যায় 'ঘাতপ্রস্বর'। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় রবীন্দ্রোক্ত তালের 'ঘা' বা 'আঘাত' শব্দ ('ছন্দ', তৃতীয় সং, পৃ ১৩৯ ও ১৪৭)। এই ঘাতপ্রস্বরকে চলতি কথায় বলা হয় 'ঝোঁক'। এই দ্বিবিধ প্রস্বরেরই উদ্দেশ্য শব্দের বা শব্দগুচ্ছের কোনো বিশেষ দলকে অন্যান্য দলের তুলনায় কিছু বেশি গুরুত্ব দেওয়া।

বৈদিক ভাষার উচ্চারণে গীতপ্রস্বরের খুবই গুরুত্ব ছিল। কিন্তু এই গীতপ্রস্বর বৈদিক ছন্দের নিয়ামক ছিল না। বাংলা ভাষার উচ্চারণে ঘাতপ্রস্বরেরই প্রাধান্য। তাই বাংলা ছন্দের আলোচনায় প্রস্বর বললে ঘাতপ্রস্বরই বোঝায়, গীতপ্রস্বর নয়। ফলে বাংলায় প্রয়োজনমতো কোনো দলকে প্রস্বরিত বা অপ্রস্বরিত বলাই যথেষ্ট। ঘাতময় (stressed) বা ঘাতহীন (unstressed) বলবার প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে বিশেষ বক্তব্য এই যে, বাংলা ছন্দের কোনো রীতিই প্রস্বর-নিয়ন্ত্রিত নয়। সব রীতিতেই (বিশেষতঃ কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতিতে) পর্ব ও মাত্রা-বিন্যাসের প্রণালীভেদে প্রস্বরের ন্যূনতা বা আধিক্য ঘটে।

কেউ কেউ গীতপ্রস্বর ও ঘাতপ্রস্বর ছাড়া আর-এক রকম প্রস্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাকে বলা হয় duration accent। এই তৃতীয় প্রকার প্রস্বরের বাংলা করা যায় **ব্যাপ্তিপ্রস্বর**। বাংলা ছন্দে ব্যাপ্তিপ্রস্থর আছে কিনা তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। ব্যাপ্তিপ্রস্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হলেও এই পারিভাষিক শব্দটি ব্যবহারের প্রয়োজন থেকে যাবে। বাংলা ছদের আলোচনায় primary ও secondary accent অর্থে প্রয়োজনমতো মুখ্য ও গৌণ প্রস্বর, অধিপ্রস্বর-উপপ্রস্বর বা প্রস্বর-উপপ্রস্বর চালানো যেতে পারে। এই তিন জোড়া শব্দের মধ্যে তৃতীয় জোড়ারই ব্যবহারযোগ্যতাই সবচেয়ে বেশি বলে মনে করি।

প্রাকৃত রীতি (রবীন্দ্রনাথ)—আমরা যাকে বলি 'দলবৃত্ত' রীতি, আর সাধারণভাবে যাকে বলা যায় চলতি ভাষার বা লৌকিক রীতি, তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলতেন 'প্রাকৃত' রীতি। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি ('ছন্দ' তৃতীয় সং, পৃ ১১৭) এই—"আমরা বাংলায়, সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে দুই ভিন্ন নিয়মে চলি, তার অন্যথা করা

অসম্ভব। তাই বাংলা কাব্যে এই দুই ভাষার ধারায় ছন্দের রীতি দুই ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে।” সাধু রীতির বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন ‘সংস্কৃত বাংলা’ আর চলতি রীতির বাংলাকে বলতে ‘প্রাকৃত বাংলা’ বা ‘বাংলা প্রাকৃত’। তাই তিনি সাধু বাংলার ছন্দোরীতিকে বলতেন ‘সাধুরীতি’, আর চলতি বাংলার ছন্দোরীতিকে বলতেন ‘প্রাকৃত রীতি’। প্রাকৃত রীতির ছন্দে মাত্রাগণনাপ্রণালী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত দ্রষ্টব্য পরবর্তী **সাধুরীতি** প্রসঙ্গে।

বন্ধ—ছন্দোরূপেরই নামান্তর ‘ছন্দোবন্ধ’। ছন্দের রীতি হচ্ছে তার অন্তঃপ্রকৃতির পরিচায়ক। এই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় মাত্রাগণনাপ্রণালীর দ্বারা। আর ছন্দের রূপ বা বন্ধ হচ্ছে তার বহিরাকৃতির পরিচায়ক। এই আকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় মাত্রা-পর্ব- ও পদ-বিন্যাসপ্রণালীর দ্বারা। ছন্দের রীতি শুধুই শ্রুতিগ্রাহ্য। আর ছন্দের রূপ বা বন্ধও মূলতঃ শ্রুতিগ্রাহ্য, কিন্তু লিখিত বা মুদ্রিত আকারে তাকে দৃষ্টিগ্রাহ্যও করা যায়। ছন্দের বন্ধ-রচনায় মাত্রা- ও পর্ব-সমাবেশের চেয়ে পদ-সমাবেশেরই গুরুত্ব বেশি। বস্তুতঃ পদবদ্ধ রচনারই নাম ‘পদ্য’। তাই ছন্দোবন্ধ বলতে প্রধানতঃ পদসমাবেশই বোঝায়। আর ছন্দের বন্ধগুলির নামকরণও হয়েছে প্রতি পঙ্‌ক্তির পদ-সংখ্যা অনুসারে। বাংলা ছন্দের প্রধান বন্ধ চার রকম—একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী। এগুলি আবার পদের দৈর্ঘ্যভেদে (অর্থাৎ পর্বসংখ্যাভেদে) অন্ততঃ দুই রকম। মনে রাখতে হবে একপদী, দ্বিপদী প্রভৃতি বন্ধ আসলে পঙ্‌ক্তিরূপের পরিচায়ক। এই চতুর্বিধ পঙ্‌ক্তিরূপের মধ্যে একপদী রূপটাই সবচেয়ে কম দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় দ্বিপদীরূপ বা বন্ধ। এই দ্বিপদীর মধ্যে আবার আট-ছয় মাত্রার রূপটাই চলে সবচেয়ে বেশি। দ্বিপদী বন্ধের এই বিশেষ রূপটারই প্রয়োগসিদ্ধ নাম **পয়ার**। আধুনিক কালে আট-দশ মাত্রার এক প্রকার দীর্ঘ দ্বিপদী বন্ধ প্রচলিত হয়েছে। এই দীর্ঘ দ্বিপদীর নাম হয়েছে **মহাপয়ার**। এই দু-রকম পয়ারই আধুনিক কালে আর এক নূতন রূপ পেয়েছে, নূতন পরিভাষায় যাকে বলি **প্রবহমান** (enjambed)। চিরাগত পয়ারবন্ধকে বলা যায় **যতিপ্রান্তক** (endstopped)। এই ছোট পয়ারকে প্রবহমান রূপ দিয়েছেন কবি মধুসূদন। তাছাড়া তিনি মিলও বর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত অমিল প্রবহমান পয়ারই ‘অমিত্রাক্ষর’ পয়ার নামে পরিচিত হয়েছে।

পয়ার বন্ধ, ত্রিপদী বন্ধ প্রভৃতি বন্ধনাম সাধারণতঃ শুধু পয়ার, ত্রিপদী বলেই উল্লিখিত হয়। অর্থাৎ ‘বন্ধ’ কথাটা উহ্য রাখা হয়। পারিভাষিক আলোচনায় ‘বন্ধ’ কথাটা এভাবে বাদ দেওয়া যায় না। তাতে অনেক সময় ভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কা থাকে। আর, ‘পয়ার ছন্দ’, ‘ত্রিপদী ছন্দ’, ইত্যাদি আখ্যা বর্জন করাই ভাল।—দ্রষ্টব্য পরবর্তী ‘**মুক্তক**’ প্রসঙ্গ।

বর্ণ—সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে অক্ষর ও বর্ণ শব্দ অভিন্নার্থক বলেই স্বীকৃত। এই দুই শব্দেরই মানে মুক্তদল (open syllable)। রুদ্ধদল (closed syllable)-এর ধারণা ভারতীয় ভাষাচিন্তায় ছিল না। যেমন, ভারতীয় মতে ‘কল্পনা’ (ক. ল্প. না) শব্দে আছে তিন অক্ষর বা বর্ণ—মধ্যে একটি ‘যুক্ত’ অক্ষর বা বর্ণ, বাকি দুটি ‘অযুক্ত’। এটা হল ‘কল্পনা’ শব্দের লিপিরূপের তথা দৃষ্টরূপের বর্ণনা। কিন্তু তার উচ্চারণরূপ তথা শ্রুতরূপ হল—কল্ প না। এর প্রথমে আছে একটি ‘রুদ্ধ’ দল, বাকি দুটি ‘মুক্ত’। শব্দের এই শ্রুতরূপটাই ছন্দের অবলম্বন, দৃষ্টরূপটা নয়। কল্. প. না শব্দের ‘প’ এবং ‘না’ এই দুটি শ্রুতবিভাগকে প্রাচীন ছন্দপরিভাষায় অযুক্ত বর্ণ বা অক্ষর বলা যায়, কিন্তু ‘কল্’-কে কিছুই বলা যায় না। তাই একে নূতন

পরিভাষায় বলতে হয়েছে 'রুদ্ধদল', আর প, না প্রভৃতি বিভাগকে বলা হয়েছে 'মুক্তদল'। বৈজ্ঞানিক ছন্দচিন্তায় এ ক্ষেত্রে প্রাচীন পরিভাষা চালানো সম্ভব নয়। তাই বাংলা ছন্দশাস্ত্রে letter অর্থে 'অক্ষর' বা 'বর্ণ' এবং syllable অর্থে 'দল' শব্দ চালানোই সংগত।

বল—সুনীতিকুমার, অমূল্যধন প্রমুখ কেউ কেউ accent অর্থে 'বল' ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই শব্দটা সুন্দর এবং পরিভাষা হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী। কিন্তু উচ্চারণের pitch ও stress, এই উভয় ক্ষেত্রেই কণ্ঠস্বরের বল প্রকাশ পায়, অর্থাৎ 'বল' শব্দের দ্বারা শুধু stress বোঝায় না। ফলে এই শব্দব্যবহারে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। আর যদি মেনেই নেওয়া যায় যে, এক্ষেত্রে 'বল' মানে stress, তবু প্রশ্ন থেকে যায় তাহলে pitch-এর বাংলা কি হবে? তাছাড়া, 'বল' শব্দকে 'প্রস্বর'-এর মতো নানাভাবে রূপান্তরিত করাও যায় না।

বিশ্লেষ, সংশ্লেষ *—প্রধানতঃ রুদ্ধদলের উচ্চারণ-নিয়ন্ত্রণের ফলেই বাংলা ছন্দ-রচনায় তিন রাতির উদ্ভব হয়েছে। ছন্দের তিন রীতি-ভেদে এই উচ্চারণনিয়ন্ত্রণ ঘটানো হয় তিন উপায়ে—রুদ্ধদলের প্রসারণ, সংকোচন এবং এই দুই-এর মিশ্রণ ঘটিয়ে। যেমন—কলাবৃত্ত রীতির প্রধান লক্ষণ রুদ্ধদলের নিত্য প্রসারণ, দলবৃত্ত রীতির প্রধান লক্ষণ রুদ্ধদলের প্রায়-নিত্য সংকোচন, আর মিশ্রবৃত্তের লক্ষণ রুদ্ধদলের অবস্থানভেদে এই সংকোচন প্রসারণের সন্নিপাত। রুদ্ধদল উচ্চারণের এই সংকোচন ও প্রসারণকে ছন্দ-পরিভাষায় যথাক্রমে বলি **সংশ্লেষ** ও **বিশ্লেষ**। এই শব্দ প্রয়োজনমতো বিশেষণ রূপেও প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন, **সংশ্লিষ্ট** বা **বিশ্লিষ্ট** উচ্চারণ। আবার সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট রুদ্ধদল মানে সংশ্লিষ্ট বা বিশিষ্ট রূপে উচ্চারিত রুদ্ধদল।

ব্যাপ্তিপ্রস্বর *—দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী '**প্রস্বর**' প্রসঙ্গ। বাংলা ছন্দের আলোচনায় ব্যাপ্তিপ্রস্বরের স্বীকৃতি অত্যাবশ্যক নয়।

বেড়াভাঙা পয়ার (রবীন্দ্রনাথ)—মুক্তক পয়ারকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বেড়াভাঙা পয়ার'। এই নামটা ছন্দোবন্ধবিশেষের বর্ণনামাত্র। পারিভাষিক নাম নয়।

মহাপদ *—কোনো-কোনো ছন্দোবন্ধে আট মাত্রার দুই পদই এক পদ বলে গণ্য হয়। এরূপ দ্বিগুণিত দীর্ঘ পদকে বলা যায় 'মহাপদ'। এ-রকম মহাপদ নিয়ে গঠিত ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধকে বলা যায় যথাক্রমে **মহাত্রিপদী** ও **মহাচৌপদী**।

মহাপয়ার (রবীন্দ্রনাথ)—আট ও দশ মাত্রার দুই পদ নিয়ে গঠিত দ্বিপদী ছন্দোবন্ধের পারিভাষিক নাম 'মহাপয়ার'। এই নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। তিনি একে 'দীর্ঘ পয়ার' বা 'বড়ো পয়ার' বলেও বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এই দীর্ঘ দ্বিপদী বন্ধ পয়ার বা পয়ারের রূপভেদ বলে স্বীকৃত ছিল না। বস্তুতঃ এই ছন্দোবন্ধ সেকালে কোনো নামেই পরিচিত ছিল না। এই নামহীন ছন্দোবন্ধের প্রয়োগও ছিল একান্ত বিরল। এর ব্যাপক প্রয়োগ প্রথম দেখা দেয় রবীন্দ্রসাহিত্যে। তাই তার নামকরণও করতে হয়েছে তাঁকেই। শুধু তাই নয়, এই ছন্দোবন্ধের পদবিভাগ অর্থাৎ আট মাত্রার পরে অর্ধযতি স্থাপনের নীতিও প্রথম স্বীকৃতি পায় তাঁর কাছেই। পূর্বগামী কবি রঙ্গলাল বা দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত মহাপয়ার-পঙ্‌ক্তিতে অর্ধযতি-স্থাপনের কোনো নির্দিষ্ট নীতি দেখা যায় না।

মাত্রা—'মাত্রা' মানে আদর্শ মান। অর্থাৎ, যে স্বল্পায়তন বস্তুর আনুপাতিক সংখ্যা গণনা করে কোনো বৃহত্তর বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা যায় তাকে বলা হয় 'মাত্রা'। 'মীয়তে অনয়া ইতি মাত্রা।' সংক্ষেপে বলা যায়, মাত্রা মানে পরিমাপক বা পরিমাণ-নির্ণায়ক (unit of measure)। শব্দটি আপেক্ষিক। কেননা, বস্তুর প্রকৃতি ও আয়তন-ভেদে এর মাত্রা-ভেদ ঘটে। এক বস্তুর যা পরিমাপক অন্য বস্তুর তা নয়। তাই ছন্দের বন্ধ ও রীতি-ভেদে তার মাত্রাও হয় ভিন্ন-ভিন্ন। যেমন—পঙ্‌ক্তির মাত্রা পদ, পদের মাত্রা পর্ব। আর রচনার রীতিভেদে কোনো পর্বের মাত্রা 'দল', কোনো পর্বের মাত্রা 'কলা'। এই দুই রকম মাত্রাকে বলা যায় যথাক্রমে **দলমাত্রা** ও **কলামাত্রা**। এইসব মাত্রার সাহায্যেই ছন্দের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণীত হয়। পর্ব পরিমিত হয় দল বা কলার সংখ্যা অনুসারে। যেমন—চতুর্দল পর্ব, পঞ্চকল পর্ব। পদ পরিমিত হয় পর্বসংখ্যা অনুসারে। যেমন—দ্বিপর্বক পদ, ত্রিপর্বক পদ। পঙ্‌ক্তি পরিমিত হয় পদসংখ্যা অনুসারে। যেমন—দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি, ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি। আর, স্তবক পরিমিত হয় পঙ্‌ক্তিসংখ্যা অনুসারে। যেমন—দুই, তিন ও চার পঙ্‌ক্তির গুচ্ছকে বলা যায় যথাক্রমে **যুগ্মক, ত্রিতক** ও **চতুষ্ক**। বস্তুতঃ ছন্দের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ে কলা, দল, পর্ব, পদ ও পঙ্‌ক্তি এই পাঁচটি উপাদানই ক্ষেত্রভেদে একে অন্যের মাত্রা রূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে।

এই মাত্রাজ্ঞানই ছন্দচিন্তার মূলকথা। কিন্তু এ বিষয়ে একটি ভ্রান্তধারণা দীর্ঘকাল যাবৎ চলে আসছে। 'মাত্রা' শব্দের সংজ্ঞাসূত্রেই এই ভ্রান্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সুপ্রচলিত সংজ্ঞাসূত্রটি এই।—"একটি হ্রস্ব স্বর বা দলের উচ্চারণকালকে বলা হয় **মাত্রা** *(mora)*।" এই সংজ্ঞাসূত্রের মাত্রা মানে 'কলা'। মাত্রা ও কলা শব্দকে অভিন্নার্থক বলে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। সে কথা একটু পরেই বলা যাবে। আসল কথা এই যে, মাত্রা বা কলাকে কালসূচক বলে মনে করাটাই ভুল। ছন্দের কারবার ধ্বনিপরিমাণ নিয়ে, কালপরিমাণ নিয়ে নয়। তাই তার মাত্রাও স্বভাবতঃই ধ্বনিসূচক, কালসূচক হতেই পারে না। ধ্বনিমাত্রই কালাশ্রিত বটে, কিন্তু ছন্দের আলোচনায় আমরা প্রত্যক্ষতঃ ধ্বনিরই পরিমাপ করি, কালের নয়। ছন্দোবদ্ধ রচনায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ধ্বনি নির্দিষ্ট প্রণালীতে উচ্চারিত হল কিনা সেটাই বিবেচ্য, নির্দিষ্ট কালে উচ্চারিত হল কিনা তা নয়। বস্তুমাত্রই দেশাশ্রিত। কিন্তু আমরা যখন কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্যপ্রস্থের পরিমাপ করি তখন প্রত্যক্ষতঃ সেই বস্তুর মাপটাই হয় আমাদের লক্ষ্য, দেশের (space-এর) মাপ হয় পরোক্ষ। বস্তুতঃ পদ্যরচনার ছন্দ ও তার মাত্রা কালাশ্রিত হলেও কালাত্মক নয়, যেমন কোনো চিত্র ও তার রেখা দেশাশ্রিত হলেও দেশাত্মক নয়, এই কথাটুকু মনে রাখা দরকার। তাই কলা অর্থে মাত্রা শব্দের সংজ্ঞাসূত্রে কালের উল্লেখ একেবারেই অবাস্তব ও বিভ্রান্তিকর।[১]

এখানে জানিয়ে রাখা কর্তব্য যে, এই লেখকও দীর্ঘকাল এই ভ্রান্ত ধারণার প্রভাবাধীন ছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'ছন্দ-পরিক্রমা' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেও (১৯৬৫)।[২] কিন্তু অনতিকাল পরেই নিজের মনের এই ভ্রান্তির নিরসন ঘটে তাঁর নিবিড়তর ছন্দচিন্তায়। এই ভ্রান্তিমুক্তির নিদর্শন আছে 'ছন্দ'-পরিক্রমা'র পরবর্তী সংস্করণেই (১৯৭৭)।[৩] অমূল্যধনের ছন্দচিন্তাও এই ভ্রান্তির প্রভাবমুক্ত ছিল না। তার নিদর্শন আছে তাঁর 'মূলসূত্র' গ্রন্থের শেষ (সপ্তম) সংস্করণেও (১৯৮৩)। এই গ্রন্থে একমাত্র কলা (mora)-ই ছন্দের মাত্রা বলে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ দলমাত্রার কোনো স্বীকৃতি নেই এই গ্রন্থে। তাছাড়া এই গ্রন্থের স্বীকৃত মাত্রাও একান্তভাবেই কালাত্মক। মূলসূত্রের এক স্থানে (পৃ ৩১) বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে—"বাংলা ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে। মাত্রার মূল তাৎপর্য duration বা **কালপরিমাণ**। এক-একটি অক্ষরের

উচ্চারণে কি পরিমাণ **সময়** লাগে তদনুসারে মাত্রা স্থির করা হয়।" অর্থাৎ এই গ্রন্থের মতে ছন্দের **কালমাত্রাই** বিবেচ্য বিষয়, ছন্দের **ধ্বনিমাত্রা** বিবেচ্যই নয়। এর চেয়ে বিভ্রান্তিকর আর কি হতে পারে?

মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

—বলাকা-৩৭, "দূর হতে কে শুনিস"

এই দুই পঙ্‌ক্তিতে কি পরিমাণ **ধ্বনি** বিন্যস্ত হয়েছে সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয়, নাকি এই দুই পঙ্‌ক্তির উচ্চারণে কি পরিমাণ **সময়** লাগে সেটা?

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল (এবং আরও কেউ কেউ) ইংরেজি সিলেব্‌ল্ অর্থেও 'মাত্রা' শব্দ ব্যবহার করতেন। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য লেখকের 'আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য' গ্রন্থ (১৯৮০, পৃ ১০-১১ এবং ২০-২১)। এ বিষয়ে আরও পরিচয় দেওয়া যাবে পরবর্তী '**সাধুরীতি**' প্রসঙ্গে।

মাত্রাবৃত্ত† —প্রাচীন (সংস্কৃত ও প্রাকৃত) ছন্দশাস্ত্রে একটি হ্রস্ব স্বরের সমপরিমাণ ধ্বনিকে বলা হত **কলা** (mora)। আর, এক রীতির ছন্দের ধ্বনিপরিমাণ নিরূপিত হত কলাসংখ্যার হিসাবেই। তাই এই রীতির ছন্দে কলাসংখ্যাভেদে বিভিন্ন আয়তনের গণকে (পর্বকে) বলা হত চতুষ্কল গণ, পঞ্চকল গণ বা ষট্‌কল গণ। কিন্তু এই কলাসংখ্যাত ছন্দোরীতিটা সেকালে পরিচিত ছিল **মাত্রাবৃত্ত** নামে। তাতে কোনো বিভ্রান্তি ঘটার কোনো সুযোগ ছিল না। কেননা তখন একমাত্র কলাই ছিল ছন্দের মাত্রা, অর্থাৎ ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয়ের উপাদান। ফলে মাত্রা বললেই বোঝাত কলা, কলা বললেই বোঝাত মাত্রা। তাই এই রীতির সংজ্ঞাসূত্রেও কলা ও মাত্রা শব্দ অভিন্নার্থে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। সেকালে কলা ছাড়া ছন্দের আর কোনো মাত্রা (ধ্বনিমাপের উপাদান) ছিল না বলেই কলা ও মাত্রা শব্দের এ-রকম অভিন্নার্থক প্রয়োগে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু বাংলায় এক রীতির ছন্দে ধ্বনিপরিমিত হয় কলাসংখ্যা অনুসারে, আর-এক রীতির হয় দলসংখ্যা অনুসারে। অর্থাৎ একরীতিতে ছন্দের মাত্রা কলা, আর-এক রীতিতে দল। বাংলায় এই দু-রকম মাত্রা থাকাতেই কলা ও মাত্রা শব্দকে অভিন্নার্থক বলে স্বীকার করা যায় না। তাই বাংলা কলামাত্রক ছন্দকে 'মাত্রাবৃত্ত' বলা যায় না, বলা উচিত **কলাবৃত্ত**।

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, 'মাত্রাবৃত্ত' নামটা একেবারেই অসার্থক। কেন না, অন্যান্য বহু ভাষার ছন্দই তো কোনো-না-কোনো মাত্রার দ্বারা পরিমিত হয়, ফলে সেসব ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলতে হয়। তাতে সেসব ছন্দের আসল প্রকৃতিটা অজ্ঞাত থেকে যায়। যেমন, বাংলায় এক শ্রেণীর ছন্দ পরিমিত হয় দলমাত্রার দ্বারা। তা বলে তাকেও কি মাত্রাবৃত্ত বলা যাবে? এসব কারণে বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'মাত্রাবৃত্ত' নাম বর্জন করাই সমীচীন মনে করি! এমন কি, কলাসংখ্যাত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দকে 'মাত্রাবৃত্ত' না বলে প্রাচীন বা প্রত্ন 'কলাবৃত্ত' বলাই যুক্তিসংগত। তবে বহুকালের প্রয়োগসিদ্ধ বলে 'মাত্রাবৃত্ত' নামটা একেবারে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র অনুসরণের ফলে বাংলা ছন্দের আলোচনাতেও 'মাত্রাবৃত্ত' নামের প্রয়োগ দেখা যায় ঊনবিংশ শতক থেকেই। কিন্তু এই নামটা দীর্ঘকাল খুবই স্বল্পরিচিত ছিল। 'মাত্রাবৃত্ত' নামটা ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে বর্তমান লেখকের প্রথম ছন্দপ্রবন্ধ প্রকাশের (১৯২২-২৩) সময় থেকে। কিন্তু গভীরতর

বিচারভাবনার ফলে বোঝা গেল 'মাত্রাবৃত্ত' নামটা বর্জন করাই সমীচীন। তার পরিবর্তে 'কলামাত্রক' বা 'কলাবৃত্ত' নাম ব্যবহার করাই সংগত।

মাত্রিক (দ্বিজেন্দ্রলাল)—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন 'বাংলা প্রাকৃত' আর আমরা যাকে বলি 'দলবৃত্ত' রীতি, দ্বিজেন্দ্রলালের মতে তারই নাম 'মাত্রিক'।—দ্রষ্টব্য পরবর্তী 'রীতি' প্রসঙ্গে।

মিতাক্ষর (দ্বিজেন্দ্রলাল)—পূর্বাগত অক্ষরবৃত্ত (অক্ষরগোনা) ছন্দোরীতিকে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'ত্রিবেণী' কাব্যের ভূমিকায় (১৯১২) আখ্যাত করেছিলেন 'মিতাক্ষর' নামে। দ্বিজেন্দ্রলালের সংজ্ঞাসূত্র অনুসারে মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর পয়ারও 'মিতাক্ষর', কারণ অক্ষরসংখ্যার হিসাবেই 'পরিমিত' হয়। অধিকন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মতে কলাবৃত্ত (অর্থাৎ রবীন্দ্রপ্রবর্তিত নূতন সাধু) রীতির ছন্দও 'মিতাক্ষর'। পক্ষান্তরে মূলসূত্রের (পৃ ৭০-৭১) মতে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর পয়ার 'অ-মিতাক্ষর' এবং অন্যসব অ-প্রবহমান (অক্ষরগোনা) ছন্দোবদ্ধই 'মিতাক্ষর'। বোধ করি মূলসূত্র-কথিত মিতাক্ষর ও অমিতাক্ষর শব্দের 'অক্ষর' মানে সিলেবল নয়। নতুবা স্বীকার করতে হবে, হয়তো একমাত্র শ্বাসাঘাতপ্রধান ছাড়া অন্য দুই রীতির সব ছন্দোবদ্ধই অ-মিতাক্ষর।

মিল—দুটি বা ততোধিক একদল শব্দ বা শব্দাংশের (মুক্ত বা রুদ্ধ) প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণগত অসাম্য এবং তার পরবর্তী স্বরবর্ণের উচ্চারণগত সাম্যকে চলতি কথায় বলা হয় 'মিল'। যেমন—পা-না, চাই-পাই। যদি এই একদল মিলের পরবর্তী সব ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের পর্যায়ক্রমিক উচ্চারণগত সমতা থাকে তবে সব দলের মিলিত ধ্বনি সাম্যাকেও 'মিল' বলা হয়। যথাক্রমে দ্বিদল ও ত্রিদল দৃষ্টান্ত—(১) ভূমি-তুমি, সিন্ধু-বিন্দু ; (২) মালিকা-বালিকা। মিল সাধারণতঃ পঙ্‌ক্তি, পদে ও পর্বের অন্তে থাকে। কখনও কখনও পদ বা পর্বের আদিতেও থাকে। মিলের পারিভাষিক নাম **উপযমক**।

মিলের ফাঁক—গানে যেমন তালির সঙ্গে ফাঁক থাকে, ছন্দেও তেমনি মিলের সঙ্গে ফাঁক থাকতে পারে। তবে মিলের ফাঁক বেশি দেখা যায় না। গানে সাধারণতঃ তিন তালি ও এক ফাঁক থাকে, ছন্দেও তেমনি প্রায়শঃ তিন মিল ও এক ফাঁক দেখা যায়। যেমন—

ঘাটে বসে আছি। আনমনা,
যেতেছে বহিয়া। সুসময়।
এ বাতাসে তরী। ভাসাব না
তোমাপানে যদি। নাহি বয়।
দিন যায়, ওগো। দিন যায়,
দিনমণি যায়। **অস্তে**।
নাহি হেরি বাট, । দূরতীরে মাঠ
ধূসর গোধূলি । ধূলিময়।

—নৈবেদ্য ২১, 'ঘাটে বসে আছি'

সুসময়, নাহি বয় ও ধুলিময়, এই তিন মিল। আর-এক মিলের স্থানে আছে ফাঁক—ওই ফাঁকটুকুতে আছে মিলহীন 'অস্তে' শব্দ। ছন্দে সাধারণতঃ তৃতীয় মিলের স্থানে ফাঁক দেখা যায়। গানে তালির ফাঁক প্রকারান্তরে তালিরই কাজ করে। ছন্দেও তেমনি মিলের ফাঁক পরোক্ষে মিলেরই কাজ কর—এই ফাঁকের উদ্দেশ্য মিলের শ্রুতিরসে একঘেয়েমি নিরস্ত করে কিছু বৈচিত্র্য আনা। যে পঙ্ক্তিতে মিলের ফাঁক থাকে তাকে বলা যায় **নিঃসঙ্গ** পঙ্ক্তি।

মিশ্রবৃত্ত *—যে ছন্দোরীতিতে শব্দান্ত্য রুদ্ধদল প্রায় সর্বদাই বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক রূপে এবং শব্দের অপ্রান্ত রুদ্ধদল সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়, তাকে বলি 'মিশ্র-কলাবৃত্ত', সংক্ষেপে 'মিশ্রবৃত্ত'। আদিকালে লিখিত সাধুসাহিত্যে প্রচলিত ছিল কলাবৃত্ত রীতি, আর অলিখিত লোকসাহিত্যে প্রচলিত ছিল আদিম দলবৃত্ত (সেকালের নাম **লাচাড়ি**) রীতি। কালক্রমে সাধু কলাবৃত্তের উপরে লৌকিক দলবৃত্ত অর্থাৎ লাচাড়ির প্রভাব পড়তে থাকে। তার ফলে যে মিশ্রপ্রকৃতির কলাবৃত্ত রূপ দেখা দেয় তাকেই বলি **মিশ্র-কলাবৃত্ত,** সংক্ষেপে **মিশ্রবৃত্ত**।—দ্রষ্টব্য পরবর্তী **'লাচাড়ি'** সংজ্ঞা।

মুক্ত ও রুদ্ধ (দল, স্বর)*—এই দুটি শব্দই 'স্বর' ও 'দল' শব্দের বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয়ে থাকে বিশেষ পারিভাষিক অর্থে। নিম্নে যথাক্রমে মুক্ত ও রুদ্ধ স্বর এবং মুক্ত ও রুদ্ধ দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

একশ্রুত স্বরধ্বনির (অর্থাৎ একক স্বরের) পারিভাষিক নাম **মুক্তস্বর** (open vowel)। আর দ্বিশ্রুত স্বরধ্বনি (অর্থাৎ জোড়াস্বর) ছন্দপরিভাষায় আখ্যাত হয় **রুদ্ধস্বর** (closed vowel) নামে। বাংলায় মুক্তস্বর আছে ছয়টি —অ আ, ই উ, এ ও। এই ছয়টি স্বরের মধ্যে ই উ এ ও, এই চারটি স্বরের আবার একটি করে অপূর্ণ বা খণ্ডিত রূপও আছে। যেমন—বই্, বউ্ বঅ্ (লিখিত রূপ বয়, মানে 'বহে') এবং বও্ শব্দের অন্তস্থিত ই্ উ্ এ্ ও্ এই চার স্বরের পূর্ণ উচ্চারণ হয় না। এ-রকম অপূর্ণোচ্চারিত স্বরধ্বনির পারিভাষিক নাম **খণ্ডস্বর** (vowel particle)। কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় **ভাঙ্‌টাস্বর**। পূর্ববর্তী কোনো পূর্ণস্বরের আশ্রয় না পেলে খণ্ডস্বরগুলি উচ্চারণযোগ্য হয় না। যেমন—বই্, ঢেউ্, শোএ্ (শোয়্), দাও্ শব্দের ই্ উ্ এ্ ও্, এই চারটি খণ্ডস্বর যথাক্রমে পূর্ববর্তী অ, এ, ও এবং আ, এই চারটি পূর্ণস্বরের আশ্রিত। তাই খণ্ডস্বরকে **'আশ্রিত স্বর'** বলেও বর্ণনা করা যায়। ফলে খণ্ডস্বরের নিম্নস্থিত তির্যক্ (্) চিহ্নটিকে বলা যায় **আশ্রয়চিহ্ন**। একটি পূর্ণস্বর ও একটি খণ্ডস্বর (বা আশ্রিত স্বর) নিয়ে গঠিত হয় একটি রুদ্ধস্বর। বাংলায় অই্ অউ্ অএ্ (অয়্) অও্ প্রভৃতি অন্ততঃ ষোলটি রুদ্ধস্বর আছে।

বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনধ্বনি পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরবর্ণের আশ্রয় না পেলে উচ্চারণযোগ্য হয় না। যেমন, অক্ (অ+ক্) বা ক (ক্+অ)। তাই বলা যায় অনুস্বার-বিসর্গ সহ সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনিই আসলে এক-একটি খণ্ড ব্যঞ্জন। যেমন—খণ্ড ত্, খণ্ড ক্। খণ্ডস্বর ও খণ্ডব্যঞ্জনকে এক কথায় বলা যায় **খন্ডবর্ণ** (sound particle বা phoneme)। অন্যভাবে বলা যায়, খণ্ডবর্ণের দুই শাখা-খণ্ডস্বর ও খণ্ডব্যঞ্জন। পূর্বেই বলা হয়েছে বাগ্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ডের পারিভাষিক নাম দল (syllable)। এই দলের দুই রূপ—মুক্তস্বরান্ত (ক, কা) ও খণ্ডবর্ণান্ত (কই, কান)। এই দুই পারিভাষিক নাম যথাক্রমে **মুক্তদল (open syllable)** ও **রুদ্ধদল (closed syllable)**।

মুক্ত ও রুদ্ধ স্বর এবং মুক্ত ও রুদ্ধ দল, বাংলা বাগ্‌ধ্বনির এই চারটি মৌলিক উপাদানের গুরুত্ব কম নয়। কেননা, সমগ্র বাংলা ছন্দশাস্ত্রই গড়ে উঠেছে এই চার স্তম্ভের উপরে।

এইসব পরিভাষার ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যেমন রুদ্ধস্বরকে diphthong বলা সমীচীন নয় বলেই মনে করি। যেমন coin, loud, side শব্দের oi, ou, ie এই স্বরধ্বনিকে ইংরেজিতে diphthong ও বাংলায় রুদ্ধস্বর বলা যায়। কিন্তু feat, deal শব্দের ea ধ্বনি diphthong বটে, কিন্তু বাংলা ছন্দপরিভাষায় রুদ্ধস্বর বলা যাবে না, বলতে হবে দুটো মুক্তস্বর। Real শব্দের ea-কেও রুদ্ধস্বর বলি না। এখানে আছে পাশাপাশি দুটো মুক্তস্বর। তাই ea-কেও 'যুগ্মস্বর' (diphthong) বলা গেলেও রুদ্ধস্বর বলা যায় না। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের মতে বাংলা 'যুগ্মস্বর' আছে ২৫টি—তার মধ্যে ইএ (দিয়ে), উআ (পড়ুয়া), উগ্র (ধুয়ে) ওআ (ঘরোয়া) প্রভৃতিও আছে। লক্ষণীয় এই সবগুলিতেই দুটি করে পূর্ণস্বর, খণ্ডস্বর নেই কোনোটিতেই। সুতরাং এগুলিকে 'যুগ্মস্বর' বা 'জোড়াস্বর' (diphthong) বলা গেলেও 'রুদ্ধস্বর' (closed vowel) বলা যায় না কিছুতেই। বাংলায় রুদ্ধস্বর আছে মোটামুটি ষোলটি, পঁচিশটি নয়।

এক সময় আমি **যুগ্মস্বর** ও diphthong এই দুটি শব্দই ব্যবহার করতাম। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেই সে ভুল সংশোধন করেছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দসরস্বতী' গ্রন্থে (দ্বিতীয় প্রকাশ) diphthong শব্দের প্রয়োগ আছে। অমূল্যধনের 'মূলসূত্র' গ্রন্থেও (সপ্তম সং, পৃ ২৪) আছে। এ-রকম প্রয়োগ সুচিন্তিত নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

এখানে আরও একটা কথা বলা আবশ্যক। বাংলায় যাকে বলেছি 'খণ্ডস্বর', ইংরেজি ধ্বনিতত্ত্বে তার কোনো প্রতিশব্দ নেই। প্রতিশব্দ রচনার প্রয়োজনও অনুভূত হয় নি। বাংলায় তার প্রয়োজন আছে বলেই 'খণ্ডস্বর' কথাটা বানিয়ে নিতে হয়েছে। ফলে বাংলা ও ইংরেজিতে স্বরবর্ণের শ্রেণীবিভাগে গুরুতর পার্থক্য ঘটেছে। বাংলা মুক্তদল-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ open syllable মানে *a syllable ending in vowel*। আর, রুদ্ধদল-এর ইংরেজি closed syllable মানে *a syllable ending in consonant*। লক্ষণীয় এই সংজ্ঞাসূত্রে খণ্ডস্বরান্ত দলের উল্লেখ নেই। অথচ ইংরেজিতেও ও-রকম দলের অভাব নেই। যেমন—I, high, sky, thou, you, new, toy, how, বস্তুতঃ বাংলার ন্যায় ইংরেজি স্বরধ্বনিতেও খণ্ডস্বর ই্ উ্ এ্ (য়্) , ও্, এই চার রূপেই বিদ্যমান। কিন্তু ইংরেজি ধ্বনিতত্ত্বে খণ্ডস্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায় নি। তাই ইংরেজিতে শুধু ব্যঞ্জনান্ত (ending in consonant) দলই closed syllable বলে স্বীকৃত হয়েছে। খণ্ডস্বরান্ত (ending in vowel particle) দল সে স্বীকৃতি পায়নি।

ইংরেজিতে খণ্ডস্বর স্বীকৃত হয়নি বলে মুক্তরুদ্ধ ভেদে স্বরধ্বনির গঠনগত দুই রূপও মানা হয়নি। কিন্তু open ও close ভেদে স্বরবর্ণের যে দুই রূপ মানা হয় তা উচ্চারণগত, গঠনগত নয়। open vowel মানে *a vowel produced* ***with relatively wide opening of mouth***। বাংলায় এই **open vowel**-কে বলা যায় 'বিবৃত স্বর'। আর close vowel মানে *a vowel* ***pronounced with relatively narrow opening of mouth***। বাংলায় এই close (closed নয়) vowel-কে বলি 'সংবৃত' স্বর। বাংলায় উচ্চারণরূপ-ভেদে স্বরবর্ণের দুই রূপ—বিবৃত (open) ও সংবৃত *(close)*, গঠনরূপ-ভেদেও দুই রূপ—মুক্ত (open) ও রুদ্ধ *(closed)*। ইংরেজিতে স্বরধ্বনির গঠনগত রূপভেদ স্বীকৃত হয়নি। তারই ফলে রুদ্ধ দলের সংজ্ঞাসূত্রও অপূর্ণ থেকে

গেছে। স্বীকার করতে হবে, স্বরধ্বনি ও দলের গঠনগত রূপভেদ নির্ণয়ে বাংলা প্রণালী ও পরিভাষা-ব্যবহার ইংরেজির চেয়ে পূর্ণতর এবং অধিকতর যুক্তিসংগত।

অমূল্যধন এ বিষয়ে অনেকাংশে ইংরেজি নিয়মপ্রণালীর অনুবর্তী। তবে তিনি স্বরবর্ণের গঠনগত দুই রূপ (তাঁর ভাষায় 'জাতি') স্বীকার করেন। তাঁর পরিভাষায় (মূলসূত্র, পৃ ২৪) মুক্ত ও রুদ্ধ স্বরের নাম যথাক্রমে **মৌলিক** ও **যৌগিক** (diphthong) স্বর। রুদ্ধ বা যৌগিক স্বরকে diphthong না বলে বলা উচিত closed vowel। কেননা **diphthong** বললে বোঝায় একক স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত দুটি স্বরবর্ণের (বা স্বরধ্বনির) একত্র সমাবেশ, অর্থাৎ জোড়াস্বর। এই diphthong-এর উচ্চারণরূপ ত্রিবিধ—

(১) একটি পূর্ণস্বর ও একটি খণ্ডস্বরের **যুক্তরূপ**। যেমন—coin, loud। দুটি স্বরবর্ণ পাশাপাশি না থাকলেও অনেক সময় এ-রকম যুক্তরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—like, side। যুক্তরূপে উচ্চারিত এ-রকম জোড়াস্বরকে (অর্থাৎ diphthong-কে) আমরা বলি 'রুদ্ধস্বর'। ইংরেজিতে অনেক সময় একক স্বরও জোড়াস্বর রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—**hight, light**। জোড়াস্বর রূপে উচ্চারিত একক স্বরকে ইংরেরেজিতে diphthong বলা হয় না। কিন্তু বাংলায় একক স্বরের এ-রকম উচ্চারণ 'রুদ্ধস্বর' বলেই স্বীকার্য। তাতেও বোঝা যায় diphthong এবং রুদ্ধস্বর সমার্থক নয়।

(২) একত্র সমাবিষ্ট দুটি পূর্ণস্বরের **অযুক্ত** (অর্থাৎ একক পূর্ণস্বরের ন্যায়) উচ্চারণরূপ। যেমন—feat, teach। দুই স্বরের এ-রকম সমাবেশকেও ইংরেজিতে diphthong বলা হয়। কিন্তু বাংলায় তাকে 'রুদ্ধস্বর' বলা যাবে না। বাংলায় তা 'মুক্তস্বর' বলেই স্বীকার্য।

(৩) দুটি স্বরবর্ণের মিশ্র বা সংযুক্ত (compound) রূপও (যেমন œ) diphthong বলেই স্বীকৃত। বাংলায় এ-রকম যুক্তস্বর নেই।

এসব কারণে আমরা রুদ্ধস্বরকে diphthong না বলে closed vowel বলাই সমীচীন মনে করি। তাছাড়া, ইংরেজিতে স্বরধ্বনির open ও closed এই দুই রূপ স্বীকৃত নয় বলে অমূল্যধন সাহস করে বাংলা স্বরধ্বনির মৌলিক ও যৌগিক রূপকে যথাক্রমে open এ closed বলতে পারেননি।

কিন্তু তিনি দলের (তাঁর পরিভাষায় 'অক্ষর'-এর) দুই রূপকে ইংরেজি প্রথায় open ও closed বলতে দ্বিধা বোধ করেন নি। ফলে দলের এই দুই রূপকে তিনি অভিহিত করেছেন (মূলসূত্র, পৃ ৩২) যথাক্রমে মৌলিক-**স্বরান্ত** (open) ও **হলন্ত** (closed), এই দুই নামে। লক্ষণীয়, দলের উক্ত দ্বিতীয় রূপটিকে তিনি বলেছেন 'হলন্ত' অক্ষর, কেননা ইংরেজিতে শুধু হলন্ত (ending in consonant) দলই closed বলে স্বীকৃত হয়। অথচ তিনি বুঝেছিলেন, অন্ততঃ বাংলায় রুদ্ধস্বরান্ত দলকেও closed পর্যায়ভুক্ত বলে স্বীকার করা উচিত। তাই closed দলকে 'হলন্ত' অক্ষর বলে অভিহিত করেও তার সঙ্গে একটি টীকাযুক্ত করেছেন—"যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর ইহার অন্তর্ভুক্ত।" কারণ ইংরেজি প্রথা লঙ্ঘন করে হলন্ত ও যৌগিক-স্বরান্ত, এই দ্বিবিধ অক্ষরকে closed পর্যায়ভুক্ত করার সাহস তাঁর হয় নি।

মনে রাখা উচিত, বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্রের একটা স্বাধীন সত্তা আছে। তার জন্য চাই স্বাধীন ছন্দচিন্তা। ধার-করা চিন্তা নিয়ে স্বাধীন ছন্দশাস্ত্র রচনা সম্ভব নয়।

মুক্তক পয়ার *—যে প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ার বন্ধে চোদ্দ বা আঠার মাত্রাকে পঙ্‌ক্তিদৈর্ঘ্যের শেষ সীমা বলে মেনে নিয়ে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে ছন্দপঙ্‌ক্তিকে ছোট-বড় নানা রূপে বিন্যস্ত করা হয় তাকে বলা যায় 'মুক্তক পয়ার' বা 'মুক্তক মহাপয়ার'। কেননা, তাতে যতিস্থাপনের নির্দিষ্ট নিয়ম এবং প্রতি পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্যসমতা মেনে চলতে হয় না। শুধু মাত্রাবিন্যাস ও পর্বরচনার নীতি নিয়ম মেনে চলাই যথেষ্ট। তাও যদি না থাকে তবে ছন্দও থাকে না, আর পদ্য রচনা ধারণ করে গদ্যের রূপ। পদ্যরচনার এই দুটি মৌলিক নীতি ছাড়া আর সব বিষয়ে পাওয়া যায় অবাধ স্বাধীনতা। এইজনই পয়ার ও মহাপয়ারের এই বিশেষ রূপকে বলা হয়েছে 'মুক্তক'।

ছোট পয়ারের মুক্তক রূপ খুবই বিরল। মহাপয়ারের মুক্তক রূপ প্রথম প্রবর্তিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'বলকা' কাব্যে (১৯১৬)। তিন রীতিতেই মুক্তক মহাপয়ার রচিত হতে পারে। 'বলাকা' কাব্যের প্রধান অবলম্বন মিশ্রবৃত্ত রীতির মুক্ত মহাপয়ার। মুক্তক মহাপয়ারের দলবৃত্ত রূপও প্রথম প্রকাশিত হয় এই কাব্যেই। কিন্তু তার পরিণত রূপ দেখা যায় পরবর্তী 'পলাতকা' কাব্যে (১৯১৮)। কলাবৃত্ত মহাপয়ারের মুক্তক রূপ দেখা যায় তাঁর উত্তর কালের বিভিন্ন কাব্যে। এই ত্রিবিধ মুক্তক মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে পূর্ববর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে। পয়ার ও মহাপয়ারের এই মুক্তক রূপকে **মুক্তবন্ধ** বা **স্বৈরবন্ধও** বলা যায়। 'মুক্তবন্ধ' শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দসরস্বতী' প্রবন্ধে (১৯১৮)। 'মূলসূত্র' গ্রন্থেও এই নাম স্বীকৃত হয়েছে। মুক্তক পয়ারকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন **বেড়াভাঙা পয়ার**। তাতে ছোট-বড় দু-রকম পয়ারই বুঝতে হবে। তবে রবীন্দ্রোক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'বলাকা' ও 'পলাতক' কাব্যের বড় পয়ার।

দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, জীবনানন্দ প্রমুখ কারও কারও মুক্তক রচনার দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি প্রায়শঃ আঠার মাত্রার সীমা ছাড়িয়ে যায়, এমন কি ছাব্বিশ মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদীর সীমাও ছাড়িয়ে যায়। এ-রকম নির্দিষ্ট সীমানাহীন মুক্তক রচনাকে বলা যায় **অতিমুক্তক**। বিভিন্ন কবির অতিমুক্তক রচনার দৃষ্টান্তও আছে চতুর্থ অধ্যায়ে। আসলে অতিমুক্তক রচনার মূলে থাকে পঙ্‌ক্তিপ্রান্তের মিলকে কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে দৃশ্যমান করার প্রয়োজনবোধ। এই চোখের প্রয়োজনকে খাতির না করে অতিদীর্ঘ পঙ্‌ক্তিগুলিকে শুধু কানের বিচারে অর্ধযতিতে ভেঙে পুনর্বিন্যস্ত করলে এসব অতিমুক্তক রচনাও রাবীন্দ্রিক মুক্ত মহাপয়ারের রূপ ধারণ করবে। আবৃত্তিকালে শ্রোতার কানেও কোনো পার্থক্যবোধ হবে না, আর উক্ত দৃশ্যমান মিলগুলিও একই ভাবে শ্রূয়মাণ হবে।

যতি—গদ্য বা পদ্য ভাষা আমাদের কণ্ঠে অ-বিরাম গতিতে উচ্চারিত হয় না। আমাদের উচ্চারণের গতিতে নানা স্থানেই কিছু-না-কিছু বিরাম ঘটে। এই বিরামেরই নামান্তর **যতি** (pause)। সব যতির গুরুত্ব সমান থাকে না। তাই গুরুত্বভেদে এসব যতি বিভিন্ন পারিভাষিক নামে অভিহিত হয়। গদ্যপদ্য-ভেদে এসব যতিনামেও প্রভেদ হয়। গদ্যের কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি প্রভৃতি গুরুত্বভেদসূচক যতিনাম সুপরিচিত। গদ্যভাষায় এগুলি ছাড়া কিছু নামহীন যতিও থাকে। গদ্যের যতি হয় প্রধানতঃ ভাবগত এবং অংশতঃ উচ্চারণসৌকর্যজাত। তাই গদ্যরচনায় যতিস্থাপনের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে না। পক্ষান্তরে পদ্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ভাষাগত ধ্বনির শ্রুতিমাধুর্য ও গতিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। ধ্বনির গতিবৈচিত্র্য একান্তভাবেই নির্ভর করে তার যতিবৈচিত্র্যের উপরে।

১। যতির গুরুত্বক্রম

ক্রমাবনত গুরুত্বভেদে পদ্যযতি পাঁচ প্রকার—**পূর্ণযতি, অর্ধযতি, লঘুযতি, উপযতি ও অণুযতি**। এই পাঁচ প্রকার যতিসূচিত ধ্বনিবিভাগের পারিভাষিক নাম যথাক্রমে পঙ্‌ক্তি, পদ, পর্ব, উপপর্ব ও দল। তাই উক্ত পাঁচ প্রকার যতিকে যথাক্রমে **পঙ্‌ক্তিযতি, পদযতি, পর্বযতি, উপপর্বযতি ও দলযতি** নামেও অভিহিত করা যায়। এসব যতি বিন্যস্ত হয় সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে। আর তার ফলে ধ্বনিপ্রবাহের যে গতিবৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় তাতেই আমাদের শ্রুতিরুচি পরিতৃপ্ত হয়। ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির এই গতিবৈচিত্র্যেরই নামান্তর ছন্দের রূপবৈচিত্র্য।

ছন্দশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ দুটি—ছন্দেবিন্যস্ত ধ্বনির উচ্চারণ-নিয়ন্ত্রণের রীতিনিরূপণ; Phonology)/ আর উচ্চারিত ধ্বনির গতিবৈচিত্র্যজাত রূপ নিরূপণ (Morphology) অমূল্যধনের 'মূলসূত্র' গ্রন্থে ছন্দশাস্ত্রের এই দ্বিতীয় বিভাগটি প্রায় উপেক্ষিতই থেকে গেছে। তার প্রধান কারণ তাঁর ছন্দশ্রুতিতে যতির তারতম্যভেদ, বিশেষতঃ পদযতি ও পর্বযতিব পার্থক্য স্বীকৃতি পায়নি। তাঁর মতে (পৃ ২৮) "যতি মাত্রাভেদে দুই রকম, **অর্ধযতি** ও **পূর্ণযতি**। ক্ষুদ্রতর ছন্দোবিভাগ বা পর্বের পরে অর্ধযতি, এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ বা চরণের পরে পূর্ণযতি থাকে।" অন্যত্র (পৃ ৩) বলা হয়েছে—"এই ক্ষণিক বিরতিকে অর্ধযতি, উপযতি, হ্রস্বযতি বা শুধু যতি বলা যায়। ছন্দের হিসাবে এই যতির গুরুত্বই অধিক।" যতিবোধের এই অপূর্ণতার জন্য তাঁর ছন্দচিন্তার মূল কাঠামোটাই দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এমন কি, তাঁর পর্ব ও পঙ্‌ক্তির (তাঁর ভাষায় 'চরণের') ধারণাও ত্রুটিহীন হতে পারে নি। যেমন, ছন্দোবন্ধের প্রসঙ্গে এক স্থানে (পৃ ১৯) তিনি বলেছেন—"১০ মাত্রার অধিক দীর্ঘ পর্ব এবং ৫ পর্বের অধিক দীর্ঘ চরণ দেখা যায় না। বর্তমানে ৬ মাত্রার পর্বের চতুষ্পর্বিক বা ত্রিপর্বিক বিলম্বিত লয়ের চরণ খুব প্রচলিত।" একটা দৃষ্টান্ত (ক্ষণিকা, নববর্ষা) দিচ্ছি।—

ওগো নদীকূলে। তীর-তৃণতলে। কে বসে অমল। বসনো॥
শ্যামল বসনে? ॥
সুদূর গগনে। কাহারে সে চায়? ॥
ঘাট ছেড়ে ঘট। কোথা ভেসে যায়? ॥
নব মালতীর। কচি দলগুলি। আনমনে কাটে। দশনে, ॥
ওগো নদীকূলে। তীরতৃণতলে। কে বসে শ্যামল। বসনে? ॥

মূলসূত্র অনুসারে-অর্ধযতি(।) এক দাঁড়ি এবং পূর্ণযতি (॥) দুই দাঁড়ি। এই হল অমূল্যধন-কৃত বিশ্লেষণ। তাঁর মতে (মূলসূত্র, পৃ ২-৩)— "এই দৃষ্টান্তের চরণগুলিতে যথাক্রমে ৪, ১, ২, ২, ৪, ৪ পর্ব আছে।" এই বিশ্লেষণ কোনো পরিশীলিত কানের সায় পাবে বলে মনে হয় না। বস্তুতঃ এই দৃষ্টান্তে পূর্ণযতি আছে তিনটি, সুতরাং এর পঙ্‌ক্তি (চরণ)-সংখ্যাও তিন—ছয় নয়। আর, কোনো পঙ্‌ক্তিতেই (চরণেই) ১ বা ২ পর্ব নেই। তিন পঙ্‌ক্তিতে ৪ পর্বও নেই, আছে এক পঙ্‌ক্তিতে। তিন পঙ্‌ক্তিতে আছে যথাক্রমে ৫, ৮, ৪ পর্ব। প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষ পর্ব অপূর্ণ। এই পার্থক্যের আসল কারণ মূলসূত্র গ্রন্থে পদযতি ও তজ্জাত পদবিভাগের অস্বীকৃতি। ফলে পদযতি কোথাও গণ্য হয়েছে পর্বযতি বলে, আর কোথাও পূর্ণযতি বলে। পর্বযতি ও পদযতির গুরুত্বভেদ মেনে উপরের দৃষ্টান্তটিকে নূতন করে সাজালেই বোঝা সহজ হবে।—

ওগো নদীকূলে। তীরতৃণতলে ॥

কে বসে অমল। বসনে , শ্যামল। বসনে?

সুদূর গগনে। কাহারে সে চায় ?॥

ঘাট ছেড়ে ঘট। কোথা ভেসে যায়? ॥

নব মালতীর। কচি দলগুলি ॥

আনমনে কাটে। দশনে।

ওগো নদীকূলে। তীরতৃণতলে ॥

কে বসে শ্যামল। বসনে?

এখানে পর্বযতি (লঘু যতি)—এক দাঁড়ি (।), পদযতি (অর্ধযতি)—দুই দাঁড়ি (॥) পঙ্‌ক্তিযতি (পূর্ণযতি)—চিহ্নহীন, অনাবশ্যকবোধে।

প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিকে পদযতি অনুসারে ভেঙে দুই ছত্রে সাজানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিকে (সুদূর...দশনে) পদযতি অনুসারে ভেঙে চার ছত্রে সাজানো হয়েছে। ফলে প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তির দ্বিপদী রূপ এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির চৌপদী রূপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে। মূলসূত্রের বিশ্লেষণে ছন্দের এই রূপটাই আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মূলসূত্র গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই এই বিভ্রান্তি দেখা যায়। তার মূল কারণ পর্বযতি ও পদযতির পার্থক্যবোধের অভাব।

'৫ পর্বের অধিক দীর্ঘ চরণ দেখা যায় না'—অমূল্যধনের এই উক্তি শুধু দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, ত্রিপদী ও চৌপদী সম্বন্ধে নয়। ত্রিপদী ও চৌপদী পঙ্‌ক্তিতে পাঁচের চেয়ে বেশি পর্ব থাকে। অমূল্যধন এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে যে আট পর্ব আছে তা তাঁর ছন্দশ্রুতিতে ধরা পড়েনি। তার কারণ পর্বযতি, পদযতি ও পঙ্‌ক্তিযতির গুরুত্বক্রম-বোধের অভাব। তাই এই চৌপদী পঙ্‌ক্তির প্রথম দুটি পদযতি তাঁর শ্রুতিতে প্রতীত হয়েছে পঙ্‌ক্তিযতি বলে, অথচ তৃতীয় পদযতিটি প্রতীত হয়েছে পর্বযতি বলে। প্রথম পঙ্‌ক্তির মধ্যবর্তী পদযতিটিও এই কারণেই গণ্য হয়েছে পর্বযতি বলে। মনে হয় এসব স্থলে তাঁর কান প্রতারিত হয়েছে পদ্যরচনার মুদ্রিত রূপের দ্বারা। আর এইজন্যই দ্বিপদীর চেয়ে দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি, বিশেষতঃ চৌপদী পঙ্‌ক্তি তাঁর কাছে প্রতীত হয়েছে স্তবক (stanza) বলে। যেমন—

বহে মাঘ মাসে। শীতের বাতাস,

স্বচ্ছসলিলা। বরুণা।

পুরী হতে দূরে। গ্রামে নির্জনে

শিলাময় ঘাটে। চম্পকবনে,

স্নানে চলেছেন। শত সখীসনে

কাশীর মহিষী। করুণা।

—কথা, সামান্য ক্ষতি

বিপুল গভীর। মধুর মন্দ্রে

কে বাজাবে সেই। বাজনা।
উঠিবে চিত্ত। করিয়া নৃত্য,
বিস্মৃত হবে। আপনা।
টুটিবে বন্ধ,। মহা আনন্দ,
নব সংগীতে। নূতন ছন্দ,
হৃদয়-সাগরে। পূর্ণচন্দ্র।
জাগাবে নবীন। বাসনা।

—সোনার তরী, বিশ্বনৃত্য

দুটি দৃষ্টান্তেই পঙ্‌ক্তিগুলিকে পদযতি অনুসারে ভেঙে সাজানো হল। তাই পদ ও পঙ্‌ক্তির অন্তে যতিচিহ্ন বর্জিত হল। একমাত্র পর্ববিভাগই দেখানো হল যতিচিহ্নযোগে। এর থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়—প্রথম দৃষ্টান্তের প্রথমে আছে একটি দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি, তার পরে একটি চৌপদী পঙ্‌ক্তি। এই দুএ মিলে গঠিত হয়েছে একটি যুগ্মক (couplet)। আর, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আছে দুটি দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি ও একটি চৌপদী পঙ্‌ক্তি। এই তিনে মিলে গঠিত হয়েছে একটি ত্রিতক (triplet)।

কিন্তু মূলসূত্র গ্রন্থে (পৃ ৮৩) প্রথম দৃষ্টান্তের প্রথম দুই পদ এবং শেষ দুই পদ সাজানো আছে এক-এক ছত্রে। তাই এই দৃষ্টান্তটি বর্ণিত হয়েছে 'চার চরণের 'স্তবক' বলে। অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম চার পদ সাজানো আছে দুই ছত্রে, আর শেষ দুই পদ এক ছত্রে। তাই এই দৃষ্টান্তটি বর্ণিত হয়েছে 'পাঁচ চরণের স্তবক' বলে। মনে হয় এসব স্থলেও রচনার মুদ্রিত রূপ গ্রন্থকারকে শ্রুতি ও যুক্তির পথ থেকে বিচলিত করেছে। আর দৃষ্টান্ত বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন।

২। যতিলোপ

ছন্দের বিশ্লেষণে **যতির তারতম্য** অর্থাৎ গুরুত্বক্রম (Degrees of Comparison) বিচারের গুরুত্ব যতখানি, অবস্থাবিশেষে **যতিলোপ** (Elison of Pause) বিচারের গুরুত্বও ততখানি। তিন রীতিতেই চতুর্মাত্রক পর্বের ছন্দোবন্ধে লঘুযতি (পর্বযতি) প্রায়শঃ লুপ্ত হয়, ভাষান্তরে বলা যায় অব্যক্ত থাকে। আর, কলাবৃত্ত রীতিতে ষন্মাত্রক পর্বের ছন্দোবন্ধে উপযতি অনুরূপভাবে প্রায়শঃ লুপ্ত হয়, অর্থাৎ অব্যক্ত থাকে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

১। চতুর্মাত্রক পর্বের ছন্দোবন্ধে **পর্বযতি** নামান্তরে **লঘুযতি-লোপ—** ক. মিশ্রবৃত্ত রীতিতে

এক দিন। এই দেখা ॥ হয়ে যাবে। শেষ,
পড়িবে ন ⋮ য়ন পরে ॥ অন্তিম নি ⋮ মেষ।
পরদিনে। এইমতো ॥ পোহাইবে। রাত,
জাগ্রত জ ⋮ গৎ পরে ॥ জাগিবে প্র ⋮ ভাত।

—চৈতালি, দুর্লভ জন্ম

প্রথম ও তৃতীয় পঙ্ক্তিতে দুটি লঘুযতি (।) সুব্যক্ত আছে। কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্ক্তিতে অনুরূপ দুটি লঘুযতি (:) অব্যক্ত (অর্থাৎ লুপ্ত) হয়েছে। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে প্রায়শঃ এ-রকম লঘু-যতিলোপ ঘটে। কিন্তু এ-রকম লঘুযতি লোপের কোনো স্থিরতা অর্থাৎ বিধিনিষেধ নেই। এ-রকম যতিলোপ একান্তভাবেই নির্ভর করে কবির ভাব ও ভাষা-গত প্রয়োজনের উপরে।

খ. কলাবৃত্ত রীতিতে

ধীরে ধীরে। শর্বরী ॥ হয় অব। সান,
উঠিল বি ⋮ হঙ্গের ॥ প্রত্যুষ। গান।
বনচূড়া। রঞ্জিল ॥ স্বর্ণ-লে ⋮ খায়
পূর্ব-দি : গন্তের ॥ প্রান্ত-রে ⋮ খায়।

—চিত্রবিচিত্র, উৎসব

তোমারে ডা ⋮ কিনু যবে ॥ কুঞ্জব ⋮ নে
তখনো আ ⋮ মের বনে ॥ গন্ধ ছি ⋮ ল।
জানি না কী ⋮ লাগি ছিলে ॥ অন্য ম ⋮ নে,
তোমার দু ⋮ য়ার কেন ॥ বন্ধ ছি ⋮ ল
এক দিন। শাখা ভরি ॥ এল ফল। গুচ্ছ,
ভরা অঞ্ । জলি মোর ॥ করি গেলে। তুচ্ছ,
পূর্ণতা।-পানে আঁখি ॥ অন্ধ ছিল ⋮ ল।

—বীথিকা, উদাসীন

গ. দলবৃত্ত রীতিতে

বল্ মা আমি। দাঁড়াই কোথা,
আমার কেহ নাই শঙ্ ⋮ করি হেথা।
মার সোহাগে। বাপের আদর ॥ এ দৃষ্টান্ত। যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে। শিরে ধরে ॥ এমন বাপের। ভরসা বৃথা।
তুমি না ক ⋮ রিলে কৃপা ॥ যাব কি বি ⋮ মাতা যথা?
ওমা যে-জন তোমার। নাম করে, তার ॥ হাড়মালা আর। ঝুলি কাঁথা।

—রামপ্রসাদ, পদাবলী, ‘বল মা আমি’

বামুনবাড়ি। গেলে পরে
ডেকে না জি ⋮ জ্ঞাসা করে,
শহরশুদ্ধ। ঘরে ঘরে
বেড়িয়ে এলাম। ঘেঁটে ঘুঁটে।...

যদি আনি। মেগে পেতে
পেট ভোরে পা ⁝ ব না খেতে,
মিছে কেবল। গন্ধ করা
মুখে দিয়ে। একটু ছিটে।
—ঈশ্বর গুপ্ত, পৌষড়ার গীত

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বর গুপ্তের দলবৃত্ত রচনায় লঘুযতিলোপের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আধুনিক কবিদের রচনাতেও আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাতেই পাওয়া যায় সব চেয়ে বেশি। তবে মিশ্রবৃত্ত ও কলাবৃত্তের তুলনায় দলবৃত্ত রীতিতে এ-রকম লঘুযতি-লোপের নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়।

লক্ষণীয়—কোনো দৃষ্টান্তেই অর্ধযতি (নামান্তরে পদযতি) লুপ্ত হয় নি। লুপ্ত হয়েছে শুধু কোনো-কোনো পদভুক্ত দুই পর্বের মধ্যবর্তী লঘুযতি (নামান্তরে পর্বযতি)। লঘুযতি-লোপের ফলে পদভুক্ত দুই পর্ব উচ্চারিত হয় একটি যুক্তপর্ব রূপে। তাই সংশ্লিষ্ট পদটিকে অভিহিত করা যায় '**যুক্তপর্বক পদ**' নামে। লঘুযতি-লোপের ফলে যুক্তপর্বক (বা অবিভক্ত) পদের মাত্রাবিন্যাসেও বিপর্যয় ঘটে। যেমন—

এক : দিন। এই : দেখা ॥ হয়ে : যাবে। শেষ,
পড়িবে : নয়ন : 'পরে ॥ অন্তিম : নিমেষ।

প্রথম পঙ্ক্তির দুটি পদই বিযুক্তপর্বক—একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ। পূর্ণ পদের দুই পর্ব চারটি দ্বিমাত্রক উপপর্বে বিভক্ত, আর অপূর্ণ পদ বিভক্ত অনুরূপ তিন উপপর্বে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পঙ্ক্তির দুই পদই যুক্তপর্বক—পূর্ণ ও অপূর্ণ। লঘুযতিলোপের ফলে প্রথম পূর্ণপদের দুই মাত্রার চার উপপূর্ব পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্ব রূপে, অনুরূপভাবে দ্বিতীয় অপূর্ণ পদের দুই-দুই-দুই মাত্রার তিন উপপর্ব পুনর্বিন্যস্ত হয়ে তিন-তিন মাত্রার দুই উপপর্বে পরিণত হয়েছে।

৩। পর্বপর্বাঙ্গ-বিচার

'মূলসূত্র' গ্রন্থে লঘুযতিলোপ ও উপযতি স্বীকৃত হয়নি। তাই চতুর্মাত্রপর্বক ছন্দের বিশ্লেষণে কিছু কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেমন (পৃ ১২)—

মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিও না, খেয়ো মনে করে।

—সোনার তরী, যেতে নাহি দিব

এই দৃষ্টান্তের 'মাথা খাও, এই বাক্যাংশটি পর্ব, না, পর্বাঙ্গ?'—গ্রন্থকার নিজেই তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—"মূলপর্ব ৪ মাত্রার ধরিলে দুই চরণের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। কারণ।

মিষ্টান্ন র। হিল কিছু। হাঁড়ির ভি। তরে

এরূপ ভাবে যতি পড়িতে পারে না। মুল পর্ব—৮ মাত্রার ধরিলে উভয় চরণের ছন্দের সংগতি রক্ষিত হয়।

মিষ্টান্ন : রহিল : কিছু। হাঁড়ির : ভিতরে,=৮+৬

মাথা খাও : ভুলিও না। খেয়ো মনে : করে।=৮+৬

সুতরাং 'মাথা খাও' পর্ব নহে, পবাঙ্গ। 'মাথা খাও' বাক্যাংশের পরে ছন্দের যতি নহে, ভাবপ্রকাশক একটা ছেদ আছে।"—এই যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক আছে। সে বিষয়ে কিছু বলা অনাবশ্যক। শুধু একটাই প্রশ্ন—প্রথম পঙ্‌ক্তির তিন ছেদ (:) আর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দুই ছেদ, এই দু-রকম ছেদের গুরুত্ব কি সমান? এ ক্ষেত্রে যুক্তির চেয়ে কানের বিচারই মান্য। কানের বিচারে নিঃসংশয়েই বলা যায়, প্রথম পঙ্‌ক্তির তিন 'ছেদ' আসলে উপযতি, আর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দুই 'ছেদ' পর্বযতি বা লঘুযতি। তাই আরও মানতে হবে, প্রথম পঙ্‌ক্তির সবগুলি বিভাগই পর্বাঙ্গ (উপপর্ব) বলে স্বীকার্য বটে, কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির বিভাগগুলি যথার্থ পর্ব বলেই স্বীকার্য, পর্বাঙ্গ (উপপর্ব) বলে নয়। এই পার্থক্যের কারণ প্রথম পঙ্‌ক্তির দুই পর্বযতিলোপ।

অমূল্যধন বলেছেন—"মিষ্টান্ন র। হিল কিছু। হাঁড়ির ভি। তরে—এরূপ ভাবে যতি পড়িতে পারে না।" পারে না যে, তার কারণ এই পঙ্‌ক্তিতে দুটি পর্বযতি লুপ্ত হয়েছে। এ-রকম যতিলোপ নূতন কিছু নয়। সংস্কৃত পুজ্‌ঝটিকা (প্রাকৃত পাদাকুলক) ছন্দ থেকে বাংলা পয়ারের উদ্ভব। আর সেই পজ্‌ঝটিকা ছন্দেও লঘুযতি বা পর্বযতি-লোপের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। যেমন—

মা কুরু। ধনজন ॥ যৌবন। গর্বম্,
হরতি নি : মেষাৎ ॥ কালঃ। সর্বম্।
ক্ষণমিহ। সজ্জন ॥ সংগতি। রেকা
ভবতি ভ : বার্ণব ॥ তরণে। নৌকা।

—শংকরাচার্য, মোহমদ্‌গর

যে দুই পদে লঘুযতি লুপ্ত হয়েছে, সে দুই পদের উচ্চারিত রূপ হয় যথাক্রমে

'হরতি : নিমে : ষাৎ' এবং 'ভবতি : ভবার্ : ণব'।

বোঝা যাচ্ছে, কোনো পদে দুই পর্বের মধ্যবর্তী লঘুযতি লুপ্ত হলে সে দুই পর্ব একত্র জুড়ে যায়। ফলে উৎপন্ন হয় একটি 'যুক্তপর্বক পদ'। আর এই যুক্তপর্বক পদ আমাদের উচ্চারণে স্বতঃই বিভক্ত হয়ে যায় ৩-৩-২ মাত্রার তিন উপপর্বে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রে 'লুপ্তযতি'-কে বলা হত 'অব্যক্ত যতি'।

পর্বযতিলোপ চতুমাত্রপর্বক ছন্দের ব্যতিক্রম মাত্র, সাধারণ নিয়ম নয়। যতিলোক স্বীকার না করে আট মাত্রার সব বিভাগকেই এক-একটি অখণ্ড পর্ব বলে গণ্য করলে ব্যতিক্রমকেই সাধারণ নিয়মের মর্যাদা দেওয়া হয়। মোট কথা, যতিলোপ স্বীকার শুধু যে যুক্তিসিদ্ধ এবং ঐতিহ্যসম্মত তা নয়, যতিলোপ স্বীকার করলে ছন্দবিশ্লেষণ সহজতরও হয়।

পরিশেষে বলা উচিত, রবীন্দ্রনাথ যে লঘু যতিলোপ স্বীকার করতেন তারও পরোক্ষ অথচ সংশয়াতীত প্রমাণ আছে। যেমন ('ছন্দ', তৃতীয় সং, পৃ ৭৩)—

অধরে ম। ধুর হাসি। বাঁশিটি বা। জাও

এই পঙ্‌ক্তিটিকে রবীন্দ্রনাথ দুই পর্বে ভাগ করেননি, করেছেন চার পর্বে। আর তাঁর মতে এতে আছে ‘four units of sound (মাত্রা) in a *bar*’। আরও বলেছেন—“Naturally the *beat* comes at the beginning of the bar”। বলা বাহুল্য—গানের পরিভাষায় bar মানে তালবিভাগ, ছন্দপরিভাষায় পর্ব, আর গানের পরিভাষায় beat মানে তালের ঘা, ছন্দপরিভাষায় ‘ঘাতপ্রস্বর’ (stress)। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, পরোক্ষে যতিলোপ স্বীকার না করলে এই পঙ্‌ক্তিটিকে চার মাত্রার পর্বে ভাগ করা সম্ভব হত না।

২। ষট্‌কল পর্বের ছন্দোবন্ধে **উপযতি-লোপ—**

আজি কি : তোমার। মধুর : মুরতি
হেরিনু : শারদ। প্রভাতে।
হে মাত : বঙ্গ,। শ্যামল : অঙ্গ
ঝলিছে : অমল। শোভাতে।
পারে না : বহিতে। নদী জ ০ ল ধারা
মাঠে মা ০ ঠে ধান। ধরে না ০ কো আর।
ডাকিছে : দোয়েল। গাহিছে : কোয়েল
তোমার : কানন। সভাতে।
মাঝ খা ০ নে তুমি। দাঁড়ায়ে : জননী
শরৎ : কালের। প্রভাতে।

—কল্পনা, শরৎ

এর প্রতি পূর্ণপর্বে আছে ছয় কলামাত্রা। শুধু চারটি বাদে অন্য সব পূর্ণপর্ব তিন মাত্রার দুই উপপর্বে বিভক্ত। এটাই ষন্মাত্রক পর্বের স্বাভাবিক বিভাগ। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ এজাতীয় ছন্দকে কখনও বলেছেন ‘তিনমাত্রামূলক’ ছন্দ, কখনও বলেছেন ‘**ত্রৈমাত্রিক**’ ছন্দ। কিন্তু এই দৃষ্টান্তটিতে ‘নদী জলধার’ প্রভৃতি চারটি পর্বে উপযতি লুপ্ত হয়েছে। আর এই যতিলোপের ফলে তিন-তিন মাত্রার দুই উপপর্ব ভেঙে গিয়ে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে ‘নদী : জল : ধার’ ইত্যাদি রূপে অর্থাৎ দুই মাত্রার তিন উপপর্ব রূপে। তাতে ছন্দের গতিভঙ্গিতে একঘেয়েমি দেখা দিতে পারেনি, বরং এসেছে কিছু বৈচিত্র্য। ছন্দের গতিভঙ্গিতে কিছু বৈচিত্র্য-সাধনেই ছোট-বড় সবরকম যতিলোপর আসল সার্থকতা।

‘মূলসূত্র’ গ্রন্থে সম্ভাবতঃই উপযতি-লোপের প্রসঙ্গও নেই। ফলে ষট্‌কলপর্বক ছন্দোবন্ধের ‘পবাঙ্গ’-বিভাগও তার মৌলিক প্রকৃতি অনুসারে নির্ণীত হতে পারেনি। আর ত্রিবিধ চতুর্মাত্রক পর্বের ছন্দোবন্ধের ‘পবাঙ্গ’ ও তার মূলপ্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু তাই নয়, পর্বাঙ্গ-নিরূপণ কোনো নির্দিষ্ট নীতিও মানা হয়নি। তাই এক স্থানে (পৃ ১১) বলা হয়েছে—‘পর্বাঙ্গের মাত্রাসংখ্যা হয় ২, ৩ বা ৪, কখন ১।” রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন ছন্দের মূল অবলম্বন দুই বা তিন মাত্রার গুচ্ছ, নিঃসঙ্গ একমাত্রা চলে না। তাঁর এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। নিঃসঙ্গ একমাত্রক দল উচ্চারিত হয় দ্বিমাত্রক রূপে। যেমন—

ধুলার মাঝে। না যদি দেন। পা

তা হলে পায়ে। ধূলা তো লাগে। না।

—কল্পনা, জুতা-আবিষ্কার

জাগিয়া উঠি। শয্যাতলে ॥ শুধালো রাজ। -বালা,

কে পরালে। মালা।

—সোনার তরী, সুপ্তোত্থিতা

প্রথম দৃষ্টান্তের 'না যদি', 'তা হলে' ও 'ধূলা তো' এই তিন উপপর্বের না, তা, তো এই একমাত্রক দল নিঃসঙ্গ নয়, কারণ, এই তিন দল উচ্চারিত হয় পরবর্তী বা পূর্ববর্তী শব্দের যুক্তরূপে,—অর্থাৎ 'নাযদি', 'তাহলে', 'ধূলাতো' রূপে। তাই এই তিন দল। উচ্চারণেও একমাত্রক বলেই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্তের পঙ্‌ক্তিপ্রান্তস্থ পা, না এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের কে, এই তিনটি একক দল উচ্চারিত হয় নিঃসঙ্গ রূপে, ফলে আমাদের উচ্চারণে এগুলি দুই মাত্রার মূল্য পায়। তাই পর্বাঙ্গের মাত্রাসংখ্যা কখনও-কখনও ১ হয়, এই ছন্দসূত্রকে ত্রুটিহীন বলে মনে করা যায় না।

আর, কোনো পর্বাঙ্গেই কখনও চার মাত্রা থাকতে পারে বলেও মনে করা যায় না। আমাদের মুখে চার মাত্রার স্বতঃই দুই-দুই মাত্রার দুই গুচ্ছে বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন—পরি : চিত, অসু: বিধা, নির: বধি। অথচ

১। মাথা : খাও। ভুলি : য়ো না । খেয়ো : মনে। করে।

২। একা : দেখি। কুল : বধূ ॥ কে বট : আপনি।

মূলসূত্রে (পৃ ১২, ১৮, ৩০) উদ্ধৃত এই দুই দৃষ্টান্তের 'মাথা খাও', 'একা দেখি' প্রভৃতি পাঁচটি চতুর্মাত্রক ধ্বনিগুচ্ছ এক-একটি 'অচ্ছেদ্য' পবাঙ্গ বলে গণ্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, মূলসূত্রের মতে 'মাথা খাও' এবং 'একা দেখি' এই দুই গুচ্ছের কোনোটারই মধ্যে তো কোনো যতি নেই-ই, অন্তেও নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস একটু সতর্ক মনে শুনলেই এই পাঁচটি ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যে একটি করে ক্ষীণ যতি (:) অনুভূত হবে এবং দুই দৃষ্টান্তেরই প্রথম দুই গুচ্ছের মধ্যে অনুভূত হবে একটি করে অপেক্ষাকৃত গুরু যতি (।)। এই গ্রন্থের পরিভাষায় উক্ত ক্ষীণ যতিকে বলা যায় **উপযতি** বা **উপপর্বযতি**, আর উক্ত অপেক্ষাকৃত গুরুযতিকে বলা যায় **লঘুযতি** বা **পর্বযতি**। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এ-রকম বিশ্লেষণের (অবশ্য পরিভাষাপ্রয়োগ বাদে) সমর্থন পাওয়া যবে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থের নানা স্থানে।

৪। **মোট কথা**

মিশ্রবৃত্ত রীতিতে চতুমাত্রক পর্বের ছন্দোবন্ধে ঘনঘন পর্বযতিলোপের ফলে প্রায়শঃ আট মাত্রার যুক্তপর্বক পূর্ণপদ ও ছয় মাত্রার অনুরূপ অপূর্ণপদ দেখা যায়। এই পর্বযতিলোপ স্বীকার না করার ফলে মূলসূত্র গ্রন্থে উক্ত দুই 'পদ'ই যথাক্রমে পূর্ণ ও অপূর্ণ 'পর্ব' বলে গণ্য হয়েছে। আর তারই অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে আট ও ছয় মাত্রার অযুক্তপর্বক পদকেও পর্ব বলে মানতে হয়েছে। আর আট মাত্রার বিভাগকে যদি পর্ব বলা হয় তবে চার মাত্রার উপবিভাগকে অগত্যা পর্বাঙ্গ বলে মানতে হয়। যেমন—

এক দিন। এই দেখা ॥ হয়ে যাবে। শেষ,

পড়িবে নয়ন ’পরে ॥ অন্তিম নিমেষ।

উপরের প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই আছে এই ছন্দোবন্ধের আদর্শ রূপ—এই পঙ্‌ক্তির পদ, পর্ব ও উপপর্ব বিভাগ সুস্পষ্ট। পর্বযতি (।) ও পদযুতি (॥) দেখানো হল, উপপর্বযতি (উপযতি) ঊহ্য রাখা হল। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে দুটি পর্বযতিই লুপ্ত হয়েছে। ফলে উৎপন্ন হয়েছে আট মাত্রার একটি যুক্তপর্বক পূর্ণপদ ও ছয় মাত্রার একটি যুক্তপর্বক অপূর্ণ পদ। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দুটি যুক্তপূর্বক (পূর্ণ ও অপূর্ণ) পদই মূলসূত্রে বর্ণিত হয়েছে দুটি (পূর্ণ ও অপূর্ণ) ‘পর্ব’ বলে। আর, এর সঙ্গে সংগতি রক্ষার প্রয়োজনে প্রথম পঙ্‌ক্তির অনুরূপ দুটি অযুক্তপর্বক পদও স্বীকৃত হয়েছে দুটি ‘পর্ব’ বলে, আর তারই অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে এই দুই পদভুক্ত চার পর্ব (তিনটি পূর্ণ, একটি অপূর্ণ) স্বীকৃত চার ‘পর্বাঙ্গ’ বলে। অর্থাৎ, এসব স্থলে চার (২+২) মাত্রার পর্বকে বলা হয়েছে ‘পর্বাঙ্গ’,আর আট (৪+৪) মাত্রার পদকে বলা হয়েছে ‘পর্ব’, অন্যত্র দশ (৪+৪+২) মাত্রার পদকেও বলা হয়েছে ‘পর্ব’। কিন্তু সর্বত্র নয়। যেমন, এক স্থানে (পৃ ৭৮)—

সারাদিন। অশান্ত বাতাস

ফেলিতেছে। মর্মর নিঃশ্বাস।

এই দুটি দশ (৪+৪ ।২) মাত্রার পঙ্‌ক্তিকে বলা হয়েছে ‘দ্বিপর্বিক’ চরণ। কিন্তু আর-এক স্থানে (পৃ ৮১)—

ওর প্রাণ আঁধার যখন। করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি,

দুয়ারেতে সজল নয়ন। এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসি রাশি।

দশ+দশ মাত্রার এই দুই দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিকেও বলা হয়েছে ‘দ্বিপর্বিক’ চরণ। অর্থাৎ দশ মাত্রার ছন্দোবিভাগকে প্রথম দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে দুই পর্ব, আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বলা হল এক পর্ব। এ বড় বিস্ময়কর ব্যাপার।

এই দুই দৃষ্টান্তের আসল পরিচয় কি তাও এখানে দেখানো গেল। নতুবা মূলসূত্রের বিশ্লেষণে কি ত্রুটি ঘটেছে তা ঠিকমতো বোঝা যাবে না।

‘জাতি’ ছন্দ। অক্ষরছন্দ এবং মাত্রাছন্দ যথাক্রমে ‘অক্ষরবৃত্ত’ এবং ‘মাত্রাবৃত্ত’ নামেই বেশি পরিচিত। এই মূলনীতিগত পার্থক্য অনুসারে বলা যায় সংস্কৃত (তথা প্রাকৃত) ছন্দরচনার দুই রীতি **অক্ষরবৃত্ত** ও **মাত্রাবৃত্ত**। হলায়ুধ আবার দ্বিতীয় রীতির ছন্দসমূহকে দুই শাখায় বিভক্ত করেন—মাত্রাছন্দ ও গণছন্দ।

১। সারা দিন। অশান্ত বা : তাস

ফেলিতেছে। মর্মর নি : শ্বাস!

২। ওর প্রাণ। আঁধার য : খন ॥ করুণ শু : নায় বড়ো। বাঁশি,

দুয়ারেতে। সজল ন : য়ন ॥ এ বড়ো নিষ্ : ঠুর হাসি। রাশি।

প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে এক **পদ**। অর্থাৎ প্রত্যেক পঙক্তি **একপদী**। পঙ্‌ক্তিশেষের পদযতি গণ্য হয়েছে পূর্ণযতি (ঊহ্য) বলে।—প্রতি পদে তিন পর্ব, দুটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ। প্রথম পর্বযতি (।) সুব্যক্ত, দ্বিতীয় পর্বযতি (:) অব্যক্ত অর্থাৎ লুপ্ত।—প্রতি পূর্ণ পর্বে চার কলামাত্রা, অপূর্ণ পর্বে দুই কলামাত্রা, রীতি মিশ্রবৃত্ত।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তি **দ্বিপদী**। পঙ্‌ক্তিযতি উহ্য, পদযতি (।।) যথারীতি চিহ্নিত। এর প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে আছে দুটি করে ত্রিপর্বক পদ, আর এই পদগুলি প্রায় পুরোপুরি ভাবেই প্রথম দৃষ্টান্তে ত্রিপর্বক পদের অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এই যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদের প্রথম পর্বযতি (:) অব্যক্ত, দ্বিতীয় পর্বযতি (:) সুব্যক্ত।

এ-রকম অসংগতির আরও অনেক নিদর্শন আছে। বস্তুতঃ পর্ব ও পর্বাঙ্গ কাকে বলে তারই কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না মূলসূত্র গ্রন্থে। এ-রকম অনিশ্চিতার্থক পরিভাষা নিয়ে সুগঠিত ছন্দশাস্ত্র রচনা সম্ভব নয়। তাই মনে হয় মূলসূত্র গ্রন্থের (পৃ ২৯ এবং ৮৭) প্রতিপাদ্য 'পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ' (The Beat and Bar Theory) বড়ই কাঁচা ভিতের উপরে গড়া হয়েছে। পরিশেষে একটা প্রশ্ন, Beat মানে কি পর্বাঙ্গ? আমার সন্দেহ আছে।

যুক্তপর্ব *—দুই পর্বের মধ্যস্থিত লঘুযতিলোপের ফলে উৎপন্ন ছন্দেবিভাগের নাম 'যুক্তপর্ব'। আর এ-রকম যুক্তপর্ব নিয়ে গঠিত পদকে বলা যায় '**যুক্তপূর্বক পদ**'। দ্রষ্টব্য '**যতিলোপ**' সংজ্ঞা।

রীতি (Style)—পদ্যরচনার বিভিন্ন প্রণালীকে বলা যায় 'রীতি', সত্যেন্দ্রনাথের পরিভাষায় 'পদ্ধতি'। এসব প্রণালী বা রীতি নির্ভর করে কবি-অনুসৃত বিভিন্ন ধ্বনিবিন্যাস নীতির উপরে। প্রাচীন ভারতীয় ছন্দ বৈদিক ও লৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। সমস্ত বৈদিক ছন্দ অযুক্তযুক্ত-নির্বিশেষে শুধু অক্ষরসংখ্যার (আসলে দলসংখ্যার) সমতাগত মূলনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই সমস্ত বৈদিক ছন্দকে 'অক্ষরবৃত্ত' শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা যায়। সেকালের লৌকিক (মানে অবৈদিক) ছন্দসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মূলনীতি লঘুগুরু ভেদে নানাভাবে বিন্যস্ত অক্ষরসংখ্যার (আসলে দলসংখ্যার) সমতা, এই শ্রেণীর ছন্দকে সাধারণভাবে বলা হয় অক্ষরছন্দ বা বৃত্ত। অপর শ্রেণীর মূলনীতি মাত্রাসংখ্যার (আসলে কলাসংখ্যার) সমতা, এগুলির সাধারণ নাম 'মাত্রাছন্দ' বা গণছন্দকে 'গণবৃত্ত'ও বলা হয় (দ্রষ্টব্য মনিঅর উইলিঅম্‌সের অভিধানে metre শব্দ)। এই হিসাবে সংস্কৃত ছন্দের তিন রীতি—**অক্ষরবৃত্ত** বা **বর্ণবৃত্ত**, **মাত্রাবৃত্ত** ও **গণবৃত্ত**। প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে 'বর্ণবৃত্ত' নামের প্রয়োগই বেশি দেখা যায়। বাংলা ছন্দ রচনার রীতি তিনটি—দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত। এই তিন সংজ্ঞাশব্দের সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে যথাস্থানে।

১

কবি **সত্যেন্দ্রনাথ** তাঁর 'ছন্দসরস্বতী' নিবন্ধে (১৯১৮। ১৩২৫ বৈশাখ) প্রথমেই পরিচয় দিয়েছেন মিশ্রবৃত্ত রীতির। এই রীতিকে তিনি বলেছেন **আদ্যা**। তাঁর মতে এই রীতি মূলতঃ ছিল 'শব্দপাপড়ি' (সিলেব্‌ল্‌)-সংখ্যাত। পরবর্তী কাল ফার্সীনবিশ লেখকরা একে ক্রমে 'অক্ষরবৃত্তে' পরিণত করেছেন। তাঁর এই মত স্বীকৃতিযোগ্য নয় বলেই মনে করি। যা হক, এই 'মাত্রাবিচার-শূন্য অক্ষরগোনা' রীতির প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন না। তাই তিনি নিঃসঙ্কোচেই বলতে পেরেছেন—"পয়ার ত্রিপদীর কাজ ফুরিয়েছে।" বস্তুতঃ এই রীতি মাত্রাবিচারহীনও নয়, নিছক অক্ষরগোনাও নয়। এই রীতিতে মাত্রাবিন্যাসের রহস্য কোথায় তা তাঁর কাছে ধরা পড়েনি। দ্বিতীয়তঃ, এই রীতির যদি কোনো গুণই না থাকত তবে সে শত শত বৎসর ধরে বাঙালি জাতির শ্রুতিরুচির উপরে এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। এই ছন্দোরীতির নমনীয়তাগুণ

প্রায় অপরিসীম। কবিরা প্রয়োজনমতো একে যেমন দৃঢ়সংবদ্ধ ও সুকঠিন রূপ দিতে পারেন, তেমনি পারেন তরলকোমল রূপ দিতেও। এ রীতির ছন্দ যেন ধীর মন্থরগতি হতে পারে, তেমনি পারে দ্রুতগামী হতেও। তৃতীয়তঃ, পয়ার ত্রিপদীর কাজ এখনও ফুরায়নি। তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্তও আছে বাংলাসাহিত্যে। তা ছাড়া, পয়ার ত্রিপদী যে শুধু আদ্যা রীতিতেই হয় তা নয়, অন্য দুই রীতিতেও পয়ার ত্রিপদী রচিত হতে পারে এবং হয়ে থাকে। এ বিষয়েও সত্যেন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন না।

কলাবৃত্ত রীতির পরিচয় আছে 'ছন্দসরস্বতী' নিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। কলাবৃত্ত রীতিকে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন **হৃদ্যা**। এই নামে থেকেও বোঝা যায়, এই রীতির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের মন বেশ প্রসন্ন ছিল। কিন্তু এই রীতির ছন্দ-বিশ্লেষণে তাঁর স্বাধীন বা নূতন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে তাঁর উক্তি এই—"পংক্তি বা শব্দের গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়গায় **যুক্ত অক্ষর প্রকৃতপক্ষে এক-জোড়া অক্ষর**, এই কথাটা স্মরণ রাখলে এই নতুন ছন্দের বিশেষত্ব বুঝতে কষ্ট হবে না। আর এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐ-কার আর ঔ-কার হচ্ছে স্বরসঙ্কর অর্থাৎ এক-জোড়া ভিন্ন জাতের স্বরবর্ণে তৈরি—ইংরেজিতে যাকে বলে diphthong!" এই দুটি বাক্যের প্রথমটি আসলে রবীন্দ্রোক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র। একটু পরেই রবীন্দ্রোক্তির পরিচয় দেওয়া যাবে। দ্বিতীয় বাক্যটি নূতন। তবে এটিও আসলে প্রথম বাক্যেরই পরিপূরক মাত্র। মোট কথা, এই দুই বাক্যের কোনোটিতেই স্বাধীন ছন্দচিন্তার আভাস পাওয়া যায় না। তাছাড়া জোড়াস্বর যে শুধু 'ভিন্ন জাতের' স্বর নিয়েই গড়া হয় তা নয়। যেমন—ইই্ (নিই্, দিই্, তুমিই্) ; এ্এ (নেয়্, দেয়্) ; ওও্ (ধোও্, এএ্)। আর, অনুস্বার-বিসর্গের কথাও বলা হয়নি এ প্রসঙ্গে।

দলবৃত্ত রীতির সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া নাম **চিত্রা**। এই চিত্রা রীতির পরিচয় আছে 'ছন্দসরস্বতী' নিবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে। এই রীতির বিশ্লেষণে সত্যেন্দ্রনাথের যথার্থ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন এই রীতির ছন্দ আসলে সিলেব্‌ল্-গোনা ছন্দ, আর এর প্রতি পূর্ণপর্বে থাকে চার সিলেব্‌ল্। তিনি সিলেব্‌ল্-কে বলেছেন 'শব্দপাপ্‌ড়ি'। বলা বাহুল্য, এই শব্দটা পরিভাষা হিসাবে সুব্যবহার্য নয়। আধুনিক কালে সিলেব্‌ল্-কে আমরা বলি 'দল'। এই দলের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ই উ এ ও, এই চারিটি স্বরবর্ণের দু-রকম উচ্চারণরূপের উল্লেখ করেছেন—গোটা ও ভাংটা। যেমন—গোটা ই, ভাংটা ই ইত্যাদি। আধুনিক পরিভাষায় বলা যায় পূর্ণ উ, খণ্ড উ। তাছাড়া, অন্যত্র (পঞ্চম অধ্যায়) ওয়া, ইয়ে এ-দুটি অন্তঃস্থ ধ্বনিরও পরিচয় দিয়েছেন যথাযথ ভাবে। ফলে দলবৃত্ত রীতির প্রায় পুরো পরিচয়ই পাওয়া যায় এই দুই অধ্যায়ে। তবে এই রীতির ছন্দে যে অবস্থাবিশেষে ত্রিদল পর্বের প্রয়োগও দেখা যায়, শুধু এই ব্যতিক্রমের উল্লেখ নেই তার এই নিবন্ধে।

এ প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, এই রীতির ছন্দ যে আসলে সিলেব্‌ল্-সংখ্যাত সে কথা বোধ করি সর্বপ্রথম বলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় (১৯০৭) তিনি বলেন—"এই কবিতাগুলির ছন্দ **মাত্রিক** (syllabic), 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ নয়।...এই ছন্দের মধ্যে একটা বিশেষ শৃঙ্খলা, সংগীত ও শক্তি লক্ষিত হবে। এ ছন্দ যে প্রচলিত ছন্দের চেয়ে অধিক **স্বাভাবিক**, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" তাঁর পরবর্তী 'ত্রিবেণী' কাব্যের অনেকগুলি কবিতাও এই মাত্রিক রীতিতে রচিত। সে কবিতাগুলিকে তিনি বলেছেন 'মাত্রিক'। এই কাব্যের ভূমিকায় (১৯১২) তিনি 'মাত্রিক' নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—"**মাত্রিক**, অর্থাৎ যে

কবিতায় ছন্দ মাত্রা (syllable) দ্বারা পরিমিত হয়।" কিন্তু পরিমাপের প্রণালী কি, অর্থাৎ প্রতি 'তাল'-বিভাগে (অর্থাৎ পর্বে) কয় 'মাত্রা' থাকে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ হিসাব করে দেখালেন, এ ছন্দের প্রতি পূর্ণ পর্বে থাকে চারটি করে 'শব্দ-পাপড়ি' অর্থাৎ দলমাত্রা। আবার পঞ্চম অধ্যায়ে কলামাত্রার হিসাব দেখিয়ে বললেন—"তুমি যাকে চারের ঘরানা, চারালী বা লাচারী বলছ, তাকে পাঁচের ঘরানা বা পাঁচালিও বলতে পার।" এই কলামাত্রার হিসাবটা অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক। রবীন্দ্রনাথের মতে কলামাত্রার হিসাবে এই রীতির প্রতি পর্ব 'ষাণ্মাত্রিক'। সে কথা বলা যাবে পরবর্তী '**সাধু রীতি**' প্রসঙ্গে।

সত্যেন্দ্রনাথ এই তিন রীতি ছাড়া 'দৃপ্তা' ও 'মঞ্জু' নামে আরও দুই রীতির পরিচয় দিয়েছেন পরবর্তী দুই অধ্যায়ে। সংস্কৃত বর্ণবৃত্তবর্গীয় ছন্দ ও অন্য কয়েকটি অ-বাংলা ভাষার অনুরূপ ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতিকে তিনি বলেছেন **দৃপ্তা**। আর, অন্য কোনো ভাষার ছন্দোবন্ধের অনুসরণ না করে স্বোদ্ভাবিত নূতন-নূতন ছন্দোবন্ধ রচনার প্রণালীকে তিনি বলেছেন মঞ্জু। দৃপ্তা ও মঞ্জু আসলে দুই শ্রেণীর নূতন ছন্দোবন্ধের নাম, নূতন ছন্দোরীতির নয়। এই দুই শ্রেণীর সব ছন্দোবন্ধই আসলে রচিত হয় চিত্রা অর্থাৎ দলবৃত্ত (syllablic) রীতিতে।

পরিশেষে বলা উচিত যে, 'ছন্দসরস্বতী' নিবন্ধে শুধু বিভিন্ন ছন্দোরীতিরই পরিচয় আছে, ছন্দোরূপের নয়। তাছাড়া, ছন্দোরীতির প্রসঙ্গেও যতি, মাত্রা, পদ প্রভৃতি পরিভাষার প্রয়োগও দেখা যায় না এই নিবন্ধে।[১] অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে কোনো-কোনো স্থলে মাত্রা ও পদ শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু এই দুই শব্দের পারিভাষিক অর্থ নির্দেশ নেই। অর্থ নির্দেশ লেখকের অভিপ্রেতও ছিল না।

২

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বাংলা ছন্দ রচনার রীতি দুটি—সাধু ও প্রাকৃত। আমরা যাকে বলি 'দলবৃত্ত' রীতি, তাকেই তিনি বলতেন 'প্রাকৃত' রীতি। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে '**প্রাকৃত রীতি**' প্রসঙ্গে।

আমরা যাকে বলি 'কলাবৃত্ত', তাকে তিনি সাধু রীতিরই প্রকারভেদ বলে মনে করতেন। কারণ তিনি কলাবৃত্ত রীতির ছন্দকেও অক্ষরগোনা ছন্দ বলেই মনে করতেন। এখানে কলাবৃত্ত (নূতন সাধু) রীতির রবীন্দ্রকৃত বিশ্লেষণের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ কলাবৃত্ত রীতির প্রবর্তন করেন 'মানসী' কাব্য রচনাকালে (১৮৮৭-৯০)। সে সময়ে এই কাব্যের ভূমিকায় (১৮৯০। ১২৯৭ পৌষ) তিনি লেখেন[২]—"এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় **যুক্তাক্ষর দুই অক্ষর স্বরূপ** গণ্য করা হইয়াছে।...যথা—

> নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল,
>
> ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।[৩]

নিম্নে, স্বচ্ছ এবং ঊর্ধ্বে, এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে **পয়ার** ছন্দ থাকে না। আমার বিশ্বাস যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।...শব্দের

আরম্ভ-অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর স্বরূপে গণনা করা যায় না।”—এই উক্তিতে বিশেষভাবে লক্ষিতব্য—

(১) “নিম্নে’ শব্দে তিন ‘মাত্রা’ গণনা করা হয়েছে। কারণ ‘ম্নে’ যুক্তাক্ষর দুই ‘অক্ষর’ বলে গণ্য হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এখানে অক্ষরই ছন্দের মাত্রা বলে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই ছন্দও রবীন্দ্রনাথের মতে অক্ষরমাত্রার (মানে অক্ষরগোনা) ছন্দ। এজন্যই তিনি এই নবপ্রবর্তিত ছন্দোরীতিকে পূর্বাগত অক্ষরগোনা ‘সাধু’ রীতির প্রকারভেদ বলেই মনে করতেন।

(২) রবীন্দ্রনাথের ন্যায় **দ্বিজেন্দ্রলালও** মনে করতেন বাংলা ছন্দ-রচনার রীতি দুটি— **মিতাক্ষর** ও **মাত্রিক**। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন ‘সাধু’ রীতি, দ্বিজেন্দ্রলালের মতে তারই নাম ‘মিতাক্ষর’, আর রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন ‘প্রাকৃত’ রীতি, দ্বিজেন্দ্রলালের মতে তার নাম ‘মাত্রিক’। ছন্দোরীতিকে সাধু ও প্রাকৃত, এই দুই নাম দেওয়া হয়েছে, দুই ভাষারীতির নাম অনুসরণে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া দুই নাম ছন্দের গঠনপ্রণালীর পরিচায়ক নয়, তাই এই দুই নামকে যথার্থ পারিভাষিক নাম বলা যায় না। কিন্তু ‘মিতাক্ষর’ ও ‘মাত্রিক’ নাম ছন্দের গঠনরীতিরই পরিচায়ক, তাই এই নাম-দুটি পারিভাষিক নাম বলে গণ্য হতে পারে। তবে এই দুই নাম যথাযথ হয়েছে কিনা, সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘মানসী’ কাব্যে প্রবর্তিত নূতন ছন্দোরীতিকে পূর্বাগত (অক্ষরগোনা) সাধুরীতিরই প্রকারভেদ বলে মনে করতেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনি এই নূতন রীতিকে মিতাক্ষর রীতিরই প্রকারভেদ বলে গণ্য করতেন। ‘ত্রিবেণী’ কাব্যের ভূমিকায় (১৯১২) তিনি বলেন—“মিতাক্ষর, অর্থাৎ যাহার ছন্দোবন্ধ অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। যুক্তাক্ষর, ঐকার ও ঔকার ছন্দোবিশেষে দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলিতে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।” ঐকার ও ঔকারের উল্লেখে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দচিন্তার কিছু স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে। দেখা গেল, ‘মানসী’ কাব্যে প্রবর্তিত ধ্বনিমাত্রা গণনার নূতন প্রণালীকে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল কেউই নূতন ছন্দোরীতি বলে স্বীকার করেননি।

(৩) আমরা দেখেছি সত্যেন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের মতেই এই শ্রেণীর ছন্দে যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর বলে গণ্য করতেন। তবু তিনি অক্ষরগণনার এই রীতিকে সনাতন অক্ষরগোনা রীতির প্রকারভেদ বলে স্বীকার করেননি। তিনি তাকে একটা নূতন রীতির **মর্যাদা** দিয়ে আখ্যাত করলেন **হৃদ্যা** নামে। পরে কবি-অকবি সবাই একে নূতন রীতি বলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের দেওয়া ‘**হৃদ্যা**’ নামটি কেউ গ্রহণ করেননি। এক কালে (১৯২২-২৩) এই নূতন রীতি পরিচিত হয়েছিল **মাত্রাবৃত্ত** নামে। তার পরে পরিচিত হয়েছে **কলাবৃত্ত** নামে।

(৪) এই রীতিতে রচিত ছন্দোবন্ধের মাত্রাগণনার তিন প্রণালী দেখা যায়।—প্রাচীন (সংস্কৃত-প্রাকৃত) প্রণালীতে—যুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণ গুরু অর্থাৎ দ্বিমাত্রক বলে গণ্য হয়। তদনুসারে নি+ম্নে=২+১ মাত্রা।

রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র-স্বীকৃত প্রণালীতে—যুক্তাক্ষরটাই দুই অক্ষরমাত্রা হিসাবে গণ্য। তদনুসারে নি+ম্নে=১+২ মাত্রা।

অধুনাস্বীকৃত প্রণালীতে—শব্দের দলবিভাগই বিচার্য, অক্ষরবিভাগ নয়। তদনুসারে রুদ্ধদল হয় দ্বিমাত্রক, মুক্তদল একমাত্রক। যেমন, নিম্‌+নে=২+১ মাত্রা।

বলা বাহুল্য, এই তৃতীয় প্রণালীটাই শ্রুতিসম্মত, তাই যুক্তিসম্মতও বটে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, প্রাচীন রীতিটাই আধুনিক প্রণালীর অনেকটা কাছাকাছি। রবীন্দ্রপ্রবর্তিত অক্ষরমাত্রা গণনার প্রণালী শ্রুতিসম্মত নয়, তাই যুক্তিসম্মত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের বিধিবিধান সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তার প্রমাণ আছে 'ছন্দসরস্বতী' নিবন্ধেই। তবু তিনি কেন যে রবীন্দ্রস্বীকৃত প্রণালীই মেনে নিলেন তা জানি না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক কালের কবিদের সকলে না হক, অনেকেই এখনও এই শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক প্রণালীটাই মেনে চলেন। তাতে কাজ চলে যায় বটে, কিন্তু আমাদের চিন্তার দুর্বলতা এবং অস্বচ্ছতাও প্রকাশ পায়।

(৫) 'মানসী' কাব্যের যে ভূমিকাংশটুকু উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে 'নিম্নে যমুনা বহে' ইত্যাদি রচনার ছন্দোবন্ধকে বলা হয়েছে 'পয়ার'। কবির এই উক্তির তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য।—

প্রথমতঃ, এই পয়ারবন্ধ রচিত হয়েছে আধুনিক পরিভাষায় 'কলাবৃত্ত' রীতিতে। সুতরাং এই পয়ারকে বলা যায় 'কলাবৃত্ত পয়ার'। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত উক্তি থেকেই বোঝা যায়, পয়ারবন্ধ একমাত্র মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই রচিত হয় এই ধারণা অভ্রান্ত নয়। অতএব মিশ্রবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত, তানপ্রধান) রীতিকে 'পয়ারজাতীয়' নামে আখ্যাত করাও অনুচিত।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলা ছন্দোবিবর্তনের ইতিহাসে 'মানসী' কাব্যের 'নিস্ফল উপহার' কবিতার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এটিতেই পাওয়া গেল **প্রথম কলাবৃত্ত পয়ার** (১৮৮৮ জুন)।

এই হল রবীন্দ্রপ্রবর্তিত নূতন সাধু (অর্থাৎ কলাবৃত্ত) রীতির পরিচয়। পূর্বতন সাধু রীতির রবীন্দ্রকৃত বিশ্লেষণ ও তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে পরবর্তী **সাধুরীতি** প্রসঙ্গে।

৩

অমূল্যধন বলেন (মূলসূত্র, পৃ ৯৯)—বাংলা ছন্দের তিন রীতির "বিশেষত্ব ও পরস্পরের সহিত পার্থক্য—লয়ে, মাত্রা গুণিবার পদ্ধতিতে নয়।...চরণের লয়ের উপরই এক এক রীতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।" এই মূলসূত্র অনুসারে তিনি বাংলা ছন্দের তিন রীতিকে **ধীর লয়ের ছন্দ**, **বিলম্বিত লয়ের ছন্দ** ও **দ্রুত লয়ের ছন্দ**, এই তিন নামে আখ্যাত করেছেন। তার মতে এই তিন রীতিকে যথাক্রমে **তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান** ও **শ্বাসাঘাতপ্রধান,** এই তিন বৈকল্পিক নামেও নির্দেশ করা যায়। কিন্তু যে কারণেই হক, পাঠকসমাজে তিন লয়াত্মক নামের চেয়ে তিন প্রধানান্ত নামই অধিকতর পরিচিত হয়েছে। তাই এই বৈকল্পিক নামের বিষয়টাই আগে আলোচনা করা যাক। লয়াত্মক নামের কথা বলা যাবে **লয়** সংজ্ঞার প্রসঙ্গে।

তানপ্রধান নামটা শুধু যে অসার্থক তা নয়, বিভ্রান্তিকরও বটে। 'তান' মানে বিস্তার, প্রসারণ। গানের স্বরবিস্তারকে বলা হয় 'তান'। ছন্দের যে রীতিকে বলা হয় তানপ্রধান, সে রীতিতে উচ্চারিত ধ্বনির প্রসারণের চেয়ে, সংকোচনই বেশি হয়। ধ্বনির সংকোচনের দিকেই তার প্রবণতা। তাতেই তার শক্তি, তার গৌরব। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

—মধুসূদন, মেঘনাদদধ কাব্য, নবম সর্গ

হে বঙ্গ, ভাণ্ডার তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

—মধুসূদন, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বঙ্গভাষা

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাষাতে চাহে বলের বন্যায়।

—নৈবেদ্য-৬৪, 'শতাব্দীর সূর্য আজি'

একথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন ধনমান।

—বলাক-৭, 'এ কথা জানিতে তুমি'

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

—গীতাঞ্জলি-১০৮, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'

এই রীতির ছন্দকেই বলা হয়েছে 'তানপ্রধান'। একটু কান পেতে শুনলেই বোঝা যায়, এসব আবৃত্তিতে ধ্বনির বিস্তার-প্রবণতা কোথাও প্রাধান্য পায় না, বরং বিস্তারহীনতা ও সংকোচ-প্রবণতাই প্রাধান্য পায়। তাই স্বীকার করতে হবে, ছন্দের এই রীতিকে 'তানপ্রধান' আখ্যা দিলে জিজ্ঞাসু পাঠকের কানকে বিপথে চালানো হয়।

'মূলসূত্র' অনুসারে এই রীতির আর-এক নাম **পয়ারজাতীয়**। এই নামটিও যে বিভ্রান্তিকর তা পূর্বেই একাধিক স্থানে দেখানো হয়েছে। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, পয়ারবন্ধ তিন রীতিতেই রচিত হতে পারে এবং হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো একটি মাত্র রীতিকেই 'পয়ারজাতীয়' আখ্যা দেওয়া সুবিবেচিত বলে মনে করা যায় না। স্মরণীয় পূর্বোক্ত 'নিম্নে যমুনা বহে' ইত্যাদি কলাবৃত্ত পয়ারের দৃষ্টান্ত।

মূলসূত্রের মতে (পৃ ১০১)—"শুধু অক্ষরধ্বনিকে প্রাধান্য না দিয়া, তাহাকে সুরের টানের অধীন রাখা হয় বলিয়া পয়ারজাতীয় ছন্দে যতগুলি অক্ষর এক পর্বে সমাবেশ করা যায়, অন্য রীতিতে লেখা কবিতায় ততগুলি করা যায় না। আট মাত্রা, দশ মাত্রার পর্ব এই পয়ারজাতীয় ছন্দেই দেখা যায়।" এখানে 'মাত্রা' মানে নিশ্চয় 'অক্ষর' (সিলেব্‌ল্) নয়। এই রীতিতে মাত্রা বলা হয় কাকে, উদ্ধৃত উক্তি থেকে বোঝা যায় না। যা হক, এই বিষয়টা গৌণ। এই উক্তির আসল তাৎপর্য্য এই যে—(১) একমাত্র এই রীতিতেই এক পর্বে (মানে কোথাও না থেমে এক 'টানে') আট বা দশ মাত্রা সমাবিষ্ট করা (মানে পড়া বা আবৃত্তি করা) যায়, আর (২) অন্য কোনো রীতিতেই তা করা যায় না। এর থেকে মনে হয়, কোথাও না থেমে (যতি না দিয়ে) এক সঙ্গে অনেক

মাত্রা আবৃত্তি করাকেই গ্রন্থকার বলেছেন ‘সুরের টান’, আর এজন্যই এই রীতির নাম হয়েছে ‘তানপ্রধান’—উচ্চারণগত স্বরবিস্তারের জন্য নয়।

একটু বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে, উক্ত দুই সিদ্ধান্তের একটিও তথ্যসম্মত নয়। উদ্ধৃত শেষ দুই দৃষ্টান্তের ‘একথা জানিতে তুমি’ এবং ‘পশ্চাতে রেখছ যারে’ এই দুই অংশ আট মাত্রার অখণ্ড অর্থাৎ যতিহীন ছন্দোবিভাগ বলে স্বীকার্য বটে। কিন্তু ‘কালস্রোতে। ভেসে যায়’ এবং ‘যারে তুমি। নীচে ফেল’ এই দুই বিভাগ তো যতিহীন রূপে অর্থাৎ একটানে উচ্চারিত হয় না, মাঝে একটি সুব্যক্ত লঘুযতি থাকে। আসল কথা এই যে, প্রথম দুটি বিভাগে লঘুযতি অব্যক্ত বা লুপ্ত হবার ফলেই ওই দুটি বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড রূপ ধারণ করেছে। যতি থাকাটাই সাধারণ নিয়ম, যতিলোপ হওয়া ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু ‘মূলসূত্র’ গ্রন্থে ব্যতিক্রমকেই সাধারণ নিয়মের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই চার-চার মাত্রার দুই পর্বের যুক্তরূপটাই আট মাত্রার দীর্ঘ ‘পর্ব’ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আট মাত্রার এ-রকম বিভাগ আসলে যুক্তপর্বক ‘পদ’, পর্ব নয়। এই পদের পরে যে অর্ধযতি থাকে, পর্বের পরবর্তী লঘুযতির চেয়ে তার গুরুত্ব (intensity) বেশি। আট মাত্রার এ-রকম বিভাগকে যে ‘পর্ব’ বলে প্রতীত হয়, তার মূল কারণ দুটি—(এক) যতিলোপ-চেতনার অভাব এবং (দুই) যতির তারতম্য-চেতনার অভাব।

দশ মাত্রার বিভাগও আসলে ‘পদ’, পর্ব নয়। দশমাত্রার পদ গঠিত হয় চার-চার-দুই মাত্রার দুটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ পর্ব নিয়ে। দুটি পর্বের পরে থাকে দুটি লঘুযতি। যেমন—“সে তোমারে। বাঁধিবে যে। নীচে”। এই দুই লঘুযতির যে-কোনো একটি বা দুটিই লুপ্ত হতে পারে। যেমন—

‘জীবন-যৌ : বন ধন। মান।’—প্রথম লঘুযতি লুপ্ত।

‘সে তোমারে। পশ্চাতে টা : নিছে।’—দ্বিতীয় লঘুযতি লুপ্ত।

‘ভারত-ঈশ্ : শ্বর শা-জা : হান।’—দুটি লঘুযতি লুপ্ত।

আট মাত্রার পর্ব একমাত্র ‘পয়ারজাতীয়’ ছন্দেই দেখা যায়, অন্য রীতিতে দেখা যায় না, মূলসূত্রের এই অভিমতও (পৃ ১০১) সত্য নয়। কলাবৃত্ত (‘ধ্বনিপ্রধান’) রীতির ছন্দে ‘আট মাত্রার পর্ব’ (আসলে যুক্তপর্বক পদ) প্রচুর দেখা যায়। দৃষ্টান্ত—

রবিঠাকুরের দেখা সেই দিন মাত্তর,
‘আজি তো বয়স তার’ ‘কেবল আটাত্তর’—
‘সাতের পিঠের কাছে’ এক ফোঁটা শূন্য,
শত শত বরষের ‘ওদের তারুণ্য’।...
‘বিধাতা আপন ক্ষতি’ করে যদি ধার্য
‘নিজেরই তবিল ভাঙা’ হয় তার কার্য।

—নবজাতক, মংপু পাহাড়ে

এই ছয় পঙ্ক্তিতে আছে ছয়টি আট মাত্রার যুক্তপর্বক পূর্ণ পদ। ‘তারুণ্য’ শব্দের অন্তে এক মাত্রার ফাঁক। এ-রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে বাংলা সাহিত্যে। মনে রাখা প্রয়োজন বাংলা কলাবৃত্তরীতিতে এ-রকম আট মাত্রার

লঘুযতিহীন যুক্তপর্বক পদ এসেছে সংস্কৃত পজ্ঝটিকা তথা প্রাকৃত পাদাকুলক প্রভৃতি ছন্দের উত্তরাধিকারসূত্রে। সংস্কৃত পজ্ঝটিকার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই।—

মা কুরু। ধনজন ॥ যৌবন ।-গর্বম্,
'হরতি নিমে-ষাৎ' ॥ কালঃ। সর্বম্।
ক্ষণমিহ। সজ্জন ॥-সংগতি ।-রেকা
'ভবতি ভবা-র্ণব' ॥-তরণে। নৌকা।

—শংকরাচার্য, মোহমুদ্গর

লক্ষিতব্য এখানে দুটি আট মাত্রার যুক্তপর্বক পদেই আছে তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্ব। উদ্ধৃত বাংলা দৃষ্টান্তের চারটি যুক্তপর্বক পদেও তিন উপপর্ব সাজানো হয়েছে তিন-তিন-দুই মাত্রায়। জয়দেবের একটি গীতে আছে—

চন্দন।-চর্চিত ॥ 'নীল-কলে-বর' ॥ 'গীত-বসন-বন' ।-মালী।

এই ছন্দোবন্ধ বাংলায় অনুকৃত ও অনুসৃত হয়েছে নানাভাবে। সেকথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আট-আট-দশ মাত্রার বাংলা ত্রিপদী বন্ধ এসেছে এই জয়দেবী ছন্দোবন্ধ থেকেই। 'জনগণমন' ইত্যাদি আমাদের জাতীয় সংগীতটি রচিত হয়েছে প্রধানতঃ এই ছন্দোবন্ধের অনুসরণেই। 'চন্দন-চর্চিত' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে আছে আট-আট-বারো মাত্রার তিন পদ। এই একটি পঙ্‌ক্তিতেই তিন-তিন-দুই মাত্রার দুটি যুক্তপর্ব —'নীল-কলে-বর' এবং 'পীত-বসন-বন'। 'জনগণমন' গানেও এ-রকম যুক্ত পর্বরে প্রয়োগ আছে যথেষ্ট।—

জনগণ।-মন-অধি ॥-নায়ক। জয় হে ॥ ভারত। -ভাগ্যবি ।-ধাতা,
পন্ -'জাব-সিন্ধু-গুজ' ॥-রাট ম ।-রাঠা ॥ দ্রাবিড়। উৎকল। বঙ্গ,
'বিন্ধ্য-হিমা-চল' ॥ যমুনা। গঙ্গা ॥ উচ্ছল। জলধিত ।-রঙ্গ।...
অহরহ। তব আহ্ ॥ 'বান প্রচা-রিত', ॥ শুনি তব। উদার। বাণী,
'হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ' ॥ 'জৈন-পার-সিক' ॥ 'মুসল-মান-খৃস্' ।-টানী।...
'পতন-অভ্যু-দয়' ॥ বন্ধুর। পন্থা ॥ যুগযুগ ।-ধাবিত। যাত্রী,
হে চির। সারথি ॥ তব রথ।-চক্রে ॥ মুখরিত। পথ দিন। রাত্রি।...
'রাত্রি প্রভা-তিল' ॥ 'উদিল রবিচ্-ছবি' ॥ 'পূর্ব-উদয়-গিরি' ।-ভালে,
'গাহে বিহঙ্-গম', ॥ 'পুণ্য-সমী-রণ' ॥ নব জী ।বনরস। ঢালে।

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে কয়েকটি বিষয় বলে রাখা দরকার—

(১) বঙ্গ, রঙ্গ, রাত্রি, এই তিন শব্দের শেষ দল স্বতঃই দীর্ঘ রূপে উচ্চারিত হয়। পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক পূর্ণযতির সুযোগেই এ-রকম হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একে বলা যায় '**যতির মাত্রা**'। প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রে বলা হয় 'পাদান্তগুরু'।

(২) উদ্ধৃত শেষ পঙ্‌ক্তির 'গাহে' শব্দের 'হে' হ্রস্ব (একমাত্রক) রূপে উচ্চার্য। সমগ্র রচনাটিতে এই একটিমাত্র ব্যতিক্রম। আর কোথাও স্বরবর্ণের উচ্চারণে প্রাচীন নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি।

(৩) দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির আদিস্থিত 'পন্' দলটি অতিপর্ব রূপে উচ্চার্য। এ বিষয়ে স্মরণীয় রবীন্দ্রোক্তি ('ছন্দ', ১৯৭৬ সং, পৃ ৮২, ৮৫)—" 'পঞ্জাব' শব্দের প্রথম সিলেব্‌ল্‌টাকে দ্বিতীয় পদের [পঙ্‌ক্তির] গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি—পন্। জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা ইত্যাদি।" গানেও 'পন্' অতিপর্ব রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু মূলসূত্রের (১৯৮৩ সং, পৃ ৩৮, ৪২) মতে—"পঞ্জাব্ সিন্ধু। গুজরাট মরাঠা।...এই চরণের দ্বিতীয় পর্বাঙ্গে 'রা 'ঠা' দুই অক্ষরের শেষেই অ-কার আছে ; কিন্তু 'রা' অক্ষরটির প্রসারণ না করিয়া 'ঠা' অক্ষরটির প্রসারণ করিতে হইবে।" কিন্তু 'গুজরাট' শব্দের 'রা' দীর্ঘ কিনা, এ বিষয়ে মূলসূত্র নীরব। 'মরাঠা' শব্দ এই চরণের দ্বিতীয় 'পর্বাঙ্গ' বলেও গণ্য হতে পারে না। মূলসূত্রের এই বিশ্লেষণ সম্পর্কে আর কিছু না বলাই ভাল।

(৪) এই রচনাটির প্রতি স্তবকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে জয়দেবী ত্রিপদী বন্ধে কিছু বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। এটিও ত্রিপদী বটে। কিন্তু আট-আট-বারো মাত্রার ত্রিপদী নয়, বারো-বারো-বারো মাত্রার ত্রিপদী। যেমন—

তব শুভ। নামে। জাগে, ॥ তব শুভ। আশিস। মাগে,॥
গাহে। তব জয় ।-গাথা।

প্রতি পদে তিন পর্ব, প্রতি পর্বে চার কলামাত্রা। প্রথম দুই পদে মিল। এখানে কিন্তু 'গাহে' শব্দের 'হে' হ্রস্ব হয় নি।

এবার মূলপ্রসঙ্গে ফিরে যাই। উপরে 'জনগণমন' গান থেকে যে নয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তাতেও তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে বিভক্ত বারোটি যুক্তপর্ব ছড়িয়ে আছে নানা স্থানে। এসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা গেল, মূলসূত্রকথিত আট মাত্রার দীর্ঘ 'পর্ব' (আসলে 'যুক্তপূর্বক পদ') একমাত্র মিশ্রবৃত্ত রীতিরই বৈশিষ্ট্য নয়। কলাবৃত্ত (প্রাচীন ও আধুনিক) রীতিতেও এ-রকম যুক্তপর্বক পদের অবাধ প্রয়োগ চলে আসছে সুদূর অতীত কাল থেকেই।

দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান) রীতিতেও এ-রকম যুক্তপর্বক পদ প্রয়োগের অভাব নেই, যদিও অন্য দুই রীতির তুলনায় কিছু কম। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

'জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা' দিয়ে কত রত্নসোনা,
'কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তায়' 'দিয়ে ছার ডাকের গহনা'।

—রামপ্রসাদ, পদাবলী

বামুন-বাড়ী গেলে পরে
'ডেকে না জিজ্ঞাসা করে'।...
যদি আনি মেগে পেতে
'পেট ভোরে পাব না খেতে'।

—ঈশ্বর গুপ্ত গ্রন্থাবলী, পৌষডার গীত

আরামে হতে ছিন্ন করে   সেই গভীরে লও গো মোরে
‘অশান্তির অন্তরে যেথায়’ শান্তি সুমহান্।

—‘রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি-৭৪, ‘বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি’

‘হও তুমি সাবিত্রীর মতো’, এই কামনা করি।

—রবীন্দ্রনাথ, পলাতক, নিষ্কৃতি

শমন্ এসে বলবে হেসে—এখন কোথা যাবে, চাঁদ?
‘ঘুঘু তো দেখেছ শুধু’, এখন তবে দেখ ফাঁদ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, আনন্দ-বিদায়

‘কোন্ ভাষা মরমে পশি’ আকুল করি তোলে প্রাণ,
কোথায় গেলে শুনতে পাব বাউল সুরের মধুর গান?...
‘কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা’ সবার অধিক পাই রে দুখ,
‘কোন্ দেশের গৌরবের কথায়’ ভরে ওঠে মোদের বুক?

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেণু ও বীণা, কোন দেশে

আর দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। অতএব ‘সুরের টানের অধীন রাখা হয় বলিয়া’ একমাত্র পয়ারজাতীয় (মানে ‘তানপ্রধান’ রীতির) ছন্দেই ‘আট মাত্রা দশ মাত্রার পর্ব’ দেখা যায়, মূলসূত্রের (পৃ ১০) এই মত মেনে নেওয়া যায় না। আসল কথা এই যে, তিন রীতিতেই চতুর্মাত্রক পর্বের ছন্দোবন্ধে লঘুযতি প্রায়শঃ লুপ্ত হয়, ফলে চার মাত্রার দুই পর্ব একসঙ্গে জুড়ে যায়। তারই ফলে দেখা দেয় এক-একটি আট মাত্রার যুক্তপর্বক পদ। আর এসব যুক্তপর্বক পদ স্বতঃই তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে বিভক্ত হয়ে যায়। অথবা বলা যায়, তিন-তিন-দুই এই ক্রমে মাত্রা বিন্যস্ত হলেই লঘুযতি লুপ্ত হয়, তাতেই উৎপন্ন হয় এক-একটি আট মাত্রার যুক্তপর্বক পদ। মোট কথা, যে দিক্ থেকেই বিচার করা যাক, ‘তানপ্রধান’ শব্দটাকে যেমন একটি সার্থক পারিভাষিক নাম বলে মনে করা যায় না, তেমনি তার ব্যাখ্যাকে যুক্তিসিদ্ধ বলে স্বীকার করা যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথ যে রীতিকে বলতেন ‘হৃদ্যা’ আর আমরা যাকে বলি ‘কলাবৃত্ত’, তাকেই মূলসূত্রে বলা হয়েছে **ধ্বনিপ্রধান**। মূলসূত্র-কথিত তিন নামের এই নামটাই সবচেয়ে অসার্থক। সব ছন্দেরই একমাত্র উপাদান ধ্বনি। কোন্ রীতির ছন্দে ধ্বনিকে কিভাবে প্রয়োগ করা হয়, আর কিভাবে ওই ধ্বনির পরিমাপ করা যায় সেটুকুই ছন্দশাস্ত্রের বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু কোনো ছন্দে ধ্বনি প্রধান, আর কোনো ছন্দে ধ্বনি অপ্রধান, এমন কথা তো ভাবাও যায় না। তানপ্রধান ও শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতির ছন্দে ধ্বনি কি অপ্রধান? আসলে ছন্দে ধ্বনিপ্রয়োগের বিভিন্ন প্রণালীরই নাম ছন্দের রীতি। ‘তানপ্রধান’ ও ‘শ্বাসাঘাতপ্রধান’ নামের মধ্যে ধ্বনিপ্রয়োগ-প্রণালীর কিছু দ্যোতনা আছে। ‘ধ্বনিপ্রধান’ নমে সেটুকুও নেই। যদি বলা হত ‘ধ্বনিবিস্তার-প্রধান’, তাহলেও এমন নিরর্থক হত না।

মূলসূত্রে ‘ধ্বনিপ্রধান’ ছন্দের দুটি বিকল্প নামও আছে—‘আধুনিক মাত্রাবৃত্ত’ এবং ‘ধ্বনিমাত্রিক’। ‘মাত্রাবৃত্ত’ রীতির প্রসঙ্গ পূর্বেই যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। আর, বলা বাহুল্য ‘ধ্বনিমাত্রিক’ নাম ‘ধ্বনিপ্রধান’-এর মতোই অসার্থক।

ধ্বনিপ্রধান ছন্দ-সম্পর্কে মূলসূত্রের (পৃ ১০৭ ও ১০৮) দুটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।—(১) "পয়ারে অক্ষর-ধ্বনির অতিরিক্ত যে-একটা সুরের টান থাকে, 'মাত্রাবৃত্তে' তাহা থাকে না।" যদি যতিহীন দীর্ঘ ধ্বনিগতিকেই বলা হয় 'সুরের টান' তাহলে বলব চতুর্মাত্রক পর্বের ধ্বনিপ্রধান (কলাবৃত্ত) ছন্দেও 'সুরের টান' দুর্লভ নয়। দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছে। (২) "মাত্রাবৃত্ত ছন্দে শ্বাসবায়ুর পরিমাণের খুব সূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে হয়। কতটুকু শ্বাসবায়ুর খরচ হইল, ধ্বনি-উৎপাদক কয়েকটি বাগ্‌যন্ত্রে কতটুকু আয়াস হইল—এ সমস্তই ইহাতে বিবেচনা করিতে হয়।"—এ-রকম উক্তির তাৎপর্য বা সার্থকতা কি, কিছুতেই তা বোঝা গেল না। এ-রকম উক্তি আরও আছে।

মূলসূত্রে বাংলার তৃতীয় ছন্দোরীতিকে বলা হয়েছে **শ্বাসাঘাতপ্রধান** ছন্দ, বিকল্পে **বলপ্রধান** ছন্দ। **বল** শব্দটা সুন্দর, পরিভাষা হিসাবেও সুব্যবহার্য। 'শ্বাসাঘাতপ্রধান' কথাটা সুব্যবহার্য নয়, যথার্থ অর্থবহও নয়। এর চেয়ে 'স্বরাঘাত'-ই ভাল ছিল। কারণ শব্দের ধ্বনির উপরে যে আঘাত (stress) পড়ে, সেটা প্রত্যক্ষতঃ আসে আমাদের কণ্ঠস্থিত স্বরযন্ত্র (larynx) থেকে, শ্বাসযন্ত্র থেকে নয়। কিন্তু আসল কথা এই যে, স্বরাঘাত বা 'বল'-এর প্রাধান্যই বাংলা ছন্দের এই তৃতীয় রীতিটিকে আসল লক্ষণ বলে মনে করা যায় না। যেমন—

আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা,
সেই কখানা পাতা
আজকে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মতো।
হিসাবের সেই অঙ্কগুলোর সময় হলো গত ;—
সে শান্তি নেই, সে দুষ্ট নেই ;
রইল শুধু এই
চিরদিনের দাগা
শিশু-হাতের আঁচড় কটি আমার বুকে লাগা।

—'পলাতকা', পলাতকা

সাধারণ বাক্যালাপের তুলনায় এই রচনার ভাষা আমাদের কানকে কিছু বেশি তৃপ্তি দেয়। তার কারণ এর ধ্বনিগতিতে আছে প্রতি পদক্ষেপের (অর্থাৎ পর্বের) সমতা, আর আছে মাঝে-মাঝে বিরতিসূচক মিল। সাধারণ বাক্যালাপের ভাষায় এই দুই-এর কোনোটাই থাকে না। সাধারণ বাক্যালাপের তুলনায় এটিতে স্বরাঘাত প্রবলতর রূপে অনুভূত হয়, এমন কথা বলা যায় না। তবে এর প্রতি পর্বের আদিতেই একটা মৃদু স্বরাঘাত বা ঝোঁক অনুভূত হয় তাও কানকে তৃপ্ত করে। তার কারণ ওই ঝোঁকগুলোর সমদূরত্বে অবস্থিতি। আমাদের বাক্যালাপের ভাষাতেও এ-রকম ঝোঁক থাকে। কিন্তু ওই ঝোঁকগুলির মধ্যে সমদূরত্ব থাকে না।

তবে কবিরা প্রয়োজনমতো রচনার কৌশলে এই রীতিতে স্বরাঘাতের (প্রস্বরের) দোলা জাগিয়ে তুলতে পারেন। যেমন—

রিক্ত যারা সর্বহারা
সর্বজয়ী বিশ্বে তারা

গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর

নয়কো তারা ক্রীতদাস।

হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে

করবো মোরা পরিহাস।

—কল্পনা, হতভাগ্যের গান

শুধু এই দলবৃত্ত রীতিতে নয়, কলাবৃত্ত রীতিতেও প্রস্বরের দোলা জাগিয়ে তোলা যায় অনায়াসেই। নিম্নে যথাক্রমে চতুষ্কল, পঞ্চকল পর্বের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

চতুষ্কল পর্ব—

১। লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে,
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীকচিত্তে,
অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন।
—নজরুল, অগ্নিবীণা, খেয়া-পারের তরণী

২। ঝর্ণা, ঝর্ণা, সুন্দরী ঝর্ণা।
তরলিত চন্দ্রিকা, চন্দন-বর্ণা।
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরিমল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে।
—সত্যেন্দ্রনাথ, বিদায়-আরতি, ঝর্ণা

লক্ষণীয়—প্রথম দুই 'ঝর্ণা' শব্দের পরে এক মাত্রা করে **যতির ফাঁক** আছে। ফলে এই দুই শব্দেই 'ণা' দল স্বতঃই দ্বিমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়। এ-রকম বাড়তি মাত্রাকে যতির মাত্রাও বলা যায়।

পঞ্চকল পর্ব

৩। অত্যাচারে, মত্তপারা
কভু কি হও আত্মহারা?
তপ্ত হয়ে রক্ত-ধারা
ফুটে কি দেহ-মাঝে?
অহর্নিশি হেলার হাসি
তীব্র অপমান
মর্মতল বিদ্ধ করি
বজ্রসম বাজে?

—মানসী, দুরন্ত আশা

লক্ষণীয়— 'অপমান' শব্দটি মিলহীন। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অন্তে আছে—**মিলের ফাঁক**। তাই এই পঙ্‌ক্তিকে বলা যায় **নিঃসঙ্গ** পঙ্‌ক্তি।

ষট্‌কল পর্ব—

৪। দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্‌ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

—নজরুল, সর্বহারা, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

এসব রচনাতে তো প্রস্বরের (শ্বাসাঘাতের) দোলা কানকে সহজেই আকৃষ্ট করে। দেখা গেল, দলবৃত্ত রীতিতে প্রস্বরের দোলাকে সংযত করে ছন্দের প্রবাহকে প্রয়োজন মতো প্রায় নিস্তরঙ্গও করা যায়। আবার কলাবৃত্ত রীতিতেও প্রস্বরের দোলা লাগিয়ে ধ্বনিপ্রবাহকে তরঙ্গিত করে তোলা যায়। উভয় রীতিতেই প্রস্বরের দোলা বাড়ানো-কমানো নির্ভর কবির রচনাকৌশলের উপরে। তাই কোনো একটি রীতির ছন্দকে 'প্রস্বরপ্রধান' (শ্বাসাঘাতপ্রধান) বলে চিহ্নিত করা যুক্তিসংগত নয় বলেই মনে হয়।

মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দও প্রস্বরহীন নয়। এই রীতির ছন্দেও প্রতি চতুর্মাত্রক পর্বের আদিতে একটি করে মৃদু প্রস্বর অনুভূত হয়। পয়ার বন্ধে প্রথম ও তৃতীয় লঘুযতি লুপ্ত হলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্বের আদিস্থিত প্রস্বরটিও লুপ্ত হয়। এই দুই লঘুযতি একসঙ্গে লুপ্ত হলে সমগ্র পয়ারপঙ্‌ক্তিই প্রায় দোলাহীন হয়ে যায়। মিশ্রবৃত্ত রীতির এই প্রায়দোলাহীন ধ্বনিগতিকেই মূলসূত্রে বলা হয়েছে 'তান'। মিশ্রবৃত্ত রীতির মহাপয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি সব ছন্দোবন্ধেই এ-কথা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে বলা বাহুল্য, এই রীতির রচনায় সব লঘুযতি একসঙ্গে লুপ্ত হয় না। লঘুযতি-লোপ রচনাভেদে বেশি বা কম হয়। তদনুসারে মূলসূত্র-কথিত 'তান'ও বাড়ে-কমে। এসব কারণেও এই রীতিকে **তানপ্রধান** বলা যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে করি না।

পরিশেষে বিভিন্ন রীতির প্রসঙ্গে মূলসূত্রের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। 'ধ্বনিপ্রধান' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে (পৃ ১০৮)—"গা ছাড়িয়া দিয়া বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণ করাই এই ছন্দের প্রকৃতি। সুতরাং এই ছন্দ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছন্দ।...ইহার শক্তি ও উপযোগিতা সীমাবদ্ধ।" আমাদের ধারণা—(১) সর্বাধিক দ্রুত লয়ের ছন্দ এই রীতিতেই রচিত হয়। (২) এই রীতিতে বৈচিত্র্যও সবচেয়ে বেশি এবং তার শক্তিও কম নয়। তার নিদর্শন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের রচনায়। (৩) এই রীতির উপযোগিতা ও তার প্রয়োগক্ষেত্রের পরিসরও কম নয়। এক দিকে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা এবং অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ও সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল'-এর কথা স্মরণ করলেই এর তাৎপর্য বোঝা যাবে।

'শ্বাসাঘাতপ্রধান' প্রসঙ্গে মূলসূত্রের (পৃ ১০৯) একটি উক্তি—(১) "আজকাল সাধুভাষাতেও এ ছন্দ চলিতেছে।" অন্যত্র (পৃ ১১৩) আছে আরও দুটি উক্তি—(২) "একই কবিতার স্থানে স্থানে বিভিন্ন রীতির ব্যবহার থাকিতে পারে।...এমন কি একই চরণের খানিকটা এক লয়ে [মানে 'রীতিতে'], বাকি অন্য লয়ে রচিত, এই রকমও দেখা যায়।" এবং (৩) "বাংলা ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি এক ও অপরিবর্তনীয়, তাহা ছন্দের রীতির উপর নির্ভর করে না।"—অনেক চেষ্টা করেও এই তিন উক্তির তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। তাই এ বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ না করাই উচিত মনে করি।

তানপ্রধানাদি তিন পরিভাষা-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—(১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-পরিষদের উদ্‌যোগে প্রকাশিত 'বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা' গ্রন্থ (১৯৭৭, প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা'), পৃ ১৯-২৮ এবং ৩১, (২) তারাপদ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'বাংলা ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৯, প্রকাশক 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'), সপ্তদশ অধ্যায় (পৃ ৫০৫-৬৭১) এবং (৩) বর্তমান লেখকের 'আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য' গ্রন্থ (১৯৮০), পৃ ১৩২-১৩৭ এবং ২৩৮-২৪২। অত্যাবশ্যক পৃষ্ঠাঙ্কগুলি স্থূললিপিতে মুদ্রিত হল।

রুদ্ধ (দল, স্বর)*—দ্রষ্টব্য '**মুক্ত**' সংজ্ঞা।

লয় (অমূল্যধন)—গানে ও ছন্দে ধ্বনির গতিক্রমকে বলা হয় 'লয়' (tempo)। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অনেক সময় তাল ও লয় এই দুই শব্দকে অভিন্নার্থক বলেই ধরে নিয়েছেন। যেমন, এক স্থানে ('ছন্দ', ১৯৭৬ সং, পৃ ৩৪) কাওয়ালিকে একই বাক্যে একবার বলেছেন 'লয়', আবার বলেছেন 'তাল'। আর-এক প্রবন্ধে (পৃ ৪২) তিনি বলেছেন—"কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে **তালের** সেই কাজ।" তার অল্প পরেই (পৃ ৪৪) আবার বলা হল—"কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেটাই **লয়**।" আসলে তাল কথাটা ধ্বনির স্পন্দ (rhythm)-সূচক, আর লয় কথাটা ধ্বনির গতিক্রম (tempo)-সূচক। মূলসূত্র গ্রন্থে 'লয়' শব্দের আসল অর্থাৎ 'গতিক্রম' অর্থটাই মেনে নেওয়া হয়েছে।

মূলসূত্রের মতে (পৃ ৯৯)—"চরণের লয়ের উপরই এক-একরকম রীতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।" তদনুসারে তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দকে যথাক্রমে বলা হয়েছে **ধীর** লয়ের, **বিলম্বিত** লয়ের ও **দ্রুত** লয়ের ছন্দ। তার পরেই মনে খটকা লাগে মূলসূত্রের আর-একটি উক্তিতে (পৃ ১১৩)—"একই কবিতার স্থানে স্থানে বিভিন্ন লয়ের ব্যবহার থাকিতে পারে।...এমন কি, একই চরণের খানিকটা এক লয়ে, বাকি অন্য লয়ে রচিত, এরকমও দেখা যায়।" তাই যদি হয়, অর্থাৎ লয় ব্যবহারে যদি কোনো স্থিরতাই না থাকে, তবে 'চরণের লয়ের উপর' নির্ভর করে 'ছন্দের রীতি' নির্ণয় করা যাবে কি উপায়ে? এপ্রশ্নের উত্তর কি হতে পারে জানি না।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ধারণা কবিরা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক রীতির ছন্দেই কিছু পরিমাণে বিভিন্ন ক্রমের লয় আনতে পারেন। যেমন, মূলসূত্রে যাকে বলা হয়েছে বিলম্বিত লয়ের (বা ধ্বনিপ্রধান) ছন্দ, তাতেই আনা যায় বাংলা ছন্দের দ্রুততম লয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দুন্দুভি বাজে ওঠে ডিম ডিম রবে,
সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে।...
নন্দিত কণ্ঠের হাস্যের রোল,
অম্বর তলে দিল উল্লাস-দোল।

—চিত্রবিচিত্র উৎসব

খুলে যায় মুহু আজ অন্তর দৃষ্টি
অবচন একি শ্লোক, অপরূপ সৃষ্টি।

সাম্যের এ কি সাম, পূত হল চিত্ত,
নিত্যের ইঙ্গিত এ মিলন-তীর্থ।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, যুক্তবেণী

এই হল **ধ্বনিপ্রধান** (কলাবৃত্ত) ছন্দ। কিন্তু এর লয় **দ্রুত**, বিলম্বিত নয়।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্র-রূপিণী।
অযূত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভুলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।

—চিত্রা, 'চিত্রা'

এটাও **ধ্বনিপ্রধান** (কলাবৃত্ত) ছন্দে রচিত। কিন্তু এর লয় **বিলম্বিত**, দ্রুত নয়।

এবার দিচ্ছি **শ্বাসাঘাত-প্রধান** (দলবৃত্ত) ছন্দের দৃষ্টান্ত।—

পরান ভরে নৃত্য করে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে,
ছন্দছাড়া আজকে আমি যাচ্ছি মরে মনের দুখে,
যাচ্ছি মরে মনের দুখে পূর্ব সুখে স্মরণ করে,
বারির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ঝরে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, কুহু ও কেকা, পাগলা ঝোরা

বলা বাহুল্য, এটুকুর স্বাভাবিক লয় **দ্রুত**, বিলম্বিত নয়। কিন্তু—

জীবন যাদের অসম্মানের বোঝা,
তলিয়ে যারা আছে অবজ্ঞাতে,
ইচ্ছা করার সহজ শক্তিটুকু
লুপ্ত যেন পঙ্গু পক্ষাঘাতে,
তাদের তুমি মুখ রেখেছ, কবি,
হাল্কা করে দিয়েছ ঢের লাজে,
সবার দুখের ভাগ নিয়ে স্বেচ্ছাতে
তক্‌মা ছেড়ে এসে সবার মাঝে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বিদায়-আরতি, নীরব নিবেদন

এটুকু পাঠের স্বাভাবিক লয় **বিলম্বিত**, দ্রুত নয়।

এবার দিচ্ছি **তানপ্রধান** (মিশ্রবৃত্ত) ছন্দের দৃষ্টান্ত।—

শাদা কাল কটা রূপ বলি হারি গুণে,
সাত পাত ভাত সারি ভ্যা ভ্যা রব শুনে।...
জাল দিতে কাল যায়, লাল পড়ে গালে,
বাটনা কামাই হয় কাটনার কালে।...
মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুষি তত খুসি, হাড়ে হাড়ে রস।...
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা,
ম'রে যেন ছাগী গর্ব্ভে জন্ম লয় তারা।

—ঈশ্বর গুপ্ত, গ্রন্থাবলী, পাঁটা

এ-রকম রচনা স্বভাবতঃই পড়া হয় **দ্রুত** লয়ে। বিলম্বিত বা 'ধীর' লয়ে পড়লে রচনার রস নষ্ট হয়।

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট্ অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার।
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।

—কল্পনা, বৈশাখ

এটুকুও তানপ্রধান (মিশ্রবৃত্ত) ছন্দে রচিত। কিন্তু এটুকু উপরের দৃষ্টান্তের মতো দ্রুত লয়ে পড়া চলে না। এটুকু স্বতঃই উচ্চারিত হয় অপেক্ষাকৃত **মন্থর** (ধীর বা বিলম্বিত) লয়ে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের উক্তি ('ছন্দ', তৃতীয় সং পৃ ১০৯)—"পয়ারের দেহসংস্থানেই গুরুর সঙ্গে লঘুর যোগ আছে। তার প্রথম অংশে আট, দ্বিতীয় অংশে ছয়।...তাকে নিয়ে মাল-বওয়ানোও যায়, বাচ-খেলানোও চলে।" অর্থাৎ পয়ারের গতিকে প্রয়োজন মতো মন্থর বা দ্রুত করা যায়। তার পরে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে পয়ারের 'ভাগগুলোকে কাটা-কাটা ছোটো-ছোটো করে ঘনঘন ঝোঁক দিয়ে এর চটুলতা বাড়িয়ে দেওয়া' যায়। আর কিভাবে রুদ্ধদলের মাল চাপিয়ে দিয়ে তার 'চটুলতা' অর্থাৎ দ্রুততা কমিয়ে দেওয়া যায়, তার দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। এখানে তা উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। তবে এখানে বলা উচিত যে, পয়ারে ঘনঘন লঘুযতি-লোপ ঘটিয়ে তার গতিক্রমকে অর্থাৎ লয়কে আরও বিলম্বিত করা যায়।

মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক রীতিতেই ছন্দের লয় নানা ক্রমে বাড়ানো-কমানো যায়। তা নির্ভর করে কবির প্রয়োজন ও অভিরুচির উপরে। লয়ের ক্রম কিভাবে বাড়ানো-কমানো যায়, তা জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সেকথা বলার স্থান এটা নয়। বর্তমান প্রসঙ্গে এ-কথাও বলা উচিত যে, বিভিন্ন রীতিতে ছন্দের একই লয়ক্রম সমস্তরে থাকে না। যেমন, উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে তিন রীতির দ্রুত লয় একই স্তরে অবস্থিত নয়। একটু কান পেতে শুনলেই বোঝা যাবে, কলাবৃত্ত রীতির চতুর্মাত্রক পর্বের লয়ই দ্রুততম। অর্থাৎ লয়ের দ্রুততায়

কলাবৃত্তের স্থানই সর্বাগ্রে। এ প্রসঙ্গে বিশদতর আলোচনা দ্রষ্টব্য এই লেখকের 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে (পৃ ৭৬-৮০)।

মোটকথা। দেখ গেল ছন্দের লয়ক্রম কিছুতেই ছন্দোরীতির পরিচায়ক বলে স্বীকৃত হতে পারে না। আর, তানপ্রধানাদি তিন নামও যে নিরর্থক ও বিভ্রান্তিকর, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

লাচাড়ি—এই সুপ্রাচীন সংজ্ঞাশব্দটির আসল তাৎপর্য কি, সে বিষয়ে কিছু মতভেদ দেখা যায়। আমাদের ধারণা সেকালে বাংলা ছন্দের লৌকিক রীতিটিই পরিচিত ছিল 'লাচাড়ি' নামে। অর্থাৎ অধুনা যাকে বলি 'দলবৃত্ত' (সত্যেন্দ্রনাথের 'চিত্রা'), সেকালে তাকেই বলা হত 'লাচাড়ি'। সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' নিবন্ধেও (তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়) এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। মতান্তরে ত্রিপদী বন্ধই এক কালে পরিচিত ছিল 'লাচাড়ি' নামে। মূলসূত্র গ্রন্থে (পৃ ১৮) এই মতটাই স্বীকৃত হয়েছে বিনা ব্যাখ্যায়। 'বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে (১৯৭৮) এ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করা গেছে। এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

শ্বাসাঘাত ও শাসাঘাত-প্রধান (অমূল্যধন)—আমরা যাকে বলি 'প্রস্বর', অমূল্যধন তাকেই বলেছেন 'শ্বাসাঘাত' (stress)। আর, যে ছন্দোরীতিকে আমরা বলি 'দলবৃত্ত', অমূল্যধনের মতে তারই নাম 'শ্বাসাঘাতপ্রধান'।—দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী '**রীতি**' প্রসঙ্গ।

সংশ্লেষ —রুদ্ধদলের উচ্চারণ-সংকোচনকে ছন্দের পরিভাষায় বলা হয় 'সংশ্লেষ'।—দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত '**বিশ্লেষ**' সংজ্ঞা।

সাধুরীতি—রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে ('ছন্দ', ১৯৭৬ সং, পৃ ১১৪) বলেছেন—"আমরা বাংলায় 'সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে দুই ভিন্ন নিয়মেই চলি, তার অন্যথা করা অসম্ভব। তাই বাংলা কাব্যে এই দুই ভাষার ধারায় ছন্দের **রীতি** দুই ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে।" আবার অন্যত্র (পৃ ১৭২) বলেছেন—"বাংলা ছন্দের তিনটি **শাখা**। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, সেই ভাষা বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করেনি। আর-একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, এই ভাষা বাংলার হসন্ত শব্দের ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে। আর-একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।" প্রথম উক্তিতে যে দুই ভাষাকে বলা হয়েছে 'সংস্কৃত' ও 'প্রাকৃত' বাংলা ; দ্বিতীয় উক্তিতে সে দুই ভাষাকেই বলা হয়েছে যথাক্রমে 'কৃত্রিম' ও 'সচল' বাংলা। অন্য নানা স্থানে এই ভাষা আখ্যাত হয়েছে যথাক্রমে 'সাধু' ও 'চলতি' বাংলা নামে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই দুই ভাষারীতিভেদে বাংলা ছন্দেরও দুই রীতি—সাধুরীতি ও প্রাকৃত (বা চলতি) রীতি। উদ্ধৃত দ্বিতীয় উক্তিতে এই দুই রীতিই বর্ণিত হয়েছে বাংলা ছন্দের প্রথম দুই 'শাখা' বলে। কিন্তু তৃতীয় শাখাটির অবলম্বন কোন্ ভাষা তা বলা হয় নি। বাংলা ছন্দের এই তৃতীয় শাখার দৃষ্টান্ত হিসাবে সংস্কৃত শিখরিণী ও মন্দাক্রান্তা ছন্দের যেসব বাংলা রূপ দেখানো হয়েছে সেসবই সাধু বাংলায় রচিত। তাতেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রকথিত এই তৃতীয় 'শাখা'-টি আসলে বাংলা ছন্দের কোনো বিশেষ 'রীতি'-র পরিচায়ক নয়, বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দকে নানাভাবে ভেঙে নিয়ে নূতন করে গড়া বাংলা ছন্দের কতকগুলি বিশেষ 'রূপ'-এর পরিচায়ক মাত্র।

মোট কথা, মাত্রাগণনার রীতিভেদে ছন্দের তিন রীতি রবীন্দ্রচিন্তায় স্বীকৃতি পায় নি, ভাষারীতিভেদে ছন্দের দুই রীতিই স্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ তিনিই যে সাধু ভাষার ছন্দে অক্ষরমাত্রা গণনার পূর্বতন রীতি মেনে নিয়েই

আর-একটা নূতন রীতি প্রবর্তন করেছেন, সে কথার উল্লেখ করেছেন একাধিক বার। মাত্রাগণনার প্রণালীভেদেই যে ছন্দ-রচনার রীতিভেদ ঘটে, সে বিষয়ে তাঁর মনোযোগ নিবিষ্ট হলে তাঁর কাছেই বাংলা ছন্দের তিন রীতি স্বীকৃতি পেত সর্বাগ্রে। আসলে তিনি সারাজীবন ছন্দ রচনা করেছেন সহজাত প্রতিভার প্রেরণায়। তাই বিভিন্ন ছন্দের মাত্রা নির্ণীত ও বিন্যস্ত হয় কি প্রণালীতে তা ভেবে দেখার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। একটা মোটামুটি ধারণা অবশ্যই তাঁর ছিল। তাতেই তাঁর কাজ চলে যেত। সে মোটামুটি ধারণার কথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন নানা সময়ে এবং নানা ভাবে। সে প্রসঙ্গে একটু পরেই বলা যাবে।

১। ভাষারীতি ও ছন্দোরীতি

তার আগে বলে নেওয়া সরকার ভাষারীতিকে ছন্দোরীতির নিয়ামক বলে স্বীকার করা যায় না কেন। রবীন্দ্রকথিত সাধু ভাষারীতির ছন্দও অমিশ্র সাধু ভাষায় রচিত হয় না। আগেও হত না। ভারতচন্দ্র এবং তাঁর পূর্বগামী কবিদের রচনাতেও সাধু বাংলার সঙ্গে চলতি বাংলার মিশ্রণ দেখা যায়। সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপেই পাওয়া যায় চলতি বাংলার প্রধান পরিচয়। কিন্তু করব্, চল্‌ছে, শুন্‌বে প্রভৃতি হস্‌মধ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দেখা যায় না প্রাচীন কবিদের রচনায়। অবশ্য মদনমোহন ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় তার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও সুদীর্ঘ কাল সাধুভাষার ছন্দে এ-রকম হস্‌মধ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহারে বিরত ছিলেন। অবশ্য সন্ধান করলে তাঁর রচনাতেও কিছু ব্যতিক্রম পাওয়া যেতে পারে। যেমন—

রাজার পদ চর্ম-আব্‌রণে
    ‘ঢাকিল’ বুড়া ‘বসিয়া’ পদোপান্তে।

মন্ত্রী কহে “আমারো ছিল মনে—
    কেমনে বেটা ‘পেরেছে’ সেটা জান্‌তে।”

—কল্পনা, জুতা-আবিষ্কার

এখানে ‘ঢাকিল’ ও ‘বসিয়া’ শব্দের সঙ্গে ‘পেরেছে’ শব্দটা এসেছে অতি স্বাভাবিক ভাবেই, অর্থাৎ প্রথাসিদ্ধ নিয়ম অনুসারেই। কিন্তু ‘হস্‌মধ্য’, ‘জান্‌তে’ শব্দটা ব্যতিক্রম, অর্থাৎ প্রথাবিরুদ্ধ। তবু তাকে আনতে হয়েছে শুধু মিলরক্ষার প্রয়োজনে। নতুবা সে ‘জানিতে’ রূপ নিয়ে ‘ঢাকিল’ ও ‘বসিয়া’ শব্দের পর্যায়ভুক্ত হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ পর্বে রচিত ‘পরিশেষ’ কাব্যে সাধুরীতির ছন্দে এ-রকম হস্‌মধ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবেই। যেমন—

সে না হলে বিরাটের নিখিলমন্দিরে
    উঠ্‌ত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনোজন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
    রইত নীরব।

—পরিশেষ, প্রাণ

বলা বাহুল্য, এটুকু রচিত হয়েছে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে। এই রীতির সাধারণ নিয়ম অনুসারে মন্দিরে, শঙ্খ ও যাত্রী এই তিন শব্দের প্রথম রুদ্ধদল (মন্, শঙ্, যাত্) হয়েছে সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক। কিন্তু উঠ্ত, মিল্ত ও রইত, এই তিন শব্দের প্রথম রুদ্ধদল (উঠ্, মিল্, রই) হয়েছে বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রক। রবীন্দ্রনাথ হস্‌মধ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহারে এই নীতিই অনুসরণ করেছেন 'পরিশেষ' প্রভৃতি কাব্যে। কিন্তু হস্‌মধ্য ক্রিয়াপদের আদিস্থিত রুদ্ধদল যে সংশ্লিষ্ট হয়ে একমাত্রক বলেও গণ্য হতে পারে, তার দৃষ্টান্তও তিনি দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে। যেমন—

মত্তরোষে বীরভদ্র ছুট্‌ল ঊর্ধ্বশ্বাসে,
ধূর্ণিবেগে উড্‌ল ধুলো রক্ত সন্ধ্যাকাশে।...
বৈকালে বৈশাখী এল আকাশ-লুণ্ঠনে,
শুক্লারাতি ঢাক্‌ল মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে।

—ছন্দ (১৯৭৬ সং), পৃঃ ১১৪-১৫

এখানে মিশ্রবৃত্ত রীতির সাধারণ নীতি অনুসারে ছুট্‌ল, উড্‌ল ও ঢাক্‌ল এই তিন ক্রিয়াপদের আদিস্থিত রুদ্ধদল (ছুট্, উড্, ঢাক্) সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক রূপেই প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্যেই চলতি ক্রিয়াপদের এ-রকম প্রয়োগ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আধুনিক কবিদের রচনায় ক্রিয়াপদের সাধু রূপ অচল হয়ে গিয়েছে বলা চলে, আর চলতি ক্রিয়াপদের অপ্রান্ত্য রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক প্রয়োগই প্রথাসিদ্ধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ভাষারীতি বদলালেও ছন্দোরীতি বদলায় নি।

রবীন্দ্র-প্রবর্তিত কলাবৃত্ত রীতিকেও তিনি নিজে সাধু ছন্দেরই একটি নূতন শাখা বলে মনে করতেন। এই নূতন শাখার অবলম্বন ও সাধুচলতির মিশ্রভাষা। যেমন—

ধরা নাহি দিলে ধরিব দু-পায় ;
কী করিতে হবে বলো সে উপায়,
ঘর ভরি দিব সোনায় রূপায়—
    বুদ্ধি জোগাও তুমি।

—সোনার তরী, পুরস্কার

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।...
বালিশ্‌তলে বইটি চাপা, **টানিয়া** লয় তাকে,
পাতাগুলিন ছেঁড়াখোঁড়া শিশুর অত্যাচারে।

—ক্ষণিকা, যথাস্থান

সবই হেথায় একটা কোথাও করতে হয় রে শেষ,
গান **থামিলে** তাই তো কানে থাকে গানের রেশ।

—ক্ষণিকা, শেষ

ভাবতেছিলাম একা একা
স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা,
আসে যেন **তাহার** মূর্তি ধরে
বাদলা রাতের আধেক ঘুমঘোরে।...
তাহা হলে **কাহার** হত ক্ষতি—
স্বপ্ন যদি ধরত সে মূরতি।

—ক্ষণিকা, নষ্ট স্বপ্ন

প্রাণ **রাখিতে** স্দাই যে প্রাণান্ত,
পান্ত আনতে লবণ ফুরায়, লবণ আনতে পান্ত।

—দ্বিজেন্দ্রলাল, হাসির গান

সাধু বাংলার গদ্য রচনায় যদি দু-একটা চলতি শব্দ (ক্রিয়াপদ বা সর্বনাম) এসে পড়ে বা চলতি বাংলার গদ্য রচনায় আসে সাধু শব্দ, তবে তা গদ্য-রচনার স্খলন অর্থাৎ রীতিলঙ্ঘন বলে গণ্য হয়। কিন্তু পদ্যরচনায় অনুরূপ সাধু বা চলতি শব্দের প্রয়োগ ছন্দের রীতিলঙ্ঘন বলে গণ্য হয় না। তাতেই বোঝা যায়, ছন্দের রীতি ভাষারীতির উপরে নির্ভর করে না। অর্থাৎ ভাষারীতিকে ছন্দোরীতির নিয়ামক, বলে গণ্য করা যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে করা যায় না।

২। সাধু ছন্দের মাত্রাগণনা

এবার দেখা যাক, সাধুরীতির ছন্দের মাত্রাগণনা প্রণালী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কি। ছেলেবেলা থেকে তিনি যে ছন্দ রচনায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন, সেই পূর্বাগত সাধু (অর্থাৎ মিশ্রবৃত্ত) রীতির ছন্দে যুক্ত, অযুক্ত ও হল্-নির্বিশেষে প্রত্যেক অক্ষরকেই একমাত্রা বলে গণ্য করাই ছিল তৎকালীন প্রচলিত রীতি। এ বিষয়ে তাঁর একটি উক্তি এই ('ছন্দ', তৃতীয় সং, পৃ -২৭)—"আমাদের সাধুসাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়িয়া দেখি...তাহাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যেমন—'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।' ইহাতে চোদ্দটি অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা।"এই উক্তির (১৯১৪) প্রায় ষোল বৎসর পরে (১৯২৯) এ বিষয়ে তাঁর আর-একটি উক্তি এই (ছন্দ, পৃ ৮১-৮২)—"বাঙালি বরাবর সহজেই 'মহাভারতে-র্ কথা' পড়ে এসেছে, অর্থাৎ 'তে'র এ-কারকে দীর্ঘ করে আপসে মীমাংসা করে দিয়েছে। তার পরে 'পুণ্যবান্' কথাটার 'পুণ্য'র মাত্রা কমিয়ে দিতে সংকোচ করেনি।" আও কিছু কাল পরে (১৯৩২)—

দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগনকোণে।
কী আছে হোথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে?

—সোনার তরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা

দেখা যাচ্ছে দুই দৃষ্টান্তেই ক্রিয়াপদের সাধু ও চলতি রূপ মিশ্রিত হচ্ছে। যদি সাধু ক্রিয়াপদগুলিকে চলতি রূপ দেওয়া যায় তাহলেও দুই দৃষ্টান্তের কলাবৃত্ত রীতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। রবীন্দ্রনাথ এই রীতিতে রচিত তার কোন

কাব্যেই হস্‌মধ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেননি, মিলরক্ষা বা অনুরূপ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া। কিন্তু তাঁর জীবনকালেই রাধারাণী দেবী (অপরাজিতা দেবী নামে) তাঁর 'বুকের বীণা' কাব্যে (১৯৩০) অমিশ্র চলতি ভাষায় রচিত কলাবৃত্ত ছন্দোরীতির আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। যেমন—

স্পষ্ট বলতে কষ্ট কী বল্? লজ্জারো কিছু নয়।
সন্ধ্যা না হতে সন্ধি করতে আসবে সে নিশ্চয়।
জিততে হবেই আজ,
নইলে এ নামে লাজ।—
বিদ্রোহী সাথে অপরাজিতার সন্ধি সহজ নাকি?
এসব নিগূঢ় রণনীতি তোর শিখতে অনেক বাকি।

—অপরাজিতা দেবী, বুকের বীণা, সন্ধির সূত্র

কাল থেকে বলে বলে মানলাম হার।
কিছুতে কি ফুরসৎ মিলল না তার?
দেড়গজ কার্পেট, দু প্যাকেট উল,
এই তার আনতে কি রোজই হয় ভুল?...
গ্রাহ্য করে না দেখি ক'দিন ধরেই,
আন্‌ছে না কিনে এটা ইচ্ছে করেই।

—অপরাজিতা দেবী, বুকের বীণা, আঁধারে আলো

দুটি দৃষ্টান্তই কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথমটির প্রতি পূর্ণপদে আছে ছয় কলামাত্রা, আর দ্বিতীয়টির পূর্ণপর্বে আছে চার কলামাত্রা। আসল বিবেচ্য বিষয় এই যে, দুটিই রচিত হয়েছে অমিশ্র চলতি ভাষায়। অথচ কলাবৃত্ত রীতির এই দুই ধারাতেই ছন্দসৌন্দর্য প্রাকশিত হয়েছে পূর্ণ মাত্রায়।

দেখা গেল রবীন্দ্রকথিত্ পূর্বতন ও নবতন সাধু রীতির ছন্দ, অর্থাৎ মিশ্রবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির ছন্দ, সাধু ও চলতি বাংলায় সমান দক্ষতার সঙ্গে রচনা করা যায়। সুতরাং মিশ্রবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতিকে 'সাধু' রীতি বলে নির্দিষ্ট করা সুবিবেচিত নয় বলেই মনে করি।

পূর্বে বলেছি মিশ্রবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে সাধুভাষার সঙ্গে চলতি বাংলার যথেচ্ছ মিশ্রণ ঘটানো যায়। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রকথিত বাংলা প্রাকৃত ছন্দের, অর্থাৎ দলবৃত্ত ছন্দের একমাত্র অবলম্বন চলতি ভাষা। তবে এই রীতির ছন্দেও প্রয়োজনমতো দু-একটা সাধু শব্দ (সর্বনাম বা ক্রিয়াপদ) চালানো যায়, তার বেশি নয়। যেমন—

১। টোটকা এই মুষ্টিযোগ লটকানের ছাল,
সিট্‌কে মুখ খাবি, জ্বর আট্‌কে যাবে কাল।

২। একটি কথা শুনিবারে তিন্‌টে রাত্রি মাটি,
এর পরে ঝগ্‌ড়া হবে, শেষে দাঁত্‌কপাটি।

৩। এক্‌টি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,
টাট্‌কা মাছ জুট্‌ল না তো, শুঁটকি দেখো চেখে।

এই তিনটি ছড়া সম্বন্ধে তিনি বলেন (পৃ ১০১)—"অক্ষর গুনতি করতে গেলে দৃশ্যত পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায়।...কিন্তু হিসাব করে দেখলেই দেখা যাবে **ছন্দের নীতি** নষ্ট হয়নি।" এই ছন্দের নীতিটি কি, তাও তিনি বুঝিয়ে বলেছেন একটু পরেই (পৃ ১০২)—"বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্র বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে। ...ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন-প্রসারণ চলে।...এই জন্যই **অক্ষরের সংখ্যা গণনা কারে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না**।" এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি উক্তি (পৃ ৯৪) স্মরণীয়-"বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না, তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের উচ্চারণে জ-এর অ এবং চাঁ-এর আ আমরা দীর্ঘ করে টেনে পরবর্তী হসন্তের [আসলে অ-লোপের] ক্ষতিপূরণ[১] করে থাকি!" এই দুই নীতি অনুসারে উদ্ধৃত তিনটি ছড়ার এই্‌, যোগ্‌, নের্‌, ছাল্‌ প্রভৃতি শব্দান্ত্য রুদ্ধদলের উচ্চারণ হয় দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক, আর টোট্‌, মুষ্‌, লট্‌ প্রভৃতি অপ্রান্ত্য রুদ্ধদল হয় হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রক। এই হিসাবে এই তিন ছড়ার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতেই পাওয়া যাবে চোদ্দ 'ধ্বনিমাত্রা', মানে কলামাত্রা। অথচ প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে অক্ষরসংখ্যা চোদ্দ ছাড়িয়ে যায়। এই নীতি অনুসারেই পূর্বোক্ত 'কাশীরাম দাস্‌ কহে শুনে পুণ্যবান্‌' পঙ্‌ক্তির রাম্‌, দাস্‌ ও বান্‌ এই তিন শব্দান্ত রুদ্ধদলের উচ্চারণ হয় দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রক, আর অপ্রান্ত্য রুদ্ধদল পুণ্‌-এর উচ্চারণ হয় হ্রস্ব বা একমাত্রক।

আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই সাধু রীতির ছন্দকে অক্ষরমাত্রার ছন্দ ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। আর, প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তিনি বললেন—"অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না।" কিন্তু তখনও তিনি ছন্দের মাত্রাগণনার নীতিকে সিলেব্‌ল্‌-এর ভূমিকায় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। বোধ করেছেন আরও কিছুকাল পরে। সে প্রসঙ্গ তোলার আগে বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সিলেব্‌ল্‌ অর্থেও ব্যবহার করতেন **মাত্রা** শব্দ। বোধ করি তাঁর 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধেই (১৯০১) সিলেব্‌ল্‌ অর্থে 'মাত্রা' শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়।[২] তাঁর 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থের (১৯৩৮) ১৯-সংখ্যক অধ্যায়ে সিলেবল-বোধক 'মাত্রা' শব্দের ব্যাপকতর প্রয়োগ আছে। আর আছে 'ছন্দ' গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে। কিন্তু কোথাও এই 'মাত্রা'র মুক্তরুদ্ধ-ভেদের উল্লেখ নেই। ফলে ছন্দের আলোচনায় এই দ্ব্যর্থক (ছন্দের ধ্বনিমাত্রা ও শব্দের উচ্চারণবিভাগ) শব্দের প্রয়োগে পাঠকের মনে কিছু বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই প্রসঙ্গভেদে 'মাত্রা' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নির্ণয় করে নিতে হয়।

চলতি বা প্রাকৃত রীতি তথা সাধুরীতির ছন্দের মাত্রাগণনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ (১৯৩৮) উক্তি এই ('ছন্দ', তৃতীয় সং, পৃ ১৮৭-৮৮)—

"চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া...সেটা পয়ার হলেও অক্ষরগোনা পয়ার হবে না, সে হবে **মাত্রাগোনা** পয়ার।...**বস্তুত সাধুভাষার পয়ারও মাত্রাগোনা**। সাহিত্যিক কবুলতিপত্রে সাধুভাষার **অক্ষর** এবং **মাত্রা** এক পরিমাণের বলে গণ্য হয়েছে। এই মাত্র রফা হয়েছে যে, সাধু ভাষার উচ্চারণকালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না, অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।—

সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে।...

জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

চলতি বাংলায় ‘নদ’ আর ‘তুমি’, ‘মোর’ আর ‘মনে হসন্তের বাঁধনে বাঁধা। এই পয়ারে ঐ শব্দগুলিকে হসন্ত বলে যে মানা হয়নি তা নয়, কিন্তু ওর বাঁধন আলগা করে দেওয়া হয়েছে। ‘কান’ আর ‘আমি’, ‘ভ্রান্তির’ আর ‘ছলনে’ হসন্তের রীতিতে হওয়া উচিত ছিল যুক্তশব্দ, কিন্তু সাধু ছন্দের নিয়মে ওদের জোড় বাঁধতে বাধা দেওয়া হয়েছে।”

এখানে ‘**মাত্রা**’ মানে syllable (দল), ‘**মাত্রাগোনা**’ মানে syllabic (দলবৃত্ত), আর ‘হসন্ত শব্দ’ মানে রুদ্ধদলান্ত শব্দ (যেমন—নদ্, মোর্, জুড়াই্, কান্, ভ্রান্তির্)। এসব শব্দ যে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে হসন্তের বাঁধনে জোড় বঁধে না (মানে ‘যুক্ত’ হয় না বা ‘গায়ে গায়ে লেগে’ যায় না), তার কারণ এসব শব্দের অন্তিম রুদ্ধদলগুলি উচ্চারিত হয় দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক রূপে। যেমন—ন-দ, মো-র্, জুড়া-ই্ ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় পূর্বোক্ত ‘কাশীরা-ম্ দা-স্ কহে শুনে পুণ্যবা-ন্’ পঙ্‌ক্তির বিশ্লেষণ।

মোট কথা। রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ বিশ্লেষণ অনুসারে সাধুভাষার পয়ারও আসলে ‘মাত্রাগোনা’ (দলবৃত্ত), তবে ‘সাধু ছন্দের নিয়মে’ এর প্রত্যেকটি হসন্ত (মানে রুদ্ধলান্ত) শব্দের শেষ রুদ্ধদল ‘সাধুছন্দের নিয়মে’ উচ্চারিত হয় দ্বিমাত্রক রূপে। এটুকু ছাড়া চলতি (প্রাকৃত) রীতির ছন্দের সঙ্গে সাধু রীতির ছন্দের আর কোনো পার্থক্য নেই। দেখা যাচ্ছে, সাধুছন্দের আধুনিক বিশ্লেষণ ও রবীন্দ্রকৃত এই শেষ বিশ্লেষণ প্রায় সর্বতোভাবেই অভিন্ন।

৩। বাংলা প্রাকৃত ছন্দের মাত্রাগণনা

এখানে প্রাকরীতির ছন্দে মাত্রাগণনা-প্রণালী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতের একটু পরিচয় দিচ্ছি। এই রীতিতে ছন্দের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণীত হবে কলাসংখ্যা অনুসারে, না দলসংখ্যা অনুসারে, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে মনে হয় দীর্ঘকাল কলামাত্রার হিসাবটাই তার চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে। তাই পর্বের হিসাবে এই ছন্দকে বলেছেন **ষান্মাত্রিক** (ছন্দ, তৃতীয় সং, পৃ ১২৭), আর উপপর্বের হিসাবে বলেছেন, **ত্রৈমাত্রিক** (পৃ ১৯৩)। আবার অন্যত্র (পৃ ১৮১) বলেছেন, প্রাকৃত বাংলা ছন্দে উপপর্বের “মাপ দুই-এর হলেও ওজন তিনের।” দেখা যাচ্ছে দুই দলের মাপের চেয়েও তিন কলার ওজনটাই তাঁর মনে প্রাধান্য পেয়েছিল। বস্তুতঃ ১৯৩২ সালেও তিনি এক স্থানে (পৃ ১২৭) বলেছেন প্রাকৃত রীতির—“**ষান্মাত্রিক** ছন্দের প্রত্যেক পর্বে ঊর্ধ্বসংখ্যা কয় সিলেব্‌ল্‌এর স্থান আছে তা আমি পূর্বে বিচার করে দেখিনি।” মনে হয় পরে বিচার করে দেখেছেন যে, প্রতি পর্বে সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার ‘মাপ’ ঠিক না রেখে ছয় কলামাত্রার ‘ওজন’ বজায় রাখলে সে ছন্দ তার প্রাকৃত রীতির বৈশিষ্ট্যটুকুই হারায়। পক্ষান্তরে সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যার মাপ ঠিক রেখে স্বাধীন ভাবে রচনা করে গেলে তার ওজনও আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যায়। সেজন্য আরও কিছু কাল পরে তিনি স্পষ্ট করেই বললেন (পৃ ১৮৭)—“চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া...সে পয়ার হলেও অক্ষরগোনা পয়ার হবে না, সে হবে **মাত্রাগোনা** পয়ার।” এই মাত্রাগোনা পয়ারের দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি উদ্ধৃত করেছেন ‘একটা খাঁটি ছড়ার নমুনা’—

এ-পার গঙ্গা ও-পার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,

তারি মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর।

এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এই—"এটা **পয়ার**, কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।" অর্থাৎ এটি মাত্রাগোনা পয়ার, অক্ষরগোনা পয়ার নয়। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত একদল শব্দ বা শব্দাংশ (মুক্ত বা রুদ্ধ) ছন্দের রীতিভেদে দুই কলামাত্রা বা দুই দলমাত্রা রূপে উচ্চারিত হয়, এই নীতি অনুসারে এই দৃষ্টান্তের 'চর' ও 'গর' এই দুটি রুদ্ধদলের প্রত্যেকটিই দুই দলমাত্রা বলে স্বীকার্য। এই হিসাবে উক্ত দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যাবে চোদ্দ দলমাত্রা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"উচ্চারণ মিলিয়ে বানান করলে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না।

এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা মধ্যিখানে চর,

তারি মধ্যে বসে আছে শ্‌শিবু সদাগর।"

এই বানান থেকেই বোঝা যায়, এই রীতির ছন্দে রুদ্ধদল সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়। চর ও গর বাদে অন্য সব রুদ্ধদলে এই সংশ্লেষ ও একমাত্রকতাকেই এখানে দেখানো হয়েছে যুক্তাক্ষরের দ্বারা। তাই এখানে প্রত্যেকটি অক্ষরই কার্যতঃ এক সিলেব্‌ল্ বলে গণ্য হতে পেরেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি স্মরণীয় উক্তি ('ছন্দ, তৃতীয় সং, পৃ ১৮৮) এই—

"ছড়ায় প্রায় দেখা যায় মাত্রার ঘনতা কোথাও কম কোথাও বেশি, আবৃত্তিকারের উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝোঁক আছে তার তাড়ায় কণ্ঠ আপনি প্রয়োজনমতো স্বর বাড়ায় কমায়।" নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকেই এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হবে।—

১। জীবনতরী। বহে যেত ॥ মন্দাক্রান্তা। তালে,

আমি যদি। জন্ম নিতেম ॥ কালিদাসের। কালে।

—ক্ষণিকা, সেকাল

২। তোমরা যাদের। বাক্য হয় না ॥ আমার পক্ষে। মুখরোচক,

তোমরা যদি। পুর্নজন্মে ॥ 'হও পুনর্বার'। সমালোচক—

—ক্ষণিকা, কর্মফল

৩। সূর্য গেল। অস্তপারে ॥ লাগল গ্রামের। ঘাটে

আমার জীর্ণ। তরী।

'শেষ বসন্তের'। সন্ধ্যা-হাওয়া ॥ শস্যশূন্য মাঠে

উঠল হাহা। করি।

—ক্ষণিকা, পরামর্শ

প্রথম দৃষ্টান্তটি আট-ছয় দলমাত্রার অপূর্ণ দ্বিপদী (পয়ার), দ্বিতীয়টি আট-আট দলমাত্রার পূর্ণ দ্বিপদী, আর তৃতীয়টি আট-ছয়-ছয় দলমাত্রার ত্রিপদী। তিন দৃষ্টান্তেই পূর্ণপর্বের কাঠামো চার দলমাত্রার 'মাপে'। কিন্তু তার ধ্বনি পরিমাণগত সমতা রক্ষা করতে হয় ছয় কলামাত্রা 'ওজনে'। কলামাত্রার এই আদর্শ রূপটি প্রত্যক্ষতঃ

রক্ষিত হয়েছে 'মন্দা-ক্রান্তা', 'তোমরা যাদের', 'লাগল গ্রামের' প্রভৃতি অল্প কয়েকটি পর্বে, 'হও পুনর্বার' এবং 'শেষ বসন্তের' পর্বে ধ্বনির পরিমাণ বা 'ঘনতা' কিছু বেশি, অন্য সব পর্বেই কিছু কম আছে। আবৃত্তিকারের কণ্ঠ স্বতঃই স্বর কমিয়ে বা বাড়িয়ে পর্বের ধ্বনিপরিমাণগত সমতা রক্ষা করে। পক্ষান্তরে প্রতি পূর্ণ পর্বেই দলমাত্রা আছে চারটি করে। এটাই সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুব কমই হয়। প্রতি পর্বে চার দল থাকলেই আবৃত্তিকারের কণ্ঠ সহজে কিছু দ্রুত বা মন্থর উচ্চারণে প্রতি পর্বের ধ্বনিসমতা রক্ষা করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে ('ছন্দ', তৃতীয় সং, পৃ ১২৭) বলেছেন—"কিঙ্‌কিণীতে ঘুন্টি কি ভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো সে কথাটা গৌণ, তার ঝংকারের লয়টাই আসল কথা।" কবি ও শ্রোতার কাছে ছন্দের তালটাই (লয়টাই) আসল কথা অবশ্যই। কিন্তু প্রতি পূর্ণপর্বে দলমাত্রার ঘুন্টি কি ভাবে ও কত সংখ্যায় সাজালে ছন্দের অভিপ্রেত ঝংকার ও তাল উৎপন্ন হয়, ছান্দসিকের প্রধান বিবেচ্য বিষয় সেটাই। এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ পরে স্বীকার করেছিলেন যে, ছড়ার ছন্দ আসলে 'মাত্রাগোনা' (মানে সিলেব্‌ল্‌গোনা) ছন্দ।

দেখা গেল, সাধু (সাবেক) ও প্রাকৃত (লৌকিক) রীতির ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বিবর্তন ঘটেছে এবং এই দুই বিষয়ে তাঁর শেষ অভিমতের সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তের কোনো গুরুতর পার্থক্য নেই। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত নূতন সাধুরীতি (মানে কলাবৃত্ত) সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায় না। 'মানসী' কাব্যের ভূমিকায় এই নূতন রীতি সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল। তার দায়িত্ব আমারই। বাংলা ছন্দের দুই রীতি নিয়ে মতভেদ ও তর্কবিতর্ক এতই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল যে, তাঁর সঙ্গে নূতন বিতর্কের সূত্রপাত সমীচীন মনে করিনি।—দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী **রীতি** প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

স্পন্দ (rhythm)—দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী '**ছন্দ**' ও '**তাল**' সংজ্ঞা।

স্বরবর্ণ—বাংলা উচ্চারণে মৌলিক স্বরধ্বনি ছয়টি—অ আ, ই উ, এ ও।

এই ছয়টি স্বরধ্বনি নিয়েই ছন্দের কারবার। ভাষাতাত্ত্বিকরা 'অ্যা' ধ্বনিকেও এই তালিকায় স্থান দেন। 'মূলসূত্র' গ্রন্থেও (পৃ ২৪) '্যা' একটি 'মৌলিক স্বর' (মানে মুক্তস্বর) বলে স্বীকৃত হয়েছে। অ্যা-কার বস্তুতঃ এ-কারের বিবৃত রূপ মাত্র। উচ্চারণে যা-ই হক, ছন্দের মাত্রাবিচারে এই দুই স্বরের কোনো পার্থক্য হয় না। যেমন

এক দিন দেব। তরুণ তপন ॥ হেরিলেন সুর। নদীর জলে
অপরূপ এক। কুমারীরতন ॥ খেলা করে নীল। নলিনী-দলে।

বিবৃত এ-কার সাধারণতঃ শব্দের আদিতেই থাকে। এখানেও 'এক' ও 'খেলা' শব্দের 'এ' বিবৃত (open) আর 'দেব' ও 'হেরিলেন' শব্দের 'এ' সংবৃত (close)। কিন্তু মাত্রামূল্য-বিচারে এই দ্বিবিধ 'এ' স্বরের কোনো পার্থক্য হয় না। তাই ছন্দশাস্ত্রে বিবৃত এ-কারের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নতুবা অকারণে জটিলতা বাড়ানো হয় মাত্র। ব্যঞ্জনবর্ণ-মালায় অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য আছে। কিন্তু ছন্দের মাত্রামূল্য-বিচারে কোনো পার্থক্য হয় না। তাই উল্লিখিতও হয় না।

স্বরবৃত্ত রীতি—এখন যাকে বলি 'দলবৃত্ত' (মানে syllabic), এক সময়ে (১৯২২) তাকেই আখ্যাত করেছিলাম 'স্বরবৃত্ত' নামে। মনে ভয় ছিল 'দলবৃত্ত' নাম দিলে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। 'স্বরবৃত্ত' নামেরও

প্রতিবাদ হতে পারে, এই আশঙ্কা ছিল মনে। প্রতিবাদ তো হলই না, বরং সকলেই মেনে নিলেন প্রসন্ন মনে। কিন্তু আমার মনই প্রসন্ন ছিল না। ‘স্বর’ শব্দের এক মানে স্বরবর্ণ (vowel), অন্য মানে শব্দের ক্ষুদ্রতম উচ্চারণবিভাগ (syllable)। একই প্রসঙ্গে কোনো শব্দের দুই অর্থ মেনে চলা অযৌক্তিক। ‘স্বর’ শব্দের vowel অর্থ প্রয়োগসিদ্ধ। তাই সিলেব্‌ল্-বোধক অন্য কোনো শব্দ বেছে নেওয়া অত্যাবশ্যক। ফলে ১৯৩১ সাল থেকে ‘দল’ চালাতে শুরু করলাম একটু-একটু করে। প্রথমেই পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন। তার পরে ছন্দোবিৎ কবি কালিদাস রায়ের স্বীকৃতিও পাওয়া গেল। আর আজকাল মুক্তদল, রুদ্ধদল ও দলবৃত্ত, এই তিনটি পারিভাষিক নাম প্রায় সর্বজন পরিচিত ও বহুজন-ব্যবহৃত। তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে দল ও দলবৃত্ত শব্দই গ্রাহ্য। কোনো পুরোনো সংস্কার তাদের মনে শিকড় গাড়ার সুযোগ পায় নি। ‘স্বরবৃত্ত’ নাম এখন বিলুপ্তির পথে। পরে বুঝতে পেরেছি, যদি সাহস করে প্রথম থেকেই ‘দলবৃত্ত’ নামটা চালাতাম তবে সেটাই পেত পাঠকসমাজের নির্বিচার স্বীকৃতি। তাহলে পরে পরিভাষা-বদল করে পাঠকসমাজের অভ্যাস বদলাবার মতো কঠিন কাজে হাত দিয়ে নাজেহাল হতে হত না।—দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত **দল** ও **দলবৃত্ত** সংজ্ঞা।

হল্, হস্—এই দুটোই ব্যঞ্জনবর্ণের সাংকেতিক নাম। তাই **হলন্ত** ও **হসন্ত** অভিন্নার্থক শব্দ। এই দুই-এরই মানে ব্যঞ্জনান্ত। যেমন—বণিক্, মহৎ, বুদ্ধিমান্ এই তিনটি **হলন্ত** বা **হসন্ত** শব্দ। তেমনি বল্‌গা, গুল্‌ফ, দন্ত, কর্ণ এগুলি **হল্‌মধ্য** বা **হস্‌মধ্য** শব্দ। ‘হসন্তমধ্য’ বলা অনুচিত। বাংলায় হসন্ত ও হস্‌মধ্য শব্দই বেশি চলে।

হৃদ্যা রীতি (সত্যেন্দ্রনাথ)—যে ছন্দোরীতিকে আমরা বলি ‘কলাবৃত্ত’ তাকেই সত্যেন্দ্রনাথ আখ্যাত করেছেন ‘হৃদ্যা’ নামে।—দ্রষ্টব্য পূর্ববর্তী ‘রীতি’ শব্দ।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে (‘ছন্দ’, তৃতীয় সং, পৃ ১৩৮) বলেছেন—“ছন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যা বলি সেটা আমার অশিক্ষিত বলা, সুতরাং তাতে দোষ স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু ছন্দের রস সম্বন্ধে আমি যদি কিছু আলোচনা করি, সংকোচ করব না, কেননা ছন্দসৃষ্টিতে অশিক্ষিতপটুত্বের মূল্য উপেক্ষা করবার নয়।”—শিল্পসৃষ্টিমাত্রই প্রতিভার কাজ। এই প্রতিভাকেই এখানে বলা হয়েছে ‘অশিক্ষিতপটুত্ব’। ছন্দের ধ্বনিগত শিল্পসৌন্দর্যেরই নামান্তর ‘ছন্দের বস’। ‘ছন্দ’ গ্রন্থে ছন্দের রসরূপের বিষয় আলোচিত হয়েছে নানা প্রসঙ্গেই। সেগুলির প্রণিধানযোগ্যতা কম নয়। কিন্তু এই বিষয়টা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছন্দের ‘তত্ত্ব’ অর্থাৎ ব্যাকরণ-বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের মতামত দোষস্পৃষ্ট কিনা অথবা কতখানি দোষস্পৃষ্ট তা দেখানো।

রবীন্দ্রনাথের সহজাত ছন্দচেতনা ছিল অভ্রান্ত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। নতুবা তাঁর পক্ষে এমন অলোকসামান্য ছন্দসৌন্দর্যের মায়াপুরী রচনা সম্ভব হত না। এই সহজাত ছন্দচেতনা স্বভাবতঃই কবিকে প্রেরণা যুগিয়েছে প্রতিভার নেপথ্যভূমি থেকে। কিন্তু কবি যখন প্রকাশ্যে ছন্দ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তখন তাঁকে চালনা করে আবাল্য শিক্ষালব্ধ কতকগুলি প্রথাগত বিচারহীন ছন্দসংস্কার (যেমন অক্ষরের সংস্কার)। তখনই কবির ছন্দ-আলোচনায় দোষ স্পর্শ করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির ঘনঘন তাগিদে কবির সহজাত ছন্দচেতনা যখন নিছক অনুভূতির আশ্রয় ছেড়ে জ্ঞানের দর্পণে প্রতিফলিত হয় তখনই ছন্দচিন্তার সত্যরূপ প্রকাশ পায়, আর প্রথালব্ধ সংস্ককারের খোলসটাও খসে পড়ে। তাছাড়া যেসব প্রথালব্ধ শব্দযোগে ছন্দবিশ্লেষণের কাজ চালানো

হত, বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সেগুলি ক্রমে সুনির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করে অথবা নূতন পারিভাষিক শব্দের কাছে নিজের দখল ছেড়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তায় বিচারবুদ্ধির এই প্রক্রিয়া বারবার দেখা গিয়েছে। কিন্তু তাঁর ছন্দচিন্তা পূর্ণ পরিণতি লাভের সুযোগ পায়নি। তবু কতকগুলি বিষয়ে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করে গেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। যেমন—

১। বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর'-সংখ্যা গণনার অনাবশ্যকতা।

২। সাধুরীতির ছন্দে শব্দান্ত্য রুদ্ধদলের দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক উচ্চারণ।

৩। সাবেক সাধুছন্দের বিশ্লেষণে সিলেব্‌ল্-এর ('মাত্রা'র) ভূমিকা এবং এ-জাতীয় ছন্দের মিশ্রপ্রকৃতি স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা।

৪। প্রাকৃত (লৌকিক) ছন্দের সিলেব্‌ল্-গোনা ('মাত্রাগোনা') প্রকৃতি স্বীকার।

৫। তিন রীতি-ভেদে ত্রিবিধ পয়ারের পরোক্ষ স্বীকৃতি। স্মরণীয়—'নিম্নে যমুনা বহে' ইত্যাদি নূতন সাধু অর্থাৎ কলাবৃত্ত পয়ার এবং 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ইত্যাদি 'মাত্রাগোনা' অর্থাৎ দলবৃত্ত পয়ারের বিশ্লেষণ।

৬। আধা যতি, পুরো যতি, পঙ্‌ক্তি প্রভৃতি কোনো-কোনো পারিভাষিক শব্দের নির্দিষ্টার্থক প্রয়োগ।

মনে রাখা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার বিবর্তন ঘটেছে প্রধানতঃ তাঁর জীবনের শেষ দশকে।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার প্রধান অপূর্ণতা নূতন সাধু, অর্থাৎ কলাবৃত্ত ছন্দের বিশ্লেষণে 'মাত্রা'র অর্থাৎ সিলেব্‌ল্-এর ভূমিকা স্বীকার না-করা। এই অপূর্ণতার কারণ এ বিষয়টা পুনর্বিবেচনার সুযোগ না পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার প্রধান দুর্বলতা অনেক পারিভাষিক শব্দের বিবিধ শিথিল প্রয়োগ—একার্থে একাধিক শব্দ প্রয়োগ এবং একাধিক শব্দের একার্থে প্রয়োগ। যেমন, 'পদ' মানে কোথাও পুরো পয়ার-পঙ্‌ক্তি, আবার কোথাও পয়ারের অর্ধযতি-বিভাগ।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান কৃতিত্ব দুটি।—

১। দুটি নির্দিষ্টার্থক যথার্থ পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ, 'মিতাক্ষর' ও 'মাত্রিক'। এ-দুটি ছন্দের গঠন-পরিচায়ক যথার্থ পারিভাষিক শব্দ। রবীন্দ্রনাথের 'সাধু' ও 'প্রাকৃত' তা নয়।

২। চলতি ভাষার ছন্দ যে আসলে syllabic ('মাত্রিক'), বোধ করি দ্বিজেন্দ্রলালই এই তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা।

দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দচিন্তার প্রধান অপূর্ণতা বা ত্রুটিও দুটি।—

১। নূতন 'মিতাক্ষর' (অর্থাৎ কলাবৃত্ত) রীতির বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তন এবং এই ছন্দোরীতি স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না-করা।

২। 'মাত্রিক' (অর্থাৎ দলবৃত্ত) ছন্দের পর্ববিভাগ নিরূপণে অক্ষমতা। ছন্দের অধিকতর বিশ্লেষণের প্রতি তিনি মনোনিবেশ করেন নি।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে—

১। ‘হৃদ্যা’ (অর্থাৎ কলাবৃত্ত) রীতির বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবর্তী হলেও এই রীতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার।

২। পর্ব ও পঙ্‌ক্তি, এই দুটি পারিভাষিক শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ। এখন এই দুই শব্দ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। ‘পঙ্‌ক্তি’ শব্দ রবীন্দ্রনাথেরও অনুমোদন পেয়েছে।

৩। ‘চিত্রা’ (অর্থাৎ দলবৃত্ত) রীতির ছন্দে পর্ববিভাগ নিরূপণ এবং প্রতি পূর্ণ পর্বে অনধিক চারটি ‘শব্দ-পাপড়ি’ (অর্থাৎ দলমাত্রা) থাকার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। ‘পাঁচটা গোটা অক্ষর দিয়ে পর্ব গড়লে শ্রুতিকটু হবে’ তাঁর উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। এখানে ‘গোটা অক্ষর’ কথাটা প্রযুক্ত হয়েছে ‘মুক্তদল’ (open syllable) অর্থে।

৪। ‘চিত্রা’ রীতিতে প্রতি পূর্ণপর্বের দুই উপপর্ব বিভাগের পরোক্ষ স্বীকৃতি। পূর্ণপর্বের পূর্বার্ধ ও শেষার্ধের উল্লেখ থেকেই উপপর্ব-চেতনার আভাস পাওয়া যায়।

৫। চাওয়া, পাওয়া প্রভৃতি শব্দের ‘ওয়া’ যে আসলে ‘অন্তঃস্থ ব-এর সামিল’ এই তত্ত্বের স্পষ্ট উল্লেখও সত্যেন্দ্রনাথের সতর্ক ধ্বনিশ্রুতির পরিচায়ক। বাজিয়ে সাজিয়ে প্রভৃতি শব্দের ‘ইয়ে’ ‘পর্বের পূর্বার্ধে থাকলে এক (মাত্রা) এবং শেষার্ধে থাকলে দুই (মাত্রা) হবে’, এই উক্তি থেকেও অনুরূপ সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যথাস্থানে তা দেখানো হয়েছে।

৬। সত্যেন্দ্রনাথের সবাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে ই্ উ্ এ্ ও্, এই চারটি ভাঙ্‌টা বা আধ্‌লা স্বরের (খণ্ডস্বরের) স্বীকৃতিতে।

৭। পদ্যপঙ্‌ক্তিতে চারটি করে পঙ্‌ক্তিপর্ব থাকে।...পয়ারেও তাই, লাচাড়িতেও তাই, ছড়ার ছন্দেও তাই, পুঁথির ছন্দেও তাই।—এখানে পদ্যপঙ্‌ক্তি মানে চতুর্মাত্রক পর্বের দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি, কেননা ত্রিপদী বা চৌপদী পঙ্‌ক্তিতে চারটির বেশি পর্ব থাকে। আর, পয়ার ও লাচাড়িকে যথাক্রমে বলা হয়েছে ‘পুঁথির ছন্দ’ ও ‘ছড়ার ছন্দ’। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে—এখানে ‘পয়ার মানে পুঁথির অর্থাৎ সাধু (মিশ্রবৃত্ত) রীতির পয়ার এবং এই পয়ারও চার পর্বে বিভাজ্য, আর ‘লাচাড়ি’ মানে ছড়ার অর্থাৎ লৌকিক (দলবৃত্ত) রীতির ছন্দ এবং এই ছন্দও পয়ারের মতোই চার পর্বে বিভাজ্য। এর থেকে লৌকিক পয়ারের পরোক্ষ স্বীকৃতি পাওয়া গেল। মোটকথা, রবীন্দ্রনাথের সাধু ও প্রাকৃত পয়ার এবং সত্যেন্দ্রনাথের পুঁথির পয়ার ও ছড়ার লাচাড়ি (পয়ার) যথাক্রমে অভিন্ন ; তাঁদের বিশ্লেষণও অভিন্ন।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার প্রধান দুর্বলতা বা ত্রুটি সংস্কৃত ‘শ্রুতবোধ’ গ্রন্থের একটি উক্তির নজিরে (ছন্দ-সরস্বতী, পঞ্চম অধ্যায়) অস্বরান্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে (আসলে স্বরব্যঞ্জন-নির্বিশেষে সব খণ্ডবর্ণকে) আধ মাত্রা বলে স্বীকার করা। খণ্ডবর্ণ স্বতঃ-উচ্চার্য নয়। কাজেই তার মাত্রা-পরিমাণ স্বীকার করা যায় না। শ্রুতবোধের উক্তিও প্রামাণিক বলে স্বীকৃত নয়। কোনো সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দেই ব্যঞ্জনবর্ণ আধ মাত্রা বলে গণ্য হয় না। বাংলা ছন্দে খণ্ডবর্ণের মাত্রা গণনা করলে বিভ্রান্তির সীমা থাকবে না। ওই আধ মাত্রার হিসাবে বাদ দিয়েই সত্যেন্দ্ররচিত নূতন ছন্দের বিশ্লেষণ করা যায় অনায়াসেই। তাতে এসব নূতন ছন্দের সৌন্দর্যবোধেরও হানি হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তার আর-এক ত্রুটি আদ্যা, হৃদ্যা প্রভৃতি অপারিভাষিক নাম ব্যবহার। নামগুলি সুন্দর ও সুপ্রযোজ্য। কিন্তু ছন্দের প্রকৃতি অর্থাৎ গঠনরীতির পরিচায়ক নয়।

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ, এই তিন কবির ছন্দচিন্তা নিজের-নিজের অভিজ্ঞতাজাত। তাঁদের অভিজ্ঞতার মূল্য কম নয়। নিছক ছান্দসিকের দৃষ্টি তাঁদের ছিল না। পূর্ণাঙ্গ ছন্দশাস্ত্র রচনার উদ্দেশ্যও তাঁদের ছিল না।

অমূল্যধন কিন্তু বিশুদ্ধ ছান্দসিক হিসাবেই ছন্দশাস্ত্র রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর 'মূলসূত্র' বইটিও সর্বাধিক প্রচারিত। কিন্তু এই বইটিতে পর্বপবাঙ্গবাদ, লয়-তত্ত্ব ও তানপ্রধান প্রভৃতি কয়েকটি নাম ছাড়া কোনো নূতন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাছাড়া সুষ্ঠু পারিভাষিক নাম এবং সার্থক সংজ্ঞাসূত্রের অভাবও অনেক সময় বিভ্রান্তি ঘটায়। যথাস্থানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান এই কয়টি—

১। সিলেব্‌ল্ অর্থে 'অক্ষর' শব্দের ব্যবহার অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর। তার নিদর্শন আছে 'মূলসূত্র' গ্রন্থেও। যেমন—'অমিতাক্ষর'।

২। ভাবযতি অর্থে 'ছেদ' শব্দের প্রয়োগ। তাতে ছন্দের বিশ্লেষণে অনাবশ্যক জটিলতা বাড়ানো হয়েছে। ছন্দবিচারে ধ্বনিযুতিই বিবেচ্য, ভাবযতি নয়। বিশেষ প্রয়োজনে কখনো-কখনো 'ভাবযতি'র উল্লেখ করা যেতে পারে। তার জন্য 'ছেদ' শব্দ প্রয়োগ অনাবশ্যক।

৩। চরণ, পর্ব ও পর্বাঙ্গ, এই তিনটি সংজ্ঞাশব্দের অর্থগত অনিশ্চয়তা। কি লক্ষণ দেখে এই তিন ছন্দোবিভাগ নিরূপণ করা যাবে, তার যথাযথ নির্দেশ নেই 'মূলসূত্র' গ্রন্থে। ফলে এই গ্রন্থের ছন্দোবিশ্লেষণ নির্ভুল হতে পারেনি। কেননা, অনেক সময় পর্ব বা পদই গণ্য হয়েছে 'চরণ' বলে! তেমনি অনেক সময় পদকে বলা হয়েছে 'পর্ব', আর পর্বকে বলা হয়েছে 'পর্বাঙ্গ'।

৪। তার কারণ যতির গুরুত্বক্রম ও যতিলোপ, এই দুই বিষয়ে সচেতনতার একান্ত অভাব। এই দ্বিবিধ অসচেতনতার ফলে ছন্দশাস্ত্রের রূপতত্ত্ব (morphology) বিভাগটা প্রায় পুরোপুরিভাবেই উপেক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া এই গ্রন্থে ছন্দ-বিশ্লেষণের যেসব আদর্শ দেখানো হয়েছে, সেগুলি প্রায় সর্বত্রই পাঠককে বিপথে চালিত করে।

৫। তানপ্রধানাদি গুণবাচক নাম ছন্দোরীতির পরিচায়ক নয়। অর্থাৎ এসব গুণ ছন্দোরীতির যথার্থ লক্ষণ নয়। এই গুণগুলি অপরিবর্তনীয় নয়। ফলে এসব গুণের উপর নির্ভর করলে এক রীতির ছন্দ সহজেই অন্য রীতির ছন্দ বলে প্রতীত হতে পারে।

৬। লয়-তত্ত্বের উপরে নির্ভর করেও ছন্দের রীতিনিরূপণ সম্ভব নয়। কেননা, কবিরা প্রয়োজনমতো ঘনঘন পর্বযতি দিয়ে বা ঘনঘন পর্বযতিলোপ ঘটিয়ে একই রীতির ছন্দে দ্রুত বা বিলম্বিত লয় সঞ্চার করতে পারেন, বিভিন্ন কবিতায় বা একই কবিতার বিভিন্ন অংশে।

এসব কারণে মনে হয়, এ বই পড়ে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।

কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান—

মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে

তোমার আহ্বান।

১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদযোগে প্রকাশিত। প্রকাশক ‘জিজ্ঞাসা’।

১। লেখকের ‘ছন্দ-জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থ (১৯৭৪), ‘বাংলা ছন্দ’ প্রবন্ধ, পৃ ৫-৬।

১। এই গ্রন্থে অমূল্যধনের সব মতামতই গৃহীত হল তাঁর ‘বাংলা ছন্দের মূলসূত্র’ গ্রন্থের শেষ (সপ্তম, ১৯৮৩) সংস্করণ থেকে। আর বইটির নাম সংক্ষেপে উল্লিখিত হল ‘মূলসূত্র’ বলে।

১. ‘দল’ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এই লেখকের ‘সিলেবল-কে দল বলি কেন?’ প্রবন্ধ—‘ছন্দপরিক্রমা’ গ্রস্থ (১৯৭৭ সং), পৃ ২০৪-৩০।

১। এই ‘বাংলা ছন্দ’ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘কবিতা’ পত্রিকায় (১৩৫২)। কিছুকাল পরে এটি সামান্য পরিমার্জিত আকারে সংকলিত হয় ‘সাহিত্যচর্চা’ গ্রন্থে (১৩৬১ বৈশাখ)।

১। দ্রষ্টব্য এই লেখকের ‘আধুনিক বাংলা ছন্দসাহিত্য’ (১৯৮০), পৃ ১৮০ এবং ২৩৯-৪০।

২। দ্রষ্টব্য ‘ছন্দ-পরিক্রমা’—প্রথম সং (১৯৬৫), পৃ ১৪, ৫২ এবং ১১৬-১৭।

৩। দ্রষ্টব্য ‘ছন্দ-পরিক্রমা’—দ্বিতীয় সং (১৯৭৭), পৃ ৫ এবং ৩৫।

১। দ্রষ্টব্য ‘বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা’ (গবেষণা পরিষদ, কলি, বিশ্ববি। প্রকাশক ‘জিজ্ঞাসা’, ১৯৭৭), পৃ ২৮-২৯ এবং ৭৬-৮৮০।

২। দ্রষ্টব্য ‘ছন্দ’ গ্রন্থ (তৃতীয় সং, ১৯৭৬), পৃ ৬—‘বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর’ প্রসঙ্গ।

৩। ‘মানসী’, নিষ্ফল উপহার (১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ ২৭। ১৮৮৮ জুন)।

১. দ্রষ্টব্য লেখকের ‘ছন্দ জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে (১৯৭৪) সংবলিত ‘বাংলা 'ছদ প্রবন্ধ (১৯২২ ডিসেম। ১৩২৯ পৌষ), পৃ ৬।

২. দ্রষ্টব্য ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ গ্রন্থ, তৃতীয় সং (১৯৮৪), পৃ ৯৩, ৯৫, ৯৭, ১১৭।

পরিশেষে

দীর্ঘকাল (১৯২২-৮৫) ধরে প্রায় অবিশ্রান্তভাবে প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে-সঙ্গে আমার জিজ্ঞাসা ও চিন্তাধারা স্বভাবতঃই নানা বাঁক ঘুরে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এই প্রবন্ধপ্রবাহ আমার জিজ্ঞাসা ও চিন্তাধারার অগ্রগতির তথা গতি পরিবর্তনের পথরেখা অঙ্কিত করে চলেছে। কালের গতির সঙ্গে চিন্তার গতি অনুসরণেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে।

প্রবোধচন্দ্র সেন

গ্রন্থকারের ছন্দবিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ

কালানুক্রমিক

তারকাচিহ্ন-নির্দিষ্ট রচনাগুলি সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংখ্যানুক্রমে সংকলিত হল পরবর্তী ‘প্রসঙ্গ-পরিচয়’ বিভাগে। এই তালিকার প্রথম ছাব্বিশটির মধ্যে ৯-সংখ্যক বাদে বাকি সব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে **ছন্দ-জিজ্ঞাসা** গ্রন্থে। তার যে সব প্রবন্ধ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তার উল্লেখ পাওয়া যাবে পরবর্তী ‘প্রসঙ্গ-পরিচয়’ বিভাগে।

প্রথম পর্ব

১৩২৯-৩০ । ইং ১৯২২-২৪

১ **বাংলা ছন্দ***	প্রবাসী	১৩২৯ পৌষ
২ স্বরবৃত্ত ছন্দ	প্রবাসী	১৩২৯ মাঘ
৩ স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব	প্রবাসী	১৩২৯ ফাল্গুন
৪ **ছন্দের শ্রেণীবিভাগ**	প্রবাসী	১৩২৯ চৈত্র
৫ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ	প্রবাসী	১৩৩০ বৈশাখ
৬ **বাংলা ছন্দ ও সংগীত-১***	প্রবাসী	১৩৩০ মাঘ
৭ বাংলা ছন্দ ও সংগীত-২	প্রবাসী	১৩৩০ ফাল্গুন
৮ বাংলা ছন্দ ও সংগীত-৩	প্রবাসী	১৩৩০ চৈত্র

দ্বিতীয় পর্ব

১৩৩৭-৫১ । ইং ১৯৩১-৪৫

৯ মেঘদূত-অনুবাদের ছন্দ*	‘মেঘদূত’ গ্রন্থ	১৩৩৭ মাঘ
১০ বাংলা ছন্দের বিবর্তন*	সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা	১৩৩৮ ভাদ্র
১১ বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ*	বিচিত্রা	১৩৩৮ অগ্রহায়ণ
১২ বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান*	‘জয়ন্তী-উৎসর্গ’ গ্রন্থ	১৩৩৮ পৌষ
১ **বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান**	পুস্তিকা (১৯৩১)	১৩৩৮ পৌষ
১৩ বাংলা ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গ	বিচিত্রা	১৩৩৮ পৌষ
১৪ ছন্দপ্রসঙ্গ	পঞ্চপুষ্প	১৩৩৮ মাঘ
১৫ ছন্দজিজ্ঞাসা-১	বিচিত্রা	১৩৩৮ মাঘ

১৬ ছন্দজিজ্ঞাসা-২	বিচিত্রা	১৩৩৮ ফাল্গুন
১৭ ছন্দোবিশ্লেষ-১	প্রবাসী	১৩৩৮ ফাল্গুন
১৮ ছন্দোবিশ্লেষ-২	প্রবাসী	১৩৩৮ চৈত্র
১৯ বাংলা ছন্দের ধ্বনি ও মাত্রা	বিচিত্রা	১৩৩৮ চৈত্র
২০ ছন্দজিজ্ঞাসা-৩	বিচিত্রা	১৩৩৯ বৈশাখ
২১ বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ*	বিচিত্রা	১৩৩৯ বৈশাখ
২২ ছন্দবিচার*	বিচিত্রা	১৩৩৯ জৈষ্ঠ
২৩ ছন্দ ও ছন্দোবদ্ধ	বিচিত্রা	১৩৩৯ শ্রাবণ
২৪ বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ*	বিচিত্রা	১৩৩৯ ভাদ্র
২৫ ছন্দসংকট*	উত্তরা	১৩৩৯ ভাদ্র
২৬ স্বরবৃত্ত ছন্দের আইনকানুন	পূর্বাশা	১৩৩৯ আশ্বিন
২৭ কাব্য ও ছন্দ*	‘অনামী’ গ্রন্থ	১৩৪০ আষাঢ়
২৮ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ	উদয়ন	১৩৪০ আশ্বিন
২৯ ছন্দের গঠন সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন*	বিচিত্রা	১৩৪১ শ্রাবণ
৩০ বাংলা কবিতার ছন্দ-১	উদয়ন	১৩৪১ ভাদ্র
৩১ বাংলা কবিতার ছন্দ-২	উদয়ন	১৩৪১ আশ্বিন
৩২ ছন্দের গঠন*	বিচিত্রা	১৩৪১ অগ্রহায়ণ
৩৩ বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ	ভারতবর্ষ	১৩৪১ অগ্রহায়ণ
৩৪ ছন্দমীমাংসা*	বিচিত্রা	১৩৪১ ফাল্গুন
৩৫ আক্ষরিক ছন্দ*	নবারুণ	১৩৪১ ফাল্গুন
৩৬ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মাত্রাগণনা*	ছায়াবীথি	১৩৪১ ফাল্গুন
৩৭ যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি-১	বিচিত্রা	১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ
৩৮ যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি-২	বিচিত্রা	১৩৪২ আষাঢ়
৩৯ ছন্দব্যাকরণ	বিচিত্রা	১৩৪৪ আষাঢ়
৪০ Rabindranath and Bengali Prosody*	V.B.Q.	1941 May
৪১ রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ*	রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্বাশা	১৩৪৮ আশ্বিন
৪২ বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা*	পরিচয়	১৩৪৮ ফাল্গুন
৪৩ বংগলা ছন্দ কী প্রকৃতি*	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৪৯ আশ্বিন
৪৪ বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ*	আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ	১৩৫০ বৈশাখ
৪৫ ছন্দের ইশারা	মৃত্তিকা	১৩৫০ আষাঢ়
৪৬ বাংলা ছন্দ ও মিল	কবিতা	১৩৫০ কার্তিক

৪৭ বাংলা ছন্দের গোড়ার কথা	নিরুক্ত	১৩৫০ পৌষ
৪৮ বাংলা ছন্দে ধ্বনিপ্রয়োগ*	বৈশাখী	১৩৫১ বৈশাখ
৪৯ রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৫১ শ্রাবণ
৫০ আধুনিক বাংলা ছন্দ*	দেশ	১৩৫১ অগ্রহায়ণ২
৫১ বাংলা সংস্কৃত ছন্দ ও হাস্যরস	বর্ষশেষ	১৩৫১ মাঘ

তৃতীয় পর্ব

১৩৫২-৭১ । ইং ১৯৪৫-৬৪

২ **ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ**	গ্রন্থ (১৯৪৫)	১৩৫২ আষাঢ়১
৫২ ছান্দসিকের নিবেদন	'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'	১৩৫২ আষাঢ়
৫৩ ছন্দ-সংলাপ	'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'	১৩৫২ আষাঢ়
৫৪ বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্র	শারদীয়া আনন্দবাজার	১৩৫২ আশ্বিন
৫৫ ছন্দ*	'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ'	১৩৫২ অগ্রহায়ণ
৫৬ বাংলা ছন্দ ও ক্রমবিকাশ ছন্দশাস্ত্রের	'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ'	১৩৫২ অগ্রহায়ণ
৫৭ 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'*	উত্তরা	১৩৫২ ফাল্গুন
৫৮ মিল	বসুমতী	১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠ
৫৯ বাংলা কবিতায় ছন্দস্পন্দ ও মিল	পূর্বাশা	১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ
৬০ 'কড়ি ও কোমল'-এর ছন্দ	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৫৫ কার্তিক
৬১ ছন্দপরিভাষা*	পূর্বাশা	১৩৫৫ মাঘ
৬২ ছন্দের মাত্রা ও কলা*	ইমরোজ (ঢাকা)	১৩৫৮ ভাদ্র-আশ্বিন
৬৩ রাবীন্দ্রিক ছন্দ	উত্তরা	১৩৬০ বৈশাখ
৬৪ ছন্দের খেলা	শারদীয়া দেশ	১৩৮১ আশ্বিন
৬৫ বাংলা ছন্দ	বেতার জগৎ	১৩৬২ আশ্বিন
৬৬ রবীন্দ্রনাথের ছন্দশিল্প	গল্পভারতী	১৩৬৪ বৈশাখ
৬৭ ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ-১*	বসুধারা	১৩৬৮ বৈশাখ
৬৮ রবীন্দ্রসংগীত ও ছন্দ*	গীতবিতান পত্রিকা	১৩৬৮ বৈশাখ
৬৯ ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ-২*	'রবীন্দ্রচর্চা' গ্রন্থ	১৩৬৮ শ্রাবণ
৭০ 'ছন্দধাঁধা'-পরিচয়*	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৬৯ কার্তিক
৩ **ছন্দ** (রবীন্দ্রনাথ)	সম্পাদিত গ্রন্থ (১৯৬২)	১৩৬৯ কার্তিক
৭১ ছন্দকৌতুক	পূর্বাশা	১৩৭০ চৈত্র
৭২ পয়ার-পরিচয়*	পূর্বাশা	১৩৭১ আষাঢ়

চতুর্থ পর্ব

১৩৭২-৯২ । ইং ১৯৬৫-৮৫

৪ ছন্দ-পরিক্রমা	গ্রন্থ (১৯৬৫)	১৩৭২ বৈশাখ ২৫
৭৩ বাংলা ছন্দের প্রাথমিক পরিচয়*	‘ছন্দপরিক্রমা’	১৩৭২ বৈশাখ
৭৪ ‘পয়ার’ নামের অপপ্রয়োগ	‘ছন্দপরিক্রমা	১৩৭২ বৈশাখ
৭৫ পারিভাষিক শব্দের অসতর্ক প্রয়োগ	‘ছন্দপরিক্রমা’	১৩৭২ বৈশাখ
৭৬ ‘জিজ্ঞাসু পড়ুয়া’র চিঠি-১*	আনন্দবাজার	১৩৭২ আশ্বিন ১৬
৭৭ ‘জিজ্ঞাসু পড়ুয়া’র চিঠি-২*	আনন্দবাজার	১৩৭২ কার্তিক ২
৭৮ ‘জিজ্ঞাসা পড়ুয়া’র চিঠি-৩	আনন্দবাজার	১৩৭২ কার্তিক৭
৭৯ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-পরিচয়*	চতুষ্কোণ	১৩৭৩ বৈশাখ
৮০ ব্যঙ্গ রচনায় সংস্কৃত ছন্দ	ভারতবর্ষ	১৩৭৩ জ্যৈষ্ঠ
৮১ বাংলা ছন্দের পরিভাষা*	চতুষ্কোণ	১৩৭৩ আশ্বিন
৮২ জয়দেবী ছন্দ*	চতুষ্কোণ	১৩৭৩ কার্তিক
৮৩ ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বর গুপ্ত	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৭৩ কার্তিক-পৌ
৮৪ ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বর গুপ্ত	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৭৩ মাঘ-চৈত্র
৮৫ কয়েকটি অ-বাংলা ছন্দের বাংলা রূপ-১	কবি ও কবিতা	১৩৭৪ আশ্বিন
৮৬ ‘ছন্দ’ ও ‘বাংলা ছন্দ’	ভারতকোষ ৩য় খণ্ড	১৩৭৪ পৌষ
৮৭ কয়েকটি অ-বাংলা ছন্দের বাংলা রূপ-২	কবি ও কবিতা	১৩৭৪ মাঘ
৮৮ বাংলা ছন্দচর্চার ধারা*	‘বাংলা পদাবলীর ছন্দ’	১৩৭৫ আষাঢ়
৮৯ পয়ারের উৎস-সন্ধানে*	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৭৫ মাঘ-চৈত্র
৯০ মেঘদূতের অনুবাদ ও বাংলা মন্দাক্রান্তা*	‘মেঘদূত’	১৩৭৫ ফাল্গুন
৯১ বাংলা ছন্দে রীতিলঙ্ঘন-১*	কবি ও কবিতা	১৩৭৬ বৈশাখ
৯২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ*	সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা	১৩৭৬ ভাদ্র
৯৩ বাংলা ছন্দে রীতিলঙ্ঘন-২	কবি ও কবিতা	১৩৭৬ আশ্বিন
৯৪ মেঘদূত অনুবাদের ছন্দ	‘ভারতাত্মা কবি কালিদাস’	১৩৭৯ পৌষ
৯৫ বাংলায় জাপানি ছন্দ*	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৭৯ মাঘ-চৈত্র
৯৬ ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ-১	কবি ও কবিতা	১৩৮০ আশ্বিন
৯৭ ছন্দ*	‘আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ’	১৩৮০ মাঘ
৯৮ ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ-২	‘ভাষা’ (তৃতীয় প্রকাশ)	১৩৮০ চৈত্র
৯৯ পরিভাষা-বিচার*	‘ভাষা’ (তৃতীয় প্রকাশ)	১৩৮০ চৈত্র

১০০ বাংলা ছন্দসাহিত্য*	আনন্দবাজার (বার্ষিক)	১৩৮১ বৈশাখ
৫ ছন্দ-জিজ্ঞাসা	গ্রন্থ (১৯৭৪)	১৩৮১ বৈশাখ ১৫
১০১ সিলেবল-কে 'দল' বলি কেন*	অমৃত	১৩৮১ পৌষ ২৩
১০২ সিলেবল-কে 'অক্ষর' বলি না কেন*	সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা	১৩৮২ কার্তিক-চৈত্র
৬ ছন্দ (রবীন্দ্রনাথ)	সম্পাদিত গ্রন্থ (১৯৭৬)	১৩৮২ মাঘ
১০৩ পয়ারের উৎস-সন্ধানে*	'বাংলা কবিতা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থ	১৩৮৩ আষাঢ়

প্রসঙ্গ-পরিচয়

১-৫ **'বাংলা ছন্দ' ও 'ছন্দের শ্রেণীবিভাগ'** নামে দুই ভাগে বিভক্ত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসে রচিত ও চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিমার্জিত হয়ে প্রবাসী পত্রিকায় প্রেরিত হয়। আট মাস পরে ওই প্রবন্ধের প্রথম বিভাগটি তিন অংশে এবং দ্বিতীয় বিভাগটি দুই অংশে খণ্ডিত হয়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় (১৩২৯ পৌষ-১৩৩০ বৈশাখ। ইং ১৯২২ ডিসেম্-১৯২৩ এপ্রিল) বিভিন্ন নামে। এই প্রবন্ধের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার, মোহিতলাল, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন প্রমুখ অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬-৮ বাংলা ছন্দ ও সংগীত ১-৩—এই তিন প্রবন্ধ আসলে এক প্রবন্ধেরই তিন অংশ, তিন মাসে প্রাকশিত হয় একই নামে।

৯ **'মেঘদূত'** গ্রন্থ—কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্ত-কর্তৃক পদ্যবন্ধে অনূদিত এবং এই লেখককর্তৃক সম্পাদিত। এই রচনাটি উক্ত গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকার অংশবিশেষ। এই ভূমিকাটি পরে সমগ্রভাবে সংকলিত হয়েছে লেখকের **'ভারতাত্মা কবি কালিদাস'** গ্রন্থে (১৯৭৩)।

১০ বাংলা ছন্দের বিবর্তন—১৩৩৮ ভাদ্র ১৩ (ইং ১৯৩১ আগস ৩০) তারিখে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ। পরিষৎ-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বক্তাকর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে অনুলিখিত ও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত (অষ্টাত্রিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্যবিবরণ, (পৃ ২২-২৩)। তালিকার এই নামটি নবপ্রদত্ত। পত্রিকায় কোনো নাম ছিল না।

১১ বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ—রচনাকাল ১৩৩৮ ভাদ্র। এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে প্রকাশিত হয় 'বাংলা ছন্দ' (বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ) এবং 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ) নামে রবান্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধ। এই প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশিত হয় এই লেখকের 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' নামক তিনটি প্রবন্ধে (১৫, ১৬ ও ১৭ সংখ্যক)। এই উপলক্ষে বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছুকাল ধরে যে ছন্দবিতর্ক চলে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে এই তিন গ্রন্থে—(১) রবীন্দ্রনাথের '**ছন্দ**' (দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রবোধচন্দ্র সেন-সম্পাদিত, ১৩৬৯ কার্তিক, পৃ ৩৮১-৪১৩), (২) দিলীপকুমার রায়ের '**স্মৃতিচারণ**', দ্বিতীয় খণ্ড (শক ১৮৮৪। বাংলা ১৩৬৯ আষাঢ়, পৃ ১৪২-৪৬) এবং (৩) 'বিচিত্রা'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত '**বিগত দিন**' (সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ ৩০-৪০)।

১২ বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান—অমল হোম মহাশয়ের অনুরোধে '**জয়ন্তী-উৎসর্গ**' গ্রন্থের জন্য ১৩৩৮ কার্তিক ২০ (ইং ১৯৩১ নভেম্বর ৬) তারিখে রচিত এবং পরবর্তী ৯ অগ্রহায়ণ তারিখে প্রুফ দেখার সময়ে ঈষৎ

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত। 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' নামের সংকলন-গ্রন্থখানি রবীন্দ্রপরিচয়সভা ও বিশ্বভারতী যুক্ত উদ্যোগে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসব দিবসে (১৩৩৮ পৌষ ১১ । ইং ১৯৩১ ডিসেম্বর ২৭ রবিবার)।

গ্রন্থ ১। বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান—'জয়ন্তী-উৎসর্গ' গ্রন্থের জন্য রচিত উক্ত প্রবন্ধটির মুদ্রণকার্য শেষ হবার পরে মুদ্রিত ফর্মায় এটি আবার কিছু পরিমার্জিত হয়ে স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে পুনর্মুদ্রিত এবং জয়ন্তী-উৎসবের পরে বিশ্বভারতীর সম্মতিক্রমে প্রকাশিত হয়। জয়ন্তী উৎসর্গে প্রবন্ধের (পৃ ৬২-৯০) শেষে পরিবর্ধন ও পরিমার্জনার তারিখটি রাখা হয়নি। পুস্তিকায় (পৃ ১-২৮) লেখার শেষে সে তারিখটি (৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৮) ছাপা হয়। শেষ পরিমার্জনার বা প্রকাশের তারিখ ছাপা হয়নি।

এই পুস্তিকাটি বিভিন্ন পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) অকুণ্ঠভাবে অভিনন্দিত হয়।

২১ বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ—'পরিচয়'-সম্পাদক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধে লিখিত।

২২ ছন্দবিচার—রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের উত্তরে 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' তিন পর্ব (১৫, ১৬ ও ১৭-সংখ্যক) প্রকাশের পরে তাঁকে এ বিষয়ে একখানি পত্র লিখি। তার উত্তরে তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে যাবার আমন্ত্রণ জানান। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে কয়েক বার যে আলোচনা হয়, এই প্রবন্ধটি তারই অনুলিপি। প্রকাশের পূর্বে এটি কবির কাছে পাঠানো হয় তাঁর অনুমোদনের জন্য। আনুপূর্বিক দেখে ও কিছু অংশ সংযোজন করে কবি অনুমোদন করেন ও আবার সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানান। কেননা তখনও মতভেদের কিছু অবকাশ ছিল। এবার আলোচনা হল কলকাতায় মহর্ষিভবনে বিচিত্রা-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। এই আলোচনার ফলে কবি তাঁর অভিমত সংক্ষেপে লিখে দিলেন। এই নবলিখিত অংশটুকু মূল প্রবন্ধের পরিশিষ্ট রূপে একসঙ্গেই প্রকাশিত হল। মূলপ্রবন্ধের 'ছন্দবিচার' নামটি কবিরই দেওয়া। আর পরিশিষ্ট অংশের নাম হল 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য'। 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য' সহ সমগ্র রচনাটি সংকলিত হয় লেখকের '**ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ**' গ্রন্থে (১৯৪৫) এবং 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে (১৯৭৪)।

২৪ বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে আলোচনার ফলেও মতভেদ সম্পূর্ণ নিরস্ত হয় নি। 'কবির পুনশ্চ বক্তব্য' অংশে সে পার্থক্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। এই পার্থক্য নিরসনের অভিপ্রায়েই লিখিত হয় এই (২৪-সংখ্যক) প্রবন্ধটি।—এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য পরবর্তী (৫২-সংখ্যক) 'ছান্দসিকের নিবেদন'-নামক প্রবন্ধ।

২৫ ছন্দসংকট—দিলীপকুমার রায়-কে উদ্দেশ্য করে খোলা চিঠির আকারে লেখা অনিলবরণ রায়ের একটি পত্রপ্রবন্ধ সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

২৭ কাব্য ও ছন্দ—এই নামটি নবপ্রদত্ত। লেখাটি বস্তুতঃ দিলীপকুমার রায়কে লেখা কয়েকটি পত্রের সারসংকলন। তাঁর '**অনামী**' গ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ) 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগে একটি স্বতন্ত্র পত্ররূপে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত। 'অনামী' গ্রন্থে প্রকাশিত তারিখটি (১৩৩৮ চৈত্র) আসলে শেষ পত্রের তারিখ।

২৯ ও ৩২ 'ছন্দের গঠন' বিষয়ে এই দুটি রচনা সংকলিত ও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এই লেখকের দ্বিতীয় '**ছন্দপরিক্রমা**' (১৯৭৭) গ্রন্থে, পৃ ১৬৯-৮৪।

৩৪ ছন্দমীমাংসা—এক সময়ে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'বিতর্কিকা' নামে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছিল। এই বিভাগে কবি শ্রীমতী মমতা মিত্র (কবি সত্যেন্দ্রনাথের মাতুল কালীচরণ মিত্রের কন্যা) প্রশ্ন করেছিলেন দলবৃত্ত রীতির ছন্দে পাঁচ মাত্রার পর্ব চালানো যায় কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে রচিত হয় এই 'ছন্দমীমাংসা' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধটি পরে কিছু মন্তব্যাদিসহ সংকলিত হয়েছে এই লেখকের '**ছন্দপরিক্রমা**' (**দ্বিতীয়** ১৯৭৭) গ্রন্থে, পৃ ১৩৩-৫০।—'ছন্দের গঠন'-বিষয়ক পূর্বোক্ত দুটি রচনাও প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকার 'বিতর্কিকা' বিভাগে।

৩৬ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মাত্রাগণনা—ছান্দসিক কবি আবদুল কাদিরকে লেখা পত্রপ্রবন্ধ।

৪০ Rabindranath and Bengali Prosody—রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে *Visva-Bharati Quarterly* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার জন্য পত্রিকা সম্পাদকের অনুরোধে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত আর-এক বিশেষ সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

৪১ রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ—**'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'** গ্রন্থের (১৯৪৫) 'পরিশেষ' বিভাগে সংকলিত (পৃ ২১০-১৫)।

৪২ বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা—কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত **পদাতিক**' কাব্যের কিছু ছন্দোবৈশিষ্ট্য নিয়ে সেকালে এক বিতর্ক দেখা দেয়। সেকালের এই বিতর্কের উল্লেখ করে 'পরিচয়'-সম্পাদক এ-বিষয়ে আমার মতামত জানতে চান। আমার মতামত জানিয়েছিলাম এই প্রবন্ধটিতে। তাতেই বিতর্কের অবসান হয়। 'পরিচয়' পত্রিকার রজতজয়ন্তী-সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

৪৩ বঁগলা ছন্দ কী প্রকৃতি--হিন্দী ত্রৈমাসিক 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'-র সম্পাদক শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিপদী-র অনুরোধে মূলতঃ বাংলায় রচিত ও পরে তাঁর দ্বারাই হিন্দীতে অনূদিত।

৪৪ বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ— জগদীশ ঘোষ-প্রণীত '**আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ**' গ্রন্থে প্রকাশিত।

৪৮ বাংলা ছন্দে ধ্বনিপ্রয়োগ—এই প্রবন্ধটি 'ধ্বনিলিপি ও ধ্বনিশ্রুতি' নামে সংকলিত হয়েছে এই লেখকের '**ছন্দপরিক্রমা**' গ্রন্থে (১৯৭৭ সং), পৃ ১২১-৩১।

৫০ আধুনিক বাংলা ছন্দ—সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের অনুরোধে রচিত। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে এই পত্রিকারই আর-এক সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত এবং পরিশেষে 'দেশ' পত্রিকার '**সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ-সংকলন**' গ্রন্থে গৃহীত (১৯৮৪ ডিসেম্বর)।

৫৫ ছন্দ—জগদীশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত '**আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ**' গ্রন্থভুক্ত ছন্দের অধ্যায়টির পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

পরবর্তী ৫৬-সংখ্যক রচনাটি এটির পরিপূরক হিসাবে গ্রহণীয়।

৫৭ 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'—বর্তমান লেখকের '**ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ**' গ্রন্থের দিলীপকুমার রায়-কৃত পত্রাকার সমালোচনার ('উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত) উত্তরে লিখিত পত্রাকার প্রবন্ধ। এই উত্তরটিও প্রকাশিত হয় 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' নামেই।

৬১ ছন্দ-পরিভাষা—এটি পুনঃসংস্কৃত রূপে '**ছন্দপরিক্রমা**' গ্রন্থে (প্রথম ১৯৬৫) ছন্দ-পরিভাষা '**পরিভাষা-পরিচয়**' নামে।

৬২ ছন্দের মাত্রা ও কলা—বিশ্বভারতীর পূর্বতন ছাত্র ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দর চৌধুরীকে লেখা চিঠি। রচনার এই নামটি নূতন দেওয়া। 'ইমরোজ' মানে 'এই দিন', অর্থাৎ অদ্য today।

৬৭ ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ (১)—এই প্রবন্ধটি পরে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পাদিত '**রবিপ্রদক্ষিণ**'-নামক সংকলন গ্রন্থে (১৯৬১। ১৩৬৮ আষাঢ়) পুনঃপ্রকাশিত হয়।

৬৮ রবীন্দ্রসংগীত ও ছন্দ—'গীতবিতান' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বাণী ও বীণা' নামে।

৬৯ ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ (২)—এটি প্রকাশিত হয়েছিল অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র-সম্পাদিত '**রবীন্দ্রচর্চা**'-নামক সংকলন-গ্রন্থে।

৭০ 'ছন্দধাঁধা' - পরিচয়—রবীন্দ্রপ্রণীত 'ছন্দ' গ্রন্থের (দ্বিতীয় সং, ১৯৬২। বা ১৩৬৯ কার্তিক) 'গ্রন্থপরিচয় বিভাগে সংকলিত।

৭২ পয়ার-পরিচয়—পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে '**ছন্দপরিক্রমা**' গ্রন্থে (প্রথম ১৯৬৫ মে) সংকলিত।

৭৩ বাংলা ছন্দের প্রাথমিক পরিচয়—এটি '**ছন্দপরিক্রমা**' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ (পৃ ১-৫০) রূপে প্রকাশিত হয় (১৯৬৫ মে)। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এই লেখকপ্রণীত '**ছন্দ-জিজ্ঞাসা**' গ্রন্থের (১৯৭৪) ভূমিকা, পৃ ৪।

৭৬-৭৭ জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার চিঠি—এই দুটি চিঠি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-র '**কবিতার ক্লাস**' গ্রন্থের (প্রথম সং ১৩৭৬ মাঘ ; চতুর্থ সং, ১৩৮২ ফাল্গুন) পরিশিষ্টে।

৭৯ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-পরিচয়—এই প্রবন্ধটি 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দোরীতি ও ছন্দোরূপ' নামে। এটি পরে অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য-সম্পাদিত '**বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন**' গ্রন্থের (১৯৬৬। বাং ১৩৭৩ আষাঢ়) পরিশিষ্ট রূপে পুনঃপ্রকাশিত হয় এই সংক্ষিপ্ত নামে। আরও কিছুকাল পরে এটি বেশ পরিমার্জিত রূপে সংকলিত হয় অধ্যাপক সুহৃদকুমার ভৌমিক-এর **'বাঙ্‌লা ছন্দের বিবর্তন'** গ্রন্থের (১৯৭৮। বাং ১৩৮৫ আষাঢ়) 'অনুষঙ্গ' বিভাগে। এই গ্রন্থে প্রবন্ধটির নাম হয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ-পরিচয়'।

৮১ বাংলা ছন্দের পরিভাষা—দিলীপকুমার রায়-কে লেখা (১৩৭৩ বৈশাখ ১৭) এই পত্রালোচনাটি সংকলিত হয় তাঁর '**ছান্দসিকী**' গ্রন্থের (দ্বিতীয় সং ১৯৬৮ এপ্রিল। ১৩৭৫ বৈশাখ) 'পরিশিষ্ট-ক' বিভাগে এবং বর্তমান লেখকের '**ছন্দ-জিজ্ঞাসা**' গ্রন্থের (১৯৭৪ এপ্রিল। ১৩৮১ বৈশাখ ১৫) 'অনুষঙ্গ' বিভাগে, পৃ ৪২৮-৩৮।

৮২ জয়দেবী ছন্দ—দিলীপকুমার রায়-কে লেখা (১৩৭৩ ভাদ্র ২৮) এই পত্রপ্রবন্ধটিও সংকলিত হয় এই লেখক-প্রণীত '**ছন্দ-জিজ্ঞাসা**' গ্রন্থের 'অনুষঙ্গ' বিভাগে, পৃ ৪৪১-৬৬।

৮৮ বাংলা ছন্দচর্চার ধারা-এই রচনাটি অধ্যাপক আনন্দমোহন বসু-র '**বাংলা পদাবলীর ছন্দ**'-নামক গবেষণাগ্রন্থের (১৯৬৮। বাং ১৩৭৫ আষাঢ়) ভূমিকা রূপে লিখিত। ভূমিকার নাম ছিল 'নান্দীবচন'।

৮৯ পয়ারের উৎস-সন্ধানে—এই প্রবন্ধের বিবরণ দ্রষ্টব্য পরবর্তী ১০৩ সংখ্যক প্রবন্ধের প্রসঙ্গ-পরিচয়।

৯০ মেঘদূত-অনুবাদ ও বাংলা মন্দক্রান্তা—দ্রষ্টব্য পরবর্তী ৯৪-সংখ্যক প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ পরিচয়।

৯১ বাংলা ছন্দে রীতিলঙ্ঘন—এই প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে এই লেখকের '**ছন্দপরিক্রমা**' (দ্বিতীয়, ১৯৭৭।) গ্রন্থে, পৃ ১৫১-৬৮।

৯২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ছন্দ—এই প্রবন্ধের রচনাসমাপ্তির তারিখ ১৩৭২ চৈত্র ৫। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (বর্ষ ১৩৭০, সংখ্যা ১-৪) প্রকাশকাল ১৩৭৬ ভাদ্র।

৯৪ মেঘদূত-অনুবাদের ছন্দ—এই রচনাটি মূলতঃ যোগীনাথ মজুমদার-অনুদিত '**মেঘদূত**' গ্রন্থের (১৩৭৫ ফাল্গুন ২০) এই লেখক-রচিত ভূমিকার (রচনাকাল ১৯৬৮ । বাং ১৩৭৫ যাঢ়) অংশবিশেষ। পরে বহুলাংশে পরিবর্ধিত রূপে বর্তমান লেখকের '**ভারতাত্মা কবি কালিদাস**' গ্রন্থে (১৯৭৩ জানু) সংকলিত।—দ্রষ্টব্য পুর্বোক্ত ৯০-সংখ্যক প্রবন্ধ।

৯৫ বাংলায় জাপানি ছন্দ—এটি পরে সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের '**ছন্দ**' গ্রন্থের (১৯৭৬ জানু। ১৩৮২ মাঘ) '**পাঠপরিচয়**' বিভাগে, পৃ ২৮২-৯১।

৯৭ ছন্দ—এই রচনাটির ইতিহাস দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত ৪৪ ও ৫৫-সংখ্যক রচনার প্রাসঙ্গিক 'তথ্যনিচয়ে' এবং 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থের 'নিবেদন' (এই গ্রহে পুনর্মুদ্রিত) অংশে। জগদীশচন্দ্র ঘোষের '**আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ**' পুস্তকের ৪৬তম সংশোধিত সংস্করণে (১৩৮০ মাঘ) এই ছন্দ-অধ্যায়টিকে পুনরায় বহুল পরিমাণে পরিমার্জিত করে ও নূতন ভাবে সাজিয়ে প্রায় আধুনিকতম রূপ দেওয়া হয়েছে। ছন্দ-অধ্যায়টির এই শেষ পরিমার্জিত রূপ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ'-এর (৪৬তম সং ১৩৮০ অগ্রহায়ণ) 'নিবেদন'-এ প্রকাশিত অনিলচন্দ্র ঘোষের অভিমত এবং '**ছন্দ-জিজ্ঞাসা**' গ্রন্থের (১৩৮১ বৈশাখ) ভূমিকায় (পৃ ৪) প্রকাশিত এই লেখকের মন্তব্য।

৯৯ পরিভাষা-বিচার—রচনাসমাপ্তির তারিখ ১৩৮০ আশ্বিন ২০ বিজয়া দশমী। এটি 'ভাষা' পত্রিকায় (প্রথম বর্ষ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৮০ জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা) প্রকাশিত হয় 'ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের 'অনুষঙ্গ' রূপে। এটি পরে অংশতঃ মার্জিত ও বর্ধিত হয়ে '**ছন্দ-জিজ্ঞাসা**' গ্রন্থে (১৩৮১ বৈশাখ) সংকলিত হয় 'পরিভাষা-পরিচয়' বিভাগের 'অনুষঙ্গ' (পৃ ৪২১-২৭) হিসাবে।

১০০ বাংলা ছন্দসাহিত্য—এই প্রবন্ধটি আসলে '**আধুনিক বাংলা ছন্দসাহিত্য**' নামে একটি গ্রন্থপরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত কাঠামো মাত্র। পরিকল্পিত মূল গ্রন্থটি পরে প্রকাশিত হয় ১৩৮০ শ্রাবণ ৩০ (ইং ১৯৮০ আগস্ট ১৫) তারিখে। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য উক্ত গ্রন্থের 'নিবেদন', পৃ ১৯।

১০১-১০২ সিলেব্‌ল্-কে 'দল' বলি কেন এবং সিলেব্‌ল্-কে 'অক্ষর' বলি না কেন—এই দুটি প্রবন্ধ রচিত হয় অমূল্যধনের 'Syllable শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ' নামে এক প্রবন্ধের ('কালি ও কলম', ১৩৮১ আশ্বিন) প্রতিবাদে। এই দুটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এই লেখকের '**ছন্দপরিক্রমা**' (দ্বিতীয়, ১৯৭৭) গ্রন্থে পৃ ১৮৫-২৩০। আর অমূল্যধনের প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে তাঁর '**বাংলা ছন্দের মূলসূত্র**' গ্রন্থে (সপ্তম সং, ১৯৮৩), পৃ ২৪৬-৪৮।

১০৩ পয়ারের উৎস-সন্ধানে—এই প্রবন্ধটি মূলতঃ রচিত হয় কবি সুশীল রায়-সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের জন্য। কিন্তু গ্রন্থপ্রকাশে বিলম্ব ঘটায় সুশীল রায় নিজেই উদ্‌যোগী হয়ে এটিকে বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৭৫ মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এই সুযোগে প্রবন্ধটিকে বহুল পরিমাণে পরিমার্জনা ও কিছু

পরিবর্ধন করা হয়। এই পরিমার্জিত প্রবন্ধটিকে উক্ত '**বাংলা কবিতা-প্রসঙ্গ**' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধের (পৃ ১-৪২) মর্যাদা দেওয়া হয়। গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৭৬ জুন (বাং ১৩৮৩ আষাঢ়)।

নূতন ছন্দ-পরিক্রমা • প্রবোধচন্দ্র সেন

॥ ই-বুকটি সমাপ্ত হল ॥